

বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার

শ্বেতপত্র ২০২৪

একটি উন্নয়ন আখ্যানের ব্যবচ্ছেদ

ঢাকা ২০২৪

বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার

শ্বেতপত্র ২০২৪

একটি উন্নয়ন আখ্যানের ব্যবচ্ছেদ

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০২৫

© গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলা সংস্করণের প্রকাশক
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

উল্লেখ্য যে, এই নথির প্রতিটি অধ্যায়ে প্রকাশিত মতামত লেখকদের ব্যক্তিগত। এর সাথে তাঁদের প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মতামতের কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই।

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি

সভাপতি

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)
এবং
আহ্বায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)*

ড. এ কে এনামুল হক
ডেপুটি ভাইস চ্যান্সেলর, ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ শাখা
এবং পরিচালক, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ, ঢাকা

ড. ইমরান মতিন
নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অফ গভার্ন্যান্স
অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি)

ড. কাজী ইকবাল
গবেষণা পরিচালক
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

ড. জাহিদ হোসেন
সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ
ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বাংলাদেশ

ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, রিফিউজ অ্যান্ড মাইগ্রেশন
মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু)

ড. ম তামিম
অধ্যাপক
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ
অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
নির্বাহী পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর
ডেভেলপমেন্ট (র‌্যাপিড)

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি
এবং কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ফেরদৌস আরা বেগম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)

অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোমী
অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. সেলিম রায়হান
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
নির্বাহী পরিচালক, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর
ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)

*শ্বেতপত্র ২০২৪ প্রস্তুতকালে সদস্যবৃন্দের তৎকালীন পদ-পদবী ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণা ও কারিগরি সহায়তা দল

প্রধান

তৌফিকুল ইসলাম খান, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সিপিডি

সদস্যবৃন্দ

নাজীবা মোহাম্মদ আলতাফ, সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি

মমতাজুল জাম্মাত, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি

শৌর্য তালুকদার, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি

নাইমা জাহান তুষা, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি

আনিকা তাসনিম অপিতা, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি

সাবা শবনম, প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি

সৈকত ইসলাম, রিসার্চ ইন্টার্ন, সিপিডি

সারাহ সাবিন খান, হেড অফ সল্যুশন ম্যাপিং, এক্সেলারেটর ল্যাব, ইউএনডিপি বাংলাদেশ

ইফফাত আনজুম, হেড অফ এক্সপ্লোরেশন, ইউএনডিপি বাংলাদেশ

প্রচার ও প্রশাসনিক সহায়তা দল

প্রধান

তারামুম জিনান, সিনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি

সদস্যবৃন্দ

অত্র ভট্টচার্য, যুগ্ম পরিচালক, সংলাপ ও প্রচার বিভাগ, সিপিডি

আ হ ম আশরাফুজ্জামান, যুগ্ম পরিচালক, আইটি বিভাগ, সিপিডি

মো. রিফাত বিন আওলাদ, সংলাপ সহযোগী, সিপিডি

নাহিয়ান রায়হানা প্রাপ্তি, প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি

জেরিন তাসনিম, এক্সিকিউটিভ অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি

মাইশা সাদিয়া, প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি

অনুবাদকবৃন্দ

রাজিব আহমেদ, ডেপুটি হেড অফ রিপোর্টিং (অনলাইন), প্রথম আলো

প্রতীক বর্ধন, সিনিয়র সাব-এডিটর, প্রথম আলো

সাহানোয়ার সাইদ শাহীন, সিনিয়র সাংবাদিক, দৈনিক কালের কণ্ঠ

সুশান্ত সিনহা, স্পেশাল কন্টেন্টসপন্ডেন্ট, একাত্তর টেলিভিশন

১৬. নির্বাচিত অধ্যায়সমূহের সংশোধিত খসড়া আলোচনার জন্য শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির ১৬তম সভা, ১৪ নভেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

১৭. নির্বাচিত অধ্যায়সমূহের সংশোধিত খসড়া আলোচনার জন্য শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির ১৭তম সভা, ১৭ নভেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

১৮. শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির ১৮তম সভা, ২৪ নভেম্বর ২০২৪, ব্র্যাক সেন্টার ইন।

নীতি পরামর্শ সভাসমূহ

১৯. জুলাই আন্দোলনের শিক্ষার্থী সমন্বয়কারীদের সাথে পরামর্শ সভা, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

২০. অনাবাসিক গবেষক ও শিক্ষাবিদদের সাথে পরামর্শ সভা, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (ভার্চুয়াল)।

২১. ইউএনডিপি ও জিইডি-র সাথে পরামর্শ সভা, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

২২. সরকারি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের ফোকাল পয়েন্টদের সাথে পরামর্শ সভা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

২৩. জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ সভা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

২৪. তরুণ অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ সভা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

২৫. তরুণ উদ্যোক্তাদের সাথে পরামর্শ সভা, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

২৬. শ্রমিক ইউনিয়নসমূহের সাথে পরামর্শ সভা, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

২৭. নির্বাচিত অর্থনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ সভা, ১ অক্টোবর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

২৮. বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে পরামর্শ সভা, ১ অক্টোবর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

২৯. নাগরিক সমাজের সংগঠনসমূহের সাথে পরামর্শ সভা, ৭ অক্টোবর ২০২৪, সম্মেলন কক্ষ, এনইসি, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৩০. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের বাংলাদেশী পেশাজীবীদের সাথে পরামর্শ সভা, ৭ অক্টোবর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৩১. বাংলাদেশে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের সাথে পরামর্শ সভা, ৮ অক্টোবর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৩২. ইউনিসেফ বাংলাদেশের সাথে পরামর্শ সভা, ১৪ অক্টোবর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৩৩. জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের সাথে পরামর্শ সভা, ২১ অক্টোবর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৩৪. ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সাথে পরামর্শ সভা, ৩১ অক্টোবর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৩৫. আইসিটি খাতের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পরামর্শ সভা, ৬ নভেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৩৬. উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ সভা, ৩ নভেম্বর ২০২৪, সম্মেলন কক্ষ, এনইসি, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৩৭. বাংলাদেশে বিদেশি মিশন প্রধানদের সাথে পরামর্শ সভা, ৪ নভেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৩৮. জাতিসংঘ সংস্থা ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বাংলাদেশস্থ প্রধানদের সাথে পরামর্শ সভা, ৫ নভেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৩৯. যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের সাথে পরামর্শ সভা, ১৮ নভেম্বর ২০২৪ (অনলাইন)।

কারিগরি পরামর্শ সভাসমূহ

৪০. জাতীয় হিসাবরক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ সভা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৪১. বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সাথে পরামর্শ সভা, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, আইএমইডি কার্যালয়, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৪২. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর সাথে পরামর্শ সভা, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, বিবিএস।

৪৩. বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যিক খাত বিষয়ক পরামর্শ সভা, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৪৪. নারী প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ সভা, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৪৫. সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ক পরামর্শ সভা, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৪৬. প্রতিবন্ধিতা ক্ষেত্রে কর্মরত পেশাজীবীদের সাথে পরামর্শ সভা, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সভাকক্ষ ১১, ভবন ৪, পরিকল্পনা কমিশন।

৪৭. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত বিষয়ক পরামর্শ সভা, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৪৮. এসএমই উদ্যোক্তাদের সাথে পরামর্শ সভা, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, এসএমই ফাউন্ডেশন।

৪৯. গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেডের (জিটিসিএল) সাথে পরামর্শ সভা, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

৫০. অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ক পরামর্শ সভা, ১ অক্টোবর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৫১. সরকারি ব্যয় বিষয়ক পরামর্শ সভা, ৬ অক্টোবর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৫২. বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাথে পরামর্শ সভা, ৭ অক্টোবর ২০২৪।

৫৩. কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে পরামর্শ সভা, ৮ অক্টোবর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৫৪. জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে পরামর্শ সভা, ১৭ অক্টোবর ২০২৪, সমন্বয় কক্ষ, নাজিয়া সালমা ভবন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

জনশুনানি

৫৫. সিলেটে জনশুনানি, ২ অক্টোবর ২০২৪, নির্বাণা ইন, সিলেট।

৫৬. চট্টগ্রামে জনশুনানি, ৫ অক্টোবর ২০২৪, দ্য পেনিনসুলা, চট্টগ্রাম।

৫৭. রাজশাহীতে জনশুনানি, ৯ অক্টোবর ২০২৪, গ্র্যান্ড রিভার ভিউ হোটেল, রাজশাহী।

মিডিয়া ব্রিফিং

৫৮. “বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার স্বেতপত্র” প্রকাশ বিষয়ক সংবাদ সম্মেলন, ২ ডিসেম্বর ২০২৪, সম্মেলন কক্ষ, এনইসি, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

মুখবন্ধ

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা অন্তর্বর্তী সরকারের উপর বিবিধ চাপে পীড়িত একটি অর্থনীতির বোঝা চেপেছে। যেখানে, উদ্বেগের অন্যতম কারণ—সম্পদ বন্টনের অন্যায়তা ও বাড়তে থাকা বৈষম্য।

সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানব উন্নয়নসহ নানা ক্ষেত্রে অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ দৃশ্যমান। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে জোর দিতে গিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

সংকটের গভীরতা অনুভব করে, অন্তর্বর্তী সরকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর ‘শ্বেতপত্র’ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। এ জন্য ২০২৪ সালের ২৯ আগস্ট প্রজ্ঞাপন জারি করে, শ্বেতপত্র কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তিন মাস সময় নিয়ে, বিনাপারিশ্রমিকে, সামষ্টিক অর্থনীতির এই বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে।

শ্বেতপত্রের নকশা

‘শ্বেতপত্র’ তৈরির মানে হলো অর্থনীতির ক্ষত আরও স্পষ্ট-স্বচ্ছ করে তুলে ধরা। কাজটি করা হয়েছে সমন্বিত উপায়ে। শ্বেতপত্রে গবেষণাগত প্রমাণ এবং অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা অংশীজনদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। শুধু কী কী হয়েছে, তার বিবরণ নয়; বরং কেন হয়েছে, তাও গভীর বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নিয়েও সীমিত পরিসরে আলোচনা রয়েছে।

প্রতিবেদনটি সরকার গ্রহণ করলেও আধেয়র (কনটেন্ট) দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে শ্বেতপত্র কমিটির। একই সঙ্গে, প্রতিবেদনে উল্লেখিত নীতি পরামর্শ ও সুপারিশমালা বাছাই-বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার পুরোপুরি স্বাধীন।

প্রতিবেদনটির আওতা এবং বিশ্লেষণের গভীরতা আরও বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ ছিল। এ ব্যাপারে শ্বেতপত্রের লেখকেরা ওয়াকিবহাল। কিন্তু, সময় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্তের অভাবে তা সম্ভব হয়নি—। তারপরও, অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি জোরাল ভূমিকা রাখতে পারে। সরকার গঠিত বিভিন্ন কমিশন-কমিটি-টাস্কফোর্সের জন্য শ্বেতপত্রটি হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

বিস্তৃত ও ব্যাপক অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্লেষণ ও আলোচনা প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে শ্বেতপত্রটি প্রস্তুত হয়েছে। প্রক্রিয়াটি মোটাদাগে তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—এক, দল গঠন এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ; দুই, উপাত্ত সংকলন, তথ্য সংগ্রহ ও সংলাপ এবং তিন, একত্রীকরণ, খসড়া তৈরি ও প্রতিবেদন যাচাই ও গ্রহণ।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে মোট ৬০টি পরামর্শ সভায় বসতে হয়েছে। শ্বেতপত্র কমিটির সদস্যরা কর্মপরিকল্পনা ও আলোচনার জন্য ৬১৮ বার বৈঠক করেছেন। নির্দিষ্ট নীতি-সম্পর্কিত পরামর্শ সভা হয়েছে ২২টি। কারিগরি পরামর্শ সভা ও মূল তথ্য প্রদানকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ১৭টি। ঢাকার বাইরে সিলেট, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ৩টি গণশুনানি হয়েছে। বৈঠকের তালিকা প্রতিবেদনে আলাদাভাবে সংযুক্ত রয়েছে।

এর বাইরে, জনমত আহ্বানের পর ই-মেইল, চিঠি এবং শ্বেতপত্র কমিটির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পেজে ৩৪০ জন নাগরিক মতামত জানিয়েছেন।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ফলাফল

শ্বেতপত্র কমিটি সুনির্দিষ্ট কিছু অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছে। এই প্রতিবেদনের ২৩টি অধ্যায় মোটাদাগে পাঁচ ভাগে বিভক্ত— এক, সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিষয়াবলি; দুই, কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ; তিন, সামাজিক বিষয়াদি; চার, প্রাতিষ্ঠানিক দিক; এবং পাঁচ, নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি।

শ্বেতপত্রের পর্যালোচনায় অর্থনীতির চলমান সংকট এবং জীবনযাত্রার কষ্টকর দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। তথ্য-উপাত্তে কারসাজি, আর্থিক ব্যবস্থাপনার দুর্দশা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় খামখেয়ালিপনা, সরকারি অর্থায়নে চুরি ও বৈদেশিক খাতে ভারসাম্যহীনতার কারণে অর্থনীতিতে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে— শ্বেতপত্রের লেখকদের অনুসন্ধানে তা সামনে এসেছে। মোটের উপর, অর্থনীতির ক্ষত যতটা গভীর বলে মনে করা হতো প্রকৃত গভীরতা তার চেয়েও অনেক বেশি।

বিগত সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপজীব্য ছিল কারসাজিপূর্ণ পরিসংখ্যান প্রসূত উন্নয়ন-বয়ান। তবে, বানোয়াট বয়ান দিয়ে সব সত্য আড়াল করা যায়নি। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাতে বিনিয়োগ ও রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে স্ববিরতা ঠিকই প্রকাশ পেয়েছে। একইভাবে, সামাজিক সুরক্ষা ও মানব উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগের অভাবও আড়ালে রাখা যায়নি। দারিদ্র্য বিমোচন নিয়ে গর্ব করা হয়েছে। কিন্তু, পরে দেখা গেল; তা আসলে মিছে। বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, কীভাবে ক্ষমতাসীনদের চাহিদা মাফিক পরিসংখ্যান বদলে দেওয়া হতো।

অর্থনৈতিক সূচকের প্রতারণামূলক উপস্থাপন ২ খাতে বড় সংকট তৈরি করেছে— এক, আর্থিক খাত (ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পুঁজিবাজার ইত্যাদি); দুই, জ্বালানি খাত। অতিরিক্ত ব্যয়ে বড় বড় প্রকল্প নেওয়া এবং অর্থপাচারও সূচকের প্রতারণামূলক উপস্থাপনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

সম্প্রতি, বিশ্বে যে দেশগুলোর উন্নয়ন নিয়ে সবচেয়ে বেশি বড়াই করা হয়েছে, তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। কিন্তু, বিগত সরকারের বানানো উন্নয়নের গল্পটির ভিত্তি দুর্বল এবং নানা সমস্যায় আক্রান্ত। ভাবনার বিষয় হলো, কিছু উন্নয়ন সহযোগী এই বানোয়াট বয়ানই বিশ্বাস করেছিল। তাহলে, বিগত সরকারের সাজানো সবকিছু কেন উল্টে গেল— এ পর্যায়ে এই মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি উত্তর দাবি করে।

লুটপাটতন্ত্রের উত্তরাধিকার

সর্বশেষ প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, দেড় দশকের বাধাহীন দুর্নীতি, জনগণের সম্পদ অপব্যয় এবং ক্ষমতার অপব্যবহার আজকের পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার অভাবে অপশাসন দীর্ঘায়িত হয়েছে। যার মূলে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের পাতানো-একতরফা-প্রহসনের জাতীয় নির্বাচন। শুধু জাতীয় নির্বাচনই

নয়, কেন্দ্রীয় একক কর্তৃত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনব্যবস্থাও ধ্বংস করা হয়েছিল। ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে আমলাদের একাংশ ও মুষ্টিমেয় কিছু ব্যবসায়ীর গোপন যোগসাজশে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখায় বেশি উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল।

রাজনীতিবিদ-আমলা-ব্যবসায়ীদের যোগসাজশে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অনন্যতা হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একইসঙ্গে, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক-নীতিগত সংস্কার বাধার মুখে পড়েছে।

এই অবৈধ যোগসাজশের ভয়ানক পরিণতি হিসেবে রাষ্ট্রের তিন বিভাগ, তথা আইন-নির্বাহী-বিচার বিভাগের ভূমিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম-নাগরিক সমাজ-বেসরকারি খাত কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। তাদের বেশিরভাগই টিকে থাকার চেষ্টায় ভীত হয়ে সেলফ সেন্সরশিপ বা স্বনিয়ন্ত্রণের পথে হাঁটা শুরু করে।

বিগত শাসনামল শুরুতে ছিল স্বজনতোষী পুঁজিবাদ, ক্রমেই তারা অলিগার্কদের (কতিপয় ক্ষমতাবান) নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। রাজনৈতিক শাসন-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় অলিগার্কদের শক্তি-প্রভাব ক্রমেই বাড়তে থাকে। ফলে, দ্রুতই সরকার নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের সার্বভৌমত্ব হারায়। নীতিনির্ধারণে সরকার নয়, অলিগার্করাই নিয়ামক হয়ে ওঠে। সরকারি নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কায়মি স্বার্থ। অলিগার্কদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি আড়াল করতেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের বানোয়াট বয়ান তৈরি করা হয়।

রাজনীতিবিদ-আমলাদের একাংশ-কিছু ব্যবসায়ীর যোগসাজশে দুর্নীতির সংস্কৃতি আরও বিস্তৃত হয়। ফলে, বহুত্ববাদী সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। জাতির উন্নয়নে যে অংশীজনরা ভূমিকা রাখতে পারতেন, তাঁদেরকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। শেষে এমন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয় যে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে তৎকালীন সরকারপ্রধান শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের সুযোগ পর্যন্ত পাননি।

দুর্নীতি-প্রকাশ

বিগত সরকারের আমলে রাষ্ট্রব্যবস্থার গভীরে প্রোথিত হয় দুর্নীতি, এর ধারাবাহিকতা অন্তর্বর্তী আমলেও জারি থাকে। বিশেষ করে সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি নজরে আসে। শ্বেতপত্র কমিটির চিহ্নিত দুর্নীতির বড় উৎসগুলো হলো—

১. ব্যাংক ঋণ কেলেঙ্কারি: ভুয়া ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ঋণ দেওয়া, ঋণের বিপরীতে যথেষ্ট জামানত না রাখা।

২. ব্যাংকের মালিকানা পরিবর্তন: রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে চাপের মুখে ব্যাংকের মালিকানা পরিবর্তন।

৩. অর্থপাচার: অবৈধ উপায়ে অর্জিত বিপুল অর্থ দেশের বাইরে পাচার।

৪. রাজনৈতিক বিবেচনায় অলাভজনক প্রকল্প: অলাভজনক প্রকল্প নিয়ে জনগণের করের টাকা অপব্যয়। পাশাপাশি প্রকল্প দীর্ঘায়িত করে বারবার ব্যয় বৃদ্ধি।

৫. অতিমূল্যায়িত প্রকল্প: অর্থ চুরির উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকল্প ব্যয় বেশি ধরা।

৬. প্রকল্প অনুমোদের পর ব্যয়বৃদ্ধি: অনুমোদিত প্রকল্পে কৃত্রিমভাবে ব্যয় বাড়িয়ে অর্থ সরানোর সুযোগ সৃষ্টি।

৭. প্রতিযোগিতাহীন দরপত্র: স্বজনতোষণ এবং বিশেষ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা দেওয়ায় প্রকৃত ব্যবসায়ীরা সরকারি কাজ বঞ্চিত।

৮. অপ্রয়োজনীয় ও যেনতেনভাবে তৈরি প্রকল্প: দুর্বল সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প নিয়ে বারবার সময়-ব্যয় বৃদ্ধি।

৯. প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় স্বজনপ্রীতি: মেধা-দক্ষতাকে গুরুত্ব না দিয়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম।

১০. ভূমি ও সম্পদ অবৈধভাবে অধিগ্রহণ: অবৈধ উপায়ে ভূমি-সম্পদ জন্ম অথবা অধিগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি টাকা অপব্যয়।

১১. ভূমি অধিগ্রহণ তহবিলের অপব্যবহার: রাজনৈতিক প্রভাবহীন জমিমালিকদের অন্যায় অধিগ্রহণ চুক্তিতে বাধ্য করে সরকারি টাকার যথেষ্ট ব্যবহার।

১২. বেশি দামে পণ্য ও সেবা ক্রয়: ক্ষুদ্র আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থে বেশি দামে সরকারি পণ্য ও সেবা ক্রয়ের চুক্তি।

১৩. প্রকল্পের টাকার অপব্যবহার: গাড়ি কেনা, ভ্রমণ ব্যয় ও প্রকল্পের অন্যান্য সম্পদ ব্যক্তি ও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার।

১৪. ঘুষ: সরকারি কাজে ঘুষ লেনদেন রীতিতে পরিণত হয়। ফাইল সামনে আগাতে অথবা আনুকূল্য পেতে ঘুষ আবশ্যিক।

১৫. জনগণের টাকার অপ-বরাদ্দ: উন্নয়নকাজের বরাদ্দ ব্যবহৃত হয় নেতাদের রাজনৈতিক-ব্যক্তিগত কাজে।

১৬. প্রভাবশালীদের জন্য কর অব্যাহতি: সরকারি করনীতির ফায়দা লুটেছে প্রভাবশালী গোষ্ঠী।

১৮. বিশৃঙ্খল সরবরাহ ব্যবস্থা: পণ্য সরবরাহে কারসাজির মাধ্যমে অন্যায্যভাবে দাম বৃদ্ধি।

১৯. আর্থিক সুবিধার জন্য গোপন তথ্য জানিয়ে দেওয়া: আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত আগেভাগেই কিছু ব্যক্তি-গোষ্ঠীকে জানিয়ে দেওয়া হতো।

২০. যোগসাজশ করে দুর্নীতি: সরকারি-বেসরকারি কর্মীদের অনেকেই নিজস্ব স্বার্থ হাসিলে যোগসাজশ করতেন।

২১. চাঁদাবাজি: জোর করে অর্থ আদায় ছিল নিয়মিত ঘটনা।

২২. একচেটিয়া বাজারব্যবস্থা তৈরি করে দুর্নীতি: কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কারসাজি করে একচেটিয়া বাজার তৈরি করা হয়।

২৩. আগাম তথ্য জানিয়ে দুর্নীতি: কিছু ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আগাম জেনে (যেমন – সম্ভাব্য ভূমি অধিগ্রহণে), ব্যাপক সুবিধা আদায় করতেন।

২৪. তথ্য আড়াল করে দুর্নীতি: অংশীজনদের বিভ্রান্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন বাঁ অপতথ্য প্রচার (যেমন- পুঁজিবাজার)।

২৫. ব্যবস্থা গ্রহণে নিষ্ক্রিয়তা: ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবস্থা নিতে দেরি করে রেন্ট সিকিংয়ের (নতুন সম্পদ তৈরি না করে সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবেশের কারসাজি করে নিজের বিদ্যমান সম্পদ বাড়ানোর কাজ) সুযোগ করে দেওয়া।

২৬. পদ ও পদোন্নতিতে দুর্নীতি: পদোন্নতি ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা-দক্ষতার বদলে ব্যক্তিগত যোগাযোগ-ঘুষের মুখ্য ভূমিকা।

২৭. 'কমিশন' ভাগাভাগি: অনুমোদনের ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থদের কমিশন (কাজের অর্থমূল্যের একটি অংশ) দাবি।

২৮. রাজনৈতিক আনুকূল্যের দুর্নীতি: সম্পদ বরাদ্দ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আনুকূল্য-আনুকূল্য নিশ্চিত করা।

২৯. আইন করার ক্ষেত্রেও দুর্নীতি: নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে সুবিধা দিতে আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন।

শ্বেতপত্রের পর্যালোচনায় ব্যাংক খাত সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত। এরপরে রয়েছে ভৌত অবকাঠামো এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত। এছাড়া, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতেও ব্যাপক দুর্নীতির নজির রয়েছে।

ব্যাপক দুর্নীতিচর্চার এই তালিকাটি অসমাপ্ত। এর সঙ্গে আরও অনেক কিছুই যোগ করা যায়। আসল কথা হলো, দুর্নীতির চর্চা রোধে প্রক্রিয়াগত সংস্কার ও জবাবদিহিতার কৌশল তৈরি করা জরুরি। যার মাধ্যমে, সরকারের প্রতি বিশ্বাস ও অর্থনীতির সহায়ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

দুর্নীতির মাত্রা

প্রতারণামূলক চর্চার মাধ্যমে সংঘটিত দুর্নীতির পরিমাণ অবাক করার মতো। শ্বেতপত্র কমিটির তৈরি করা কিছু প্রক্ষেপণ তুলে ধরা হলো—

রাজস্বের ক্ষতি ও আর্থিক অপচয়: প্রক্রিয়াগতভাবে কর ফাঁকি-করছাড়ের অপব্যবহার-সরকারি ব্যয়ের দুর্বল ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ থেকে বঞ্চিত এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া স্থবির করেছে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বছরে গড়ে ১৬ বিলিয়ন ডলারের (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ৯২ হাজার কোটি টাকা) সমপরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে। যা বাংলাদেশে সে সময়ে আসা বিদেশি বিনিয়োগ ও বৈদেশিক সহায়তার দ্বিগুণের বেশি। করছাড় কমিয়ে দিলে বাংলাদেশ শিক্ষা খাতে দ্বিগুণ এবং স্বাস্থ্য খাতে তিনগুণ বিনিয়োগ করতে পারত। এতে স্পষ্ট, দুর্নীতির কারণে দেশ কত বড় সুযোগ হারিয়েছে!

সরকারি বিনিয়োগ: দুর্নীতির কারণে বড় বড় সরকারি প্রকল্পে গড়ে ব্যয় বেড়েছে ৭০ শতাংশ। প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ বেড়েছে গড়ে পাঁচ বছরের বেশি। বিগত ১৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও উন্নয়ন প্রকল্পে ৬০ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৭ লাখ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ থেকে ২৪ বিলিয়ন ডলার (১ লাখ ৬১ হাজার থেকে ২ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা) ক্ষতি হয়েছে রাজনৈতিক চাঁদাবাজি, ঘুষ ও প্রকল্পের ব্যয় বাড়িয়ে ধরার কারণে। ভূমি অধিগ্রহণের সময় তহবিলের অপব্যবহার এবং রাজনৈতিক বিবেচনা অথবা স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পদের অপচয় আরও বাড়িয়েছে। ফলে ভৌত অবকাঠামো ও আর্থসামাজিক বিনিয়োগের যথাযথ সুফল পাওয়া যায়নি।

বিশৃঙ্খল সরবরাহ ব্যবস্থা: দেশে কৃষিপণ্যের উৎপাদন পরিসংখ্যান ছিল কারসাজিপূর্ণ। চাহিদাও কম দেখানো হয়েছে। ফলে চাল, ভোজ্যতেল, গমের মতো নিত্যপণ্যের বাজার অস্থির হয়েছে। অনিশ্চিত ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত ক্রয়নীতি প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিয়েছে, বিপরীতে ভুগতে হয়েছে ক্রেতাদের। পণ্যের মজুত কতটা আছে, তা পর্যবেক্ষণে সরকারি ব্যবস্থা নেই। যথাসময়ে আমদানী হয়নি বা বাড়িয়ে আমদানী করা হয়েছে। ফলে বাজারের বিশৃঙ্খলা আরও বেড়েছে।

ব্যাংক ও আর্থিক খাত: ব্যাংক খাতে ঋণ দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক প্রভাবে। ফলে মন্দ ঋণ বেড়েছে। ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত জমে থাকা মোট মন্দ ঋণের পরিমাণ ১৪টি মেট্রোরেল অথবা ২৪টি পদ্মা সেতুর নির্মাণ ব্যয়ের সমান। খেলাপি ঋণ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি এবং বড় বড় ঋণ কেলেঙ্কারি আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নষ্ট করেছে। পাশাপাশি উৎপাদনশীল খাত থেকে অর্থের প্রবাহ অন্যদিকে ঘুরে গেছে।

শ্রমিকদের অভিবাসন: বিগত এক দশকে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো ভিসা কেনার নামে ১৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে পাঠিয়েছে। এই অর্থ উত্তরা-মতিঝিল পথে মেট্রোরেলের (লাইন-৬) নির্মাণ ব্যয়ের চার গুণ। অভিবাসনের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দুষ্টিচক্রের আধিপত্য ও শোষণমূলক নীতি, শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সের সম্ভাবনা অসাধু চক্রের কারণে বাড়তে পারেনি।

সামাজিক সুরক্ষা: সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি-অপব্যয় আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত লাখে মানুষকে বঞ্চিত করেছে। ২০২২ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় থাকা ৭৩ শতাংশ মানুষ আসলে দরিদ্র নন। ২০১৬ সালে এই হার ছিল ৬৬ শতাংশ। অন্যদিকে, প্রায় দুই কোটি মানুষ দুই দিন কাজ করতে না পারলেই দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যান। সব মিলিয়ে বলা যায়, সুরক্ষা কর্মসূচিতে দুর্নীতির কারণে লাগামহীন অন্যায়তা।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা তহবিলেও ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। পরিবেশ দূষণ পরিস্থিতির আরও অব্যাহতভাবে অবনতি ঘটেছে। তহবিলের অর্থ রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যয় করার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় টেকসই কোনো কাজ হয়নি। দীর্ঘ মেয়াদে জলবায়ুসংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবিলা আরও কঠিন হয়েছে।

উপসংহার

এই প্রতিবেদন শ্বেতপত্র কমিটির যৌথ প্রয়াস। কমিটির সদস্যদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা। পাশাপাশি যাঁরা নানাভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। উল্লেখ্য, সবাই নতুন বাংলাদেশ গঠনের আকাঙ্ক্ষায় স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে শ্বেতপত্র তৈরিতে সময় ও মেধা নিয়োগ করেছেন।

এই প্রতিবেদন প্রস্তুতে দেশি-বিদেশি অনেক অংশীজন মতামত ও সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা। প্রতিবেদনের কৃতজ্ঞতা স্বীকার অংশে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্বাত্মে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক রূপান্তরের সময় তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাদের সংযুক্ত থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন।



ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সভাপতি, বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার ‘শ্বেতপত্র’ প্রণয়ন কমিটি,

আহ্বায়ক, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

এবং

সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) সূচিপত্র

সূচিপত্র

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গবেষণা, কারিগরি সহায়তা এবং অনুবাদক দল শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সভাসমূহের তালিকা	তিন চার পাঁচ
মুখবন্ধ	নয়
প্রথম পরিচ্ছেদ: সামষ্টিক অর্থনীতি	১
অধ্যায়-১: উন্নয়নের অঙ্গীকার অনিশ্চয়তায়	৩
অধ্যায়-২: জিডিপি প্রবৃদ্ধি: নিজের অজান্তে মধ্যম আয়ের ফাঁদে	১২
অধ্যায়-৩: মূল্যস্ফীতি: জীবনযাত্রায় প্রলম্বিত যন্ত্রণা	১৯
অধ্যায়-৪: বৈদেশিক লেনদেন-ভারসাম্যের 'চোরাবালি'	২৬
অধ্যায়-৫: রাষ্ট্রীয় ঋণের বাড়ন্ত বোঝা	৩২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কাঠামোগত বিষয়	৩৯
অধ্যায়-৬: রাজস্ব আহরণ: এক অধরা লক্ষ্য	৪১
অধ্যায়-৭: সরকারি বিনিয়োগ: দুর্নীতির শেকড় অনুসন্ধান	৫৪
অধ্যায়-৮: উচ্চ ঝুঁকিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা	৬৮
অধ্যায়-৯: বিনিয়োগের খোঁজে	৭৭
অধ্যায়-১০: ব্যাংকিং খাত: গভীর অন্ধকূপে পতিত	৮৬
অধ্যায়-১১: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত: দুর্নীতির পরিকল্পিত ব্যবস্থা	৯৫
অধ্যায়-১২: বৈদেশিক বাণিজ্যের ফাঁদ	১০৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সামাজিক খাত

১১৭

অধ্যায়-১৩: দারিদ্র্য, বৈষম্য, এবং দুর্বলতা: একটি ভঙ্গুর গৌরবের গল্প	১১৯
অধ্যায়-১৪: মানব উন্নয়নের বাস্তবতা: ফাঁক ফোকড়গুলোও মাথায় রাখতে হবে	১২৭
অধ্যায়-১৪.ক: স্বাস্থ্য ও পুষ্টি: সাফল্য অর্জনে পিছিয়ে	১২৭
অধ্যায়-১৪.খ: বাংলাদেশের শিক্ষাখাত যেন 'হীরক রাজার দেশে' সিনড্রোমে ভুগছে: যত কম জানে, তত বেশি মানে	১৩৭
অধ্যায়-১৪.গ: উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী মানুষদের অন্তর্ভুক্তি: শুরুটা যেভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল	১৫০
অধ্যায়-১৫: কথামালা ও বাস্তবতার ফারাক: জেডার ইস্যু	১৫৫
অধ্যায়-১৬: কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজারের গতিপ্রকৃতি: বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি	১৬৪
অধ্যায়-১৭: ভালোবাসা বঞ্চিত রেমিট্যান্স যোদ্ধারা	১৭০
অধ্যায়-১৮: পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন: বিপর্যয়ের পদধ্বনি	১৭৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ

১৮৩

অধ্যায়-১৯: মেগা প্রকল্পে মেগা উৎকর্ষা	১৮৫
অধ্যায়-২০: অবৈধ সম্পদ পাচারের দুষ্টিফিকত	১৯৮
অধ্যায়-২১: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাবে জাতীয় উন্নয়নে স্থবিরতা	২০৯
অধ্যায়-২২: ডেটা ইকোসিস্টেম: উন্নয়ন আখ্যানের খলনায়ক	২২৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: সংস্কার ও নীতিমালা

২৪৫

অধ্যায়-২৩: কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপন	২৪৭
--	-----

প্রথম পরিচ্ছেদ

সামষ্টিক অর্থনীতি

অধ্যায়-১: উন্নয়নের অঙ্গীকার অনিশ্চয়তায় *

- প্রবৃদ্ধির হিসাবে গোঁজামিল দিয়ে বাংলাদেশকে ‘সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধির’ অর্থনীতি হিসেবে প্রচার করা হয়
- প্রকৃত বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৪-৫ শতাংশ, যা আয়-সম্পদ-সুযোগের বৈষম্যের কারণে ম্লান হয়ে গেছে
- দেশের অর্থনীতি অজান্তেই ‘মধ্যম-আয়ের ফাঁদ’ এ আটকে পড়েছে
- অর্থনৈতিক কাঠামোতে স্বজনতোষী পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
- মোট জাতীয় আয়ে বড় একটি জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্ব কমে গেছে, বিপরীতে উচ্চ আয়ের শীর্ষ ১০ শতাংশ লোক আরও ধনী হয়েছে
- ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ স্বীকৃত খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৮৪ হাজার কোটি টাকায়
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের মোট ঋণ জিডিপির প্রায় ৪০ শতাংশে পৌঁছায়
- নীতিনির্ধারণের বিপদের অশনি সংকেত টের পেয়েও উটপাখির মতো বালুর নিচে মাথা গুঁজে থেকেন
- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে
- দুর্নীতি-অনিয়মের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করতে জ্যেষ্ঠ আমলা, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী—এই তিন শ্রেণি একজোট হয়ে কাজ করেছেন
- গণমাধ্যমের সংখ্যা বাড়লেও স্বাধীনতা কমে গেছে
- সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত তীব্র ক্ষোভ ক্ষমতাসীনরা টেরই পায়নি
- বাঁক বদলের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর সম্ভাবনার নতুন দরজা খুলেছে
- বদলে যাওয়া সময়ে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের প্রত্যাখ্যান করে নতুন পথ খুঁজে নিতে, জনগণকেই ক্ষমতার প্রকৃত মালিক হতে হবে

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েই একটি ঘুণে-খাওয়া অর্থনীতির মুখোমুখি হয়েছে। অর্থনীতির এই অবস্থার নেপথ্যে রয়েছে—বিদায়ী সরকার আমলে কাঠামোগত সংস্কার স্থবিরতা। কিছু ক্ষেত্রে সংস্কারের পর তা উল্টে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। সঙ্গে যুক্ত হয় প্রতিকূল বৈশ্বিক অবস্থা। এছাড়াও, সরকারি নীতিনির্ধারণকদের ধারণার সঙ্গে মাঠের বাস্তবতার ছিল বিস্তর ফারাক।

সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতি ঘুমিয়ে হাঁটা মানুষের মতো নিজের অজান্তেই মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়ে গেছে। ফাঁদে পড়ার বিষয়টি নানান সূচকে স্পষ্ট হয়েছে। যেমন: জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) প্রবৃদ্ধির ধীরগতি, বৈদেশিক বাণিজ্য-বিনিয়োগ-আর্থিক খাতসহ বিভিন্ন খাতে কাঠামোগত স্থবিরতা।

দেড় দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ‘সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধির অর্থনীতি’ হিসেবে প্রচার করা হয়। এখানে, ‘সবচেয়ে দ্রুত’ বয়ানটি ছিল কারসাজিপূর্ণ পরিসংখ্যানে ভরা। সরকারি নীতিনির্ধারণকরা ওই বয়ানের নেশায় বুন হয়েছিলেন। সে সময় কল্পিত প্রবৃদ্ধি নিয়ে দেশি-বিদেশি চিয়ারলিডারেরা (উৎসাহদাতা) ছিল উদ্বাহৃত।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি যে একেবারেই হয়নি, তা বললে ভুল হবে। প্রবৃদ্ধি হয়েছে; কিন্তু বিগত সরকার ‘উন্নয়ন বয়ানে’ যতটা প্রচার করেছে, প্রকৃত প্রবৃদ্ধি তার ধারেকাছেও নেই। আবার বলা হয়েছে, দেশের অর্থনীতির গতি করোনা অতিমারির কারণে ধীর হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অতিমারির আগেই অর্থনীতি গতি হারিয়েছিল।

পূর্ববর্তী সরকারের শাসনকালে নিরপেক্ষ নির্বাচন না হওয়ায়, গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা ছিল না। রাজনীতি-ব্যবসা-আমলাতন্ত্র-আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী-গণমাধ্যম-উন্নয়ন সহযোগী ও নাগরিক সমাজের একাংশের সঙ্গে সুবিধাবাদী লেনদেনের সম্পর্ক তৈরি করে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম করা হয়। কীভাবে এটা সম্ভব হলো, এই অধ্যায়ে তা তুলে ধরা হবে। একইসঙ্গে, উঠে আসবে ব্যাপক বৈষম্য-ভুল নীতির কারণে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক চাপ-ভঙ্গুরতা-প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতার চিত্র।

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন ড. জাহিদ হোসেন, সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ।

আমাদের সামনে সম্ভাবনার দিকও রয়েছে। বিশেষ করে, ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সুযোগ এসেছে। সংস্কারের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের ফাঁদ এড়িয়ে সামনে যাওয়ারও সম্ভাবনা প্রবল। অধ্যায়ের উপসংহারে এ সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

১.১ বাংলাদেশের উন্নয়ন ধন্দ

বাংলাদেশের উন্নয়নের দুই ধরনের ধন্দ। এক, মানব উন্নয়ন, দুই, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি; যার হার বিশ্বে শীর্ষস্থানীয়।

মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে কাঙ্ক্ষিত মানব উন্নয়ন মাত্রায় বাংলাদেশ এগিয়েছে। পরিসংখ্যান যাচাই করেও এমনটাই পাওয়া গেছে। কিন্তু, পরিসংখ্যান যাচাইয়ের পর ‘সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধির দেশ’ তকমাটি আর টেকানো যাচ্ছে না। বরং দেখা যায়, উচ্চ প্রবৃদ্ধির বয়ানটি মূলত পরিসংখ্যান কারসাজির ফল। ভারত-পাকিস্তান-কম্বোডিয়া-লাওস-ইথিওপিয়ার সঙ্গে উন্নয়নের তুলনার সময় উল্লেখিত ‘বাংলাদেশ মডেল’ এখন অতীত। মূলত, বাংলাদেশের অর্থনীতির ‘দ্রুতগতি’ ছিল পরিসংখ্যানে কারসাজির নিদর্শন।

বিগত সরকার উন্নয়নকে শাসনের দর্শন হিসেবে ঘোষণা করে। সরকার ও সরকারের দেশি-বিদেশি চিয়ারলিডারেরা ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত করার আকাঙ্ক্ষা সামনে আনে। বড় বিনিয়োগে শিল্প প্রতিষ্ঠার নীতি নিয়ে, উন্নয়নের নিদর্শন হিসেবে বিদ্যুৎ-পরিবহন খাতে বড় প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ফলে, ছোট-মাঝারি শিল্প ও কৃষি খাত থাকে বঞ্চিত। বাসযোগ্য শহর তৈরিতেও সরকারের কোনো নজর ছিল না।

সরকারের অগ্রাধিকারে টেকসই উন্নয়ন ছিল না। তাদের লক্ষ্য ছিল ছলচাতুরির নির্বাচন করে যে কোনো মূল্যে ক্ষমতা টেকানো। যে কারণে, ভুল উন্নয়ন কৌশলের মাশুল আড়াল করা হয়। সরকার-সরকারঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী মহল-আমলাতন্ত্র মিলে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতাকে অনেক দূরে ঠেলে দেয়।

বিগত সরকারের শাসনামলে আয়বৈষম্য ব্যাপকভাবে বেড়ে গেলে, নীতিনির্ধারকেরা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ সাইমন কুজনেতের ‘কুজনেৎ রেখা (কার্ভ)’ তত্ত্ব সামনে আনেন। তত্ত্ব অনুযায়ী, উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে আয়বৈষম্য বাড়বে, পরে ফের কমতে থাকবে। একই কথা বারবার বলায় মনে হতো, এটাই স্বতঃসিদ্ধ। ভবিষ্যৎ সুফলের জন্য বর্তমানের কষ্ট মেনে নিতে হবে। কিন্তু গভীরে নজর দিলে দেখা যায়, সরকার সুকৌশলে স্বজনতোষী পুঁজিবাদী একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছিল।

সরকারি উন্নয়ন কৌশলের অংশ হয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের উন্নয়নের দাবিই আসলে আয়বৈষম্য বাড়িয়েছে। রাজনীতি ও বাজারব্যবস্থায় অবৈধ সম্পদ অর্জনকারীদের নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে এই উন্নয়ন কৌশল উল্টে যেতে বাধ্য।

বিগত সরকারের দুর্নীতি আড়াল করতে পদ্মা সেতু-মেট্রোরেল নির্মাণের মতো কিছু কাজকে বড় করে দেখানো হয়। সাধারণ কিছু তথ্য যাচাই করে এই ফাঁকি ধরা সম্ভব। আসলে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি গতি হারিয়েছিল; প্রকৃত বাস্তবতা ছিল সরকারি ব্যয়ানের ঠিক উল্টো। বছর বছর জিডিপি যে ৪-৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে তা আয়-সম্পদ-সুযোগ বৈষম্যে লীন হয়ে গেছে।

১.২ দৃষ্টিপথে ধোঁয়াশা

শ্বেতপত্র তৈরির আলোচনায় সর্বসম্মতভাবে একটি মতামত পাওয়া গেছে, স্বৈরাচারী সরকারের আমলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি-মূল্যস্ফীতি-দারিদ্র্য-বৈষম্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য নিরাপত্তা-জ্বালানিসহ সব খাতের পরিসংখ্যান তৈরির তথ্য-

উপাত্ত সংগ্রহ ও উপস্থাপন ব্যবস্থা ছিল অতীব ধোঁয়াশাপূর্ণ। সমস্যার শুরু, উপাত্ত সংগ্রহ থেকে; প্রক্রিয়াকরণও ক্রটিপূর্ণ। পরে অবশ্য ক্ষমতাসীনরা রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পূরণের আদলে পরিসংখ্যান উপস্থাপন শুরু করে। তাই, শ্বেতপত্র তৈরির পরামর্শ সভায় অংশীজন-পর্যবেক্ষকেরা বিদ্যমান উপাত্তের ওপর পুরোপুরি আস্থা না রাখার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হিসাব সব সরকারের আমলেই বাড়িয়ে দেখানো হতো। বিগত সরকারের দেড় দশকে সে প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে আর মূল্যস্ফীতি কমিয়ে দেখানো হতো। সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য সূচকগুলোর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও উপস্থাপন ছিল তুলনামূলক সহজ। কিন্তু, সেখানেও দেখা গেল বড় ঘাটতি।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের পরিসংখ্যানকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ধরা হতো। কিন্তু, রপ্তানি হিসাব সংশোধনের পর তাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রতিবেদনে বৈদেশিক মুদ্রা মজুতের হিসাব নিয়ে প্রশ্ন উঠলে ওই পরিসংখ্যানও বিতর্কিত হয়ে পড়ে। রাজস্ব আদায়ের হিসাব বাড়িয়ে দেখায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপে উঠে আসা উপাত্তের সঙ্গে প্রশাসনিক পরিসংখ্যানের পার্থক্য সামাজিক সূচকগুলোও প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

দারিদ্র্যের হারের পরিসংখ্যানও ক্রটিপূর্ণ। বিবিএস দারিদ্র্যের হিসাব প্রাক্কলনের পদ্ধতি পুনর্মূল্যায়ন এবং উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি বদলানোর পর, ২০১০ থেকে ২০২২ সময়কালে দেশে দারিদ্র্যের হার কমতে শুরু করে।

সব মিলিয়ে, স্বৈরাচারী আমলে উপাত্ত সংগ্রহ-পরিসংখ্যান উপস্থাপনে রাজনৈতিক প্রভাব ভিন্ন মাত্রা পেয়েছিল। আগে থেকেই দুর্বল বিবিএস, সে সময় আরও নতজানু হয়ে পড়ায় পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতা ঠেকে তলানিতে।

উপাত্ত সংশোধন ও অর্থনীতির ধারাবাহিকতা পরীক্ষা করে দেখা যায়, উন্নয়নের গল্পটি আসলে গালগল্প। সরকারের দেখানো হারের চেয়ে প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে। গরিবেরা আরও দুরবস্থায় পড়েছে। বৈষম্য আরও গভীর হয়েছে। শিক্ষার মান আরও নেমেছে। স্বাস্থ্যসেবা স্বল্প আয়ের মানুষের আয়ভের আরও বাইরে চলে গেছে। সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় আরও হ-য-ব-র-ল অবস্থা।

১.৩ মধ্যম আয়ের ফাঁদ

বিগত দেড় দশকে বাংলাদেশের উন্নয়ন-অর্জনের গুণকীর্তন করে বহু প্রতিবেদন লেখা হয়। ২০২২ সালে তৈরি করা একটি প্রতিবেদনের শুরুরটা ছিল এমন— বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেড়েছে শিল্প-সেবা খাতের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে। কর্মসংস্থানে এই দুই খাতের হিস্যা বেড়েছে। পাশাপাশি বেড়েছে ভোগ্য ও মূলধন গঠন। কৃষি থেকে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক শিল্প-সেবা খাতে চলে গেছে। কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে। এর মাধ্যমে, অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধিবর্ধক কাঠামোগত রূপান্তর হয়েছে।

একটি দেশের অর্থনীতি কৃষি থেকে শিল্প-সেবা খাতের দিকে যাত্রা শুরু করলে তাকে কাঠামোগত রূপান্তর বলা যায়। যেহেতু, কৃষির চেয়ে শিল্পের উৎপাদনশীলতা বেশি। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেই রূপান্তর হচ্ছিল, কিন্তু তা থমকে গেছে। ২০১৬ থেকে ২০২২ সময়কালে মোট কর্মসংস্থানে কৃষির আধিপত্য বাড়তে শুরু করে। শিল্প খাতে শ্রমের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি থাকায় কর্মসংস্থান কমে যায়। বিশেষ করে, বিপুলসংখ্যক স্বল্প দক্ষ তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। বিগত দশকে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির গতিও হ্রাস পায়। শুধু পোশাক-বস্ত্র-ওষুধ শিল্পই স্বল্প ব্যয়ের শ্রম ও বিদেশি প্রযুক্তির অনুকরণগত সুফল পেয়েছে। ডিজিটাইজেশন ও ‘গিগ ইকোনমি’ (অস্থায়ী বা ফ্রিল্যান্স শ্রমনির্ভর অর্থনীতি) সাময়িক প্রবৃদ্ধি এনে দিলেও, পরে এ খাতে প্রভাবশালী রাজনৈতিকদের খাবা পড়ে।

এসবই মধ্যম আয়ের ফাঁদে আটকে পড়ার লক্ষণ। বৈদেশিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ঋণ, জ্বালানি সরবরাহ এবং অনানুষ্ঠানিকতা অতিমারির আগেই অর্থনীতির গতি কমে যাওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করেছে। ১৯৯০ সালের পর থেকে প্রবাসী আয়, পোশাক রপ্তানি ও সেবা খাতের বিকাশ দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিলেও নতুন করে কোনো উৎস তৈরি হয়নি। ফলে, পুরোনো উৎসনির্ভর অর্থনীতি ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে শুরু করে।

বাংলাদেশ এখন আফ্রিকার অনেক দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে। কারণ, সেখানে মজুরি আরও কম; পরিণত শিল্পে তারা আধিপত্য ধরে রেখেছে। আবার, উচ্চ মধ্যম ও উচ্চ আয়ের দেশের সঙ্গেও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় পারবে না। কারণ তারা উদ্ভাবনী ও উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পে ইতোমধ্যেই আধিপত্য তৈরি করে ফেলেছে।

সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন, মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়ার একটি নিদারুণ উদাহরণ।

১.৪ বহুরকম বিভাজন

জনসংখ্যার বড় একটি অংশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের খুবই অল্প ভাগ পেয়েছে। সমাজের ধনী ১০ শতাংশ মানুষ আরও ধনী হয়েছে। স্বল্প আয়ের ৫০ শতাংশ মানুষের আয় কমেছে। জাতীয়ভাবে মাথাপিছু আয় বাড়লেও প্রতি ১০ জনে ৭ জন সেই আয়ের ধারেকাছেও যেতে পারেনি। বিগত এক দশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের বড় একটি জনগোষ্ঠী সংকুচিত হয়ে গেছে। বিপরীতে উচ্চ আয়ের ১০ শতাংশ বিকশিত হয়েছে। শ্রমিকেরা বিদেশে কাজ করতে যেতে না পারলে আয়বৈষম্য আরও বাড়ত। বিদেশে দেশের সম্ভাব্য আয়ের চেয়ে আড়াই থেকে তিনগুণ বেশি উপার্জন করা যায়।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফার হার বেশি। এমন পরিস্থিতিতে মূলধন প্রাচুর্যের দেশগুলো থেকে অর্থ বাংলাদেশে আসার কথা। স্থানীয় মূলধনকে অতিমাত্রায় সুরক্ষা দেওয়া এবং প্রতিকূল বিধিবিধানের কারণে তা হয়নি। তবে, দেশ থেকে উল্লেখযোগ্য হারে অর্থপাচার হয়েছে ঠিকই।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে অতিমাত্রার বৈষম্য মানুষের আয়-সম্পদ বৈষম্য বাড়িয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী প্রচুর, কিন্তু শিক্ষকেরা মানসম্পন্ন নন। ফলে প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্তর থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার বাড়ছে। শিক্ষাগত দিক দিয়ে অপ্রস্তুত বিপুলসংখ্যক তরুণ প্রতি বছর শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। শহর-গ্রামে স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা-মানের বড় ফারাক দেখা দিয়েছে। চিকিৎসায় ব্যক্তিগত ব্যয়ের তুলনায় সরকারি ব্যয় নগণ্য। এমন পরিস্থিতিতে, উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজনে নিম্ন-মধ্যম আয়ের পরিবারগুলো সংকটে পড়ছে।

বৈষম্যের আরও বহু দিক আছে। বিবিএসের পরিসংখ্যান বলছে, গ্রামের মাত্র ৩৭ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। শহরে এই হার প্রায় ৫৪ শতাংশ। নারীদের মাত্র ৩৫ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, পুরুষের ক্ষেত্রে তা ৪৮ শতাংশ।

নীতি গ্রহণেও বৈষম্য দেখা যায়। পরিবেশ খাতের উদাহরণটি দেওয়া যাক— জোর দেওয়া হয় জলবায়ু পরিবর্তনে, অর্থব্যয়ও বেশি। কিন্তু মাটির পুষ্টি ফেরানো, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সমুদ্র উপকূল-নদী ভাঙন রোধ, ভূ-উপরিভাগ ও ভূ-গর্ভের পানি কমে যাওয়া, বায়ু দূষণ, ভূমি দখল এবং পরিবেশগত অভিবাসনকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ২০২৪ সালের বন্যা দেখিয়ে দিয়েছে, অবৈধভাবে খাল ভরাট ও বিশৃঙ্খল নগরায়ণ কী সংকট তৈরি করতে পারে? প্রধান নদীগুলো শিল্পবর্জ্য-প্লাস্টিক-মানববর্জ্যের দূষণের কবলে পড়ে পানির গুণগতমান হারিয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংকটগুলো আমরাই তৈরি করছি।

১.৫ অসহনীয় চাপ

বাংলাদেশের অর্থনীতি আগে থেকেই বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। তার ওপর, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় ফাটল মাথাব্যথা আরও বাড়িয়েছে।

অতীতে তাকালে দেখা যায়, গত শতাব্দীর আশির দশকের পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি মোটামুটি স্থিতিশীলভাবে এগিয়েছে। এ সময়কালে বৈশ্বিক সুদের হার শূন্যের কাছাকাছি ছিল। পণ্যের দামও ছিল কম। ২০০৮-২০০৯ সালের পর থেকে ডলারের দামেও তেমন ওঠানামা হয়নি। বাজেট ঘাটতি সীমিত রাখা গেছে। সরকারের ঋণ কম ছিল; সুদের হারও ছিল কম। বৈদেশিক মুদ্রার মজুত-বিনিময় হার মোটাদাগে স্থিতিশীলই ছিল।

মূল্যস্ফীতির সমস্যাটি শুরু হয় করোনা অতিমারী ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, মূল্যস্ফীতি ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। এ সময় বিশ্ববাজারে পণ্যের দামও বেড়েছে। অবশ্য পরে দেখা গেল, বিশ্ববাজারে অনেক পণ্যের দাম কমলেও বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি কমেই; বরং বেড়েছে। এর কারণ মার্কিন ডলারের মূল্যবৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার মজুতে ঘাটতি ও আমদানি নিয়ন্ত্রণ। সরকারিভাবে গ্যাস-বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ-পরিবহন ব্যয় বেড়েছে, যা মূল্যস্ফীতিকে আরও উসকে দিয়েছে। পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। বাজারের নিয়ন্ত্রণ গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকায় প্রতিযোগিতা কমে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে মুদ্রানীতি ছিল সম্প্রসারণমুখী। সরকার নিজে ব্যাংক থেকে বিপুল ঋণ নিয়ে বাজারে টাকার সরবরাহ বাড়িয়েছে। যা মূল্যস্ফীতি বাড়িয়ে দিয়েছে। দুরাবস্থায় থাকা মানুষ আরও দুর্দশায় পড়েছে।

করোনা অতিমারির আগেই আর্থিক খাত দুর্দশার মধ্যে পড়েছিল। পরে সেই দুর্দশা কয়েকগুণ হয়েছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে স্বীকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৮৪ হাজার কোটি টাকায়। এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে সাতটি পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব। খেলাপি ঋণের আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী, ঋণপরিস্থিতি মূল্যায়নে পুনঃতফসিল-অবলোপন করা এবং মামলার আওতাধীন ঋণও হিসাব করা হয়। সেক্ষেত্রে, বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ আরও অনেক বাড়বে।

দেশে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত অস্বস্তিকর অবস্থায় ঠেকেছে। শুধু বাংলাদেশ ব্যাংক নয়, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও বৈদেশিক মুদ্রার মজুত হারিয়েছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ ব্যাংক বিনিময়ের নানা হার চালু করে। পরে, যা মারাত্মক ক্ষতিকর বলে প্রমাণ হয়েছে। এর ফলে, রপ্তানি আয় দেশে আনা ও বৈধ পথে প্রবাসী আয় পাঠানোকে নিরুৎসাহিত করে অর্থপাচারকে উৎসাহিত করা হয়। নীতির স্বচ্ছতা কমে যাওয়ায়, বিদেশি ঋণদাতাদের আস্থা সংকটের মুখে; বাংলাদেশের ঋণমান কমিয়ে দেওয়া হয়।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপির অনুপাতে দেশের ঋণ ৪০ শতাংশে উঠে যায়। যদিও বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বলেছিল, বাংলাদেশের ঋণ-অনুপাত এখনো কম। কিন্তু ডলার সংকট মাথায় রেখে বিকল্প মূল্যায়ন বলছে, বাংলাদেশ আসলে স্বস্তিতে নেই। তার ওপর বড় প্রকল্পের নামে দেশে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। রাজস্ব আদায় সেভাবে বাড়েনি। বাজেটে ঋণের সুদ পরিশোধের হিস্যা বাড়ছে। সরকার টাকা ও ডলারের সংকটে রয়েছে।

ঘণীভূত হতে থাকা সংকটের দায় এড়াতে প্রাক্তন ক্ষমতাসীনরা সব দোষ বৈশ্বিক পরিস্থিতির ওপর চাপানোর চেষ্টা করেছেন। তারা সামনে এনেছেন অতিমারির পর বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতি, ডলারের মূল্য বেড়ে যাওয়া, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ইত্যাদি বিষয়কে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণের পর ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। বৈশ্বিক পণ্যবাজারে দাম ও বিশ্ববাজারে ঋণের সুদের হার বেড়ে যায়। এটা সত্য যে, বৈশ্বিক সংকটের কারণে বাংলাদেশ বিপাকে পড়েছে। তবে, বাংলাদেশের সংকটের বড় কারণ সরকারি ব্যর্থতা। নীতিনির্ধারণের বিপদ দেখে উটপাখির মতো বালুর মধ্যে মাথা গুঁজে ছিলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক ও ব্যবসাজগতের অলিগার্কদের মনোরঞ্জে ব্যস্ত ছিল।

১.৬ দুর্বল নীতিতে অর্থনীতি ভঙ্গুর

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা-স্বস্তি ছিল। নীতির দুর্বলতায় সেই স্বস্তি উবে গেছে। কাঠামোগত সংস্কারে স্ববিরতা, দেশীয় শিল্পকে অপ্রয়োজনীয় ও অতিমাত্রায় সুরক্ষা, সেবা দানে স্বজনতোষণ, অর্থবাজারে দমননীতি,

একাধিক বিনিময় হার, সরকারের বাজেট ঘাটতির দায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কাঁধে নেওয়া, পক্ষপাতী নিয়মকানুন তৈরি এবং দুর্নীতি নিয়ে নিষ্কৃপ থাকা—এসব অর্থনীতির যতটা ক্ষতি করেছে, বৈশ্বিক প্রতিকূলতা ততটা চাপ তৈরি করেনি। বিনিময় হার এবং মুদ্রা ও আর্থিক খাত, শিল্প, জ্বালানি ও বাণিজ্যনীতি সরকার-ঘনিষ্ঠ অনেক পুঁজিপতিকে সহায়তা করেছে। বিপরীতে ঋণ, বিদেশি মুদ্রাবাজার ও পণ্যবাজারে বিশৃঙ্খলা-অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উদাহরণই দেওয়া যাক। একদিকে নীতি সুদের হার বাড়িয়ে বাজার থেকে টাকা তুলে নেওয়ার সংকেত দিয়েছে, অন্যদিকে সরকারের বাজেট ঘাটতি দূর করতে অর্থ সরবরাহ করেছে। নানা অনিয়ম করে সংকটাপন্ন ব্যাংকগুলোকে টিকিয়ে রাখতে টাকা দিয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রা জমা দিয়ে সামান্য সুদে ব্যাংককে ঋণ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

অর্থনীতির সংকটের মধ্যে সরকার কৃষ্যসাধনের কিছু কিছু পদক্ষেপ নেয়। তার মধ্যে ছিল সরকারি চাকরিজীবীদের বিদেশ ভ্রমণ সীমিত করা, গাড়ি কেনা বন্ধ করা, নতুন ভবন না করা, বিনোদন ও মনিহারি দ্রব্যাদি কেনার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ইত্যাদি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ব্যয় নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কথা হয়েছে বেশি, কাজ হয়েছে কম।

সরকারের উচিত ছিল মূল্যক্ষীতি নিয়ন্ত্রণে বাজার থেকে টাকা তুলে নেওয়া। বৈদেশিক মুদ্রার জোগান বাড়তে বিনিময় হারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ না রাখা। আর্থিক চাপ দূর করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। দরিদ্রদের সহায়তা ও মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ করা। কিন্তু, কিছুই না করে তারা নীতি-দুর্বলতার কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকে অস্বীকার করেছে। অথবা, বৈশ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা বলে দায় এড়িয়েছে।

১.৭ ক্ষয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠান

সুষ্ঠু-গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ন্যূনতম চর্চাও বিগত সরকারের সময় ছিল না। ১৯৯০ সালে রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৫ বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। বাংলাদেশ গণতন্ত্রে ফিরে আসে। ২০১৪ সালে একতরফা ভোটের মাধ্যমে সেই গণতন্ত্র-যাত্রার অবসান ঘটে। এরপর থেকে আইনের শাসন, বাকস্বাধীনতা—কিছুই ছিল না। অবশ্য ২০১৪ সালের আগেই সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের ক্ষয় শুরু হয়। একইসঙ্গে চোরতন্ত্র, রাজনৈতিক সমর্থনের বিনিময়ে সুবিধা দেওয়া এবং স্বজনতোষী পুঁজিবাদের যাত্রা শুরু হয়। ফলাফল, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির চাষ।

বিগত আমলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একক কর্তৃত্বের অধীনে আমলাতন্ত্র পরিচালিত হতো। কর্মকর্তারা দলবাজ হলেই কেবল পদপদবি পেতেন। আমলাতন্ত্রের যেমন রাজনীতিকীকরণ হয়েছে, তেমনই আমলাতন্ত্রও দুর্বল রাজনীতির সুযোগ নিয়েছে। এটা ঠেকানোর শক্তি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ছিল না। জ্যেষ্ঠ আমলারা রাজনীতিবিদ-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগসাজশ করেছিলেন। তাঁদের দায়বদ্ধতাও ছিল প্রভাবশালীদের প্রতি। ফলে আমলাতন্ত্রের দায়বদ্ধতা ফিরিয়ে আনতে বেসরকারি খাত, দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সুপারিশমালা আলোর মুখ দেখেনি।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছোট-বড় দুর্নীতি উদ্বেগজনকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে নেমে যায়। রাজনীতি ও অপরাধীকরণ সরকারি কর্মকর্তা, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ, গণমাধ্যম ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জবাবদিহিতা ধ্বংস করে দিয়েছে। রাজনৈতিক, বিচারিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও জনমানসে দায়মুক্তির সংস্কৃতি প্রোথিত হয়েছে।

প্রধান প্রধান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অক্ষমতার এমন চিত্র আগে কখনো দেখা যায়নি। শাসনসংক্রান্ত বেশির ভাগ সূচকে বাংলাদেশ স্থান পেয়েছে নিচের দিকে। যেমন বৈশ্বিক সক্ষমতা সূচক— এতে বাংলাদেশ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসহ আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের অর্থনীতির দেশগুলোর চেয়ে ধারাবাহিকভাবে পিছিয়ে পড়ে।

বিশ্বব্যাংকের ২০২৪ সালের ব্যবসা প্রস্তুতি সূচকে সরকারি সেবা (পাবলিক সার্ভিস) এবং প্রতিযোগিতা খাতে বাংলাদেশের স্থান তলানিতে। এই দুর্বলতা প্রমাণ করে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ক্ষমতাসীনদের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অদক্ষতা-অসাম্য দূর করার কোনো তাগিদ ছিল না।

বিগত সরকার আমলে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) মতো সংস্থাগুলো স্বাধীনভাবে পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও; নিয়োগ দেওয়া হতো অবসরপ্রাপ্ত সরকার-ঘনিষ্ঠ সামরিক-বেসামরিক আমলা-বিচারকদের। নাগরিক সমাজের সংস্থাগুলো বিভাজিত হয়ে পড়ায় কার্যক্রম ততো দৃশ্যমান ছিল না। গণমাধ্যমের সংখ্যা বাড়লেও রাজনীতির সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্দেশনায় সরকারি সংস্থাগুলো কুশাসন, অনিয়ম ও ঘাটতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশে বাধা দিয়ে দমন-পীড়ন চালায়।

গণমাধ্যম সম্প্রসারিত হলেও, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়েছে। সমালোচকদের দমন ও স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণের (সেলফ সেন্সরশিপ) সংস্কৃতি তৈরির জন্য সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো দমনমূলক আইন করে। নজরদারির জন্য নানা আধুনিক সরঞ্জাম কেনা হয়। গণমাধ্যম, বিশেষ করে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের মালিকানা বদলের ঘটনা অনেকবার ঘটে। এর মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমকে ক্ষমতাসীনদের বৃহত্তর বলয়ে ঢোকানো হয়। তবে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বড় বড় দুর্নীতি প্রকাশ পেয়ে যায়।

১.৮ রাজনীতি, ব্যবসা ও ক্ষমতার যোগসাজশ

জবাবদিহিতার রাজনীতিকীকরণ, নিয়ন্ত্রক সংস্থার নেতৃত্ব অলিগার্কদের হাতে যাওয়া, সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাওয়া এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সততা একেবারেই তলানিতে ঠেকার কারণে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্ষয় শুরু হয়। শিল্পখাতে এমন নীতি নেওয়া হয়েছিল, যা বিনিয়োগের বাধা। অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করা জরুরি ছিল। কিন্তু, সেগুলোকে টিকিয়ে রাখার নীতি নেওয়া হয়। বাংলাদেশে আমদানি শুল্ক হার বিশ্বে শীর্ষস্থানীয়। ব্যাংক খাতের স্বাস্থ্য নষ্ট করেছে বাড়তে থাকা মন্দ ঋণ। সরকারি ব্যবসা প্রতিযোগিতা সক্ষম নয়, জবাবদিহিতাও নেই। সরকারি কর্মচারীরা সেবা দিতে অনিচ্ছুক। পুলিশ আইন রক্ষা করে না। রাষ্ট্রের অর্থ চুরিতে সহযোগিতা করে রাজস্ব আদায়কারীরা। জিডিপি প্রবৃদ্ধির বিপরীতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার কম। চাকরির মানও প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে মেলে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা অতীতে ছিল, এখন আছে, ভবিষ্যতেও থাকতে পারে ক্ষুদ্র কিছু প্রভাবশালীর হাতে। এসবের কারণে বেশির ভাগ নীতির সুফল পেয়েছে প্রভাবশালীরা। গণমানুষ থেকেছে বঞ্চিত।

রাজনীতি-ব্যবসা-প্রশাসনের মধ্যে মাথাখাখি গ্রহণযোগ্য নয়, সীমানা প্রাচীর জরুরি। কিন্তু সুবিধাবাদী লেনদেনের সম্পর্ক এই প্রাচীর বিলীন করে ফেলে। বাধাহীনভাবে বাড়ে অসাধু পৃষ্ঠপোষকতা, এতে বিনিয়োগ-উদ্ভাবন বাধাগ্রস্ত হয়। নতুন বিনিয়োগকারীরা খাতের প্রসার-বৈচিত্র্যের বদলে অন্যের বাজার দখলের চেষ্টা করে। এতে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে গুটিকয়েক টিকে থেকে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয়, বাকিরা ব্যর্থ। স্থানীয় অলিগার্করা বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ ঢুকতে দেয়নি, স্থানীয় প্রতিযোগীদের টিকতে দেয়নি। ফলে বাজার সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা হারিয়েছে। সম্প্রতি ৫০ দেশকে নিয়ে করা এক প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, বাজারে সর্বনিম্ন প্রতিযোগিতার ছয়টি দেশের একটি বাংলাদেশ।

ব্যবসা ক্ষেত্রে অপকর্মের মাধ্যমে আয়ের অনেক সুযোগ তৈরি হয়। ব্যবসায়ীরা রপ্তানিমুখী পোশাক, নির্মাণ খাত, পরিবহন, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও কৃষি প্রক্রিয়াকরণে বেশি বিনিয়োগ করেন। এসব খাতে সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বিনিয়োগ ছিল অত্যন্ত লাভজনক। অনেকেই বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনে ব্যাপক সফল হয়েছেন। কিন্তু কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আগ্রহী হয়েছেন কম। কারণ, তাঁদের লক্ষ্য ছিল অর্থপাচার।

যোগসাজশ ও দুর্নীতির বড় উদাহরণ জ্বালানি খাত। এ খাতে বিনিয়োগে দায়মুক্তি দিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ আইন-২০১০ করা হয়। যা জ্বালানির মূল্য-সুশাসনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। জ্বালানি খাতে চুক্তি অনুমোদনের ক্ষমতা ছিল শুধু জ্বালানিমন্ত্রী। মন্ত্রণালয়টি আগাগোড়া প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকায় উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ-জ্বালানি কেনার চুক্তি করার সুযোগ এবং দুর্নীতির উর্বর ভূমি তৈরি হয়। ক্ষমতাসীনদের ঘনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মকর্তারা সুযোগটি লুফে নেন। অন্যদিকে সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকা দক্ষ বিনিয়োগকারীদের সুযোগ সীমিত হতে থাকে।

দিনকে দিন সরকারের কর্তৃত্বপরায়ণতা প্রকাশ পেতে থাকে। চূড়ান্ত ক্ষমতা বিগত সরকারকে চূড়ান্তভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে। ক্ষমতাসীনরা তখন অন্যায্য শাসনের ন্যায্যতা তৈরিতে 'বিএনপি-জামায়াতের সম্ভ্রাস ফিরে আসার' বয়ান প্রচার শুরু করেন। সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নিয়ে নেওয়ার মতো ষড়যন্ত্র তত্ত্বও হাজির করা হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা টের পাননি, সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিতে সর্বস্তরে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে।

২০২৪ সালের জুলাইয়ে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন থেকে ৫ আগস্ট সরকার পতন হয়ে যায়। আন্দোলন দমনে রাষ্ট্র তার নিজের নাগরিকের ওপর ব্যাপক বলপ্রয়োগ শুরু করে। কিন্তু মানুষ নৃশংসতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় সরকার আর টিকতে পারেনি। এই অসম্মানজনক পতন, আন্দোলন মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতার প্রমাণ। একইসঙ্গে, রাজনৈতিক ভিন্নমতের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী আচরণেরও ফলাফল।

১.৯ শুধু কথা নয়, দরকার কাজ

বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের গণ্ডি পার হওয়ার ক্ষেত্রে ভালো করেছে; দারিদ্র্যের হারও কমেছে। ফলে বলা হয় যে, বিগত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের উন্নয়ন ছিল অসাধারণ। বাস্তবে প্রত্যাশাই ছিল কম। যার ফলে উন্নয়ন নিয়ে এত গর্ব। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৯০ সালের পর থেকে উচ্চ আয়ের পর্যায়ে যাওয়া লোকের সংখ্যা; দেশের একটি গ্রামের জনসংখ্যার চেয়েও কম।

ইতিহাসের বাঁক বদলে দেওয়ার মতো সম্ভাবনার দরজা ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খুলে গেছে। রাজনৈতিক শক্তি নতুনদের হাতে যাওয়ায় সংস্কারের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। নতুন সরকার ক্ষমতা নিয়েই কাগজে-কলমে কিছু সংস্কার করেছে। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ সংস্কারের প্রত্যাশা প্রাথমিকভাবে পূরণ করেছে। সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফেরানো, ব্যাংক-জ্বালানি খাতে রূপান্তরকামী উদ্যোগ, মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ ইত্যাদি পদক্ষেপ প্রবৃদ্ধির সেই গতি আবার ফিরিয়ে আনতে পারে। যার মধ্য দিয়ে অর্থনীতি একটি অপরিণত ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

উন্নয়ন পরিমাপের ক্ষেত্রে গবেষকেরা বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, সেসব সূচকে প্রকৃত চিত্র উঠে আসে না। যেমন: শিল্পখাতে কারখানার আকার দিয়ে উৎপাদন দক্ষতা বোঝা সম্ভব নয়। খানার (এক চুলায় যতজন রান্না করেন) আয় দিয়ে সমাজ টেকসই কি না, বোঝা যায় না। শুধু অনুমান করা যায়। অনুমানভিত্তিক নীতিসিদ্ধান্ত অকালে অর্থনীতির গতি কমে যাওয়ার কারণ হয়। নীতিনির্ধারণে সেকেন্দ্রে পদ্ধতিগুলো বাতিল করে আরও বাস্তবসম্মত পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন তথ্য-উপাত্ত পুরোপুরি প্রকাশ করার মানসিকতা এবং নীতিবিতর্কের সুযোগ রাখা। নইলে চোখ বন্ধ রেখে ঝড়ের মধ্যে জাহাজ চালানোর মতো অবস্থা তৈরি হবে।

বাংলাদেশকে স্বৈরাচার ও দুর্নীতি থেকে রক্ষার জন্য শুধু কিছু সংস্কারই যথেষ্ট নয়। সামাজিক-নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঢেলে না সাজালে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে উত্তরণ-যাত্রা কঠিন হবে।

অভিজ্ঞতা বলছে, দুর্নীতি-অনিয়মের বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপ অনেক সময় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের উইচহ্যান্ডিংয়ে পর্যবসিত হয়। অনিয়ম-অপকর্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা আর নেওয়া হয় না। দ্বিচারিতার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব নয়। বদলে যাওয়া সময়ে বাংলাদেশে জনগণকে এমনভাবে ক্ষমতায়িত করতে হবে, যাতে তারা দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের নাকচ করে দিতে পারে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ বাড়তে হবে। স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় রাজনীতির বাইরে উদিত হওয়া শিক্ষার্থীদের শক্তিকে এক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে অত্যাৱশ্যক কী, তা একেবারেই সুস্পষ্ট। সেটি হলো, বাংলাদেশকে মূলধন-শ্রম-জ্ঞানির ব্যবহারে আরও দক্ষ হতে হবে।

মধ্যম আয়ের ফাঁদ থেকে বের হতে বাংলাদেশের দরকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, কাজের প্রক্রিয়া এবং জীবিকার ব্যবস্থা চেলে সাজানো। সঙ্গে থাকতে হবে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা-সামাজিক গতিশীলতা-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। বর্তমান রূপান্তরের মধ্যে কীভাবে সেটা সম্ভব? বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র, অভিজাত প্রভাবশালী শ্রেণি ও নাগরিক সমাজ কোনো কিছু গড়তে পারে, আবার ধ্বংসও করে দিতে পারে। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক বিভাজন সারাবিশ্বেই পুরোনো বন্দোবস্ত ভেঙে নতুন বন্দোবস্তের সুযোগ তৈরি করে।

বাংলাদেশের মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, তা পূরণে দরকার সমন্বিত-যৌথ উদ্যোগ।

অধ্যায়-২: জিডিপি প্রবৃদ্ধি: নিজের অজান্তে মধ্যম আয়ের ফাঁদ*

- অনেক উন্নয়নশীল দেশই নিম্ন আয় থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ করেছে, তবে এ নিয়ে বাংলাদেশেই অপেক্ষাকৃত বেশি আলোচনা হয়েছে
- সত্তরের দশকে বাংলাদেশ-ভারত-ইন্দোনেশিয়া-চীন-ভিয়েতনামের অর্থনৈতিক অবস্থা সমপর্যায়ে ছিল, এখন অন্যদেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি পিছিয়ে
- বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশে জিডিপির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৩.৫% বেশি দেখানো হয়েছে
- ক্ষমতাসীন প্রবৃদ্ধির মাত্রা নীতিনির্ধারকদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না
- জিডিপির অনুপাতে রপ্তানি আয় ২০১০ সালে ছিল ১৮.৫%, যা ২০২৪-এ কমে ১৩.১% হয়
- বাড়িয়ে দেখানো জিডিপির প্রবৃদ্ধির কারণে অনেক ক্ষেত্রে অপব্যয় বেড়ে যায়, যেমন: বিদ্যুৎ খাত
- বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি করা সম্ভব
- ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট হতে পারে অর্থনীতির কৌশলগত ব্যবস্থাপনার এক নতুন সূচনা

২০১০ সাল থেকে পরের এক দশকে জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধিকে দেশের অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়, যা বাংলাদেশকে দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতির তকমা এনে দিয়েছিল। বাংলাদেশ এই স্বীকৃতি পাওয়ার পুরোপুরি যোগ্য নয়, তা বলা যাবে না। কিন্তু আলোড়ন তৈরি করা হয়েছিল অনেক বেশি। তাও কারসাজি করা পরিসংখ্যানের মাধ্যমে। এবং অর্থনীতি উচ্চ মধ্যম আয়ের অনেক নিচে থাকা অবস্থাতেই নিজের তৈরি করা ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে। ফাঁদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আবার লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গালগল্প প্রচার করা হলেও কর্মসংস্থানে চিত্র ছিল ভিন্ন। মোট কর্মসংস্থানে কৃষি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের হিস্যা বাড়ছিল। এসব খাত স্বল্প উৎপাদনশীল। দেশে যখন জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ে, তখন কর্মসংস্থান বাড়ে শিল্প ও সেবা খাতে। বাংলাদেশে সম্প্রতি তা হয়নি। এছাড়া সম্পদের ভুল বণ্টন ছিল সর্বত্র। অর্থনীতি তার প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল।

এই অধ্যায় শুরু হবে পরিসংখ্যান যাচাইয়ের মাধ্যমে। তুলে ধরা হবে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হিসাব ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অন্যান্য সূচকের অমিলের চিত্র। উপাত্তের ত্রুটি কোথা থেকে আসছে, তা খুঁজে দেখা হবে। এই ত্রুটি কতটা উপাত্তের উৎসগুলোতে প্রোথিত, কতটা হিসাব করতে গিয়ে হয় এবং রাজনৈতিকভাবে কতটা বাড়িয়ে দেখানো হয়, তা অনুসন্ধান করা হবে এই অধ্যায়ে। শুরুতে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া যায়, বাড়িয়ে দেখানো জিডিপির প্রবৃদ্ধির হিসাব সবার নজর কেড়েছিল।

বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে কমছে। এটা মধ্যম আয়ের দেশের ফাঁদে পড়ার লক্ষণ। এই ফাঁদ থেকে কীভাবে বের হওয়া সম্ভব, তা তুলে ধরে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা হবে।

২.১ অতিরঞ্জিত বয়ান

২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংকের নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ হয়। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় (অ্যাটলাস পদ্ধতি) ছিল ৫১৯ ডলার, যা বেড়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২ হাজার ৬৭৫ ডলারে উন্নীত হয়। অ্যাটলাস পদ্ধতিতে মাথাপিছু জাতীয় আয় হিসাবের ক্ষেত্রে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, বিনিময় হার, প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি—সব কিছুই বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এ হিসাবে দেখা যায়, ২০১৫ সালে অ্যাটলাস পদ্ধতিতে গণনায় বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১ হাজার ২৬ ডলার ছাড়ায়। মানে হলো, তখনই বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে যায় বা মধ্যম আয়ে দেশে পরিণত হয়।

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন ড. জাহিদ হোসেন, সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ।

যদিও বিবিএস গণনা পদ্ধতি পুনর্মূল্যায়ণ করার ফলে তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব মাথাপিছু আয় হিসাব করার ক্ষেত্রে পড়েছে। অর্থাৎ, মাথাপিছু আয় বাড়তি দেখা গেছে। সেটা বিবেচনায় না নিলেও দেখা যায়, বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের আয়সীমার অনেক উপরে রয়েছে।

সরকার জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে দেখিয়েছে। বাড়িয়ে দেখানোর পরও যে হার দাঁড়িয়েছে, তা খুব বেশি আলোড়ন তৈরির মতো নয়। অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টি বোঝা যায়। তার আগে কী আলোড়ন তৈরি করা হয়েছিল, তা খানিকটা দেখে নেওয়া যাক। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের প্রশংসা করে বোস্টন কনসালটেন্সি গ্রুপের মন্তব্যটি তুলে ধরা যেতে পারে। তারা বলেছিল, বাংলাদেশ ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বছরে গড়ে ৬.৪% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনের মতো এশীয় সঙ্গীদের ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে (২.৯%) অনেক ভালো। ২০২২ সালে দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮০০ ডলারে। এই হারে এগিয়ে গেলে ২০৩১ সালে বাংলাদেশ উচ্চমধ্যম (মাথাপিছু আয় ৪ হাজার ডলার) আয়ের দেশ হতে পারবে। বাংলাদেশ যে বৈশ্বিক অভিঘাত মোকাবিলায় সক্ষম, সেটা তারা প্রমাণ করেছে।

শুধু বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ নয়, আরও অনেকে সরকারি পরিসংখ্যান ব্যবহার করে অতিরঞ্জিত উন্নয়ন বয়ান প্রচার করেছে। তারা শুধু সরকারি পরিসংখ্যানে আস্থাই রাখেনি; বেছে বেছে সেই সব পরিসংখ্যান সামনে এনেছে, যেগুলো বাংলাদেশের অগ্রগতি তুলে ধরে। মধ্যবিত্ত যে সংকুচিত হচ্ছে, সেটা তারা এড়িয়ে গেছে।

যদি ধরেও নিই যে, পরিসংখ্যান ও প্রবৃদ্ধির গতিধারা নিয়ে সরকারি বক্তব্য সঠিক। তাহলেও দেখা যাবে, অনেক সঙ্গী দেশ বাংলাদেশের চেয়ে ভালো করছে। যেমন: ১৯৮৭ সালে বিশ্বব্যাংকের তালিকায় নিম্ন আয়ের দেশের অনুপাত ছিল ৩০%, যা ২০২৩ সালে নামে ১২% এ। মানে হলো, অনেক দেশই নিম্ন আয়ের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে। ১৯৭০'র দশকে বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চীন ও ভিয়েতনামের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি একই রকম ছিল। ১৯৭২ সালের তুলনায় বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি বেড়ে চারগুণ হয়েছে ঠিকই; বিপরীতে ভারতের মাথাপিছু জিডিপি বেড়ে হয়েছে পাঁচগুণ, ইন্দোনেশিয়ার ছয়গুণ এবং চীনের ৩০ গুণ। ১৯৮৪ সালের পর ভিয়েতনামের মাথাপিছু জিডিপি বেড়ে হয়েছে পাঁচগুণের বেশি। একই সময়ে বাংলাদেশের বেড়েছে ৩ দশমিক ৪ গুণ।

২.২ সরকারি পরিসংখ্যানের গভীরে অনুসন্ধান

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিপথ নিয়ে দেশি-বিদেশি উচ্চ ধারণা তৈরি করেছিল সরকারি পরিসংখ্যান। তাই এই পরিসংখ্যান আরও গভীরভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে।

২০২২ সালে বিবিএস জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যানের ৫০ বছর শিরোনামে একটি প্রকাশনা বের করে। পরবর্তীতে বিবিএস জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যানের সূত্র ও পদ্ধতি হিসেবে একই উৎসের কথা বলেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্বাসযোগ্যতা বিবিএসের পরিসংখ্যানের সত্যমিথ্যার ওপর নির্ভরশীল। ভুল বের করার আগে দেখা যাক বিবিএসের উপাত্ত কী বলছে।

বিগত শতাব্দীর আশির দশকে বাংলাদেশের গড় জিডিপির প্রবৃদ্ধি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ২ শতাংশে। যা আগের পাঁচ বছরে ছিল ৩ দশমিক ৮ শতাংশ। যদিও আগের পাঁচ বছর প্রবৃদ্ধির হারের ওঠানামা ছিল অনেক বেশি। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৫ দশমিক ২ এ উন্নীত হয়। এ সময় উত্থান-পতন ছিল কম। একই ধারা চলতে থাকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত। ২০০৯-১৪ সময়ে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি বেড়ে গড়ে ৬ দশমিক ৭ শতাংশে দাঁড়ায়। পরের পাঁচ অর্থবছরে (২০১৫-১৯) অগ্রগতি ছিল আরও বেশি, ৭ দশমিক ৩ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির গতি ধীর হয়ে যায় ২০২০ সালে করোনা অতিমারী শুরুর পর।

এবার দেখা যাক শিল্প খাতের চিত্র। সত্তরের দশকে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি ব্যাপক ওঠানামার মধ্যে ছিল। আশির দশকে তা স্থিতিশীল হয়। বিগত চার দশকের মধ্যে শিল্পখাতে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২০১৭-১৮ অর্থবছরে। শিল্প খাতের অবদান কমেছে ২০২০-২১ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে। নির্মাণখাত নব্বইয়ের দশকের পর থেকে স্থিতিশীলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রবৃদ্ধির হার ৮ থেকে ১০ শতাংশ। উৎপাদন খাতের উত্থানকে সঙ্গে নিয়ে শিল্প সবসময়ই প্রবৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দিয়েছে, যা শুরু হয়েছিল নব্বইয়ের দশকে।

সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল ৫ দশমিক ২ শতাংশ। এখানে ১ শতাংশের মতো বিচ্যুতি রয়েছে। খুচরা ও পাইকারি ব্যবসা, পরিবহন, মজুদাগার, যোগাযোগ খাত ধারাবাহিকভাবে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি এগিয়ে নিয়েছে। অতিমারী অনলাইন ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করেছে। গিগ অর্থনীতি দৃশ্যমান হয়েছে।

কৃষি খাত স্থিতিশীলতার পথে যেতে সময় নিয়েছে। জিডিপিতে কৃষির অবদান ধীরে ধীরে কমেছে। একই সময় শিল্প ও সেবা খাত কৃষিকে ছাড়িয়ে গেছে। অতিমারী থেকে কৃষি একটি কৌতূহলউদ্দীপক ভূমিকা নিতে শুরু করে। অভিঘাত মোকাবিলার আশ্রয়ে পরিণত হয় কৃষি। ২০২০-২১ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি খাতে ৩ শতাংশের বেশি বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। যদিও এ সময়ে আবহাওয়া প্রতিকূল ছিল এবং চাষাবাদের জমি অন্য খাতে চলে যাচ্ছিল।

সব গবেষণামূলক বিশ্লেষণে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির সম্ভাব্য উৎস হিসেবে পুঁজি সঞ্চয় ও জনসংখ্যাগত সুফলকে সামনে আনা হয়েছে। এই দুই উৎস শিল্প ও কৃষিতে প্রবৃদ্ধি বাড়িয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। কৃষিতে উদ্ভাবন ও উপকরণের ব্যবহার বেড়েছে। এর একটা কারণ অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি। সেটা আবার শিল্পায়ন ও নগরায়ণে ভূমিকা রেখেছে। একই সময়ে বাংলাদেশ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুফলের তৃতীয় পর্যায়ে উঠেছে, যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি কমেছে। পাশাপাশি কমেছে নির্ভরশীল মানুষের হার। এসবের সুফল পেয়েছে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত।

রপ্তানিমুখী পোশাক খাত, ব্যাংকিং, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই), বাণিজ্য, টেলিযোগাযোগ, অভিবাসন, গণমাধ্যম, শস্য উৎপাদন ইত্যাদি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বেড়েছে। প্রবাসী আয় ব্যাপকভাবে বেড়েছে। যা নিম্ন মধ্যম আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়েছে এবং দেশের বাণিজ্য ঘাটতি পূরণে ভূমিকা রেখেছে।

নানা সংস্কারও হয়েছে। আশির দশকের শেষ ও নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে কৃষিতে উপকরণের ব্যবহার, গ্রামীণ অবকাঠামো, জ্বালানি সরবরাহ, বাণিজ্য, অর্থায়ন সুবিধা ইত্যাদি বাড়তে থাকে। দেশের রাজনীতিতেও পরিবর্তন আসে এবং বাজার অর্থনীতি সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু ২০০৪ সালের পর সংস্কার বিবর্ণ হয়ে যায়। তারপরও প্রবৃদ্ধি বেড়েছে, যা আপাতদৃষ্টিতে ছিল আগের করা সংস্কারের সুফল।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক যাত্রা শুরু হয়েছিল খুবই খারাপ পারদর্শিতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু পরে বাংলাদেশ ভালো করে। ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার বৈশ্বিক গড় প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি। বাংলাদেশ ভালো কিছু সুযোগ নিতে পেরেছে। যেমন উন্নত বিশ্বের কারিগরি জ্ঞান ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফার হার ছিল আকর্ষণীয়। কারণ, মূলধন এ দেশে ছিল সোনার হরিণের মতো। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কারগুলো আর হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে আগের করা সংস্কার উল্টে ফেলা হয়েছে।

২.৩ ‘দ্রুত গতির’ স্বরূপ উন্মোচন

এতক্ষণ যে প্রবৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা বিশ্লেষণে গেলে ‘তোতলানো’ শুরু হয়। অতিমারির আগের এক দশকের প্রবৃদ্ধি শ্রমিকপ্রতি পুঁজিসঞ্চয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ সময়ে প্রবৃদ্ধিতে শ্রমের অবদান কমেছে। জাতীয় মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির তুলনায় দারিদ্র্য হ্রাসের হার কম ছিল।

মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে আগে করা সংস্কারের সুফল ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত ছিল ৩ দশমিক ৫ শতাংশীয় বিন্দু। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর সময়ে তা কমে নামে ১ দশমিক ৫ শতাংশীয় বিন্দুতে। একই হারে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে আরও বেশি মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রয়োজন, বিশেষ করে যখন অবকাঠামোতে বিনিয়োগের সুফল কমছে। অন্যদিকে অর্থপাচার ও অদক্ষ ঋণদান ব্যবস্থা প্রবৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

আয় বাড়লে সাধারণত প্রতিষ্ঠান আধুনিক হয়। এ দেশে সেটা হয়নি। বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে দুর্নীতির ধারণাসূচক, সুশাসন সূচক, সহজে ব্যবসা সূচক, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকের মতো মাপকাঠিতে সমপর্যায়ের অর্থনীতির দেশের চেয়ে পিছিয়ে থেকেছে।

২০২২ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হিসাব পর্যালোচনা করেছিল। তারা বাংলাদেশসহ ১৪৯টি দেশের ১৯৭০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়ের উপাত্ত নিয়ে বিশ্লেষণ করে (প্যানেল ডেটা রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস)। সংস্থাটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিমাপের বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে রাতে কত বাতি জ্বলে তাও বিবেচনায় নেয়। উল্লেখ্য, রাতে কত বাতি জ্বলছে, তা দিয়ে একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য ও অসমতার হার বোঝা যায়।

বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণে উঠে আসে, বাংলাদেশে ২০১৩ থেকে ২০১৯ সময়কালের চিত্র অন্য সময়ের চেয়ে ভিন্ন, অর্থাৎ সরকারি পরিসংখ্যানের সঙ্গে বাস্তবতার মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। সরকারের দাবি করা প্রবৃদ্ধি এবং নতুন বিশ্লেষণে অনুমান করা প্রবৃদ্ধির হারের পার্থক্য আগের সময়কালের চেয়ে গড়ে সাড়ে তিন শতাংশ বেশি। খাতের মধ্যে কৃষিতে ১, সেবা খাতে ১ দশমিক ৭ এবং শিল্প খাতে ৭ শতাংশের বেশি পার্থক্য দেখা যায়। এ সময়ে (২০১৬-২০) বাংলাদেশে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে গড়ে ১০ দশমিক ৬ শতাংশ। লুইস মার্তিনেজ মডেল ধরে প্রাক্কলন (২০১৮) করে দেখা যায়, ১৯৯২ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি গড়ে ১ দশমিক ২৮ শতাংশ বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশের উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি আসলে একটি কল্পকাহিনী। ২০১০ সাল থেকে শুরু হয়ে পরের এক দশকে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি পরিসংখ্যানগত দিক দিয়ে ব্যতিক্রম, অর্থাৎ মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে অমিল রয়েছে সমপর্যায়ের অর্থনীতির দেশগুলোর সঙ্গে। যদিও এই প্রশ্নবদ্ধ প্রবৃদ্ধি ধরেই বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং করা হয়। বিশ্বজুড়ে উন্নয়নের গল্প প্রচার করা হয়। যারা উন্নয়নে বাংলাদেশ মডেলের প্রচারে যুক্ত ছিলেন, তারা অগ্রগতিকে সত্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

সরকারের পরিসংখ্যান সঠিক ধরে নিলে বাংলাদেশের উন্নয়নকে আসলেই ধাঁধা বলে মনে হয়। কিন্তু উপাত্তগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সব কিছু আসলে মিছে। ২০১০ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত অর্থনীতি কোন উৎসের ওপর ভর করে দ্রুত গতিতে এগিয়েছে তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

জিডিপির প্রবৃদ্ধির হিসাব নিয়ে বিবিএসের জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যান শাখার সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। তারা হিসাবের দুর্বলতা নিয়ে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। সরকারি উপাত্ত ও প্রণালী (মেথড) ব্যবহার করে, তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে যাচাই ছাড়াই দেখা যায়, পদ্ধতিগত কারণে কিছু কিছু খাতের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হওয়ার সুযোগ নেই। এ থেকে বোঝা যায়, উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিলের সময়ও পরিসংখ্যান কেন অর্থনীতিতে টেকসই দেখিয়েছে।

অবশ্য, উপাত্ত ও প্রণালী অতিমারীর আগের দশকে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। রাজনৈতিক মনিবেরা প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে দেখিয়েছিলেন। হয়তো বাড়িয়ে দেখাতে পারলে মনিবেরা লাভবান হতেন অথবা তাদের মানসিকতাই ছিল অসৎ। সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তির বিদায়ের পরও বিবিএসে আগের প্রভাব থেকে যেতে পারে। বিবিএস ওপর মহলের রোষ এড়াতে প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে দেখানোকেই কৌশল

বানিয়েছিল। সংস্থাটিতে কারিগরি কমিটি ছিল। কিন্তু ২০১৫ সালের পর কমিটির মাধ্যমে পরিসংখ্যান যাচাই করার ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়েছিল।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ধন্দকে আর ধন্দ বলা যাবে না। তা ছিল পরিসংখ্যান কারসাজির ফল। উপসংহার হলো, অতিমারীর চার থেকে পাঁচ বছর আগে জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতি কমে গিয়েছিল এবং পরে সেখান থেকে বের হতে পারছিল না। সরকারিভাবে দেখানো প্রবৃদ্ধি ও প্রাক্কলনের মাধ্যমে সংশোধিত প্রবৃদ্ধির হারের ধারার মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত মিল ছিল। পরের ছয় বছরে সরকারের দেখানো প্রবৃদ্ধির তুলনায় প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির হার অনেক কম দেখা যায়। ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশের নিচে নেমে গেছে। পড়তির ধারা আমাদের পরিসংখ্যান ব্যবস্থা হয় ধরতে পারেনি, নয়ত আড়াল অথবা কারসাজি করেছে।

২.৪ কাঠামোগত স্থবিরতা

সংশোধিত প্রবৃদ্ধি হারের ধারায় স্পষ্ট যে, বিভিন্ন কাঠামোগত সূচকে স্থবিরতা এসেছে। কাঠামোগত স্থবিরতা আর অর্থনৈতিক মন্দা এক নয়। মন্দা আসে সাময়িক সময়ের জন্য। আর্থিক ও মুদ্রানীতিতে কিছু পরিবর্তন আনলে মন্দা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। কিন্তু কাঠামোগত স্থবিরতা মানে দীর্ঘসময় ধরে উচ্চ বেকারত্ব, উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া এবং শ্রম ও মূলধনের গতিশীলতা হ্রাস। সংস্কার ছাড়া কাঠামোগত স্থবিরতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত স্থবিরতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ হলো শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের অনুপাত কমে যাওয়া। মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের স্তর ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল সময়ে কার্যত কমে গেছে। মোট কর্মসংস্থানে নগরায়ণের হিস্যা ২০২২ সালে ২৫ শতাংশে নেমেছে, যা ২০১৬ সালে ছিল ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ। নগরায়ণে কর্মসংস্থানের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ২০১৬-২২ সময়ে নেমেছে শূন্য দশমিক ৮ শতাংশে, যা ২০১০-১৭ সময়ে ছিল ৪ দশমিক ৬ শতাংশ।

রায়হান ও বুগিনিও (২০২৩) দেখিয়েছেন, ১৯৯১-২০০০ সময়কালের তুলনায় এর পরে শ্রমের মোট উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু বিগত দশকে কাঠামোগত পরিবর্তনের অবদান উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। এ সময়ে অর্থনীতিকে রক্ষা করেছে বিদেশে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান।

আনুষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের ভালো আয়ের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক খাতেই শ্রমিক কম। বিপুল সংখ্যক মানুষ কাজ করে অনানুষ্ঠানিক খাতে। অতিমারীর সময় শহরে কাজ কমে যায়। তখন জীবিকার তাগিদে বহু মানুষ আবার কৃষির কর্মসংস্থানে ফিরে যায়। অনেকে সেখানে রয়ে গেছেন। আগে থেকেই পীড়িত কৃষি খাতকে এখন মোট শ্রমশক্তির ৪৫ শতাংশকে কাজ দিতে হচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈচিত্র্য সমপর্যায়ের অন্য দেশের তুলনায় কম। ১৯৮১ সালে জিডিপি অনুপাতে রপ্তানির হিস্যা ছিল ৫ দশমিক ৩ শতাংশ। ২০১০ সালে তা বেড়ে হয় সাড়ে ১৮ শতাংশ। এরপর থেকে কমেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপি অনুপাতে রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ১ শতাংশ। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে। রপ্তানির বাঁড়িতে খুব বেশি পণ্য নেই। এ খাত শুধু পোশাকের ওপর নির্ভরশীল। এক দশক আগেও একই চিত্র ছিল। জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে পণ্য রপ্তানির অবদান অতিমারীর আগে থেকেই কমছিল। ২০২০ সালের হিসাবে, বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণের হার ২৩ দশমিক ৭ শতাংশ, যা এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি অনুপাতে বিনিয়োগের হার ৩২% ছাড়ায়। এর আগের দশকেরও বেশি সময় তা ২৯ শতাংশের নিচে আটকে ছিল। বেসরকারি বিনিয়োগ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকেই ২৩ শতাংশের আশেপাশে ঘুরছে। বিনিয়োগ এগিয়েছে মূলত সরকারি খাতের ওপর ভর করে। ২০১০ সাল থেকে এক দশকে সরকারি বিনিয়োগ জিডিপির ৭ শতাংশের বেশি ছিল। এই হার উচ্চ ও টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, সরকারি বিনিয়োগের নামে অতি খরুচে অবকাঠামো নির্মাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

বাংলাদেশে ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপির অনুপাতে সরকারি বিনিয়োগ বেড়েছে বছরে গড়ে শূন্য দশমিক ২ শতাংশীয় বিন্দু হারে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর সময়কালে তা বছরে শূন্য দশমিক ৭ শতাংশীয় বিন্দু হারে বেড়েছে।

বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয়বৃদ্ধির সমস্যাটি সকল শাসনামলেই দেখা গেছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ২০১২-১৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর সময়কালে পরিবহন খাতে নেওয়া ৩২৯টি প্রকল্প বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে, ৪৯ দশমিক ৭ শতাংশ প্রকল্পের সময় ও ব্যয় বাড়তে হয়েছে। আরও ৩৬ দশমিক ৭ শতাংশ প্রকল্পে হয় ব্যয় অথবা মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। সব প্রকল্প মিলিয়ে ব্যয় বৃদ্ধির হার ছিল ২৬ দশমিক ৩ শতাংশ। আর সময় বৃদ্ধির হার ছিল ৯৪ দশমিক ৮ শতাংশ।

সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পগুলো থেকে যতটা সুফলের কথা বলে জনগণের টাকা ব্যয় করা হয়েছিল, ততটা সুফল পাওয়া যায়নি। বাড়িয়ে দেখানো জিডিপির প্রবৃদ্ধি অনেক ক্ষেত্রে অপব্যয়ের কারণ হয়েছে। যেমন: বিদ্যুৎ খাত। মহাপরিকল্পনায় জিডিপির প্রবৃদ্ধি ধরে বিদ্যুৎ চাহিদার প্রাক্কলন করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী বিপুল ব্যয়ে বড় বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র করার পর দেখা যায়, বিদ্যুতের চাহিদা সেভাবে বাড়েনি। ফলে, বিদ্যুৎকেন্দ্রের মোট সক্ষমতার বড় একটি অংশ কাজে লাগছে না।

এদিকে, আমদানিতে উচ্চহারে শুল্ক বেসরকারি বিনিয়োগকে ভুল পথে নিয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছিল, দেশীয় বাজারকে উচ্চসুরক্ষা দেওয়া হলে আমদানিবিকল্প খাতে বিনিয়োগ হবে। তরুণদের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে, সেটা খুব একটা হয় না, আমদানিবিকল্প শিল্প কর্মসংস্থান সমস্যা দূর করতে পারে না। কারণ আমদানিবিকল্প শিল্পে মধ্যবর্তী পণ্যের চাহিদা তৈরি হয়। তৈরি পণ্য ও মধ্যবর্তী পণ্যের দামের পার্থক্যের কারণে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা শাশ্রয় হয়। কিন্তু কারখানাগুলোর অদক্ষতার কারণে এর সুফল মেলে না।

বিগত ৫০ বছরে ১০০টি দেশের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে বিশ্বব্যাংক দেখেছে, দেশগুলো সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু জিডিপির ১০ শতাংশের সমপরিমাণ অর্জন করার পর ফাঁদে পড়ে। অর্থমূল্যে ২০২৪ সালে তা দাঁড়ায় ৮ হাজার মার্কিন ডলারের সমান। বাংলাদেশ এখন ওই পরিমাণ আয়ের ধারে কাছও নেই। কিন্তু তার আগেই ফাঁদে পড়ে গেছে। এবং সেটা হয়েছে গত দশকের মাঝামাঝিতে।

২.৫ ফাঁদ-মুক্তি কীভাবে

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দেখিয়ে দিয়েছে, সবাইকে নিয়ে উন্নয়নের পথে না হাঁটলে, অর্থাৎ সমাজে বৈষম্য থাকলে কী ফলাফল দাঁড়ায়। বাংলাদেশের বড় অংশের মানুষের প্রকৃত আয় বাড়ছে না। এর কারণ উপযুক্ত নীতি গ্রহণে রাষ্ট্রের সক্ষমতার অভাব। সম্পদের সংকটের মধ্যেও লুপ্ত। পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ শাসনব্যবস্থা। এবং উন্নয়নের কথিত জোয়ারে সকল নৌকাকে ভাসতে না দেওয়া। সুশাসন নিশ্চিত করে, ব্যবসা করা সহজ করে এবং বৈদেশিক অভিঘাত মোকাবিলার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যেতে পারে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে একগুচ্ছ সংস্কার দুই বছরে প্রবৃদ্ধি দুই শতাংশ এবং চার বছরে আট শতাংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম। এসব সংস্কার মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক ঋণে সুদহার বেড়ে যাওয়া এবং বিদেশি বিনিয়োগে ঘাতটির মতো সামষ্টিক অর্থনীতির চাপ মোকাবিলায় সহায়তা করতে পারে। সঙ্গে বাড়বে প্রতিযোগিতা ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা।

অন্তবর্তী সরকার ক্ষমতা নিয়েই প্রবৃদ্ধির একটি পিচ্ছিল পথ পেয়েছে। চার বছর আগে ‘প্রবৃদ্ধির জ্যামিতি’ নামের একটি বুলি জনপ্রিয় হয়েছিল। তাতে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল, ‘প্রবৃদ্ধির জ্যামিতি’ বাংলাদেশের অর্থনীতির অতিমারী এবং উচ্চমূল্যস্ফীতি ও উচ্চ বেকারত্বের স্থায়ী হয়ে যাওয়ার প্রবণতা ঠেকিয়ে সামনে এগিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তা হয়নি।

দৃষ্টিসীমার ভেতরে কিছুটা স্বস্তিকর দিকও দেখা যায়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি সময় রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে গেলেও প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৩ শতাংশের বেশি। রপ্তানি খাতও ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষণ দেখাচ্ছে, প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ শতাংশের কিছু বেশি। আমদানি আবার ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে, বেড়েছে শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ। আগের দুই বছরের বেশি সময়ে আমদানি ধপাস করে পড়ে গিয়েছিল। বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্যতা এখন আর বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বাণিজ্যের মূল সমস্যা নয়।

সব মিলিয়ে ইতিবাচক কিছু লক্ষণ থাকলেও কোনোভাবেই বলা যায় না যে, দেশের অর্থনীতি সংকট কাটিয়ে উঠেছে। জিডিপির অনুপাতে রাজস্ব আয়, বেসরকারি ঋণ, জ্বালানি সরবরাহের মতো সূচকগুলো খুঁকছে। প্রকৃতিও এই প্রান্তিকে সদয় ছিল না। আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)—এই তিন সংস্থার পূর্বাভাস একই রকম। তা হলো ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি কমবে। সেটা দাঁড়াতে পারে চার থেকে সাড়ে চার শতাংশে। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে প্রবৃদ্ধি নিয়ে এখন আলোচনা কম হলেও কার্ঠামোগত সংস্কারের তাগিদ বাড়ছে।

নানা ক্ষেত্রে নানা রকম সংস্কার দরকার। তালিকাটাও দীর্ঘ। মানবসম্পদ উন্নয়নের পরিপূরক হতে হবে অবকাঠামো। অনুকরণ ও অনুসরণের সঙ্গে থাকতে হবে উদ্ভাবন। রাষ্ট্রীয় সংস্থার পরিপূরক হতে হবে সামাজিক সংহতি ও প্রতিষ্ঠানকে। এখন সাধারণ গতানুগতিকভাবে কাজ করলে হবে না। কারণ সংস্কারের বাধা অনেক। আর্থিক খাত সংস্কার, ব্যবসার বিধিবিধান সংস্কার, শুদ্ধকাঠামো যৌক্তিকীকরণ ইত্যাদি সংস্কারের জন্য মৌলিকভাবে দরকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার। যাতে আস্থা ও আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। আর্থিক খাতকে প্রবৃদ্ধির সহায়ক করা যেতে পারে। যদি বিশ্বাস স্থাপনের মতো নীতি পদক্ষেপ নেওয়া যায়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট নৈপুণ্যের সঙ্গে করার মধ্য দিয়ে কাজটি শুরু হতে পারে। বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য সূচকে বাস্তবমুখী প্রত্যাশা থাকতে হবে।

অধ্যায়-৩: মূল্যস্ফীতি: জীবনযাত্রায় প্রলম্বিত যন্ত্রণা*

- বাংলাদেশে এত বেশি ও একটানা উচ্চ মূল্যস্ফীতি আগে কখনো দেখা যায়নি
- বিগত সরকারের আমলে মূল্যস্ফীতির হার ১০ শতাংশের নিচে দেখানোর একটি নির্দেশনা ছিল বলে শোনা যায়, এটা ভিত্তিহীন নয়
- অর্থনীতিবিদ ডিন জোলিফের পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখা যায়, ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ছিল ১৫% থেকে ১৮%, বিবিএস দেখিয়েছিল ৯-১১%
- বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি শুধু বিশ্ববাজারের কারণে সৃষ্টি হওয়ার তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছিল যদিও তা সঠিক ছিল না
- বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম কমলেও বাংলাদেশে কমেনি; বরং সরকার দফায় দফায় জ্বালানির দাম বাড়িয়েছে
- ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর সময়ে সরকারকে দেওয়া ছাপানো টাকার পরিমাণ জিডিপির ১ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যা ছিল ১ দশমিক ১ শতাংশ।
- স্বল্প আয়ের মানুষ যাতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে পারে সে জন্য নীতি সহায়তা ও প্রত্যয় পদক্ষেপ নিতে হবে

বাংলাদেশের মানুষ উচ্চ মূল্যস্ফীতির যন্ত্রণার মধ্যে আগেও দিন কাটিয়েছে। কিন্তু এবারের মতো এতো বেশি ও একটানা উচ্চ মূল্যস্ফীতি কখনোই দেখা যায়নি। যখন মানুষ অতিমারীর অর্থনৈতিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টায় রয়েছে তখনই মূল্যস্ফীতি চেপে বসেছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষকে সংসারের ব্যয় কাটছাঁট করতে বাধ্য করছে। সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী নিম্ন আয়ের মানুষ। তাঁদের কষ্ট বেশি বাড়িয়েছে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি। এটা তাদের জীবনমানকে আরও নিচে নামিয়েছে। সার্বিকভাবে চড়া মূল্যস্ফীতির কারণে অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে মন্দাভাব।

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির বাস্তবতা তুলে ধরা হবে। নজর থাকবে মূলত ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর সময়কালে। কী কী কারণে দীর্ঘসময় ধরে মূল্যস্ফীতির উচ্চহার বিরাজ করছে, বৈষম্য ও দারিদ্র্যের ওপর মূল্যস্ফীতি কী প্রভাব ফেলেছে, তা তুলে ধরা হবে এই অধ্যায়ে। কী কী নীতি পদক্ষেপের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতির কষ্ট থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব, তা তুলে ধরে অধ্যায়টির উপসংহার টানা হবে।

৩.১ মূল্যস্ফীতির বাস্তবতা

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে মূল্যস্ফীতি সরকারিভাবে যতটা দেখানো হয়, বাস্তবে তার চেয়ে বেশি। ২০২৪ সালে বিআইডিএসের এক জরিপে উঠে এসেছিল, মূল্যস্ফীতির হিসাব নিয়ে বিশ্লেষকদের অনাস্থা সবচেয়ে বেশি।

সরকারের দেখানো মূল্যস্ফীতির হার ও প্রকৃত মূল্যস্ফীতির পার্থক্যের একটি চিত্র উঠে এসেছিল সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) গবেষণায়। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি সময়ে তারা নগর ও গ্রামের ৮০০টি করে খানার ওপর জরিপ করে। এতে উঠে আসে, খানাগুলোর আয় আগের মতোই আছে। কিন্তু ব্যয় বেড়েছে ১৩ দশমিক ১ শতাংশ। একই সময়ে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ১ শতাংশ। এতটা পার্থক্যকে হিসাব প্রক্রিয়ার ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন হলো, মূল্যস্ফীতি হিসাবের ক্ষেত্রে যে উপাত্ত ব্যবহার হয়, তা উৎসের কারণে যথার্থ হয় কি না? নাকি হিসাব প্রণালিতেই সমস্যা? মূল সমস্যা সম্ভবত মূল্যস্ফীতি হিসাবের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব। কিছু প্রধান খাদ্যপণ্যে মূল্যবৃদ্ধি কম দেখানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা তিন ধরনের চাল, তিন ধরনের মাংস, তিন ধরনের মাছ, মসুর ডাল, পেঁয়াজ, তরল দুধ, ডিম ও সয়াবিন তেলের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির হিসাব করেছি। এ ক্ষেত্রে উপাত্ত নেওয়া হয়েছে বিবিএসের কাছ থেকেই।

*এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন ড. জাহিদ হোসেন, সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ।

চাল, ডাল, পেঁয়াজ, মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য। এসব পণ্য প্রতিদিনই মানুষের পাতে ওঠে। কিন্তু খাদ্য মূল্যস্ফীতির হিসাবের ক্ষেত্রে এসব পণ্যের প্রভাব খুবই কম ধরা হয়। ফলে সার্বিক মূল্যস্ফীতি কম দেখায়। এটা কেন করা হয়, তা স্পষ্ট নয়। সম্ভবত এটি ইচ্ছাকৃত, কিংবা পূর্ব পরিকল্পিত নয়। তবে বিগত সরকারের আমলে মূল্যস্ফীতির হার ১০ শতাংশের নিচে দেখানোর একটি নির্দেশনা ছিল বলে অনুমান করা হতো। বিবিএসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা বলছে, ওই অনুমান ভিত্তিহীন নয়।

বিবিএসের ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) তৈরি হয় গড়পড়তা ক্রেতা যেসব পণ্য ও সেবা কেনেন তার জাতীয় মূল্য ধরে। খানা আয়-ব্যয় জরিপে জীবনযাত্রার ব্যয় হিসাব করার ক্ষেত্রেও বিবিএস পণ্যের দামের তথ্য সংগ্রহ করে। নীতিগতভাবে সেই তথ্য-উপাত্ত দিয়েও মূল্যস্ফীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। প্যারাগুয়ের অর্থনীতিবিদ লি গিমনেজ ডিন জলিফ ২০১৪ সালে বাংলাদেশের ২০০৫ সাল ও ২০১০ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপের তথ্য নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখান, ওই সময়কালে দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতি হয়েছিল মোট ৭১ শতাংশ। গ্রামে তা ছিল ৬৯ ও শহরে ৭৬ শতাংশ। যদিও একই সময়কালে বিবিএস সিপিআইতে সার্বিক, গ্রাম ও শহরের মূল্যস্ফীতি দেখিয়েছিল যথাক্রমে ৪৬, ৪৭ ও ৪৪ শতাংশ।

ডিন জোলিফের দেখানো পদ্ধতিতে সাম্প্রতিককালের মূল্যস্ফীতি আসলে কতটা, তা ধারণা করা যায়। দেখা যায়, ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ছিল ১৫ থেকে ১৮ শতাংশ। যদিও সিপিআইতে বিবিএস দেখিয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম, ৯ থেকে ১১ শতাংশের মধ্যে। বাস্তবে মূল্যস্ফীতি ১৫-১৭ শতাংশ হয়ে থাকতে পারে। এই বক্তব্যের সমর্থনসূচক আরও প্রমাণ রয়েছে। যেমন বিআইডিএস জরিপ করে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মূল্যস্ফীতি পেয়েছিল ১৫ শতাংশ। যদিও ওই সময় সরকারি হিসাবে মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ৯ শতাংশ।

মোট চাল, সয়াবিন তেল, মসুর ডাল, পেঁয়াজ, মাছ, গরুর মাংস, খাসির মাংস ও ডিমের মূল্যবৃদ্ধির (গ্রামের ভাঙিত গড়) চিত্র বিশ্লেষণ করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) দেখিয়েছিল, ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে গড়ে মূল্যস্ফীতি হয়েছে গড়ে ১১ দশমিক ৭ শতাংশ। একই সময়ে বিবিএস গড় মূল্যস্ফীতি দেখিয়েছে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ।

বিআইডিএস ও সিপিডির চেয়ে আমরা রক্ষণশীলভাবে হিসাব করেছি। তারপরও দেখা যাচ্ছে, বিবিএসের হিসাবের চেয়ে মূল্যস্ফীতি অনেক বেশি ছিল। তারপরও ধরে নিলাম সরকার যা বলেছে, তা সত্যি। তবু গোলমালে ভরা মূল্যস্ফীতির হিসাব থেকে কিছু আগ্রহ উদ্দীপক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এসব বৈশিষ্ট্য মাঠের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে। আসলে সরকারি হিসাবে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে দেখানো হতে পারে, কিন্তু তার গতিপ্রকৃতি বাস্তব অবস্থা সামনে নিয়ে আসে।

২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির গতিপ্রকৃতির সঙ্গে বৈশ্বিক চিত্রের মিল ছিল না। অমিল ছিল একই সময়ের পূর্ববর্তীকালের সঙ্গেও। যেমন দুই বছর আগে বিশ্বের ১৯৪টি দেশের মধ্যে ১৭৯টিতে মূল্যস্ফীতি তরতরিয়ে বেড়ে যায়। তারপর থেকে মূল্যস্ফীতি কমছে। বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি হারের মধ্যমা প্রাক্কলন করা হয় ৭ দশমিক ২ শতাংশ, যা ছিল ২০২৩ সালের এপ্রিলে। হারটি ২০২২ সালের জুলাই মাসের ৯ দশমিক ৪ শতাংশের চেয়ে কম। ওই মাসে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ হয়েছিল। ২০২৪ সালে মূল্যস্ফীতি কমে ৫ দশমিক ৯ শতাংশে নেমেছে। বিপরীতে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বাড়তে শুরু করে ২০২২ সালের শুরুর দিকে। ওই বছর জানুয়ারিতে দেশে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬ শতাংশের কম, যা দ্রুত বাড়তে বাড়তে ২০২৩ সালের আগস্টে ৯ শতাংশের বেশি হারে উঠে যায়। এই প্রতিবেদন লেখার সময়কালে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ৬ শতাংশের বেশি।

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির স্তর ও অস্থিরতা দুটোই বেড়েছে। এর স্থায়ী পতন এখন দূর অতীতের স্মৃতি। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির সর্বোচ্চ হার নিকট অতীতের মধ্যে ছিল ১২ দশমিক ৩ শতাংশ, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে। ওই বছরে

বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট হয়েছিল। পরের বছরই মূল্যস্ফীতি ৭ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে যায়। ২০১০-১১ অর্থবছরে আবার মূল্যস্ফীতি বেড়ে ১০ দশমিক ৯ শতাংশে ওঠে। তা কমে যায় পরের অর্থবছরেই। এরপর ২০২০-২১ বছর পর্যন্ত মূল্যস্ফীতি মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল।

খাদ্য ও খাদ্য-বর্হিভূত মূল্যস্ফীতির মধ্যে সম্পর্কও বদলে গিয়েছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছর ও ২০২০-২১ অর্থবছর সময়কালের মধ্যে ২৪ মাস খাদ্য ও খাদ্য-বর্হিভূত মূল্যস্ফীতির মধ্যে নেতিবাচক সঙ্গতিও ছিল। পরের ৩৭ মাসে এটি ইতিবাচক সঙ্গতিতে রূপ নেয়, অর্থাৎ একইসঙ্গে বাড়তে থাকে। খাদ্য ও খাদ্য-বর্হিভূত মূল্যস্ফীতির একইসঙ্গে বাড়তে থাকা ইঙ্গিত করে যে, দুই ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি একইসূত্রে গাঁথা। কারণগুলো হলো বৈশ্বিক পণ্য মূল্যবৃদ্ধি, ডলারের মূল্যবৃদ্ধি, সরকারিভাবে জ্বালানির দাম বাড়ানো এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে সম্প্রসারণমুখী নীতিমালা গ্রহণ।

৩.২ মূল্যস্ফীতির উসকানি ও তীব্রতা বৃদ্ধির কারণ

অনেকগুলো কারণ একত্র হয়ে মূল্যস্ফীতি উসকে দিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া, অর্থনীতির সম্প্রসারণমুখী নীতি ও বিশ্ববাজার থেকে পণ্য সরবরাহে ভাটা। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর অনেক আগে ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকেই মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকে। যুদ্ধ শুরুর পর মূল্যস্ফীতি লাফিয়ে বাড়তে থাকে।

টিকাদান ও অতিমারী পরিস্থিতির উন্নতির পর ২০২১ সালে মানুষের চলাচল ও সমাগমের ওপর বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়। এরপরই পণ্য চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। বেসরকারি খাতে দেওয়া প্রণোদনার সম্প্রসারণ, বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও জাহাজ ভাড়ার উল্লেখ্য মূল্যস্ফীতির দৈত্যকে বোতলের বাইরে নিয়ে এসেছিল। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ভূ-অর্থনৈতিক প্রভাবে পণ্যমূল্য ও জাহাজভাড়া আরও বাড়ে, যা মূল্যস্ফীতিকে লাগামছাড়া করে।

বাংলাদেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকে বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম আগের বছরের জুন মাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ের তুলনায় ৩০ শতাংশের মতো কমে যায়। একইভাবে কমেছে জ্বালানির দাম। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি শুধু বিশ্ববাজারের কারণে সৃষ্টি হওয়ার যে তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে, তা এসব তথ্য দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। অতিমারির পরে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে প্রকৃত মজুরি কমেছে। ফলে মজুরি বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির তত্ত্বও ধোঁপে টেকে না। আসলে চাহিদা ও সরবরাহের ক্ষেত্রে নানা উদ্দীপক পণ্য ও সেবার দাম বাড়িয়েছে।

সরবরাহগত দিক থেকে মূল্যস্ফীতি উসকে দিয়েছে ডলারের মূল্যবৃদ্ধি। অন্য মুদ্রার বিপরীতে মার্কিন ডলারের দাম দুই দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতে তা আবার উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। বাংলাদেশের বাণিজ্য মূলত ডলারনির্ভর। ডলারের দাম যত বেড়েছে, মূল্যস্ফীতি তত বেড়েছে। আইএমএফের প্রাক্কলন বলছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডলারের বিপরীতে টাকার মান পড়েছিল ২০ শতাংশ। ওই অর্থবছরে ৯ শতাংশ মূল্যস্ফীতির অর্ধেকের কারণ ছিল ডলারের মূল্যবৃদ্ধি। একইভাবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও ডলারের দাম বেড়েছে ১১ দশমিক ৪ শতাংশ। ওই অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে ৯ দশমিক ৭ শতাংশ, যার এক-তৃতীয়াংশ ডলারের দামের কারণে হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

বিনিময় হার নির্ধারণে নীতিনির্ধারণকদের হস্তক্ষেপ বৈদেশিক মুদ্রার মজুতে সংকট তৈরি করে, আমদানি নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করেছে। এতে উৎপাদন ও সরবরাহে ভাটার টান তৈরি হয়েছে। বিপুল চাহিদার বিপরীতে সরবরাহের ঘাটতির সময়ে, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট সরাসরি দেখা যায় না। তবে পর্যবেক্ষণ করা গেছে যে, ব্যাংকগুলো নস্ট্রো হিসাব খালি করে ফেলেছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বিক্রি করেছে। ডলারের আনুষ্ঠানিক দর ও অনানুষ্ঠানিক দরের বড় পার্থক্য তৈরি হয়েছিল। এতে ডলার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় না এসে আনুষ্ঠানিক বাজারে বেশি যাচ্ছিল।

ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট বিদেশি সম্পদ বা নেট ফরেন অ্যাসেটের (এনএফএ) সঙ্গে মূল্যস্ফীতির পরোক্ষ সম্পর্ক আছে। দেখা যায়, এনএফএ যত কমেছে, মূল্যস্ফীতি তত বেড়েছে।

২০২২ সালের আগস্টে তৎকালীন সরকার অকটেনের দাম প্রায় ৫০ শতাংশ এবং ডিজেল ও কেরোসিনের দাম ৩৬ শতাংশ বাড়ায়। এর আগে ২০২১ সালের নভেম্বরে বাড়ানো হয়েছে ২৩ শতাংশ। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে বিদ্যুতের খুচরা মূল্য বাড়ানো হয়েছে ১৫ দশমিক ৭ শতাংশ। পরে ২০২৪ সালের মার্চে বাড়ানো হয় সাড়ে ৮ শতাংশ। ২০২৩ সালের জুনে গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের গড় দাম প্রায় ২৩ শতাংশ বাড়ানো হয়। এসব মূল্যবৃদ্ধি মূল্যস্ফীতির ওপর সরাসরি ও পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছে। নগরের মূল্যস্ফীতির হিসাবের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি তেলের ভার (যতটুকু প্রভাব ফেলে) ৪ শতাংশ, গ্রামের ক্ষেত্রে তা ২ শতাংশ। কিন্তু পরোক্ষ প্রভাব হিসাবে নিলে দেখা যাবে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে শিল্প খাতে গ্যাসের দাম ১৭৯ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি পণ্যের উৎপাদন খরচ বাড়িয়েছে।

বাংলাদেশে পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থায় চাঁদাবাজির ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে। উৎপাদক অথবা আমদানিকারকের কাছ থেকে কোনো পণ্য শহরের পাইকারি বাজারে নিয়ে যাওয়ার সময় ব্যবসায়ীকে কয়েক পর্যায়ে চাঁদা দিতে হয়। ফলে উৎপাদনকারীর পাওয়া দর ও বাজারে বিক্রি হওয়া দামের মধ্যে ফারাক অনেক এবং তা পণ্যভেদে ভিন্ন। চাঁদাবাজির কারণে মূল্যস্ফীতি কতটা বাড়ে, তার শক্ত প্রমাণ নেই। অবশ্য গত ৫ আগস্টের পর দুই সপ্তাহে দেশে একটি ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। ওই সময়ে আগের সরকারের আমলের চাঁদাবাজেরা পালিয়ে গিয়েছিলেন। নতুন চাঁদাবাজেরা তখনো চাঁদা আদায় শুরু করতে পারেনি। সংবাদপত্রগুলো তখন প্রতিবেদন প্রকাশ করে জানিয়েছিল, নিত্যপণ্যের দাম পড়তির দিকে। কিছুদিন পরেই অবশ্য নতুন চাঁদাবাজেরা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ফলে আবার বাড়তে থাকে পণ্যের দাম। করহারের ওঠানামা যেমন পণ্যের দামে প্রভাব ফেলে, তেমনি চাঁদাবাজির হারও পণ্যের দামকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশে চাঁদাবাজির কারণে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি অবাস্তব নয়।

পণ্যের উৎপাদন খরচের সঙ্গে ও খুচরা মূল্যের পার্থক্য অনেক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিক্রেতাদের অসাধু অনানুষ্ঠানিক জোট (সিভিকিট) তাদের বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ব্যবহার করে পণ্যের দাম বাড়ায় বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। একই সময়ে করপোরেট প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধি এই ধারণাকে আরও পোক্ত করে।

নিত্যপণ্যের বাজারে বড় ব্যবসায়ীদের আধিপত্যের কথা সবার জানা। ২০২৪ সালের অক্টোবরে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) একটি গবেষণায় উঠে এসেছে, পণ্য সরবরাহের বিভিন্ন ধাপে কতটা দাম বাড়ে। যেমন উৎপাদন পর্যায়ে থেকে ক্রেতার হাতে আসতে ব্রয়লার মুরগির দাম বাড়ে ১ দশমিক ২৭ গুণ। হলুদের দাম বাড়ে ৮ দশমিক ২৫ গুণ। হলুদ, ডিম, রুই মাছ ও সরু চালের বাজারে পাইকারি ব্যবসায়ীদের বড় ধরনের বাজার আধিপত্য রয়েছে। পণ্য ও অঞ্চলভেদে পণ্যের দাম বাড়ার হারে ভিন্নতা রয়েছে, যা বাজারের বিভাজনকে নির্দেশ করে। ঢাকা চেম্বারের গবেষণায় উঠে এসেছে, স্থানীয় পর্যায়ের ডিম, ব্রয়লার মুরগি, আলু, লালশাক ও কাঁচামরিচের বাজারেও একক বিক্রেতার আধিপত্য রয়েছে।

মুনাফা বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতিকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। বৈশ্বিক বাজারে প্রতিকূল অবস্থা, বিনিময় হারে অবমূল্যায়ন, বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি, বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রণগত সমস্যা মুনাফাসম্পাদনীদের সুযোগ করে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আরও বেশি মুনাফা রেখে পণ্য বিক্রি করে। বাড়তি মুনাফার কারণে কতটা মূল্যস্ফীতি বাড়ে, তা বের করা কঠিন। তবে অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই সম্পর্ক খোঁজ করার দিকে নজর দেওয়া শুরু করেছে।

বাজারে অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির মধ্যে স্থিতিশীল সম্পর্ক অনেক সময়ই থাকে না। তার মানে এই নয় যে, মূল্যস্ফীতি ব্যবস্থাপনায় মুদ্রানীতির ভূমিকা নেই। সাম্প্রতিক উপাত্ত সাধারণভাবে দেখলে চোখে পড়ে যে,

ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির মধ্যে নেতিবাচক সম্পর্ক (কো-রিলেশন) রয়েছে। কিন্তু মূল ঘটনা ভেতরে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে অর্থনৈতিক নীতি ও পদক্ষেপও ছিল মূল্যবৃদ্ধি-সহায়ক। মুদ্রানীতি বাস্তবে কী প্রভাব ফেলেছে, তা প্রায়ই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যাপকভাবে নীতি সুদের হার বাড়ানোর পরও ঋণ ও আমানতে প্রকৃত সুদের হার কমেছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে তা শূন্যে দাঁড়ায়। এটাকে যা কিছুই বলা হোক না কেন, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বলা যায় না।

বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বাড়ার পরোক্ষ মাধ্যমও রয়েছে। ব্যাপক মুদ্রা বলতে বোঝায় মোট বিদেশি সম্পদ ও দেশীয় আর্থিক সম্পদকে। ব্যাংকব্যবস্থায় এনএফএ কমে যাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বিক্রি করে। এর মাধ্যমে টাকা চলে যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে। তবে আগে থেকে থাকা উদ্বৃত্ত তারল্য ব্যাংকগুলোর ঋণদান সক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছিল। ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ব্যাংক ঋণের সুদহারে ৯ শতাংশের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। এর ফলে নীতি সুদ বাড়লেও ব্যাংক ঋণের সুদ বাড়েনি। ঋণ ছিল সস্তা। কোভিড-১৯ এর প্রকোপ কমানোর পর শুধু পণ্য ও সেবার চাহিদাই তরতরিয়ে বাড়েনি, বেড়েছে ঋণের চাহিদাও। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি পূরণে সরকারের ব্যাংক ঋণ বাজারে টাকার সরবরাহ বাড়িয়েছে। সব মিলিয়ে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে।

মুদ্রানীতিতে আর্থিকনীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব মূল্যস্ফীতির অস্থিরতা বাড়িয়েছে। মূল্যস্ফীতি যখন বাড়ে, তখন সাধারণত উত্থান-পতন বেশি হয়। বিশেষ করে যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বাধীন থাকে না এবং মুদ্রা ছাপিয়ে বাজেট অর্থায়ন করে সরকার লাভবান হয়। মূল্যস্ফীতির হারের মধ্যে বাজেট ঘাটতি, মুদ্রা ছাপিয়ে সরকারের লাভবান হওয়া, নতজানু কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক দেখা যায়। বাংলাদেশে ঠিক একই পরিস্থিতি ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর সময়ে সরকারকে দেওয়া ছাপানো টাকার পরিমাণ জিডিপি ১ শতাংশে দাঁড়ায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যা হয় ১ দশমিক ১ শতাংশ। তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর আর্থিক নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব ছিল প্রকাশ্য।

৩.৩ ‘মরার ওপর’ মূল্যস্ফীতির ঘা

স্বচ্ছলদের চেয়ে দরিদ্র মানুষ মূল্যস্ফীতির চাপে বেশি পড়ে। সেটা কতটা বেশি তা জানতে গবেষণা দরকার। বিশ্ববাজারে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও কোভিড-১৯ পরবর্তী প্রভাবে ২০২২ সালে অন্তত সাড়ে ২৭ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে। মূল্যবৃদ্ধির কারণে গরিব মানুষের খাবারের প্রাপ্যতা কমে যায়। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করার পর বেশির ভাগ পরিবার মূল খাদ্য উপকরণগুলো গ্রহণ করা কমিয়েছে। অনেকে, বিশেষ করে শহরের বস্তিতে বসবাসকারীরা দিনে তিন বেলা খেতে পায়নি। নারীদের মধ্যে অনেকে বাধ্য হয়েছে কাজ খুঁজতে। বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী খাদ্য-বর্হিভূত ব্যয় কমিয়ে খাদ্য কেনায় বাড়তি ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলন বলছে, ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ নতুন করে হতদরিদ্র হয়েছে। কারণ, তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। দরিদ্ররা তাঁদের পরিবারের মোট ব্যয়ের অর্ধেকের বেশি খাদ্য কেনার পেছনে খরচ করতে বাধ্য হয়। খাদ্যের উচ্চমূল্য তাদের (যাদের আয় দিনে ২ ডলার ১৫ সেন্টের কম) বেশি সংকটে ফেলেছে। বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলনে আরও বলা হয়, দেশের আরও ৮৪ লাখ মানুষ ‘মডারেট’ দারিদ্র্য শ্রেণিতে নেমে গেছে। এদের আয় দিনে ৩ দশমিক ৬৫ ডলার।

আগেই বলা হয়েছে, দরিদ্র ও সচ্ছলদের ওপর মূল্যস্ফীতির প্রভাব ভিন্ন। এটাই এই দুই শ্রেণির মানুষের জীবনমানের পার্থক্য দিন দিন বেড়ে যাওয়ার বড় কারণ। অর্থনীতি-গাণিতিক (ইকোনোমেট্রিক) মডেল ব্যবহার করে প্রাক্কলনে দেখা যায়, বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি ১ শতাংশ বাড়লে আয়বৈষম্য বাড়ে ৫ শতাংশ। ১০১ দেশের ১৯৮৫ থেকে ২০২০ সাল সময়ের উপাত্ত নিয়ে আরেকটি বিশ্লেষণে দেখা যায়, মূল্যস্ফীতির হার ৬ শতাংশের ওপরে উঠলে আয়বৈষম্য বাড়ে।

গরিবেরা সম্বলের পুরোটা দিয়েই বাজার থেকে খাদ্য ও সেবা কেনে, যাকে বলা হয় ‘নেট বায়ার’। তিন বছর ধরে মূল্যস্ফীতির হার স্বল্প দক্ষ শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। মানে হলো, শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি ও ক্রয়ক্ষমতা কমছে। এই শ্রমিকেরা মজুরি নিয়ে দর কষাকষি করতে পারেন না। আর্থিক বাজারে তাঁদের প্রবেশের সুযোগ সীমিত, অর্থাৎ, তাঁদের কেউ ঋণ দিতে চায় না।

মূল্যস্ফীতির সময় মুনাফা বাড়ে ‘নেট সেলারদের’, যারা কেনে কম, বিক্রি করে বেশি। সাধারণত শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য খাতে বড় করপোরেটরা ‘নেট সেলার’ হয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়ার সুবিধা এরাই বেশি পায়।

৩.৪ মূল্যস্ফীতির লাগাম টানার উপায়

মূল্যস্ফীতি খুব কম থাকা এবং খুব বেশি থাকা, উভয়ই গুরুতর সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত। মূল্যস্ফীতির উচ্চ ও নিম্ন হার অব্যাস্তাবী নয়, যে জাতিকে সেটা গ্রহণ করতে হবে। এটা মানুষের সৃষ্টি। এখানে ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘসময় দুই অঙ্কের মূল্যস্ফীতির মধ্যে থাকতে অভ্যস্ত নয়। আবার সরকারি পরিসংখ্যানে মূল্যস্ফীতি হার কমিয়ে দেখিয়ে তাঁদের বোকা বানানোও সম্ভব নয়।

বিশ্ববাজার ও দেশের অভ্যন্তরের পরিস্থিতিতে সুখবরও আছে। কিন্তু সঠিক নীতি না নিলে সুফল তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছাবে না। বিশ্ববাজারের সুখবর হলো, পণ্যের দাম কমছে। বিশ্বব্যাংকের পণ্য মূল্যসূচক ২০২৪ সালে ৩ শতাংশ কমেছে। এটা আগামী বছর আরও ৫ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে ২ শতাংশ কমেতে পারে। তখন মূল্যসূচক ২০২০ সালের পর সবচেয়ে কম দাঁড়াবে। ২০২৪ সালে জ্বালানির মূল্যসূচক কমার হার দাঁড়াতে পারে ৬ শতাংশ। এটা ২০২৫ সালে ৬ শতাংশ এবং পরের বছর ২ শতাংশ কমেবে, যদি মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত আরও না বাড়ে। ২০২৫ সালে কৃষিপণ্যের মূল্য কমেতে পারে ৪ শতাংশ। ইউক্রেন পরিস্থিতির অবনতি না হলে খাদ্যপণ্যের বৈশ্বিক মূল্যসূচক ২০২৫ সালে ৪ শতাংশ কমেবে। চীনে চাহিদা ব্যাপকভাবে না বাড়লে ধাতুর দামও কমার আশা আছে।

বিশ্ববাজারে কমে গেলে বাংলাদেশে পণ্যের দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমে যাবে, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। বিশ্ববাজারে পড়তি দর বাংলাদেশ ব্যাংককে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে নিয়ে আসার একটি সুযোগ তৈরি করে দেবে। মূল্যস্ফীতির হিসাব করার ক্ষেত্রে খাদ্য ও জ্বালানির মূল্যের ভার বেশি ধরা হয়। অর্থাৎ, খাদ্য ও জ্বালানির দাম বাড়লে মূল্যস্ফীতি বেশি বাড়ে, কমলে বেশি কমে। বিশ্ববাজারে এসব পণ্যের মূল্যহ্রাস দেশেও দাম কমানোর প্রত্যাশা তৈরি করবে। এটি মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধির চাপ কমিয়ে দেবে।

যদিও বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশে দ্রুত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কমার সময় হ্রাস পায় ধীর গতিতে। দাম কমলে বড় বিক্রেতার পণ্য মজুত করে। ব্যাংকের উচ্চসুদের হার (সংকোচনমুখী মুদ্রানীতির কারণে) মজুত করার খরচ বাড়ায়। তখন ব্যবসায়ীর জন্য মজুত না করাই লাভজনক হয়।

বাজারে মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কতটুকু ভূমিকা রাখছে, তা বিচারের সময় এখনো আসেনি। তবে বোঝা যায় যে, শুধু এই কৌশলে কাজ হবে না। খাদ্যের উচ্চমূল্য নিম্ন আয়ের মানুষসহ জনসংখ্যার বড় অংশের (৭০ শতাংশের বেশি) জন্য জীবিকার সংকট তৈরি করেছে। চাল, মসুর ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, ভোজ্যতেলের মতো নিত্যপণ্যের দাম শুধু স্থিতিশীল হলেই হবে না, বর্তমান মূল্য থেকে কমানো দরকার। এ ক্ষেত্রেও সহায়তা করতে পারে সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি। মুদ্রানীতি বিনিময় হার স্থিতিশীল করতে ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লারের দাম আর না বাড়লে বাজারে তার সুফল পাওয়া যাবে। মুদ্রানীতি দিয়ে অবশ্য বাজারকাঠামো ও চাঁদাবাজিজনিত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

চাঁদাবাজি বন্ধে ও বাজারে অসাধু জোট করে দাম বাড়ানোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ দেখা যায় না। বাংলাদেশে শুধু দেখা যায় বাজারে অভিযান, যাতে কার্যকর কিছু হচ্ছে না। বাজারে অভিযান চালালে বিক্রেতার ভীত হন

এবং অনেকে বিক্রি বন্ধ করে দেন। জরিমানা করা হলে তা পণ্যের দাম থেকেই ওঠানো হয়। ডিমের বাজারে সাম্প্রতিক অভিযান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা প্রমাণ করে, অভিযান আসলে আত্মঘাতী।

বাজারে কারসাজির প্রতিরোধের একটি উপায় হতে পারে পণ্যের সরকারিভাবে মজুত বৃদ্ধি। যদিও সেটার সঠিক ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং পণ্যের পরিমাণ বেশি হতে হবে। বিআইডিএসের একটি সমীক্ষায় উঠে এসেছিল, খুব শক্তিশালী না হলেও চালের সরকারি মজুতের সঙ্গে বাজারে দামের একটি সম্পর্ক রয়েছে। সরকারিভাবে থাকা বড় মজুত বেসরকারি মজুতদারদের প্রতি একটি হুমকি হিসেবে কাজ করে। অবশ্য সরকারি মজুতের ব্যবস্থাপনা প্রায়ই সঠিকভাবে করা হয় না। একই কথা প্রযোজ্য ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) ক্ষেত্রে। সংস্থাটির ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কর্মসূচি এক কোটি পরিবারকে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য দেওয়া হয়। অনেকে যোগ্য না হয়েও এই কার্ড পেয়েছে, অনেকে যোগ্য হয়েও পাননি।

সরকারকে আগে অগ্রাধিকার ঠিক করতে হবে। মনে রাখা সরকার, একেবারে নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করতে গিয়ে ভালো কাজ যেন থমকে না থাকে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট পুনর্মূল্যায়ন ও ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট তৈরির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে হতদরিদ্রদের নগদ সহায়তা ও তার আওতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে। স্বল্প আয়ের মানুষ যাতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, সে জন্য নীতি পদক্ষেপ নিতে হবে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসা মানে এই নয় যে, নিত্যপণ্যের দাম আগের পর্যায়ে ফিরে যাবে। নিয়ন্ত্রণ মানে হলো মূল্যস্ফীতি দ্রুত ও নাটকীয় বৃদ্ধি বন্ধ হওয়া। মূল্যস্ফীতি ৫ শতাংশের নিচে নামাতে বাজারে টাকার সরবরাহ আঁটসাঁট রাখা ও সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা দরকার। পাশাপাশি গরিবদের আরও উদারভাবে সরকারি সহায়তা দিতে হবে। বাজারে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং উৎপাদন, আমদানি ও সরবরাহ পরিস্থিতি নজরদারির জন্য যেসব সংস্থা রয়েছে, তাদের মূল কাজ হওয়া উচিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া। কারণ এসব পণ্য মূল্যস্ফীতির হারকে বেশি প্রভাবিত করে এবং দরিদ্র মানুষ নিত্যপণ্য কিনতেই বেশি ব্যয় করে।

অধ্যায়-৪: বৈদেশিক লেনদেন-ভারসাম্যের ‘চোরাবালি’*

- বাংলাদেশে টানা তিন বছর বৈদেশিক মুদ্রার মজুত কমেছে। ফলে বৈদেশিক দেনা পরিশোধ নিয়ে সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে
- ২০২১ সালে আইএমএফের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভ বাড়িয়ে দেখাচ্ছে
- ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর সময়ে রিজার্ভের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ১৯ বিলিয়ন ডলার দেখানো হয়েছে বাদ পড়ার ভুল হিসেবে, যা আগের তিন অর্থবছরে ছিল দেড় বিলিয়ন ডলার
- বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফের শর্ত পাশ কাটানোর উদ্দেশ্যে বাফেদা ও এবিবির মাধ্যমে টাকার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে
- ভারত, চীন, ভিয়েতনামসহ বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয়ের অনুপাতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত অনেক কম
- তিন মাপকাঠিতে বাংলাদেশের জন্য নিরাপদ রিজার্ভ ১৪ থেকে ৩৬ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যমা (মিডিয়ান) ২৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার, রিজার্ভ (প্রকৃত) আছে সাড়ে ১৫ বিলিয়ন ডলার
- মুদ্রার বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ার এখনই সময়; অপেক্ষা করতে গেলে বর্তমান সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে

বাংলাদেশে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আছে কি না, তা বোঝাতে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতিতে ব্যবহারের চল রয়েছে। অতিমারীর আগে পরিস্থিতি সবুজ, অর্থাৎ স্বস্তিজনক ছিল। এরপর ধাপে ধাপে তা ‘লাল’, অর্থাৎ উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। কারণ বিশ্ববাজারে ডলারের দাম, সুদের হার ও পণ্যের দাম বেড়েছে। দেশে নেওয়া হয়েছিল ভুল নীতি পদক্ষেপ। ফলে বাংলাদেশে টানা তিন বছর বৈদেশিক মুদ্রার মজুত কমেছে। বৈদেশিক দেনা পরিশোধ নিয়ে সংকট চূড়ায় উঠেছে।

এই অধ্যায়ে দুটি দিক দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে বাস্তবতা দেখা হবে। একটি হলো, বৈদেশিক বাণিজ্য ও দেনা পরিশোধ; অন্যটি, জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ। এ দুটি একই মুদ্রার দুই পিঠ। বৈদেশিক অভিঘাতের সবচেয়ে বড় শিকার হয় বিনিময় হার। এ সংক্রান্ত নীতি মুদ্রার মজুত রক্ষার বদলে পতনের দিকে নিয়ে গেছে। এটা এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হবে। অধ্যায়টির উপসংহারে বলা হবে, অতীতে ভুলের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কী কী শিক্ষা নিতে পারি।

৪.১ দুরাবস্থা দুই দিকেই

২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত সবাই মনে করত, বাংলাদেশের চলতি হিসাব ঘাটতি থেকে উদ্ধৃত্তে পরিণত হয়েছে। এই ধারণা ঠিক নয়। কেন, তা পরে বলছি। আগে দেখে নিই, কী কী কারণে চলতি হিসাবে ঘাটতি কমেছে বলে মনে করা হয়। কারণগুলো হলো আমদানি ব্যাপকভাবে কমে যাওয়া, বিদেশ থেকে পণ্য আনার ক্ষেত্রে মূল্য বেশি দেখানোর (ওভার ইনভয়েসিং) প্রবণতা হ্রাস, রপ্তানি খাতের ঘুরে দাঁড়ানো এবং প্রবাসী আয় বৃদ্ধি। চলতি হিসাবের ঠিক বিপরীত চিত্র ছিল আর্থিক হিসাবে। বাণিজ্য-ঋণ (ট্রেড ক্রেডিট) যতটুকু আসছিল, বেরিয়ে যাচ্ছিল তার তুলনায় অস্বাভাবিক হারে। ফলে আর্থিক হিসাবে কয়েকশ’ কোটি ডলারের ঘাটতি তৈরি হয়।

আগেই বলেছি যে, চলতি হিসাবের উদ্ধৃত্তের ধারণাটি সঠিক নয়। এবার দেখা যাক কারণ কী? রপ্তানি আয়ের পরিসংখ্যানে ভুল ছিল। ২০২৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানি আয়ের পরিসংখ্যান সংশোধন করার পর দেখা যায়, আয়ের পরিমাণ আসলে অনেক কম। রপ্তানি আয়ের হিসাবে সংশোধন চলতি হিসাবকে উদ্ধৃত্ত

*এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন ড. জাহিদ হোসেন, সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ।

থেকে আবার ঘাটতিতে পরিণত করে। আর্থিক হিসাব ঘাটতি থেকে উদ্ধৃত্তে পরিণত হয়। এই দুই বিপরীতমুখী পরিবর্তনের পর সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য আগের মতোই ছিল।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের হিসাব নিয়ে প্রশ্ন আগেই উঠেছিল। ২০২১ সালে আইএমএফের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভ বাড়িয়ে দেখাচ্ছে। ওই বছর জুনে রিজার্ভ দেখানো হয়েছিল ৪৬ বিলিয়ন ডলার (১ বিলিয়নে ১০০ কোটি)। কিন্তু বৈশ্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য মাপকাঠিতে পরিমাপ করা হলে দেখা যায়, রিজার্ভ আসলে ৩৯ বিলিয়ন ডলারের বেশি নয়। সহজভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানিকারক, অবকাঠামো নির্মাণকারী, রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক, শ্রীলঙ্কাকে ঋণসহ বিভিন্ন খাতে যে বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে রেখেছিল, সেগুলোকেও হিসাবে দেখানো হচ্ছিল। পরে আইএমএফ বাংলাদেশকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত দেয় যে, বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের হিসাব আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে (বিপিএম৬) রাখতে হবে।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুত কমছিল ২০২১ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিক থেকে। চাপ আসে বাণিজ্য ও চলতি হিসাবের ঘাটতি থেকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি ছিল সাড়ে ৯ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে সাড়ে তিনগুণ বেড়ে ৩৩ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। একইসময়ে বেড়েছে চলতি হিসাবের ঘাটতি, যা ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন থেকে বেড়ে ১৮ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। এ সময়ে ডলার শক্তিশালী হওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ছাড়া অন্যান্য বাজারে রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পণ্য মূল্যবৃদ্ধিতে আমদানি ব্যয় বাড়ে। যদিও আমদানির পরিমাণ কমে যায়। বাণিজ্য-ঋণ (ট্রেড ক্রেডিট) কমে যাওয়া এবং বেসরকারি খাতে স্বল্পমেয়াদি বিদেশি ঋণ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া আর্থিক হিসাবের উদ্ভূত দ্রুত কমিয়ে দেয়। বৈশ্বিক সুদের হার বৃদ্ধিতে আমদানি-রপ্তানিতে ঋণ ও বাণিজ্যিক ঋণের খরচ বেড়ে যায়। ব্যাংক খাতের দুর্দশা এ খাতের ওপর বিদেশি ঋণদাতাদের আস্থা কমিয়ে দেয়।

লেনদেন ভারসাম্যের ক্রমিক নেতিবাচকতার মধ্যেই বাংলাদেশ ব্যাংক মজুত থেকে ডলার বিক্রি শুরু করে। রিজার্ভে পতনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, হিসাব ছাড়া বিপুল পরিমাণ ডলার বেরিয়ে যাওয়া। এটাকে হিসাবের ভুল-ত্রুটি হিসেবে দেখানো হয়েছে। ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর সময়কালে এমন অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৯ বিলিয়ন ডলার। এর আগের তিন অর্থবছরে (২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর) পরিমাণটি ছিল দেড় বিলিয়ন ডলার। আন্দাজ করা যায়, এটা আসলে অর্থপাচার। সেই আন্দাজের ক্ষেত্রে শক্ত ভিত্তিও থাকতে পারে। গত ৫ আগস্ট তৎকালীন সরকারের পতনের পর সামনে আসা নানা ‘অ্যাককোউন্ট’ (তথ্য অথবা গবেষণাভিত্তিক নয়) এই ধারণাকে সমর্থন করে।

৫ আগস্টের আগে ৩৬ মাস ধরে বৈদেশিক মুদ্রার মজুতে বিরাট পতন হয়েছে। তার আগে করোনাকালে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে আমদানি কমে যাওয়ায় মজুত বেড়েছিল। ২০২০-২১ অর্থবছরে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৯ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের উদ্ভূত ছিল। তখন রিজার্ভ হিসাবে ভুল-ভ্রান্তি কম ছিল। পরিস্থিতি যথেষ্ট খারাপ হওয়ার পর সরকার আইএমএফের দ্বারস্থ হয়।

চলতি হিসাবের ভারসাম্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগে মধ্যকার বিচ্যুতি তুলে ধরে। সাধারণত ঘাটতিতে থাকা দেশ, নিজস্ব উৎপাদনের চেয়ে বেশি ব্যয় করে। অন্যদিকে উদ্ভূত থাকা দেশ, উৎপাদনের চেয়ে ব্যয় করে কম। বিদেশি মূলধনের অন্তর্মুখী প্রবাহ স্বল্পমেয়াদে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের পার্থক্য পূরণ করে। কোনো দেশ দীর্ঘ মেয়াদে চলতি হিসাবে বড় ঘাটতি নিয়ে চলতে পারে না। অনেক বেশি বিদেশি দায় অর্থনীতিকে ভঙ্গুর করে তোলে।

জাতীয় সঞ্চয় কমে যাওয়া, স্থবির বিনিয়োগ, অতিমূল্যায়িত বিনিময় হার, বাজেট ঘাটতি বাড়তে থাকা ও অত্যধিক ঋণ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে, দেশ চলতি হিসাবের ঘাটতিতে রয়েছে। বাংলাদেশে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় বেড়েছে। তার আগে কমে গিয়েছিল। জিডিপির অনুপাতে বিনিয়োগ, ২০২১-২২ অর্থবছর ছাড়া বাকি বছরগুলোতে ৩১ শতাংশের আশপাশে ছিল। অতিমারীর পরে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিনিয়োগের চাহিদা

অনেক বেড়ে যায়, ওই বছরটি ব্যতিক্রম। একই সময়ে প্রকৃত বিনিময় হার বাড়ে, যা রপ্তানি খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমিয়ে দেয়। প্রাথমিক বাজেট ঘাটতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল জিডিপি ১ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা ২ দশমিক ৮ শতাংশ হয়েছে বলে প্রাক্কলন করা হয়। স্থানীয় ঋণের প্রবৃদ্ধি ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ১০ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫ শতাংশে দাঁড়ায়। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অবশ্য হারটি কমে সাড়ে ১০ শতাংশে নামে।

জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হারের একত্রে নড়াচড়া লক্ষণীয়। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দুই দশক দুটিই গড়ে কম ছিল। পরের দশকগুলোতে তা বাড়ে। ৫৩ বছরে জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের আন্তঃসম্পর্ক সহগ শূন্য দশমিক ৯৬। এটি বাণিজ্য ঘাটতি পূরণে আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনের নীতি নেওয়া পদক্ষেপের ব্যর্থতার একটি উত্তম উদাহরণ। বাংলাদেশে বিদেশি অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা, জাতীয় সঞ্চয়ের বিপরীতে বিনিয়োগ ততটা বাড়তে দেয়নি। চলতি হিসাবে ঘাটতি মেটানো সম্ভব হতো দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় অর্থায়ন দ্বারা। সচ্ছলতার জন্য চলতি হিসাবে ঘাটতির বিপরীতে উচ্চ জাতীয় সঞ্চয় অথবা কম বিনিয়োগ দরকার। যেভাবে এই সমন্বয় হচ্ছিল তা ২০২২ সালে কথিত ব্যতিক্রমী নীতির কারণে মারাত্মকভাবে আটকে যায়।

৪.২ বিশৃঙ্খল নীতি

বিদেশি ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রার মজুত কমে যাওয়ায় এ দুটির ব্যবহার সীমিত করে দিতে বাধ্য হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার। এতে উৎপাদন বিঘ্নিত হয়, বিনিয়োগ কমে যায় এবং বিপরীতে বাড়তে থাকে বিদেশি দেনা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তখন বিনিময় হার ও সুদের হারের ক্ষেত্রে নীতি পরিবর্তনে বাধ্য হয়। বিনিময় হারের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ ও নৈরাজ্যিক নীতি রিজার্ভের পতন আরও ত্বরান্বিত করে।

বাংলাদেশে বিনিময় হার বাজারভিত্তিক ছিল না। ১৯৭২ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সময়ে বিনিময় হার ঠিক করে দেওয়া হতো। ২০০৩ সাল থেকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিনিময় হার ছিল নিয়ন্ত্রিত বাজারভিত্তিক। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিত বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে হস্তক্ষেপ করেছে। ২০০৩ সালের ডলারের দাম ছিল ৬০ টাকা। ২০২১ সালে তা দাঁড়ায় প্রায় ৮৫ টাকা। বাৎসরিক অবমূল্যায়ন হার ছিল গড়ে চার শতাংশের মধ্যে। ব্যতিক্রম ছিল শুধু ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছর। এই দুই অর্থবছরে ডলারের বিপরীতে টাকার মান সামান্য বাড়ে। এই সময়ে নামিক বিনিময় হার ও প্রকৃত বিনিময় হার একই সঙ্গে একই অভিমুখে যাত্রা করেছে।

ডলার সংকটের মধ্যে যখন টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে, তখন বাংলাদেশ ব্যাংক নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। যদিও ওই সব পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন ছিল এবং তা সফল হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস (ব্যাংক) ও অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশকে (এবিবি) রপ্তানি ও প্রবাসী আয় আনার ক্ষেত্রে ডলারের মূল্যসীমা বেঁধে দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছিল। তারা বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কম দর নির্ধারণ করে। দরের পার্থক্যও ছিল অনেক বেশি। ওই সময় বিনিময় হারের বংশ বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ কয়েক ধরনের হার তৈরি হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক টেলিফোনে নির্দেশনা দেওয়া এবং বাজারে পুলিশিং শুরু করে। ব্যাংক-এবিবির নির্ধারণ করা বিনিময় হারেও ডলারের দাম বাড়ছিল। পরবর্তীতে নানা পদক্ষেপ প্রবাসী আয় ও রপ্তানি আয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে ডলারের দামের পার্থক্য কমে আসে।

মজার বিষয় হলো, ঋণদানের সময় আইএমএফ বছরকম বিনিময় হার নিয়ে চূপ ছিল। সংস্থাটির নিজস্ব বিধি (বিধি-৮) বলছে, বছরকম বিনিময় হার থাকলে তারা ঋণ দেওয়ার এখতিয়ার নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফের নিয়ম পাশ কাটাতে ব্যাংক ও এবিবির মাধ্যমে বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে আইএমএফকে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে যে, একাধিক বিনিময় হার তৈরি হয়েছে বিশৃঙ্খল বাজারের কারণে।

যা-ই হোক, বাংলাদেশ ব্যাংক আনুষ্ঠানিক দামের চেয়ে কম দরে রিজার্ভ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রি করছিল। এ ক্ষেত্রে আইএমএফ চোখ বন্ধ রাখতে পারেনি। আইএমএফ বলেছিল, বাংলাদেশ সফরকালে তাদের প্রতিনিধি

দল জানতে পারে এ দেশে একাধিক বিনিময় হার রয়েছে। এটা করা হচ্ছে সরকারি অর্থায়নের ক্ষেত্রে। বহুরকম বিনিময় হার ঋণদানের এখতিয়ার দেয় না।

বিষয়টি নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকও ছিল সতর্ক। তারা বলেছিল, বিনিময় হারের এই ব্যবস্থাকে অস্বাভাবিক বলা যায়। এবিবি ও বাফেদা মূলত খাতভিত্তিক ব্যবসায়ী সংগঠন হিসেবে অ্যাডভোকেসি ও নীতি-সংলাপের কাজ করে। এটা পরিষ্কার নয় যে, বিনিময় হার কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাফেদা ও এবিবিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না? বাফেদা বিনিময় হারে বিচ্যুতির বিষয়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থার পদক্ষেপের কথা বলেছে।

কোনো পদক্ষেপেই কোনো কাজ হয়নি। ব্যাংক ব্যবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি আরও বেড়ে যায়। ফলে অর্থনীতির মোটামুটি সব স্তরে বিঘ্ন ঘটে। স্বেচ্ছাচারী উপায়ে বিনিময় হার নির্ধারণ করে দেওয়ার পর বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনে অস্থিরতা তৈরি হয়। ব্যাংকে মজুত কমে যায়। বাজারে নির্ধারিত হার যেমন ছিল, তেমনি নানা ফাঁকফোকরও ছিল। এতে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের বড় অংশ অনানুষ্ঠানিক হয়ে যায়। আমদানিকারকেরা রপ্তানিকারকদের কাছ থেকে ডলার কিনছিলেন। রপ্তানিকারকেরা আমদানিকারক খুঁজে খুঁজে বাড়তি দামে ডলার বিক্রি করছিলেন। ব্যাংকারেরা শুধু মধ্যস্থতা করতেন। সব মিলিয়ে আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার অনেকটা 'কোমায়' চলে গিয়েছিল।

বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের ক্ষেত্রেও স্বজনতোষণ (ক্রোনিজম) শুরু হয়েছিল। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক হারের কম দামে রেকর্ড ১৩ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিক্রি করে আরও ১২ দশমিক ৭৯ বিলিয়ন ডলার। ক্ষমতাসীনেরা তখন বলেছিলেন, সার-জ্বালানি ইত্যাদি আমদানিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের ব্যবস্থা করছে। এই দাবি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক কার কাছে কত ডলার বিক্রি করেছে তা কখনো প্রকাশ করেনি। যেসব পণ্য আমদানি করার জন্য ডলার দেওয়ার দাবি করা হয়েছে, তার মোট আমদানিমূল্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিক্রি করা ডলারের পরিমাণের ধারেকাছেও যাবে না।

বিনিময়হারের যে ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল তাতে আমদানিকারকদের সুবিধা হতো। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতিতে সেই সুবিধা সরকারঘনিষ্ঠ আমদানিকারক ছাড়া অন্যরা নিতে পারেনি। শুধু রপ্তানি খাত বিনিময় হারের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু সরকারঘনিষ্ঠ রপ্তানিকারকেরা নিয়মকে পাশ কাটিয়ে ডলার বিক্রি করে লাভবান হন।

বাংলাদেশের বাণিজ্য মূলত ডলারনির্ভর। ডলারের দাম কমিয়ে রাখা ও বহুরকম দর থাকলেও তা এড়িয়ে আন্তঃমুদ্রা লেনদেনের সুযোগ ছিল। দুর্নীতিও হচ্ছিল। এক পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের মর্জি বদলালে, বিনিময় হার সীমা আর কার্যকর থাকেনি।

উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো বৈশ্বিক প্রতিকূলতার মধ্যেও পরিস্থিতি আংশিকভাবে সামাল দিতে পেরেছে। কারণ তারা আর্থিক-মুদ্রা-বাজেটের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নীতি বাস্তবায়ন করতে পেরেছিল। সে সময় বাংলাদেশ বেছে নিয়েছিল ভিন্ন পথ। অলিগার্করা বৈদেশিক মুদ্রা বাজারকে ব্যক্তিগত লেনদেন ব্যবস্থায় পরিণত করেছিল। অনেক ব্যাংক বাফেদা-এবিবি নির্ধারিত দরকে পাশ কাটিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন শুরু করেছিল। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা ও ডলারের আগাম (ফরোয়ার্ড) বিনিময়মূল্যের ৯০ দিন মেয়াদি একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়। সেখানে কতটা বাড়তি মূল্য নেওয়া যাবে তা বলে দেওয়া হয়। যা আরেকটি বিনিময় হারের জন্মের উদাহরণ।

৪.৩ বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থা

রিজার্ভে দ্রুত পতন বাংলাদেশকে আইএমএফের দ্বারস্থ করে। ২০২৪ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিনিময় হারে ‘ক্রলিং পেগ’ পদ্ধতি চালু করলে, ডলারের দাম সাত টাকা বেড়ে যায়। পরে আগস্ট মাসে তা আরও বাড়ে। কিন্তু ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগের কর্মকর্তারা ভয়ডরহীন ভাবে লেনদেনের সুযোগ পান। ওদিকে ডলার কেনাবেচায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দর ও আন্তঃব্যাংক লেনদেনের মূল্য সমান হয়। সব মিলিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে কিছুটা স্থিতি ফেরে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বাজারে দামের পার্থক্য ২ শতাংশের নিচে নেমে আসে। যা স্বাভাবিক বলে ধরা যায়। বৈদেশিক মুদ্রার মজুতে পতন থামে। বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বিক্রি বন্ধ করায় আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারে প্রাণ ফেরে।

কিন্তু আমরা এখনো স্বস্তিজনক জায়গায় যেতে পারিনি। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত এখনো কম। ‘ক্রলিং পেগ’ পদ্ধতিতে আন্তঃব্যাংক লেনদেনে ডলারের দাম এখনো বাজারভিত্তিক নয়, সীমাবদ্ধ।

সম্প্রতি বাণিজ্যিক ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত পরিস্থিতি ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে। তাদের কাছে এখন দেনার চেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা রয়েছে। প্রবাসী আয় বাড়ছে। ২০২৪ সালের জুলাইয়ের পর থেকে মাসে ২ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি প্রবাসী আয় আসছে। হুন্ডিতে ডলারের চাহিদা কমার প্রাথমিক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সাময়িকভাবে অর্থপাচারের প্রবণতা কমায়ে হুন্ডির চাহিদা কমে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ বন্ধের পদক্ষেপ নিয়েছে।

ভারত-চীন-ভিয়েতনামসহ বিভিন্ন দেশ সাম্প্রতিককালে চলতি হিসাবে উল্লেখযোগ্য হারে উদ্বৃত্তের দেখা পেয়েছে। জাতীয় আয়ের অনুপাতে তাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুতও বেশি। ভিন্ন চিত্র শুধু ইথিওপিয়ায়। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত পরিস্থিতি টানটান। প্রয়োজনের চেয়ে বাড়তি নেই। প্রতিবেশী দেশ নেপালের মোট রিজার্ভ ১৮ বিলিয়ন ডলার। জাতীয় আয়ের (আটলাস পদ্ধতি) পরিমাণ ৪১ বিলিয়ন ডলার। জাতীয় আয়ের বিপরীতে রিজার্ভের অনুপাত সাড়ে ৪৪ শতাংশ। বাংলাদেশের রিজার্ভ ২১ বিলিয়ন ডলার। জাতীয় আয়ের পরিমাণ ৪৫৫ বিলিয়ন ডলার। জাতীয় আয়ের বিপরীতে রিজার্ভের অনুপাত ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। এই অনুপাত ভারতের ২০, চীনের ১৮ দশমিক ৮, থাইল্যান্ডের ৪৫ দশমিক ৯, ইন্দোনেশিয়ার ১১ দশমিক ২, মালয়েশিয়ার ২৬ দশমিক ৪, ফিলিপাইনের ২৩ দশমিক ১, ভিয়েতনামের ২২ দশমিক ৯ শতাংশ। ইথিওপিয়ার ক্ষেত্রে তা মাত্র ২ দশমিক ১ শতাংশ।

বাড়তি রিজার্ভ থাকলে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। ফের অতিমারী, বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, রপ্তানি আয় কমে যাওয়ার মতো আঘাত আসলে লেনদেন ভারসাম্য ও বৈদেশিক দেনা পরিশোধে সংকট তৈরি হতে পারে। আন্তর্জাতিক ঋণমান নির্ধারণকারী সংস্থাগুলো বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের পরিমাণেই স্বস্তি খোঁজে।

রিজার্ভ কম থাকা বিপজ্জনক। কম রিজার্ভের মানে হলো বিমা ছাড়া ঝুঁকি নেওয়া। রিজার্ভ বেশি থাকাও ভালো নয়। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি রিজার্ভের মানে হলো, বাড়তি সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ নেই। তবে, রিজার্ভ কত থাকতে হবে; তার নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। একটি দেশের কাছে তিন থেকে ছয় মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার মজুত থাকা উচিত। এর কম থাকলে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয় ব্যবহার এবং কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্য ও কারখানার মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমে যায়। স্বল্পমেয়াদি ঋণ পরিশোধের সমপরিমাণ রিজার্ভ থাকা উচিত। যেন, কোনো কারণে ঋণের প্রবাহ বন্ধ হলে আগের দেনা পরিশোধে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে থাকে। শেষ বিষয়, তবে সামান্য নয়; ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের অন্তত ২০ শতাংশের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা থাকা দরকার। সেক্ষেত্রে, বৈদেশিক মুদ্রার অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশ চাইলেই সহজে বৈদেশিক মুদ্রা জোগাড় করতে পারব না। ২০২৩ সালে আইএমএফ এক পর্যালোচনায় জানায়, ৪ দশমিক ৪ থেকে ৫ দশমিক ৭ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা থাকলে, রিজার্ভ

পর্যাপ্ত বলা যাবে। পরিমাণটি অবশ্য রিজার্ভের অনুমিত ব্যয়ের ওপরও নির্ভর করে। যেহেতু, বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে; সেহেতু, রিজার্ভ বেশি থাকা দরকার। আইএমএফের মাপকাঠিতে হিসাব করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের জন্য ১২ দশমিক ৪ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর সমপরিমাণ রিজার্ভকে যথেষ্ট বলা যাবে।

চার মাসের আমদানি ব্যয়, স্বল্পমেয়াদি বিদেশি ঋণের পুরোটা ও ব্যাপক মুদ্রার ২০ শতাংশ এই তিন মাপকাঠিতে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলাদেশের জন্য নিরাপদ রিজার্ভ ১৪ দশমিক ২ থেকে ৩৬ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার। এই মাপকাঠি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় রিজার্ভের গড় ২৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের এখন পাকা বা নেট ইন্টারন্যাশনাল রিজার্ভ (এনআইআর) সাড়ে ১৫ বিলিয়ন ডলার। যা শুধু স্বল্পমেয়াদি বিদেশি ঋণের মাপকাঠিটি পূরণ করে। প্রকৃত এনআইআর সম্প্রতি সাড়ে ১৪ থেকে সাড়ে ১৫ বিলিয়ন ডলারে স্থিতিশীল হয়েছে। স্থিতিশীলতা এসেছে দুটি কারণে। প্রথমত, বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বিক্রি কমিয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্বর্ণ আকারে রাখা রিজার্ভের দাম বেড়ে নভেম্বরে দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ২৩ বিলিয়ন ডলারে, যা জুনে ছিল ১ দশমিক শূন্য ৬ বিলিয়ন ডলার।

৪.৪ ভুল থেকে শেখা

বৈদেশিক মুদ্রার ভুল ব্যবস্থাপনার পরিণতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নেওয়ার আছে। যেমন: সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিতে ভুল করলে ঝুঁকি তৈরি হয়। বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া তখনই নিরাপদ, যখন অনানুষ্ঠানিক বাজারে মুদ্রার দাম আনুষ্ঠানিক বাজারের কাছাকাছি থাকে। রিজার্ভ গঠনে বাংলাদেশ ব্যাংককে সতর্কভাবে এগোতে হবে। যদি ছুন্ডি বাজার থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংক ব্যবস্থায় ফেরা শুরু করে, তাহলে টাকার মান বাড়ার সুযোগও দিতে হবে। এতে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমার আশা তৈরি হতে পারে।

আন্তঃব্যাংক ব্যবস্থায় লেনদেন এখনো অত্যন্ত কম। গত আগস্টে বাংলাদেশ ব্যাংকে নেতৃত্ব পরিবর্তনের পর ডলারের দাম আড়াই শতাংশ বেড়েছে। ক্রলিং পেগ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ সীমা ১২০ টাকায় স্থির হয়ে আছে। বৈদেশিক মুদ্রার পাইকারি বাজার এখনো চাঙা হয়নি। বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে তারল্য পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। মুদ্রা বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ার এখনই সময়। বাংলাদেশ ব্যাংক আরও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলে হয়তো সুযোগ হাতছাড়া হবে।

মুদ্রানীতির আধুনিকায়ন ও বাস্তবায়ন কাঠামোর উন্নয়নে বড় কাজ হওয়া দরকার। দ্রুত ও দক্ষভাবে কাজ করার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক নিয়ন্ত্রিত বিনিময় হার ব্যর্থ হয়েছে, এখন এটিকে একক হারে পরিণত করার ওপর সাফল্য নির্ভর করছে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতাভিত্তিক করার ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, বিনিময় হার কতটা নমনীয় হতে হবে; আর কত দ্রুত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সংস্কার করা যাবে?

অধ্যায়-৫: রাষ্ট্রীয় ঋণের বাড়ন্ত বোঝা*

- ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকা বাংলাদেশের ঋণের বোঝা আগামীতে আরও বাড়বে
- সাম্প্রতিক অতীতে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা ব্যক্তিস্বার্থে সরকারি ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করেন
- ২০২৪ সালের জুন নাগাদ জিডিপির অংশ অনুযায়ী ঋণের প্রক্ষেপিত অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৪১.৩ শতাংশে
- ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে বৈদেশিক ঋণের কিস্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩.৯ বিলিয়ন ডলার, যা জিডিপির ০.৯%
- আশাবাদের ওপর ভিত্তি করে, ঋণ সংকটের ঝুঁকি কম—এ ধরনের মূল্যায়ন করা হলেও বাস্তবতা বেশ ভিন্ন
- ২০২৮ সাল নাগাদ সরকারি ঋণের আসল বাবদ বছরে অতিরিক্ত প্রায় ২০৯ কোটি ডলার দরকার হবে, যা ২০২৫ সালের তুলনায় প্রায় তিনগুণ
- বাংলাদেশের ঋণ-ঝুঁকি বৃদ্ধির মূল কারণ— বড় প্রকল্পে উচ্চসুদের বিদেশি ঋণ, নতুন ঋণ না আসার শঙ্কা, রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি ও বৈদেশিক মুদ্রা সংকট
- ঋণ পরিশোধের চাপ মোকাবিলায় বাংলাদেশ প্রধান ঋণদাতাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান কিংবা নতুন সমঝোতার পথ খুঁজতে পারে

বাংলাদেশের ঋণ বাড়ছে। আগামীতে জিডিপির অনুপাতে ঋণ কমবে, তেমন কোনো লক্ষণও নেই। সমপর্যায়ের অর্থনীতির দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, বাংলাদেশের জিডিপির অনুপাতে ঋণের পরিমাণ অস্বস্তিকর। এটা আরও অস্বস্তিকর মনে হয়, যখন ঋণ পরিশোধের জন্য রাজস্ব ও বিদেশি মুদ্রার জোগান কম থাকে। বাস্তবতা হলো, ঋণ পরিশোধের চাপ ইতোমধ্যেই বেড়ে গেছে; আগামীতে আরও বাড়বে।

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি ঋণ-পরিস্থিতি তুলে ধরা হবে। কোন কোন জায়গায় স্বস্তির দিক আছে, তাও বলা হবে। যদিও, এই স্বস্তি আসলে স্বস্তি নয়। গণনা পদ্ধতি বদলালে সেই স্বস্তিকে অলীক বলেও মনে হতে পারে। এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হবে, ঋণ পরিশোধে কী পরিমাণ টাকা ও বিদেশি মুদ্রার প্রয়োজন হতে পারে। সরকারি ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও বিচক্ষণতার প্রত্যাশা রেখে অধ্যায়ের উপসংহার টানা হবে।

৫.১ ঋণের পরিমাণ ও ধরন

অভ্যন্তরীণ ঋণ-বাজারে সরকারই সবচেয়ে বড় গ্রহীতা। সরকার চাইলে বিদেশি উৎস থেকেও ঋণ নিতে পারে। ২০২৪ সালের ৩০ জুনের হিসাব অনুসারে, প্রতি সাড়ে চার টাকা বেসরকারি ঋণের বিপরীতে এক টাকা ছিল সরকারি ঋণ। বিদেশি ঋণের ক্ষেত্রে চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বেসরকারি খাতের প্রতি পাঁচ ডলার বিদেশি ঋণের বিপরীতে সরকারি ঋণ চার ডলার।

প্রাক্কলন বলছে, ২০২৪ সালের জুন নাগাদ জিডিপির বিপরীতে বাংলাদেশের ঋণের অনুপাত ৪১ দশমিক ৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। যা মাত্র দুই বছর আগেই ছিল ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে সরকারি ঋণ ও সরকারের নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৬৬ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারে। এর বেশিরভাগই অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে নেওয়া ঋণ। অভ্যন্তরীণ ঋণের ৫০ শতাংশের মতো ট্রেজারি বিল ও বন্ডের বিপরীতে নেওয়া। যার বেশিরভাগের ক্রেতা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের পাঁচ ভাগের এক ভাগের কিছু কম বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে। বাকি ঋণ সরকার নিয়েছে ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে। সরকারি অভ্যন্তরীণ ঋণের ২০ দশমিক ৩ শতাংশ নেওয়া হয়েছে সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে। ২০২২-২৩

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন ড. জাহিদ হোসেন, সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ।

অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ ও আসল মিলিয়ে কিস্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৯ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার (জিডিপি ১১ দশমিক ৭ শতাংশ)।

সরকারের বৈদেশিক ঋণও বাড়ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল পিপিজি (সরকারের নিশ্চয়তার বিপরীতে নেওয়া ঋণ) ঋণ স্থিতির ৪৪ দশমিক ৪ শতাংশ এবং জিডিপি ১৭ দশমিক ৭ শতাংশ। জিডিপি অনুপাতে বৈদেশিক ঋণ ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ১৫ দশমিক ১ শতাংশ। বৈদেশিক পিপিজি ঋণ প্রধানত বহুপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় ঋণদাতাদের কাছ থেকে নেওয়া সরকারের ঋণ। যা ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে যথাক্রমে ৫২ শতাংশ ও ৩৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বাকি ঋণ মূলত অনাবাসী বাংলাদেশিদের কাছে বিক্রি করা স্বল্পমেয়াদি সার্বভৌম বন্ডের বিপরীতে দেনা এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর নেওয়া ঋণ। ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে বেসরকারি খাতের বৈদেশিক ঋণ দাঁড়িয়েছে জিডিপি ৫ শতাংশে। যা ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে কমছে। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালের জুনের শেষ নাগাদ এটি আরও সাড়ে ৭ শতাংশ কমছে। ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল মিলিয়ে কিস্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার (জিডিপি শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ)।

৫.২ অর্ধসত্য বয়ান

সরকারি ঋণের পরিমাণ নিয়ে নীতিনির্ধারক ও বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্বস্তিজনক অনুভূতির মূলে রয়েছে দুই ধরনের তথ্য। প্রথমত বলা হয়, সম্প্রতি বাংলাদেশের ঋণ বাড়লেও মোট ঋণ এখনো ভারত-চীন-থাইল্যান্ড-ভিয়েতনামের তুলনায় কম। দ্বিতীয়ত, ২০২৪ সালের জুনে আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের যৌথ বিশ্লেষণে আগের মতোই বলা হয়েছে; বাংলাদেশের ‘বৈদেশিক ও সরকারি ঋণ সংকটের কম ঝুঁকি’। সংস্থা দুটি ঋণ পরিশোধের সাম্প্রতিক চাপকে ‘কম মাত্রা ও স্বল্পকালীন’ বলে উল্লেখ করেছে। তাদের প্রক্ষেপণ বলছে, মধ্য মেয়াদে বাংলাদেশের সামগ্রিক ঋণ ও জিডিপি অনুপাত কমতে থাকবে। যদিও মনে রাখা দরকার, অতীতে এরকম প্রক্ষেপণ করা হলেও; তা ফলেনি।

আইএমএফের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট ঋণ বহন সক্ষমতা জিডিপি ৫৫ শতাংশ। বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে তা জিডিপি ৪০ শতাংশ। একটি যৌগিক সূচকের (সিআই) ওপর ভিত্তি করে হিসাবটি করা হয়, যেখানে জিডিপি প্রকৃত প্রবৃদ্ধি, প্রবাসী আয়, রিজার্ভ, বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট দেশ সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন বিবেচনায় নেওয়া হয়। বাংলাদেশ সিআইতে মাঝারি রেটিং পেয়েছে।

অবশ্য ‘ঋণ সংকটের ঝুঁকি কম’ এমন মূল্যায়ন মূলত আশাবাদেভিত্তিক, বাস্তবতা তেমন নাও হতে পারে। বাংলাদেশ নিয়ে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের প্রক্ষেপণ ছিল ৭ শতাংশ গড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ২ দশমিক ৬ শতাংশ গড় প্রাথমিক বাজেট ঘাটতি, ৫-৬ শতাংশ মূল্যস্ফীতি এবং বিনিময় হার স্থিতিশীল ধরে। ২০২৫ সালে পা রাখতে রাখতেই সামষ্টিক অর্থনীতির এই সুখী অবস্থা আর নেই। চলতি বছরে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ইতোমধ্যেই নাটকীয়ভাবে কমিয়ে ৪-৫ শতাংশ ধরা হয়েছে। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াও অনিশ্চিত। রপ্তানি খাতে প্রতিঘাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আর্থিক বাজারে সংকট, অনিশ্চয়তা থেকে তৈরি হওয়া দায়— এসব বিষয়ও রয়েছে।

বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের সহনশীলতা মূল্যায়নও প্রশ্নবিদ্ধ। বলা হয়ে থাকে, এই মূল্যায়ন প্রায়শই সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মন্দা বিবেচনায় নিতে পারে না। ফলে, ঋণ সহায়তা বিলম্বিত হয় এবং সরকারকে জরুরিভাবে কৃচ্ছসাধনে যেতে হয়। অবশ্য, আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক সরকারকে কিছু পদক্ষেপ নিতে বললেও আদতে দুই সংস্থাই আশার কথাই শোনায। ফলে, সরকার আশাবাদের মধ্যে ডুবে থাকে।

৫.৩ স্বস্তির খুঁটিগুলো দুর্বল

এবার দেখা যাক, স্বস্তির খুঁটিগুলো কোথায়-কীভাবে দুর্বল। সরকারি ঋণের সুদের গড় হার ও জিডিপির প্রবৃদ্ধির পার্থক্য অর্থনীতির সহনশীলতার পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, কেবল জিডিপি প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম ঋণ সুদহারই কোনো দেশকে সংকট থেকে রক্ষা করতে পারে না। আইএমএফ ১৫০টি দেশের ১৯৭০ সাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে, বাজেট ঘাটতি স্থায়ী হলে ঋণ পরিশোধের বোঝা হঠাৎ বেড়ে যায়। সেখান থেকেই আর্থিক সংকটের শুরু। এই ঋণদায়ের বড় অংশটি তৈরি হয় বিনিময় হারের ওঠানামা ও অনিশ্চয়তাজনিত দায় (কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি) থেকে। সব মিলিয়ে; ঋণের সুদ ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারের পার্থক্য, বড় বাজেট ঘাটতি-বৈদেশিক মুদ্রাজনিত সংকট-লুপ্তায়িত ঋণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত রাখতে পারে না। বাংলাদেশের বাজেট ও অর্থনীতিতে এর সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি-ঋণের সুদহার-প্রকৃত বিনিময় হার চোখের সামনে থাকায় প্রভাব দৃশ্যমান। জিডিপির অনুপাতে ঋণের পরিমাণ দেড় শতাংশ বাড়লে এসবের ভূমিকা থাকে মাত্র শূন্য দশমিক ৪ শতাংশীয় বিন্দু। কিন্তু, অনাকাঙ্ক্ষিত নানান সমস্যা জিডিপির অনুপাতে ঋণ বাড়িয়ে দেয়। সমস্যাগুলোর মধ্যে, বিনিময় হার পরিবর্তন ও অন্যান্য হিসাব অনেক বড় প্রভাব ফেলে। ফলে প্রকৃত ঋণ পরিস্থিতি বোঝা যায় না।

দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি সাড়ে ৬ শতাংশে নেমে যাওয়ার পরও বৈদেশিক ও সামগ্রিক ঋণ ঝুঁকিতে কোনো পরিবর্তন আসে না—এই মূল্যায়নের ওপর আস্থা রাখা কঠিন। জিডিপির প্রবৃদ্ধির হিসাব যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ, সেখানে ঋণঝুঁকি মুক্ত থাকতে সাড়ে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধিও জন্য যথেষ্ট নয়। ফলে, সাড়ে ছয় শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ঋণঝুঁকি কমে যাওয়া সংক্রান্ত আইএমেফের বয়ানটি এখানে গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

বাংলাদেশে সত্তরের দশকের উত্থানপতনের সময় ছাড়া সম্ভবত কখনোই জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫ থেকে সাড়ে ৫ শতাংশের বেশি অর্জন করতে পারেনি। ফলে, বাড়িয়ে দেখানো উপাত্ত ধরে হিসাব করলে জিডিপির অনুপাতে ঋণের প্রকৃত চিত্র নয়; পাওয়া যাবে ভুয়া স্বস্তির চিত্র। আরও বড় বিষয় হলো, উচ্চ বাজেট ঘাটতিতে স্বস্তিকর ঋণপরিস্থিতিও নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যেই রাষ্ট্রের দায় কমাতে পারে।

বাংলাদেশের ঋণ দায় বহনের সক্ষমতা, ধারণার চেয়ে অনেক কম। দেশের এই ভঙ্গুরতা বৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে বড় প্রকল্পের জন্য উচ্চসুদের বিদেশি ঋণ, নতুন ঋণ না আসার আশঙ্কা, রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি ও বৈদেশিক মুদ্রার অভাব। ঋণ সহনশীলতার মাপকাঠির একটি পরিবর্তিত সংস্করণ ব্যবহার করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) দেখিয়েছিল, সম্প্রতি বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ দায় বহনের সক্ষমতা কমেছে। সিপিডির প্রক্ষেপণে, বাংলাদেশের রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের অনুপাতে ঋণের গ্রহণযোগ্য সীমা ১২৪ শতাংশ। বাংলাদেশ এই সীমা ২০২১-২২ অর্থবছরেই অতিক্রম করেছে। যদিও জিডিপি প্রবৃদ্ধির হিসাবটি প্রশ্নবিদ্ধ। অন্যদিকে, বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও বৈদেশিক দেনাভিত্তিক ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতিটি অধিক বিশ্বাসযোগ্য। সিপিডির সাম্প্রতিক মূল্যায়নটিতে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

স্বল্প সুদের ঋণ কমে যাওয়া, বাণিজ্যিক ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বেড়ে যাওয়া এবং বিশ্ববাজারে ঋণের বাড়তি সুদহারের কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের সুদহার বহুগুণ বেড়ে গেছে। ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি কমলেও, বিশ্ববাজারে পণ্য চাহিদা বৃদ্ধি ও মূল্যজনিত আঘাত বিবেচনায় নিলে আশাবাদী হওয়া যায় না। বরং বিনিময় হার পরিবর্তনের প্রভাব আরও গভীরভাবে পর্যালোচনার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

অভ্যন্তরীণ ঋণ বৈদেশিক ঋণের তুলনায় কম বিপদের, এই প্রচলিত ধারণাটি সঠিক নয়। অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে সহনশীলতার অন্যতম মাপকাঠি, সরকারের রাজস্ব আয়ের বিপরীতে ঋণের অনুপাত। যা দিনকে দিন

বাড়ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সরকারের রাজস্ব আয়ের বিপরীতে ঋণের পরিমাণ ছিল ২১২ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা ২৫৮ শতাংশে দাঁড়ায়। এই ঋণের উৎস মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো। ফলে, বেসরকারিখাতে ঋণ প্রাপ্যতা ক্রমেই সীমিত হয়ে পড়ে। অর্থনীতির মূলভিত্তিগুলো শক্তিশালী অবস্থান থেকে দুর্বল হতে শুরু করে। কম রাজস্ব আদায়, চড়া সুদহার এবং বাজেট ঘাটতি বাড়তে থাকে। বাজেটে পেনশন ব্যয়ের বাড়তে থাকা হিস্যা, অভ্যন্তরীণ ঋণ ব্যবস্থাপনাকে আরও জটিল করে তোলে।

অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদহারও বাড়তির দিকে। সরকারি ঋণের স্বল্পমেয়াদি বিলে সুদহার ৪০০ বেসিস পয়েন্ট এবং দীর্ঘমেয়াদি বিলে ২৫০ বেসিস পয়েন্ট বেড়েছে। রাজস্বের বিপরীতে অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ পরিশোধের অনুপাত ২০২২-২৩ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ২২ শতাংশে। যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ। ফলে, বাজেটে স্বস্তি নেই। এই স্বস্তির জায়গা আরও কমবে যদি, সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি ও মূল্যস্ফীতির কারণে ট্রেজারি বিল ও বন্ডের সুদহার বাড়ি।

অন্য দেশগুলোর সরকার বাড়তি রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের চেষ্টা চালায়। নতুন ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার আলোচনাটি সামনে আসে; যাকে বলা যায় ঋণ-রাজস্ব। সাধারণত, ঋণদাতারা বাজারের চেয়ে কম সুদে সরকারকে ঋণ দেয়। ঋণের পরিমাণ থেকে এই ছাড় বাদ দিয়ে ঋণ-আয় নির্ধারণ করা হয়। ঋণ পরিশোধে ছাড়ের কারণে ভবিষ্যতে সরকারের সামনে কম কর আদায়ের সুযোগ থাকে। আগে, সাশ্রয়ী ঋণ-রাজস্বের উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য ছিল। তবে, এখন বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে; সেই পরিস্থিতি আর নেই।

যতক্ষণ ঋণের সুদে ছাড় থাকে, ততক্ষণই ঋণ-রাজস্ব চালু থাকে। অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে, ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সেই অর্থে কোনো ছাড় ছিল না। এসময়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সুদহারে ৯ শতাংশের সীমা আরোপ করে রাখলেও, ট্রেজারি বিল-বন্ড-সঞ্চয়পত্রের ক্ষেত্রে কোনো সীমা রাখেনি। ফলে, ব্যাংকঋণের সুদহারের চেয়ে সরকারি ঋণের কার্যকর সুদহার বেড়ে যায়। তখন, ব্যাংকগুলো কম ঝুঁকিতে বেশি লাভের আশায় সরকারকে ঋণ দিতে আগ্রহী হয়।

ব্যাংকঋণের সুদহারের চেয়ে সরকারি বিল-বন্ডের সুদহার বেশি হওয়া, অর্থনীতির ইতিহাসে বিরল ঘটনা। ভবিষ্যৎ করদাতারা সুযোগ থাকলে হয়তো, ট্রেজারি বিল-বন্ডের বদলে ব্যাংক থেকে সরকারের সরাসরি ঋণ নেওয়ারকেই বেছে নিতেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের সুদহারে সীমা তুলে নেয়। এর মধ্য দিয়ে, ঋণ-রাজস্ব ইতিবাচক ধারায় ফেরে।

আগামীতে বৈদেশিক ঋণের সুদাসল পরিশোধের পরিমাণ বাড়বে, এ বিষয়ে বিশ্লেষকেরা আগাম সতর্কতা জানিয়ে রেখেছেন। বেশকিছু বড় ঋণের অর্থপ্রাপ্তি ও পরিশোধ শুরুর মাঝের সময়কাল (গ্রেস পিরিয়ড) শেষ হয়েছে। আরও কিছু ঋণের গ্রেস পিরিয়ড শেষ হওয়ার পথে। বিদেশি ঋণে করা বড় বড় অবকাঠামোগুলো থেকে আয় হয় দেশীয় মুদ্রায়। ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় ওই সব ঋণ পরিশোধে, বোঝা আরও বাড়বে।

২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত বিদ্যমান ঋণ পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অন্তত ২১৩টি ঋণ পরিশোধের বাড়তি চাপ ঘনিয়ে আসছে। এর মধ্যে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল ইত্যাদি প্রকল্প রয়েছে।

সব মিলিয়ে, ২০২৮ সাল নাগাদ সরকারি ঋণের বার্ষিক বাড়তি সুদাসল হবে প্রায় ২০৯ কোটি ডলার। যা, ২০২৫ সালে বাড়তি পরিশোধযোগ্য সুদাসল ৮০ কোটি ডলারের প্রায় তিনগুণ। অবশ্য, এই প্রক্ষেপণ নির্ভর করছে বিনিময় হার, ঋণ বাতিল, পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠনের ওপর। তারপরও ধরে নেওয়া যায়; সুদাসল পরিশোধের ক্রমবর্ধনশীল চাপের বিপরীতে রাজস্ব আয় ও বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতিতে ঋণ পরিশোধ পরিস্থিতি অসহনীয়

হয়ে উঠতে পারে। সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সুদাসল পরিশোধে মোট ব্যয় ধরেছে ২৬০ কোটি ডলার, যা আগের অর্থবছরে ছিল ২৪৭ কোটি ডলার। পরিমাণটি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২৭৩ কোটি, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৩২০ কোটি ডলারে দাঁড়াতে পারে বলে প্রক্ষেপণ রয়েছে। পুরোনো ও নতুন ঋণ বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, এই প্রক্ষেপণে আসলে সুদাসল পরিশোধের পরিমাণ কমিয়ে দেখানো হয়েছে।

ঋণ অনেকটা তলোয়ারের মতো, দুই পাশেই ক্ষুরধার। ফলে, ঋণ উপকারী নাকি বিপজ্জনক হবে; ব্যবহারের ওপর তা নির্ভর করে। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের পর্যালোচনায় বিষয়টিকে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। ঋণের অর্থ কী কাজে ব্যবহার হয়েছে, তারা তা দেখেনি। দৃশ্যমান বড় প্রকল্পগুলো অনেকক্ষেত্রেই অর্থ আত্মসাৎ-পাচারের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। অবকাঠামোগত প্রকল্পের সবক্ষেত্রেই ব্যাপক ব্যয় বাড়ায়; বাড়তি ঋণ তৈরি হলেও, বাড়তি সম্পদ তৈরি হয়নি।

সম্প্রতি বকেয়া পরিশোধের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চাপ তৈরি হয়েছে। বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সারের ভর্তুকিতে বকেয়া বেড়ে জিডিপি ১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। রাজস্ব ও বৈদেশিক ঋণের ঘাটতি থেকে বকেয়া তৈরি হওয়ার পর সরকার বাধ্য হয়ে বন্ড ছাড়ে। বেসরকারি ব্যাংকগুলো বাজারের চেয়ে কম সুদে বন্ড কিনে নেয়। বকেয়া পরিশোধে সরকারের এই ব্যবস্থা ঋণ পরিশোধকে আরও প্রলম্বিত করে। বকেয়া বেড়ে যাওয়ায়, সরকার বাজেট সহায়তার জন্য বহুপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় ঋণদাতাদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়। দেখা যাচ্ছে; একদিকে সরকার ঋণ পরিশোধের চাপ রয়েছে। অন্যদিকে, সরকারি চাকরিজীবীদের পেনশন ও ভবিষ্যৎ তহবিল থেকে ব্যাপকহারে অর্থ বেরিয়ে যাচ্ছে।

সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা কমতে কমতে তলানিতে ঠেকায়, দুর্নীতি-অনিয়ম প্রতিরোধ করতে পারেনি। বড় অবকাঠামো প্রকল্পে কেলেঙ্কারির ঘটনা তার প্রমাণ। এ সবকিছুই আর্থিক খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

বিপদ যখন আসে, সব দিক দিয়েই আসে। ঋণ পরিশোধের চাপ যেমন বৈদেশিক মুদ্রার মজুত কমিয়েছে, তেমনই সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণ মূল্যস্ফীতি বাড়িয়েছে। ঋণের মুদ্রাগত ধরন, পরিশোধের সময়কাল এবং ঋণ পরিশোধে সম্পদের জোগান—সবকিছুই সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খারাপের দিকে গেছে। বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি বিল পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণদাতারা আস্থা হারিয়েছে। যে কারণে, বৈদেশিক মুদ্রার মজুত কমে গেছে। এ অবস্থায়; বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে ধস, সুদহার বৃদ্ধি অথবা উর্ধ্বমুখী আমদানি মূল্য আস্থার সংকট আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

৫.৪ ঋণ গ্রহণে বিচক্ষণতা

এক সরকার নেয়া ঋণ পরিশোধের দায় আরেক সরকারের ওপরও বর্তায়। যেমন: বিগত সরকারের নেওয়া ঋণের বোঝা অন্তর্বর্তী সরকার ও পরের সরকারের ওপর চাপবে। যা, অন্তর্বর্তী সরকারের আর্থিক নীতি নির্ধারণে প্রভাব ফেলবে। আর্থিক নীতি সাধারণ কোনো নীতি নয়, এর সঙ্গে রাজনৈতিক-আঞ্চলিক-প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব জড়িত। সাম্প্রতিক অতীতে, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা ব্যক্তিস্বার্থে সরকারের ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা বেপরোয়া ব্যবহার করেছেন। সুযোগ পেলেই ঋণ নিয়ে তাঁরা দায় বাড়িয়েছেন। জ্বালানি-পরিবহন-ব্যাংকসহ বিভিন্ন খাতে এসব ঋণ ও দায় দুঃস্থলের মতো। ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করে যখন যথেষ্ট সুফল মেলে না, তখনই অর্থনীতি ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

এতকিছুর মধ্যেও সুখবর হলো, গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার কমাতে পারে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম নীতি সুদহার কমানোয়, সিকিউরড ওভার নাইট ফাইন্যান্সিং রেট (সোফর) ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমে গেছে। বাংলাদেশের অনেক বহুপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় ঋণ সোফরভিত্তিক হওয়ায় ঋণের সুদ বৃদ্ধির বোঝা কমে আসবে।

সম্প্রতি, বাংলাদেশের ঋণমান কমে গেছে। ঋণমান নির্ধারণকারী বৈশ্বিক সংস্থা ফিচ, ২০২৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশের ফরেন কারেন্সি ইস্যুয়ার ডিফল্ট রেটিং (আইডিআর) ‘বিবি মাইনাস’ থেকে ‘বি প্লাস’ করেছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দীর্ঘ মেয়াদে দুর্বল হয়ে পড়ায় সংস্থাটি এমন সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাদেশ রিজার্ভ-ক্ষয় ঠেকাতে বহু ব্যবস্থা নেয়া হলেও, পরিস্থিতি শিগগিরই বদলাচ্ছে না। তাই, অর্থনীতির বহিস্থ খাতে ধাক্কা আসলে বাংলাদেশ আরও অরক্ষিত হয়ে পড়বে। জুলাইয়ে বাংলাদেশের ঋণমান কমিয়ে দেয় আরেক ঋণমান নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস (এসঅ্যান্ডপি)।

সার্বভৌম ঋণ সংকট তৈরির আগেই সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। সুদাসল পরিশোধের চাপ মোকাবিলায় বাংলাদেশের সামনে একটিই পথ খোলা; আর তা হলো, ঋণদাতাদের সঙ্গে আলোচনা ও পুরোনো ঋণ নিয়ে আবার দর-কষাকষি। দ্বিপক্ষীয় ঋণ পরিশোধের শর্ত শিথিলের অনুরোধ করা যেতে পারে। জেনে রাখা দরকার; ২০০৩ সালে যখন বৈশ্বিকভাবে ঋণগ্রস্ত দেশগুলোর ঋণ মওকুফ করে দেওয়া হয়েছিল, তখন বাংলাদেশ এই সুযোগের যোগ্য হয়নি। জি-২০ দেশগুলো ২০২০ সালে যখন সংকটাপন্ন দেশগুলোর জন্য ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখার উদ্যোগ নিয়েছিল, তখন বাংলাদেশ সে সুযোগ নেয়নি।

নতুন করে দর-কষাকষির ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি হিসাবে, বাংলাদেশকে ঋণ ব্যবস্থাপনায় রূপান্তরমুখী সংস্কার করতে হবে। সেক্ষেত্রে, বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের মতো ঋণদাতাদের সমর্থনও পেতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাঠামোগত বিষয়

অধ্যায়-৬: রাজস্ব আহরণ: এক অধরা লক্ষ্য*

- জাতীয় আয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজস্ব আদায় বাড়াইনি
- মোট রাজস্বের ৪০% এখনো ভ্যাটনির্ভর
- প্রায় ৫৯% করদাতা রিটার্ন জমা দেন না
- সম্ভাব্য রাজস্বের প্রায় ৪২% সংগ্রহে ব্যর্থ এনবিআর
- রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যবসায়ী গ্রুপগুলোকে কর অব্যাহতি
- দুর্বল কর প্রশাসন, ব্যাপক দুর্নীতি এবং করদাতাদের আস্থার অভাবে রাজস্ব আদায় বাধাগ্রস্ত

৬.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের অন্যতম চ্যালেঞ্জ, রাজস্ব আহরণে দুর্বলতা কাটানো। এই দুর্বলতার কারণে, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত হচ্ছে না। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে রাজস্ব আহরণ বাড়াইনি। ফলস্বরূপ, উন্নয়ন কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য দেশীয়-বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতা ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

স্বেতপত্রের এ অধ্যায়টিতে রাজস্ব আদায়ের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা এবং সংস্কারের সম্ভাব্য পথ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও, এনবিআর, অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার সংস্থা এবং বেসরকারি খাতের সংগঠন থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত-পরামর্শ এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৬.২ রাজস্ব আহরণ ও ব্যবস্থাপনা: ছয়টি উল্লেখযোগ্য দিক

নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত: বিশ্বে সবচেয়ে নিম্ন রাজস্ব আদায়কারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। ২০০৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর সামগ্রিক গড়ের তুলনায় অনেক কম ছিল। ২০০৭ সালে কর-জিডিপি অনুপাত ছিল ৬.৩%। এই অনুপাত ধীরে ধীরে বাড়লেও, এখনো ৮%-এর নিচেই রয়ে গেছে। ২০২২ সালে কর-জিডিপি অনুপাত ৭.৫%-এ পৌঁছায়। অর্থাৎ, দেড় দশকে বাংলাদেশের কর-জিডিপির অনুপাতে অগ্রগতি খুবই নগণ্য।

অপরদিকে, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অধিকাংশ দেশের কর-জিডিপি অনুপাত ১০% থেকে ৩৪% এর মধ্যে। যেমন: পাকিস্তান (১০.০%), ভূটান (১১.৩%), মালয়েশিয়া (১২.২%)। অন্যদিকে, জাপান (৩৪.১%), ওইসিডি দেশসমূহ (৩৪%) এবং নিউজিল্যান্ড (৩৩.৮%) এর মতো উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো কর-জিডিপি অনুপাতে শীর্ষস্থানে রয়েছে। অনেক এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ, যেমন: সামোয়া (২৯.৫%) এবং কোরিয়া (৩২%) বাংলাদেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে। এসব তথ্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিকভাবে সমপর্যায়ের দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবস্থাপনার অবস্থা নাজুক।

কর-জিডিপি অনুপাত কম হওয়ার কারণে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন ব্যাহত হতে পারে। তাই, প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজস্ব; বিশেষত, প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ বাড়াতে পারলে বৈষম্য এবং বাহ্যিক অর্থায়ন নির্ভরতা কমানো যাবে।

*এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন ড. এম আবু ইউসুফ, অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্বাহী পরিচালক, রিসোর্স অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট।

রাজস্ব আহরণে পরোক্ষ কর নির্ভরশীলতা: বাংলাদেশের কর ব্যবস্থা মূলত পরোক্ষ করনির্ভর। প্রত্যক্ষ কর আদায়ের সক্ষমতা অপ্রতুল। ফলে ব্যক্তিগত আয়কর থেকে রাজস্ব আদায় তুলনামূলক কম হচ্ছে। বাংলাদেশের কর রাজস্ব কাঠামোতে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট প্রধান ভূমিকা পালন করে। মোট রাজস্বের ৪০ শতাংশই ভ্যাট, যা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি। বাংলাদেশে মোট রাজস্বের ২০% আসে কর্পোরেট আয়কর থেকে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল এবং আফ্রিকার দেশগুলোর সাথে এক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য না থাকলেও, ওইসিডি (OECD) অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর গড়ের তুলনায় কম। ব্যক্তিগত আয়কর বাংলাদেশে মোট রাজস্বের মাত্র ১৩%। যা ওইসিডিভুক্ত দেশগুলোর গড় ২৪ শতাংশের চেয়ে অনেক কম।

বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ কর-জিডিপি অনুপাত বিশ্বে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। প্রত্যক্ষ কর আদায়ের দুর্বলতা শুধু রাজস্বেই প্রভাব ফেলে না; আয় অসমতাও বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশ আয় অসমতা (Income inequality) মোকাবিলায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রত্যক্ষ কর বাড়িয়ে এই বৈষম্য কমানো সম্ভব।

করের আওতায় সীমিতসংখ্যক মানুষ-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশের ট্যাক্স নেট (কর প্রদানে যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা) খুবই কম। এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত ১.০৪ কোটি টিআইএনধারী করদাতার মধ্যে মাত্র ৪৩ লাখ কর রিটার্ন দাখিল করেছে। ২০২২-২০২৩ সালের তুলনায় করদাতা ২২% বাড়লেও, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিবন্ধিত করদাতাদের প্রায় ৫৭% কর রিটার্ন জমা দেয়নি। এনবিআর আরও প্রকাশ করে যে, ২ লাখ টিআইএনধারী মৃত এবং ৩ লাখ ব্যক্তি অভিবাসনের উদ্দেশ্যে টিআইএন নিয়েছেন।

নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা বাড়লেও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর রিটার্ন জমা হচ্ছে না। ফলে, সরকারি ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কর সংগ্রহ সম্ভাব্য মাত্রার চেয়ে কম হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠান কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত থাকলেও নিষ্ক্রিয়। এনবিআর টিআইএনধারী প্রায় ১.৩৭ লাখ নিষ্ক্রিয় কোম্পানি চিহ্নিত করেছে। যেগুলো যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ফার্মগুলোর রেজিস্ট্রারের অধীনে তালিকাভুক্ত। এদের অনেকেই শুধুমাত্র ব্যবসার লাইসেন্স পেতে টিআইএন নিয়েছেন কিন্তু পরে কোম্পানিগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।

উচ্চ প্রত্যক্ষ কর এবং ভ্যাট ব্যয়: কর ব্যয় বলতে কর ভর্তুকিকে বোঝায়। যার মধ্যে কর রেয়াত, অব্যাহতি, হ্রাসকৃত কর হার এবং মোট করযোগ্য আয়ের বাইরে নির্দিষ্ট আয় বাদ দেওয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত আছে। এর অর্থ হলো, এই ভর্তুকিগুলো কর হিসেবে সংগ্রহ করা হলে; সামগ্রিক কর রাজস্ব বৃদ্ধি পেত।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক অবস্থার প্রভাবে, প্রত্যক্ষ কর ব্যয় কিছুটা কমেছে। কোনো তথ্যভিত্তিক নীতি বিশ্লেষণ ছাড়াই কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে, অব্যাহতির সময়সীমাও নির্ধারণ করা হয়নি। কর অব্যাহতির ফলে সংশ্লিষ্টরা কী সুফল পাচ্ছে বা, অর্থনীতিতে কেমন প্রভাব পড়ছে; তাও যাচাই করা হয় না।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতা অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য প্রত্যক্ষ কর ব্যয়ের পরিমাণ আনুমানিক ১,১৫,৬১৬ কোটি টাকা। যার মধ্যে ৭১,৯৫৪ কোটি টাকা কর্পোরেট খাতে এবং ৪৩,৬৬২ কোটি টাকা ব্যক্তিগত কর খাতে। এটি ২০২১-২২ অর্থবছরের মোট জিডিপির ২.৯১%। যা আগের অর্থবছরের (৩.৫৬%) তুলনায় কম।

বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ভ্যাট ঘাটতি ব্যাপক। সম্ভাব্য ভ্যাট রাজস্ব এবং প্রকৃত আদায়কৃত ভ্যাট রাজস্বের মধ্যকার পার্থক্য এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। ২০১৯ অর্থবছরে ভ্যাট ঘাটতি আনুমানিক ২ লাখ কোটি টাকা। যা প্রকৃত আহরিত ভ্যাট রাজস্বের (৮৫ হাজার কোটি টাকা) দ্বিগুণেরও বেশি। ভ্যাট ঘাটতির প্রধান কারণ, নীতিগত বিভ্রান্তি। যেমন: ভ্যাট অব্যাহতি-হ্রাসকৃত হার-উচ্চ নিবন্ধন সীমা মোট ভ্যাট ঘাটতির ৬৯ শতাংশের

জন্য দায়ী। বাদবাকি অংশের দায় কমপ্লায়েন্স ঘাটতির। বাংলাদেশের কমপ্লায়েন্স ঘাটতি অন্যান্য দেশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। যার ফলে সম্ভাব্য রাজস্বের প্রায় ৪২% সংগ্রহ করাই সম্ভব হয় না।

নিম্ন কর-বহির্ভূত রাজস্ব: কর-বহির্ভূত রাজস্ব জিডিপি অনুপাত ২০১৪ অর্থবছরে ছিল ১.৫%, ২০১৯ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়ায় ০.৯ শতাংশে। ২০২০ এবং ২০২১ অর্থবছরে কর-বহির্ভূত রাজস্ব জিডিপি অনুপাত বেড়ে যাওয়ার নেপথ্যে ছিল এক নতুন আইন। যার মাধ্যমে, রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান থেকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে স্থানান্তরের অনুমতি মেলে। এরপরেও, কর-বহির্ভূত রাজস্ব জিডিপি ০.৯ শতাংশে ফিরে আসে। যা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। বাংলাদেশের কর-বহির্ভূত রাজস্বের প্রধান প্রধান উৎস—লভ্যাংশ, মুনাফা, সুদ, টোল, লেভি এবং প্রশাসনিক-সেবা ফি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে কর বহির্ভূত রাজস্বের প্রবৃদ্ধি ছিল শক্তিশালী।

রাজস্ব লক্ষ্য অর্জনে ঘাটতি: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজস্ব আহরণ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ধারাবাহিকভাবে কমেছে। ২০২৪ অর্থবছরে এনবিআরকে ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকার কর সংগ্রহের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল (যা ২০২৩ অর্থবছরের প্রাথমিক সংগ্রহের চেয়ে ২২% বেশি)। ২০১৮ থেকে ২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক গড় ঘাটতি ছিল ৭৪ হাজার ৯০০ কোটি টাকা (জিডিপি ২.৪%)। এছাড়াও, অবৈধ চ্যানেলে টাকা পাচারের কারণে বাংলাদেশ রাজস্ব ক্ষতির মুখে পড়ে, রাজস্ব সংগ্রহে এর প্রভাব গুরুতর। শ্বেতপত্রের অবৈধ আর্থিক প্রবাহ সংক্রান্ত অধ্যায়ে (২০ অধ্যায়) বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

৬.৩ কী কারণে রাজস্ব সংগ্রহে গতি নেই?

উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও, বাংলাদেশে কর-জিডিপি অনুপাত ৮ শতাংশে স্থবির। কর সংগ্রহের পরিমাণও সম-আয়স্তরের দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। মাথাপিছু আয় বাড়লেও, সেই অনুপাতে রাজস্ব আহরণ বাড়েনি। এর পেছনের মূল কারণগুলো তুলে ধরা হলো:

বিভিন্ন পরিকল্পনা ডকুমেন্টে (৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) করব্যবস্থা সংস্কার এবং ডিজিটাইজেশনকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও, জটিল রাজনৈতিক অর্থনীতির কারণে সংস্কারের ধীরগতি দেখা দেয়। রাজনৈতিক এলিট এবং ব্যবসায়িক স্বার্থাঙ্গী গোষ্ঠী পরিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ২০১৫ সালের ১০.৯% থেকে পরিকল্পনার সময়কাল শেষে ১৬%-এ উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। ডিজিটাইজেশন প্রচেষ্টায় ধীরগতিরও কারণ একই। ১৯৯১ সালের ভ্যাট সংস্কারে সাফল্যের পরবর্তী ব্যর্থতাগুলো প্রমাণ করে, কর সংস্কার অর্থবহ করতে শক্তিশালী রাজনৈতিক সমর্থন-কারিগরি প্রস্তুতি-স্টেকহোল্ডারদের অংশীদারত্ব জরুরি।

রাজস্ব সংগ্রহে অটোমেশনের উদ্যোগও যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। অর্থাৎ, এনবিআর এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশনের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। এনবিআর কর ফাইলিং এবং প্রদানের জন্য কিছু স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করেছে। এই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, যৌথ স্টক কোম্পানির নিবন্ধনকারী অফিস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পুরোপুরি সংযুক্ত না হওয়ায় অটোমেশনের সুফলও পাওয়া যায়নি। যেমন: করদাতার আর্থিক লেনদেনের সামগ্রিক চিত্র যাচাই ছাড়া, তিনি আন্তররিপোর্টিং করছেন কি না বা কর ফাঁকি দিচ্ছেন কি না তা বের করা জটিল। বিদ্যমান বিচ্ছিন্ন অটোমেশন উদ্যোগের কারণে এনবিআর ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে না।

বাংলাদেশে কর রাজস্ব কম হওয়ার কয়েকটি প্রধান কারণ হলো: দুর্বল কর প্রশাসন ব্যবস্থা ও কর সংগ্রহে ব্যাপক দুর্নীতি। যার ফলে কর ফাঁকি বাড়ে। ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন সহযোগীদের সহজলভ্য সহায়তা গ্রহণে এনবিআরের সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। এছাড়াও করের টাকায় আদৌ নাগরিক সুবিধাদি মিলছে কি না, এ

বিষয়ে আস্থার অভাব কর প্রদানে অনীহা সৃষ্টি করে। কর সংস্কার এবং জনগণের পরামর্শ গ্রহণের কিছু উদ্যোগ রাজনৈতিক-প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জের কারণে বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

১৯৯১ সালে ভ্যাট চালু হওয়ার পর থেকে বড় সংস্কারগুলো স্থগিত হয়ে গেছে। যেমন: ২০১১ সালের ট্যাক্স মর্ডার্নাইজেশন প্ল্যান এবং ২০১২ সালের ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। মূলত কর প্রশাসনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে, সংস্কারের লক্ষ্য কাগজে-কলমেই থেকে গেছে; বাস্তবায়িত হয়নি।

গবেষণাভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ না করেই, রাজস্ব পূর্বাভাস এবং বার্ষিক রাজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়। এক্ষেত্রে, এনবিআরের সাথেও কোনো সুষ্ঠু পরামর্শ/সংলাপ করা হয় না। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা হয়, রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য যত বেশি হবে, রাজস্ব আদায় তত বেশি হবে।

এসআরওর (Statutory Regulatory Order) মাধ্যমে ট্যাক্স আইনে পরিবর্তন, দেশের কর রাজস্বের স্বচ্ছতা ও পূর্বানুমানযোগ্যতা (predictability) ব্যাহত করেছে। অত্যধিক ব্যবহারে এসআরও এখন রাজনৈতিক সুবিধা দেওয়ার উপকরণে পরিণত হয়েছে। যা বাংলাদেশের কর নীতির কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ করেছে। অংশীজনদের আলোচনায় জানা যায়, এসআরও জারির ক্ষেত্রে এনবিআরকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মেনে নিতে হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক বিবেচনায় এসআরও জারির মাধ্যমে কর অব্যাহতি পেয়েছে। টেবিল ৬.১ বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত আয়কর অব্যাহতির একটি তুলনামূলক চিত্র প্রকাশ করে।

উল্লেখ্য, কর অব্যাহতি দোষের কিছু নয় বরং ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা। তবে, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছাড়াই কর অব্যাহতির ক্রমাগত চর্চা দেশকে রাজস্ব বঞ্চিত করেছে। কর অব্যাহতি আদৌ সুফল বয়ে আনছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

টেবিল ৬.১: নির্বাচিত বড় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত আয়কর অব্যাহতি:

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান	শিল্প খাত	কর অব্যাহতির প্রকার	কোম্পানির নাম এবং অব্যাহতির আরম্ভকাল	অব্যাহতির কাল	অব্যাহতি পরিমাণ/ শতাংশ	মন্তব্য/অতিরিক্ত তথ্য
সামিট গ্রুপ	এল এন জি টার্মিনাল অপারেশন	আয়কর অব্যাহতি	সামিট এলএনজি টার্মিনাল কো (প্রাইভেট) লিমিটেড ২০১৮	১৫ বছর	১০০%	প্রকল্প আয়, বিদেশিদের দ্বারা উপার্জিত আয়, রয়্যালটি, কারিগরি জ্ঞানের ফি এবং কারিগরি সহায়তা ফি, শেয়ার হস্তান্তর থেকে সৃষ্ট মূলধন লাভ এবং বিদেশি সুদের ঋণের ওপর কর, হিসাব রক্ষণ এবং আয়কর রিটার্ন দাখিলের শর্তে অব্যাহতি।

চলমান টেবিল ৬.১

চলমান টেবিল ৬.১

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান	শিল্প খাত	কর অব্যাহতির প্রকার	কোম্পানির নাম এবং অব্যাহতির আরম্ভকাল	অব্যাহতির কাল	অব্যাহতি পরিমাণ/ শতাংশ	মন্তব্য/ অতিরিক্ত তথ্য
সামিট গ্রুপ	বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (কয়লা-বিহীন জ্বালানিতে পরিচালিত) বাংলাদেশে মোট ১৫টি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট।	আয়কর অব্যাহতি	- আশুলিয়া পাওয়ার প্ল্যান্ট - ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ - চাঁন্দিনা পাওয়ার প্ল্যান্ট - ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ - মাধবদী পাওয়ার প্ল্যান্ট I- ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ - চাঁন্দিনা পাওয়ার প্ল্যান্ট II- ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ - মাধবদী পাওয়ার প্ল্যান্ট II- ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৬ - আশুলিয়া পাওয়ার প্ল্যান্ট II - ৩ ডিসেম্বর, ২০০৭ - উল্লাপাড়া পাওয়ার প্ল্যান্ট - ২ মার্চ, ২০০৯ - মৌনা পাওয়ার প্ল্যান্ট - ১১ মে, ২০০৯ - রূপগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট - ৯ জুন, ২০০৯ - বাদলিয়া পাওয়ার প্ল্যান্ট - ২৫ জুন, ২০০৯ - নারায়ণগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট I - ১ এপ্রিল, ২০১১ - নারায়ণগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট II - ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬	প্রতিটি (১৫টি) বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে কর অব্যাহতি উপভোগ করছে।	১০০%	বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে অর্জিত আয়, বাংলাদেশে আগমন থেকে তিন বছরের জন্য বিদেশিদের দ্বারা উপার্জিত আয়, বিদেশি সুদের ঋণের ওপর কর, রয়্যালটি, কারিগরি জ্ঞান ফি এবং কোম্পানি প্রদত্ত কারিগরি সহায়তা ফি, এবং শেয়ার হস্তান্তর থেকে সৃষ্ট মূলধন লাভ, আয়কর আইন, ২০২৩ এবং বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতিমালা অনুসরণের শর্তে অব্যাহতি।

চলমান টেবিল ৬.১

বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার শ্বেতপত্র

চলমান টেবিল ৬.১

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান	শিল্প খাত	কর অব্যাহতির প্রকার	কোম্পানির নাম এবং অব্যাহতির আরম্ভকাল	অব্যাহতির কাল	অব্যাহতি পরিমাণ/ শতাংশ	মন্তব্য/অতিরিক্ত তথ্য
			- বরিশাল পাওয়ার প্ল্যান্ট - ৫ এপ্রিল, ২০১৬ - গাজীপুর II পাওয়ার প্ল্যান্ট - ১০ মে, ২০১৮ - গাজীপুর II পাওয়ার প্ল্যান্ট - ১২ জুলাই, ২০১৮			
এস আলম গ্রুপ	এনার্জি	আয়কর অব্যাহতি	এস এস পাওয়ার লিমিটেড ২০১৯	চলমান	১০০%	এসএস পাওয়ার ১ লিমিটেডকে প্রদানকৃত ঋণের জন্য ঋণদাতাদের দ্বারা প্রাপ্ত ফির ওপর কর অব্যাহতি।
	কয়লা-ভিত্তিক জ্বালানিতে পরিচালিত বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট	আয়কর অব্যাহতি	বাশখালি পাওয়ার প্ল্যান্ট - সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৫ বছর	১০০%	বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে অর্জিত আয়, বাংলাদেশে আগমন থেকে তিন বছরের জন্য বিদেশিদের দ্বারা উপার্জিত আয়, বিদেশি সুদের ঋণের ওপর কর, রয়্যালটি, কারিগরি জ্ঞান ফি এবং কোম্পানি দ্বারা প্রদানকৃত কারিগরি সহায়তা ফি, এবং শেয়ার হস্তান্তর থেকে সৃষ্ট মূলধন লাভ,

চলমান টেবিল ৬.১

চলমান টেবিল ৬.১

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান	শিল্প খাত	কর অব্যাহতির প্রকার	কোম্পানির নাম এবং অব্যাহতির আরম্ভকাল	অব্যাহতির কাল	অব্যাহতি পরিমাণ/ শতাংশ	মন্তব্য/অতিরিক্ত তথ্য
						আয়কর আইন, ২০২৩ এবং বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতিমালা অনুসরণের শর্তে অব্যাহতি।
ওয়ালটন গ্রুপ	ফ্রিজ, মোটর সাইকেল এবং এয়ার কন্ডিশনার প্রস্তুতকারী	আয়কর অব্যাহতি	ওয়ালটন হাই টেক ইন্ডাস্ট্রিস পিএলসি ২০০৯	১২ বছর	৯৫%	ফ্রিজ, মোটর সাইকেল এবং এয়ার কন্ডিশনার উৎপাদন ব্যবসা থেকে অর্জিত আয়ে অব্যাহতি।
	হাই-টেক পার্ক	আয়কর অব্যাহতি	- ওয়ালটন হাই টেক ইন্ডাস্ট্রিস পিএলসি ২০২২ - ওয়ালটন ডিজিটেক লিমিটেড ২০২১	১০ বছর	প্রথম ৭ বছর ১০০% পরবর্তী ৩ বছর ৭০%	হাই টেক পার্কে ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে অর্জিত আয়ে অব্যাহতি।
বেক্সিমকো গ্রুপ	সুকুক বন্ড	আয়কর অব্যাহতি	২০২১	চলমান	১০০%	বিশেষ উদ্দেশ্য যান (SPV) এর SUKUK সম্পর্কিত আয়ে অব্যাহতি শর্তসাপেক্ষে যে SPV আয়কর আইনের বিধান অনুসরণ করবে। উদ্ভাবক এবং SPV এর মধ্যে SUKUK সম্পর্কিত লেনদেনকে আয়কর ব্যবস্থাপনা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে শর্তসাপেক্ষে যে তারা আয়কর আইনের বিধান অনুসরণ করবে।

সূত্র: এনবিআর

মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও, ব্যক্তিগত আয়কর রাজস্ব জিডিপি়র মাত্র ১ শতাংশের সমান। বিশেষত উচ্চ আয়কারীদের কর ফাঁকি, বেশ সাধারণ ব্যাপার। রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং কর সংগ্রাহকদের “ম্যানেজ” করে কর ফাঁকির সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে। করদাতাদের নিবন্ধন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কিছুটা বেগবান হলেও কর আহরণে সুফল মিলছে না। জটিল রিটার্ন ফাইলিং প্রক্রিয়ার কারণে করদাতারাও নিরুৎসাহিত হচ্ছেন।

কর্পোরেট করের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিভিন্ন অসঙ্গতি। সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ ছাড়াই বিভিন্ন খাতের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন কর্পোরেট কর হার নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন: তামাক ও টেলিকমিউনিকেশন খাতে উচ্চ কর হার বিদ্যমান। জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় তামাক খাতে উচ্চ কর হার আরোপ করা হলেও, অন্যান্য খাতের নির্ধারিত কর হারের কোনো বিশ্লেষণমূলক সুনির্দিষ্ট ভিত্তি নেই। এছাড়াও কর কর্তৃপক্ষের হয়রানির ভয়ে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনানুষ্ঠানিক খাতে থাকতে বাধ্য হয় (অর্থাৎ, তারা ট্যাক্স প্রদানের জন্যে নিবন্ধনই করে না)। এভাবেও বাংলাদেশ অনেক রাজস্ব হারাচ্ছে।

ভ্যাট ব্যবস্থাতেও নানান অসঙ্গতি ও প্রশাসনিক জটিলতা রয়েছে। যেমন: একাধিক নিবন্ধন ব্যবস্থা, জটিল নিরীক্ষা এবং পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটারাইজড সিস্টেমের অভাবে ভ্যাটের রাজস্ব সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এনবিআরের সাথে আলোচনা ও সংশ্লিষ্ট নথি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ইলেকট্রনিক ফিসকাল ডিভাইস (ইএফডি) এবং এসডিসি (সেলস ডেটা কন্ট্রোলার) ইউনিটে ভ্যাট আহরণ জোরদারের কথা থাকলেও; কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি (টেবিল ৬.২)। মূলত এখানে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অদক্ষ ভেন্ডর (জেনেব্র ইনফোসিস লিমিটেড) নির্বাচিত হলে, একটি দায়সারা চুক্তি হয়। ভেন্ডর চুক্তির শর্তাবলী অনুসরণ করেন না এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত জবাবদিহিতার অভাব দেখা যায়।

টেবিল ৬.২ ইএফডি এবং এসডিসি উদ্যোগের দুর্বল বাস্তবায়ন

চুক্তির শর্তাবলী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
প্রাথমিকভাবে ২০,০০০ ব্যবসা নিবন্ধিত হয়েছে, যার লক্ষ্য ইএফডি (ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস) এবং এসডিসি (সেলস ডেটা কন্ট্রোলার) ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে এটি ৬০,০০০-এ বৃদ্ধি করা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর এর মধ্যে আরও ৩০,০০০ ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে, এবং ২০২৪ সালের মধ্যে আরও ৬০,০০০ ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।	৬০,০০০ ইএফডি মেশিন স্থাপনের জন্য ৪২,২৩৫ বিআইএন তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তবে, এখন পর্যন্ত ১১,৩১৩টি মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। ৪,৬৬২টি মেশিন হাতে রয়েছে। এর মধ্যে ৭৫৭টি দোকান বন্ধ বলে রিপোর্ট করা হয়েছে, এবং ২,৫৫০টি ব্যবসা প্রয়োজনীয় ডিভাইস স্থাপনের জন্য অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ভেন্ডর দাবি করেছে, ১৯৫টি এসডিসি স্থাপন করা হয়েছে। তবে বাস্তবে, ৯৭টি এসডিসি স্থাপন করা হয়েছে। ৭৯৫৮টি মেশিন স্টকে থাকা সত্ত্বেও সেগুলো স্থাপন করা হয়নি। স্থাপিত মেশিনগুলি সিক্সোনাইজেশন সমস্যায় ভুগছে। ফলে, অর্জিত অগ্রগতি মাত্র ১৯%।
ভবিষ্যতের প্রশিক্ষণের জন্য রেকর্ডকৃত টিউটোরিয়াল যোগান	কোন তথ্য পাওয়া যায়নি
মেশিনগুলির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করদাতাদের প্রশিক্ষণ	কিছু ক্ষেত্রে সচেতনতামূলক সেশন হলেও, তালিকা অনুযায়ী কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি।
প্রত্যেক ডিভাইস ব্যবহারকারীর জন্য ৩ দিনের ব্যাচে ৬ ঘণ্টার সেশনে প্রশিক্ষণ।	তালিকা অনুযায়ী ডিভাইস ব্যবহারকারীদের কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। মেশিন ইনস্টলেশনের সময় শুধুমাত্র প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

চলমান টেবিল ৬.২

চলমান টেবিল ৬.২

চুক্তির শর্তাবলী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
মানবসম্পদ উন্নয়নসহ (বিশেষ, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, বাস্তবসম্মত এবং সময়সীমাবদ্ধ) কাজ সম্পন্নের পরিকল্পনা। ইএফডি/এসডিসি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মেশিনের জন্য কর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি সতর্কতা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।	মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য তথ্য দেওয়া হয়েছে। সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মোট ১৪৪জন কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। তাদের মধ্যে ৩১ জন চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিসে এবং ১০৬ জন ঢাকা গুলশানের মূলঅফিসে কাজ করছেন। ১১,৪১০টি প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়োজিত ১০৬ জন কর্মচারী। অর্থাৎ, প্রতি ৭৯.২৬ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে আছেন ১ জন কর্মচারী। নির্ধারিত কাজে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ভেদরদের ছিল না। নিয়োগকৃত কর্মচারীর সংখ্যা অপরিপূর্ণ। ইএফডি এবং এসডিসি ব্যবহারকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। মেশিনের সম্প্রসারণে কোনো SMART পরিকল্পনা নেই। অস্বাভাবিকতা পর্যবেক্ষণে সতর্কতা পরিকল্পনা প্রস্তুতির কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
ভেদর সমস্ত দলের নথি প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ করবে, যার মধ্যে সার্ভে এবং রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত থাকবে।	কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি
ভেদর তত্ত্বাবধায়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা উপস্থাপন করবে।	তত্ত্বাবধায়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে ভেদর কোনো পরিকল্পনা দেয়নি।
সতর্কতার সাথে ইএফডি এবং এসডিসি ব্যবহার করে কর সংগ্রহের তথ্য নেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট কমিশনারকে আইনগত পদক্ষেপ নিতে অবহিত করা।	সংশ্লিষ্ট কমিশনারকে কর সংগ্রহের সমস্যা এবং আইনগত পদক্ষেপ নিতে অবহিত করার কথা থাকলেও, বাস্তবে এমন অপচয়ের তথ্য কমিশনারের কাছে জমা দেওয়া হয়নি। কমিশনার অফিস থেকে জানা গেছে, কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ব্যবসাক্ষেত্রে গিয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চালান ইস্যু করেছেন। ডেটা অনুযায়ী, প্রত্যাশিত পরিমাণের চেয়ে বেশি কর ফিরতি মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে।

সূত্র: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বাংলাদেশের অন্যান্য কর ব্যবস্থার তুলনায় কাস্টমস বেশ ভালোভাবে পরিচালিত হয়। আধুনিকীকরণ উদ্যোগের ফলে অটোমেটেড সিস্টেম ফর কাস্টমস ডেটা (ASYCUDA) এখন আগের তুলনায় বেশ উন্নত। ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়াও কিছুটা সহজ হয়েছে। তবে এখানেও নানান জটিলতায় ব্যবসার খরচ বেড়ে যায়। বন্দরে দীর্ঘসূত্রিতা এবং লেনদেনে উচ্চ ব্যয় ব্যবসার খরচ বাড়িয়ে দেওয়ায় বেসরকারি বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এছাড়া কর ফাঁকি দেয়ার চর্চা তো রয়েই গেছে। আমদানিকারক এবং কাস্টমস কর্মকর্তাদের অবৈধ আঁতাতে রাজস্ব হারাচ্ছে বাংলাদেশ। এ ব্যাপারে প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং সম্পূর্ণ অটোমেশন এর কোনো বিকল্প নেই।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সক্ষমতা অপ্রতুল এবং কর নীতি বিশ্লেষণে দক্ষতার অভাব। গবেষণা ও পরিসংখ্যান শাখা বিশ্লেষণমূলক কাজে এনবিআরকে সহায়তা দিতে পারছে না। প্রথাগত পদ্ধতিতে চাকরিতে রদবদলের ফলে, প্রশিক্ষিত জনবলও কাজে লাগছে না।

এনবিআর চেয়ারম্যান নিয়োগের বর্তমান প্রক্রিয়া, প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করছে। ১৯৭৩ সালের এনবিআর আদেশ ছিল চেয়ারম্যান নিয়োগের রেফারেন্স পয়েন্ট। আদেশে বলা হয়েছিল, এনবিআরের সদস্যদের

মধ্যে থেকেই চেয়ারম্যান হতে হবে। তবে, ১৯৭৯ সালের একটি অধ্যাদেশ; প্রশাসন ক্যাডার থেকে এনবিআর চেয়ারম্যান নির্বাচনের সুযোগ করে দেয়। প্রশাসন ক্যাডারের চেয়ারম্যান রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মতো জটিল বিষয়ে বিশদ জ্ঞান না রাখায়, এনবিআরের কৌশলগত সংস্কার বাস্তবায়ন গতি পাচ্ছে না। এছাড়া, এনবিআর চেয়ারম্যানের মেয়াদকাল এমন যে, দীর্ঘমেয়াদী-টেকসই সংস্কারের চেয়ে স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্য (quick gains/low-hanging fruit) প্রাধান্য পায়। এই স্বল্পমেয়াদে কাজ করার প্রবণতায় রূপান্তরমূলক (transformative) সংস্কার তেমন বেগবান হয়নি।

৬.৪ মূল বার্তা ও সম্ভাব্য করণীয়

রাজস্ব সংস্কারের সফলতা কেবল নীতিমালার উপর নির্ভর করে না। রাজস্ব সংস্কার তখনই সফল হয়, যখন রাজনৈতিক-আমলাতান্ত্রিক বাধা কাটিয়ে সর্বস্তরে দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ করতে পারে। এজন্যে প্রয়োজন শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগ। এই অধ্যায়ের মূল বার্তাগুলো নিম্নরূপ-

রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার পৃথক কার্যক্রম: অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পৃথক রাজস্ব নীতি এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ তৈরি করতে হবে। তাহলে, আরো দক্ষতার সাথে রাজস্ব আদায় ও রাজস্বসংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ সম্ভব হবে।

রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এন্ড-টু-এন্ড ডিজিটাইজেশন ছাড়া রাজস্ব সংস্কার দুর্বল: রাজনৈতিক-ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং স্বার্থান্বেষী পক্ষগুলো কর ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে প্রয়োজনীয় সংস্কার (ডিজিটাইজেশন-ইন্টিগ্রেশন) বাধাগ্রস্ত করছে। কর প্রশাসন আধুনিকীকরণ, ত্রুটি হ্রাস, এবং কমপ্লায়েন্স প্রক্রিয়া সহজতর করতে সমন্বিত ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। নিচে কিছু কার্যকর ব্যবস্থা উল্লেখ করা হলো:

- **স্বয়ংক্রিয় কমপ্লায়েন্স ও প্রয়োগ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ:** এনবিআরের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় কর কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থার উন্নয়নে তহবিল বরাদ্দ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কর রিমাইন্ডার, জরিমানা এবং অডিট সংকেত স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেওয়া সম্ভব হবে। সব নিবন্ধিত ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান কর আইন মেনে চলছে কি না তা নিশ্চিতও হওয়া যাবে। বাজেটে স্বয়ংক্রিয় প্রকল্পগুলোর জন্য (যেমন: ইলেকট্রনিক ট্যাক্স ডিডাকশন অ্যাট সোর্স) তহবিল বরাদ্দ করা গুরুত্বপূর্ণ। যা কর কর্তনে ধারাবাহিকতা আনবে এবং আয়কর সংগ্রহে গতি ফেরাবে।
- **ঝুঁকিভিত্তিক অডিট ব্যবস্থার জন্য তহবিল:** রিয়েল এস্টেট, পাইকারি বাণিজ্য এবং আমদানি-রপ্তানির মতো খাতগুলোতে সাধারণত নন-কমপ্লায়েন্সের হার বেশি। সরকারকে একটি কেন্দ্রীয় ঝুঁকিভিত্তিক অডিট ব্যবস্থা (centralized risk-based audit system) বাস্তবায়নের জন্য তহবিল বরাদ্দ করে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ফলে, উচ্চ কর ফাঁকির ঝুঁকিসম্পন্ন খাতগুলোতে তথ্যভিত্তিক অডিট পরিচালনার সুযোগ তৈরি হবে। এই অডিট ব্যবস্থা ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ এবং দুর্নীতির সুযোগ কমিয়ে আনতে পারে।
- **ডিজিটাল কর ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো উন্নয়ন:** করদাতাদের রেকর্ড কেন্দ্রীভূত করতে এবং বিভিন্ন সংস্থার জন্য একক ডাটাবেস তৈরির সক্ষমতা আনতে এনবিআরকে তহবিল বরাদ্দ করা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা রিয়েল-টাইম আপডেট করার ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে। যা কর দাখিল, অর্থ প্রদান, এবং সম্মতি পর্যবেক্ষণকে সহজতর করবে।

কর ফাঁকি রোধে তথ্য আদান-প্রদান অবকাঠামো তৈরি: কর ফাঁকি কমাতে সরকারি-বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে ডিজিটাল তথ্য আদান-প্রদানের সক্ষমতা তৈরি করা অতিব জরুরি। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি তাৎক্ষণিকভাবে নেওয়া যেতে পারে:

- **তথ্য আদান-প্রদান অবকাঠামোতে বিনিয়োগ:** এনবিআর, ব্যাংক, টেলিযোগাযোগ, এবং অন্যান্য সংস্থাগুলোর মধ্যে করদাতার তথ্য যাচাইয়ে সমন্বিত অবকাঠামো তৈরি করতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ করতে হবে। এবং দ্রুততম সময়ে এই অবকাঠামো কে চালু করতে হবে। এই অবকাঠামো কর ফাঁকি শনাক্তে তৃতীয় পক্ষের তথ্য যাচাই করার মাধ্যমে কমপ্লায়েন্স চেক এবং অডিটের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে।
- **তৃতীয় পক্ষের ডাটা সমন্বয় (third party data integration):** তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে (যেমন: ব্যাংক/নন-ব্যাংক প্রতিষ্ঠান বা মোবাইল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম) তথ্য সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিতে হবে। রাখতে হবে প্রয়োজনীয় তহবিল। এটি এনবিআরকে করদাতাদের লেনদেন, তথ্যের সাথে মেলানোর সুযোগ করে দেবে। এই ইন্টিগ্রেশন সরকারের কর ফাঁকি শনাক্তকরণ এবং করজাল সম্প্রসারণের ভূমিকা রাখবে।

নীতি বিশৃঙ্খলার কারণে সৃষ্ট রাজস্ব ঘাটতি হ্রাসে পদক্ষেপ নিতে হবে: রাজনৈতিক-ব্যবসায়িক প্রভাব খাটিয়ে স্ট্যাটুটরি রেগুলেটরি অর্ডার (SRO) জারি করে নীতি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে। যা স্বচ্ছতা এবং ন্যায্যতার পরিপন্থী। কর-জিডিপি অনুপাত বাড়াতে, কর অব্যাহতি ব্যবস্থাকে নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতর আনতে হবে। কর অব্যাহতি প্রক্রিয়া সঠিক করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে:

- **কর অব্যাহতি বিবেচনায় বিশ্লেষণভিত্তিক পদ্ধতি প্রণয়ন:** অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যথাযথ আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কর অব্যাহতি প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে। প্রদত্ত অব্যাহতিগুলোর কার্যকারিতাও নির্দিষ্ট সময় পরপর পর্যালোচনা করতে হবে।
- **অকার্যকর কর অব্যাহতি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা:** কর অব্যাহতির সুবিধাভোগী ব্যবসা/সেক্টরগুলোর মধ্যে যেগুলো অর্থনীতিতে কাক্ষিত প্রভাব রাখতে পারছে না, তাদের সুবিধা যথাযথ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বন্ধ করতে হবে। উল্লেখ্য, কীভাবে অর্থনীতিতে প্রভাব রাখছে; তা নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট নির্দেশক (indicator) থাকতে হবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে, এটা যেন ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে।

বিশ্লেষণভিত্তিক নীতি নির্ধারণ এবং এনবিআরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জরুরিভিত্তিতে নজর দিতে হবে: রাজস্ব লক্ষ্য এবং কর নীতিগুলো প্রায়ই এনবিআরের সাথে পরামর্শ এবং তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ ছাড়াই অর্থ বিভাগ নির্ধারণ করে থাকে। ফলে, লক্ষ্যমাত্রা হয় অবাস্তব; থাকে না কোনো কার্যকর কর সংগ্রহ কৌশল। এনবিআরের সক্ষমতার অভাব, জনবল সংকট এবং এনবিআর চেয়ারম্যানের সংক্ষিপ্ত কার্যকাল বড় উদ্বেগের কারণ। জনবল বৃদ্ধি, উন্নত বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং এনবিআর চেয়ারম্যানের দীর্ঘমেয়াদী নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যকারিতা উন্নত করা সম্ভব। এই বিষয়ে নিচের পদক্ষেপগুলো অবিলম্বে নেওয়া প্রয়োজন:

- **রাজস্ব বোর্ডে জনবল এবং প্রশিক্ষণ বাজেট বৃদ্ধি:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অতিরিক্ত জনবল দেওয়া প্রয়োজন। একইসাথে, ডিজিটাল কর ব্যবস্থাপনা এবং কর সঙ্গতি বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। আসন্ন বাজেটে কমপ্লায়েন্স অফিসার, নিরীক্ষক এবং তথ্য বিশ্লেষক নিয়োগে তহবিল রাখা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের আধুনিক কর প্রশাসনের সেবা পদ্ধতিগুলো জানানো জরুরি।
- **উন্নত বিশ্লেষণ এবং নিরীক্ষণ পদ্ধতি:** রাজস্ব বোর্ডের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং তথ্য বিশ্লেষক সফটওয়্যারসহ উন্নত বিশ্লেষক সরঞ্জাম কিনতে তহবিল বরাদ্দ করতে হবে। এই প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ এনবিআরকে কর ফাঁকির প্যাটার্ন চিহ্নিত এবং নজরদারিতে সহায়তা করবে।

- **রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের মেয়াদ নিশ্চিত করা (এনবিআর অভিজ্ঞতাসহ):** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের মেয়াদকাল ন্যূনতম তিন বছর নির্ধারণ করা হলে, নীতিগত ধারাবাহিকতা বাড়বে এবং বহু বছরের সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। পাশাপাশি, নেতৃত্ব পরিবর্তনে রাজনৈতিক প্রভাব কমানোর জন্য ১৯৭৩ সালের এনবিআর আদেশ পুনর্বহাল করা যেতে পারে।

করদাতাদের আস্থা অর্জনে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে: করদাতারা অনাস্থার কারণে কর দেওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। তাদের মধ্যে কর ব্যবস্থাপনার প্রতি আস্থা তৈরিতে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষামূলক প্রচারণা এবং স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। নিম্নলিখিত তাৎক্ষণিক পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে:

- **জনসচেতনতামূলক প্রচারণা:** করদাতাদের মধ্যে স্বেচ্ছায় কর দেওয়ার আগ্রহ বাড়াতে শিক্ষামূলক প্রচারণা অপরিহার্য। আসন্ন বাজেটে মিডিয়া, স্থানীয় ইভেন্ট এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ব্যাপক জনশিক্ষা প্রচারণার জন্য তহবিল বরাদ্দ ও বাস্তবসম্মত কর্মসূচি নেয়া উচিত। এমন কর্মসূচির মাধ্যমে, রিটার্ন ফাইলিং প্রক্রিয়া সহজবোধ্য হবে এবং মানুষ নিবন্ধনেও উৎসাহ পাবে।
- **টিআইএন নিবন্ধন সম্প্রসারণ কর্মসূচি:** শহরাঞ্চল এবং উচ্চ আয়ের অঞ্চলে টিআইএন নিবন্ধন প্রচারণার জন্য তহবিল বরাদ্দ ও কর্মসূচি নেয়া উচিত। এই কর্মসূচি সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক, বিশেষত ১৮ বছরে পৌঁছানো ব্যক্তিদের ইউনিভার্সাল ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর দিয়ে নিবন্ধিত করার উপর গুরুত্বারোপ করবে। প্রধান অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং শহরাঞ্চলে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে আনুষ্ঠানিক কর ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রয়েছে।

ট্যাক্স সার্কেল অফিসের (Tax Circle Office) দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যক্রম পুনর্গঠন করতে হবে: বর্তমানে ট্যাক্স সার্কেল অফিসের যে গঠন, তাতে ট্যাক্সের ডেপুটি কমিশনারের উপর নানান দায়িত্ব অর্পিত। যেমন: কর হিসাব নির্ধারণ (tax assessment), মাঠ প্রতিবেদন তৈরি (field reporting) এবং বাস্তবায়ন। এসব শুধু যে কর্মদক্ষতায় ব্যাঘাত ঘটায় তা নয়, করদাতাদের মাঝে হতাশাও তৈরি করে। এই সমস্যা সমাধানে, ট্যাক্স সার্কেল অফিসকে তিনটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—প্রতিবেদন প্রদান বা রিপোর্টিং, মূল্যায়ন এবং প্রয়োগ (enforcement)। প্রতিটি বিভাগের নেতৃত্বে থাকবেন অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার অথবা, ইন্সপেক্টর। আর সার্বিক মূল্যায়ন করবেন ডেপুটি কমিশনার অথবা, সহকারী কর কমিশনার। এই পুনর্গঠন করদাতাদের সঠিক সেবা প্রদান, ট্যাক্স হিসাব নির্ধারণ এবং উচ্চতর সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

Faceless Tax Assessment প্রয়োগ করতে হবে: অর্থ আইন, ২০২৪ এ সাধারণ ট্যাক্স রিটার্নধারী কর্পোরেট করদাতাদের উপর থেকে নিয়মিত অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া বাতিল করেছে। কিন্তু, এই আইন অসং করদাতাদের জন্য কর ফাঁকির সুযোগ করে দিয়েছে। যেহেতু, বছরে মাত্র ২-৩% ট্যাক্স রিটার্নের অডিট করা সম্ভব হয়। আবার যারা সৎভাবে কর দেন তাদেরই বারবার ভোগান্তির শিকার হতে হয়। উপরন্তু আয়কর আইন, ২০২৩-এর ৫৫ ধারার (পূর্বে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ৩০ ধারা) বাস্তব প্রয়োগ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর ফলে, উৎসে কর কর্তনের ক্ষেত্রে নন-কমপ্লায়েন্স (non-Compliance) এর সুযোগ তৈরি হচ্ছে। Faceless Tax Assessments পদ্ধতি প্রয়োগ করলে এই সমস্যা কমে আসবে। এর মাধ্যমে, করদাতাদের সাথে কর কর্মকর্তাদের সরাসরি যোগাযোগ থাকবে না। ফলে, স্বচ্ছতা বাড়বে, কর ফাঁকি কমবে এবং কমপ্লায়েন্স (compliance) হার বাড়বে বলে আশা করা যায়।

স্থানীয় সরকারের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সম্পত্তি কর (Modern Property Tax System) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন: বর্তমানে সম্পত্তি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বাজারমূল্যের পরিবর্তে মৌজামূল্য ব্যবহারে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়। বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে সম্পত্তি কর প্রবর্তন করা উচিত। এ প্রক্রিয়া ঢাকা থেকেই শুরু করা যায়। প্রক্রিয়াটি শহরাঞ্চলীয় পৌরসভার জন্য টেকসই রাজস্ব উৎপাদনে সহায়ক হবে। এই ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ

করতে, ডিজিটাল সম্পত্তি ডাটাবেস (digital property database) তৈরি করতে হবে। যার মাধ্যমে, সম্পত্তি নিবন্ধনে অযৌক্তিক নয় সুসংহতভাবে সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা যাবে।

কার্যকর সম্পদ কর (Wealth Tax) ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন: রাজস্ব সংগ্রহে সম্পত্তির মূল্যভিত্তিক সম্পদ কর প্রবর্তন করা প্রয়োজন (wealth tax based on asset values)। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কাজটি জটিল। কারণ, সম্পদের সঠিক মূল্য নির্ধারণেই বহু দুর্বলতা রয়েছে। তবে, সম্পদ কর প্রণয়ন ছাড়া দীর্ঘ মেয়াদে আয়-বৈষম্য নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসইভাবে রাজস্ব আদায় কঠিন হবে।

পর্যায়ক্রমে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং নগদ লেনদেন কমাতে উৎসাহিত করা: বাংলাদেশে ডিজিটাল পেমেন্টকে উৎসাহিত করতে হবে। পাশাপাশি, কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ করে দেয়া উচ্চমূল্যের নগদ লেনদেন সীমিত করতে হবে। ডিজিটাল লেনদেনে প্রগোদনা দেওয়া যেতে পারে, যা অতিরিক্ত নগদ ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করবে।

অধ্যায়-৭: সরকারি বিনিয়োগ: দুর্নীতির শেকড় অনুসন্ধান*

- সরকারি পরিষেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির সম্মুখীন ৭০.৯% পরিবার
- দেশের অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৭.৫০ লাখ কোটি টাকা, জনপ্রতি ঋণ ৯৮,৫৫৪ টাকা
- আমলাদের তুষ্টি রেখে নির্বাচনে কারসাজি, সরকারি বেতনভাতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ
- আমলাদের পুরস্কৃত করতেই জনপ্রশাসনের বরাদ্দ ২১.২ শতাংশে উন্নীত করা হয়
- ২০১০-২০২৩ সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ব্যয় প্রায় ৭ লাখ কোটি টাকা
- ২০১১ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে সরকারি ব্যয় বেড়েছে ১.৪৫ গুণ
- ২০১৪ ও ২০১৮ এর নির্বাচনের আগে সরকারি ব্যয় বেড়েছে সবচেয়ে বেশি
- সরকারি ব্যয়ের ৭১% যায় সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ৫ খাতে
- গত ১৫ বছরে পণ্য ও সেবা ক্রয়ে বরাদ্দ প্রায় ৭ লাখ কোটি টাকা
- বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ঘুষ-চাঁদাবাজিতে ব্যয় ১.৬১-২.৮০ লাখ কোটি টাকা
- সরকারি কর্মকর্তারা ঘুষ নিয়েছেন ৭৭-৯৮ হাজার কোটি টাকা
- ১ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন রাজনীতিবিদ ও তাদের সহযোগীরা
- দুর্নীতির অর্থের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদেশে পাচার
- প্রকল্প পেতে ঘুষ প্রকল্প ব্যয়ের ১১-১৪%, যার মধ্যে প্রকল্প সদস্যদের ৫-৬% এবং মাঠ পরিদর্শকদের ৬-৮%
- দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রভাব মূল্যায়ন না করে, রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে
- নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ফিতা কাটার জন্য প্রকল্প নেওয়া হয়েছে
- কৃত্রিম অগ্রগতি দেখাতে অনেক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে
- সিএজির নিরীক্ষায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের এক-চতুর্থাংশ ব্যয়ে অনিয়ম দেখা গেছে
- সর্বাধিক অনিয়ম হয়েছে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, বিদ্যুৎ, স্বরাষ্ট্র, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সেতু বিভাগে
- নির্মাণ প্রকল্পের পেছনে মোট ব্যয়ের ২৩-৪০ শতাংশই দুর্নীতি
- দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ এবং কর্মকাণ্ড রাজনীতি প্রভাবিত
- অনেকক্ষেত্রেই রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনের হাতিয়ার হিসেবে দুদককে ব্যবহার
- দুর্নীতি ব্যাপকতার মূল কারণের মধ্যে আছে: আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার অপব্যবহার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রাজনৈতিক কড়পক্ষের অনিয়ম
- ই-জিপি চালুর পরও ৭০% কাজ স্থানীয় ঠিকাদাররা পেয়েছে
- স্থানীয় ঠিকাদারদের শক্তিশালী আঁতাতে ক্রয় প্রক্রিয়ার দীর্ঘস্থায়ী অনিয়ম
- সরকারের উন্নয়ন ব্যয়ের বড় উদ্বেগ 'লাস্ট কোয়ার্টার সিনড্রোম' (যখন বরাদ্দের বড় অংশই অর্থবছরের শেষ কোয়ার্টারে খরচ করা হয়)
- মূল পরিকল্পিত ব্যয়ের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় ৪০০% পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে
- ধারণা করা হয়, সরকারের মোট ব্যয়ের ৪০ শতাংশই অপব্যবহার হয়েছে
- সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা থাকায় দায়ী ব্যক্তিরা সুরক্ষা পেয়েছে
- উচ্চশিক্ষিত যুবকদের বেকারত্ব হার ২০১৩ সালে ৯.৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ২৭.৮% উন্নীত হয়েছে
- দেশের অর্থনীতি 'চাকরিবিহীন প্রবৃদ্ধির' দুষ্টিচক্রে পড়েছে
- দুর্নীতি থেকে প্রাপ্ত অর্থের সিংহভাগ আবাসন, মৎস্য, কৃষি ও পরিবহন খাতে বিনিয়োগ

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন অধ্যাপক এ কে এনামুল হক, ডেপুটি ভাইস চ্যান্সেলর, ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ক্যাম্পাস এবং পরিচালক, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ ঢাকা।

- চট্টগ্রামে কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ স্থানীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি
- সিলেট ও রাজশাহীতে হাইটেক পার্ক নির্মাণ স্থানীয় কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারেনি
- সরকারি প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের বড় অংশ বিদেশে পাচার

৭.১ ভূমিকা: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সরকারি সেবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

বাংলাদেশের মতো দেশে, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য জনসেবার (Public Goods) প্রাপ্যতা ও গুণগত মান নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং বিশুদ্ধ পানির মতো প্রয়োজনীয় সেবাগুলো এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলে যা অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে এবং নাগরিকদের জীবনমান উন্নত করে।

সামষ্টিক অর্থনীতির স্তরে সরকারি বিনিয়োগ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। অপরদিকে, ব্যাপ্তিক অর্থনীতি বা মাইক্রো স্তরে এই বিনিয়োগ দারিদ্র্য হ্রাসে এবং আয়ের বৈষম্য কমাতে সহায়ক হয়। তবে এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে, সরকারি বিনিয়োগে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প বাছাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জনসেবার নির্ভরযোগ্য সরবরাহ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য অপরিহার্য। যদি জনসেবা পর্যাপ্ত না থাকে, তাহলে বিনিয়োগকারীরা উচ্চ ঝুঁকির শঙ্কায় বিনিয়োগে অনাগ্রহী হতে পারেন। সড়ক, রেলপথ, বন্দর, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগসহ মানসম্পন্ন অবকাঠামো বাণিজ্য এবং সংযোগ স্থাপনের জন্য অপরিহার্য। অপর্যাপ্ত অবকাঠামো ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি এবং সময়ক্ষেপণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে পারে।

একইভাবে, একটি সুশিক্ষিত জনশক্তি উদ্ভাবন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। সরকারি শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ নাগরিকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। যা দক্ষ কর্মশক্তি নির্ভর শিল্পকে আকৃষ্ট করে। বিপরীতে, দুর্বল শিক্ষা ব্যবস্থা দক্ষতার ঘাটতি সৃষ্টি করে। যা ব্যবসা পরিচালনায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে সরকারি বিনিয়োগে প্রকল্পের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিশেষ করে সেতু, সড়ক, বিদ্যুৎ, মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে এবং নগর পরিবহন খাতে। এসব প্রকল্প প্রধানত সরকারি ঋণের মাধ্যমে অর্থায়িত হয়েছে— যার মধ্যে রয়েছে দেশীয় ও বিদেশি উৎসের ঋণ এবং বহুপাক্ষিক-দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা। এর ফলে, বাংলাদেশের মোট দেশীয় ঋণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা। যার মধ্যে ৬০.৭৩% দেশীয় এবং ৩৯.২৭% বিদেশি ঋণ (অর্থ বিভাগ, ২০২৩)। এই হিসাব অনুযায়ী, মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৯৮,৫৫৪ টাকা।

এত বড় আর্থিক বোঝার প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠেছে— এই ধরনের সরকারি বিনিয়োগ আদৌ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ কি না?

এই অধ্যায়ে বিগত এক দশকে বাংলাদেশের সরকারি ব্যয়ের ধারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ কৌশলের আকার, কৌশল তুলে ধরার সাথে সাথে রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। মূলত এরাই সংকট তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছেন। ফলে, বাংলাদেশ এখন বিশ্ব দুর্নীতির সূচকে নিম্ন অবস্থানে রয়েছে।

৭.২ অন্যান্য দেশের সরকারি ব্যয়ের সাথে তুলনা

বাংলাদেশ গত দশকে সরকারি খাতে বিনিয়োগ সম্প্রসারণে উচ্চাভিলাষী কৌশল নিয়েছে। যার অংশ হিসেবে পদ্মা সেতু, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, ঢাকার মেট্রোরেল এবং চট্টগ্রামে টানেল নির্মাণের মতো মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়ন

করা হয়েছে। সম্প্রতি দেশের সরকারি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধিকে অনেকে ‘ঐতিহাসিক/রেকর্ডভাঙা’ বলে আখ্যা দিলেও, বাস্তবতা হলো—বাংলাদেশের সরকারি ব্যয় এখনো অনেক প্রতিযোগী দেশের তুলনায় কম।

নির্বাচিত এশীয় দেশগুলোর সরকারি ব্যয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। এতে বোঝা যায়, বাংলাদেশের সরকারি ব্যয় অতিরিক্ত বা অত্যধিক উচ্চ নয় বরং অন্যান্য দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম। সরকারি ব্যয়ে আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ করতে না পারা, দেশের সীমাবদ্ধতা স্বরণ করিয়ে দেয়। তাই, স্বল্প বিনিয়োগের মধ্যেই সর্বোচ্চ দক্ষতা ও প্রতিফল নিশ্চিত করে সরকারি ব্যয়ের কার্যকর ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। এই ধরনের কৌশল আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারি ব্যয়ে বিদ্যমান অদক্ষতার মূল কারণ, তহবিলের অপব্যবহার ও দুর্বল ব্যবস্থাপনা; যা দুর্বল-অস্বচ্ছ শাসন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। এই সমস্যাই সম্ভবত দেশের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলোকে আরও জটিল করে তুলেছে। অতএব, সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা উন্নত করতে প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করে ব্যাপক বিশ্লেষণ এবং করণীয় বিষয়ে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭.৩ সরকারি বিনিয়োগের উত্থান, আর্থিক বোঝা এবং বেসরকারি বিনিয়োগের উপর প্রভাব

বাংলাদেশের সরকারি ব্যয় ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছানোর সাথে সাথে, উন্নয়ন বহির্ভূত সরকারি ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে বেতন ও ভাতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে মনে করেন, এই বেতন বৃদ্ধি মূলত ২০১৪ সালের নির্বাচনে কারসাজির সহায়ক আমলাদের সম্ভষ্টির জন্য করা হয়েছিল। তবে, নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত এবং উচ্চ সরকারি ঋণের কারণে ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ঋণের সুদ পরিশোধের পরিমাণ বাড়ে। এটি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতার পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যায়।

অর্থনৈতিক সংকট এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। সরকারি ব্যয়ে দুর্নীতির অভিযোগ বাড়তে থাকে। এর ফলে তথ্য অধিকার আইনে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ব্যবহার বাড়ানো হয়। যার আওতায় ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ৭ হাজারের বেশি মামলা হয় (সিজিএস-২০২৪)। এই পদক্ষেপগুলো সরকারের স্বচ্ছতা সীমিত করে এবং নির্বাহী বিভাগের হাতে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেয়। যার ফলে, জবাবদিহিতা কমে; দুর্নীতিতে উৎসাহ বাড়ে। সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের বাধ্যবাধকতার কারণে দায়ী ব্যক্তিরা আরও অধিক সুরক্ষা পায়।

২০২১ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক জরিপে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির চিত্র ফুটে ওঠে। যেখানে দেখা যায়, ৭০.৯% শতাংশ পরিবার সরকারি পরিষেবা গ্রহণকালে দুর্নীতির সম্মুখীন হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, পাসপোর্ট অফিস এবং সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হয়। যেখানে ৫৬.৮% উত্তরদাতা বিচার বিভাগে এবং ৪৮.৭% জনস্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন বলে জানান। ২০১৭ সালে এই দুর্নীতির হার ছিল ৬৬.৫%, যা ২০২১ সালে বেড়ে ৭০.৯ শতাংশে পৌঁছায়। এর ফলে, ঘুষের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৩ কোটি টাকা। যা ২০২০-২১ অর্থবছরের সরকারি বাজেটের ৫.৯ শতাংশ। এ থেকেই বোঝা যায়, বিচার বিভাগসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে।

২০১০ এর দশকে বাংলাদেশে শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে ৭.৪% প্রবৃদ্ধি এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে ৮.৫% প্রবৃদ্ধি নিয়ে সরকার ২০২১ রূপকল্প চালু করে। এই প্রবৃদ্ধি অবকাঠামোগত খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের বাড়াবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। তবে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, কোভিড-১৯ মহামারি এবং অর্থনৈতিক মন্দার ফলে ২০২২ সালের শেষের দিকে প্রবৃদ্ধি স্থবির হয়ে পড়ে। যদিও ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৯৪% ছিল। তবে পরবর্তী বছরগুলোতে প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়নি। যার ফলে কর্মসংস্থানের হার কমে, শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব বেড়ে যায়।

একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, উচ্চশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব হার ২০১৩ সালে ৯.৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ২৭.৮ শতাংশে পৌঁছায়। কারণ অনেকেই উপযুক্ত চাকরি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন। এই পরিস্থিতি ‘চাকরিবিহীন প্রবৃদ্ধি’ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সরকারি চাকরিতে কোটার কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। কারণ, কোটা ক্লাতকদের সুযোগ সীমিত করে দিয়েছিল। ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের ফলে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরু হয়। যা শেষ পর্যন্ত সরকার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সরকারি ব্যয়ের ধরন ও সমস্যা

সংকট মোকাবিলায় গত দশক ধরে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন ব্যয়ের প্রবণতা এবং ধরন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, বড় পরিসরের পরিকাঠামো প্রকল্পে জোর দেওয়া। যা বাংলাদেশের উন্নয়নকে সহজতর এবং দেশকে এলডিসি (লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি) থেকে উত্তরণে সহায়তা করার লক্ষ্যে নেওয়া হয়। পরিকাঠামো উন্নয়নে এই মনোযোগ সরকারি উন্নয়ন কৌশলের মূল কাঠামো হিসেবে কাজ করেছে।

২০১০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অনুযায়ী সরকারি ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, এডিপিতে গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৬.৬% এবং ২০২৩ সালের সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ ২০১১ সালের তুলনায় প্রায় ১.৪৫ গুণ বেশি। তবে, দুই বছরে সরকারি ব্যয়ের উর্ধ্বমুখীতা দেখা গেছে। একটি ২০১৪ সালে নির্বাচনের সময় এবং অন্যটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়। এই বছরগুলোর অন্যতম প্রধান বিনিয়োগ ছিল পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের নির্মাণ, যেখানে প্রকৃত বিনিয়োগ ছিল ৩৮৬ কোটি ৮০ লাখ ডলার। প্রকল্পটির মূল খরচ ছিল ১২০ কোটি ডলার। পরে এটি ২২২% বৃদ্ধি পায়। প্রকল্পটি ২০১৪ থেকে শুরু হয়ে ৭ বছরে সম্পন্ন হয়।

২০১০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে প্রায় ৭ লাখ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি, ২০২৪) বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৬ সালে ৩৮% প্রকল্প সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিদেশি তহবিলে অর্থায়ন করা হয়। যা ২০২৩ সালে তীব্র হ্রাস পেয়ে মাত্র ১১ শতাংশে নেমে আসে। এটি বিদেশি তহবিলযুক্ত প্রকল্প কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

এছাড়াও, ৪০টি প্রকল্পে (৩.২ শতাংশ) বরাদ্দ ছিল মাত্র ১ লাখ টাকা। যেগুলো প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত হয়, অর্থায়নের যৌক্তিক ভিত্তি হারায়। বিশ্লেষণে আরও প্রকাশ পায়, ৩১.৪% প্রকল্প ৬-১০ বছরের বিলম্বের সম্মুখীন হয়েছে এবং প্রায় ৩% প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিলম্ব ১০ বছর অতিক্রম করেছে। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা-জবাবদিহিতা-সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতায় ব্যাপক সমস্যা রয়েছে।

সংশোধিত বাজেট অনুসারে, ২১.২% বরাদ্দ জনপ্রশাসনের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। যা সিভিল প্রশাসন শক্তিশালীকরণে সরকারের মনোযোগ নির্দেশ করে। অনেকেই এ বরাদ্দকে ১৫ বছর ধরে সেবাদানকারী আমলাতন্ত্রকে পুরস্কৃত করার প্রতিফলন হিসেবে দেখেন, যদিও এই সময়কালে গণতান্ত্রিক অবক্ষয়ের জন্য সরকার সমালোচিত হয়।

পরিবহন, গ্রামীণ পরিকাঠামো এবং বিদ্যুৎ খাতে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু, এই খাতগুলোতে উচ্চমাত্রার দুর্নীতি সরকারি তহবিলের কার্যকর ব্যবহারের বিষয়ে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করে। সবচেয়ে বেশি সরকারি ব্যয় হয়— পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও শিক্ষা, আবাসন ও কমিনিউনিটি সুবিধা এবং স্বাস্থ্য। এই ৫ খাতে মোট ব্যয়ের প্রায় ৭১% ব্যয় হয়।

শেষ প্রান্তিক (লাস্ট কোয়ার্টার) সিনড্রোম নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। যেখানে অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে (শেষ তিন মাসে) সরকারি বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ দ্রুত ব্যয় করা হয়। এর ফলে, বর্ষাকালে সরকারি তহবিলের কার্যত

অপচয় ঘটে। এই সমস্যা সমাধানে তিন বছর মেয়াদী রোলিং বাজেট চালু করা হলেও, তা যথাযথভাবে কার্যকর হয়নি। অনেকে মনে করেন, নির্মাণ প্রবণতা সরকারি ব্যয়ের অদক্ষতার অন্যতম কারণ। এই প্রবণতা অনুযায়ী, অনেক প্রকল্প মূলত অবকাঠামো নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পিত হয়—ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) প্যাকেজে প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো উপেক্ষিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক স্কুল ভবন নির্মাণ করা হলেও শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কিংবা বিজ্ঞান ল্যাবের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বরাদ্দের আওতায় রাখা হয় না।

বাংলাদেশে সরকারি ব্যয়ের অযথা বরাদ্দ, দুর্ব্যবস্থাপনা ও অদক্ষতা দূর করতে হলে প্রথমেই এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

পরবর্তী অংশে বাংলাদেশের প্রকল্প পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে— যা সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকর কৌশল প্রণয়নে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

৭.৪ অনুসন্ধান পদ্ধতি

এই শ্বেতপত্রের উদ্দেশ্য সরকারি ব্যয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট অব্যবস্থাপনা বা দুর্নীতির ঘটনা চিহ্নিত করা নয়। বরং, এর লক্ষ্য হলো স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা। গত ১০ থেকে ১৫ বছরে সম্পদের অপব্যবহার বা ভুলভাবে বরাদ্দ (যদি ঘটে থাকে) সংক্রান্ত ঘটনাগুলো নথিভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়।

আমাদের গবেষণা প্রক্রিয়ায় নিচের ধাপগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল:

(ক) সরকারি নথিপত্রের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (content analysis), যার মধ্যে ছিল: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (IMED) প্রতিবেদন, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বার্ষিক প্রতিবেদন, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশসহ (টিআইবি) অন্যান্য উৎসের প্রতিবেদনসমূহ;

(খ) নির্ধারিত কিছু সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ;

(গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও তাদের অধীনস্থ দপ্তরের সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) আয়োজন;

(ঘ) চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহীতে গণশুনানি (Public Hearing) আয়োজন।

এই নথিপত্র, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়ের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ স্বতন্ত্রভাবে আংশিক কাঠামোবদ্ধ (semi-structured) পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। যাতে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গভীর ও প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া যায়।

তথ্য ত্রিভুজীকরণ (data triangulation) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তথ্যের নিরপেক্ষতা-বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায়।

৭.৫ সরকারি ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ

অনেকই মনে করেন, গত এক দশকে সরকারি ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার ও তার প্রতিষ্ঠানগুলো আত্মসাৎ করেছে। এই ধারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়: এটি কীভাবে

ঘটল? আরও নির্দিষ্টভাবে, সরকারি ব্যয় পর্যবেক্ষণের জন্য এতগুলো সংস্থা থাকার পরও কীভাবে এত উচ্চমাত্রার দুর্নীতি দীর্ঘ সময় ধরে টিকে আছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে সরকারি ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা জরুরি।

প্রকল্প নির্বাচন ও বাস্তবায়ন: প্রক্রিয়া ও দুর্বলতা

বাংলাদেশে সরকারি ব্যয় দুইটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত। ক) চলতি ব্যয়: বেতন, ভাতা ও সরকারি সংস্থার নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়। খ) উন্নয়নমূলক ও মূলধনী ব্যয়: বিনিয়োগ ও সরকারি অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল। উন্নয়ন ব্যয় সাধারণত বিভিন্ন সরকারি সংস্থা নির্দিষ্ট প্রকল্পে বিন্যস্ত করে থাকে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কঠোর মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে যায়। প্রকল্প শুরুর সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়গুলো এতে মূল্যায়ন ও অনুমোদনের ভূমিকা পালন করে:

- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
- অর্থ মন্ত্রণালয়
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
- নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

প্রতিটি প্রকল্পকে বেশকিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। যার মধ্যে রয়েছে: ক) ৫০ কোটি টাকার উপরের প্রকল্পগুলোর জন্য অর্থনৈতিক এবং আর্থিক উপযুক্ততা বিশ্লেষণ; খ) রেড এবং অরেঞ্জ ক্যাটেগরিতে শ্রেণিবদ্ধ প্রকল্পগুলোর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্লিয়ারেন্স; গ) সরকারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিনিয়োগের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ক্লিয়ারেন্স; এবং ঘ) নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জেন্ডার বিশ্লেষণ। এছাড়া, প্রকল্পটি দারিদ্র্য হ্রাসে কতটুকু অবদান রাখবে সেটি বিশ্লেষণের দায়িত্বে থাকবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। এগুলো ছাড়াও, প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য প্রযুক্তিগত শর্তাবলীও প্রয়োগ করা হয়।

প্রকল্প প্রণয়ন সম্পন্ন হওয়ার পর, যেসব প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের হার ১২% অতিক্রম করে (পূর্বে এটি ১৫% ছিল, যা সামাজিক ডিসকাউন্ট রেট হিসেবে নির্ধারিত), তা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হয়। তবে, এই ডিসকাউন্ট রেট বাস্তব না কি নামমাত্র মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত, তা স্পষ্ট নয়। কারণ, যখন সমস্ত ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণের তথ্য নির্দিষ্ট মূল্যে প্রকাশ করা হয়, তখন সংশ্লিষ্ট ডিসকাউন্ট রেটও বাস্তবিক হওয়া উচিত।

একনেক (প্রধানমন্ত্রী সভাপতি এবং পরিকল্পনামন্ত্রী সহ-সভাপতি) অনুমোদন দিলে প্রকল্পগুলো সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। বাস্তবায়ন পর্যায়ে, সংশ্লিষ্ট সংস্থার অধীন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এবং অর্থ মন্ত্রণালয় প্রকল্পের অগ্রগতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করে, যাতে সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়। প্রকল্প পরিচালকরা উচ্চ বা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় নির্ধারিত ব্যয়সীমার বাইরে কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারেন না।

একনেক নির্দেশিকা অনুযায়ী, অপ্রত্যাশিত ব্যয় বা কার্যক্রম পরিবর্তনের কারণে একটি প্রকল্প ন্যূনতম তিনবার সংশোধন করা যেতে পারে। যদি সংশোধিত ব্যয় মোট বরাদ্দের ১৫% অতিক্রম করে, তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পাশাপাশি একনেকের পুনঃঅনুমোদন প্রয়োজন হয়। তবে, প্রকল্প ব্যয় ও সময়সীমা প্রায়শই সংশোধনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কিছু ক্ষেত্রে, প্রকৃত ব্যয় মূল পরিকল্পিত ব্যয়ের তুলনায় ৪০০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) যা প্রকল্পের মোট ব্যয় নির্দেশ করে, তা বিনিয়োগের প্রত্যাশিত রিটার্ন বা লাভজনকতার বিষয়ে একইমাত্রার কঠোর মূল্যায়নের সম্মুখীন হয় না। এই পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার অভাবে,

অনেক সংশোধনী “অর্থনৈতিকভাবে অসমর্থ” এবং বাস্তবায়নযোগ্য নয় এমন বিনিয়োগের দিকে পরিচালিত করছে।

অবশেষে, প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্প পরিচালকরা প্রকল্প সম্পন্ন রিপোর্ট জমা দেন। আইএমইডি প্রকল্পটি মূল্যায়ন করে। এছাড়াও, বাংলাদেশ সরকারের কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল (সিএজি) প্রতিটি প্রকল্প পর্যালোচনা করেন। যার মধ্যে সমস্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেন যে কোনো অবৈধ চর্চা বা প্রক্রিয়া চিহ্নিত করা যায়। পরিশেষে, সিএজির প্রতিবেদন সংসদের হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে দাখিল করা হয়। তারা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। এছাড়াও, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কোনো অনিয়ম হয়েছে কি না তা তদন্তের দায়িত্বে থাকে। ব্যয় ব্যবস্থাপনার এই প্রক্রিয়া অনেক দেশে সাধারণ হলেও, এটি প্রকল্প অফিসগুলোতে প্রায়শই কাগজপত্রের মতো অনুসরণ করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং ব্যবস্থার পরও; ব্যাপক জনমত রয়েছে, সরকারি ব্যয়ের প্রায় ৪০% অপব্যবহার করা হয়। এই উদ্বেগ সাধারণ পরামর্শ প্রক্রিয়ায় বারবার উঠে এসেছে। যা আমাদেরকে ব্যয় প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানিক তদারকি ব্যবস্থা পরীক্ষায় উৎসাহিত করেছে।

৭.৬ সরকারি ব্যয় যাচাই-বাছাই: প্রক্রিয়া ও তদারকি ব্যবস্থা

পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল এবং ঢাকায় মেট্রো রেলের মতো বড় প্রকল্প শুরু করার পরও, বাংলাদেশ এখনও গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত ঘাটতির সঙ্গে লড়াই করছে। যদিও সরকার পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। কিন্তু অনেক প্রকল্প এমনভাবে অনুমোদিত হয়েছে যে, তাদের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রভাব যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি এবং প্রায়ই রাজনৈতিক প্রণোদনা প্রভাবিত। এডিপির অধীনে সরকার গড়ে প্রতি বছর প্রায় ১২০০-১৫০০ প্রকল্পে অর্থায়ন করত।

অনেক প্রকল্প নির্বাচনী প্রচারের অংশও ছিল। যেখানে ভিত্তিপ্তস্তর স্থাপন বা ফিতা কাটার মাধ্যমে ‘আনুষ্ঠানিকভাবে’ এগুলো উদ্বোধন ঘোষণা দেওয়া হতো। যদিও সেগুলো জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এর একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হলো, ঢাকা বিমানবন্দরের টার্মিনাল-৩। এমন প্রবণতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যায়। যা অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে, কারণ তাদের কোনো নির্বাচনী প্রণোদনা থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিজয় সরণি ফ্লাইওভার উদ্বোধন করেছিল। যদিও তখনো ফ্লাইওভারটি সম্পূর্ণভাবে নির্মিত ও জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলস্বরূপ, এই প্রকল্পগুলো নির্ধারিত নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেও, প্রায়শই যথাযথ ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ ছাড়াই দ্রুত বাস্তবায়িত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে অনেক প্রকল্প অকার্যকর হয়ে পড়ে, যা শেষ পর্যন্ত সরকারি বাজেটের ওপর গুরুতর চাপ সৃষ্টি করে।

এছাড়াও, একটি ব্যাপক জনমত রয়েছে যে, এসব প্রকল্প অনেক সময় শুধুমাত্র সরকারের প্রদর্শনী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যা একটি মিথ্যা জাতীয় গর্বের অনুভূতি তৈরি এবং শাসক রাজনৈতিক দলকে কৃত্রিম অগ্রগতি প্রদর্শনের সুযোগ করে দেয়। দুর্নীতি নিয়ে আমাদের তদন্ত চলাকালে জনসাধারণের মতামত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্বেগের ভিত্তিতে আমরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নথি পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যেন, প্রকল্পগুলোর প্রকৃত পরিস্থিতি উন্মোচিত করা যায়।

তদারকি ব্যবস্থা এবং সীমাবদ্ধতা

অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি, সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা এবং অপব্যবহার প্রতিরোধের জন্য বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানিক তদারকি ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল (সিএজি) অফিস, সংসদীয় পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের

বাস্তবায়ন মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), যা মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রস্তুত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। নিচে আমরা এসব প্রতিষ্ঠানের কিছু প্রধান সুপারিশ পর্যালোচনা করছি।

সিএজির পর্যবেক্ষণ

২০২২ সালে বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় বিভিন্ন সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষার পর ৫১টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। অনিয়মের কারণ সম্পর্কে প্রধান পর্যবেক্ষণগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল: (ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাসহ বিভিন্ন সংস্থার সরকারি বিধিবিধান লঙ্ঘন; (খ) অস্তিত্বহীন প্রকল্পে ব্যয়; (গ) তহবিল আত্মসাৎ; (ঘ) সরকারি ক্রয় আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ না করা; এবং (ঙ) সরকারি নির্দেশনা বা নিয়ন্ত্রক সংস্থার আদেশ লঙ্ঘন করা।

২০২১ সালে সিএজির কার্যালয় ১৩ হাজারের বেশি নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ চিহ্নিত করে। যার মোট অর্থমূল্য ১ লাখ ২৬ হাজার ৫৯২ কোটি টাকা। সর্বাধিক নিরীক্ষাগত অনিয়ম চিহ্নিত হয় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে। যার পরিমাণ ৩২ হাজার ৯৪৬ কোটি টাকা। এরপরের অবস্থানে রয়েছে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (২৬ হাজার ৮৯ কোটি টাকা), বিদ্যুৎ বিভাগ (১৬ হাজার ২১৪ কোটি টাকা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (৬ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (৬ হাজার ১১১ কোটি টাকা), এবং সেতু বিভাগ (৪ হাজার ৩৭২ কোটি টাকা)।

অডিট পর্যবেক্ষণের উচ্চ সংখ্যা সেই আমলাতন্ত্রের অক্ষমতাকে তুলে ধরে, যারা প্রকল্প তদারকিতে ছিল। বিভিন্ন খাতে বাজেট বরাদ্দ এবং তাদের জন্য নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ সংখ্যার মধ্যে একটি লক্ষণীয় ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। এই পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। যখন কম্পিউটার এবং অডিটর জেনারেল (সিএজি) হাজার হাজার কোটি টাকা পরিমাণ অডিট লঙ্ঘনের রিপোর্ট দেয় (এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা প্রকল্পগুলোতেও) তখন অন্যান্যদের কাছে ক্ষতিকর বার্তা যায় এবং সরকারি তহবিল ব্যবস্থাপনায় আস্থা কমতে থাকে।

সংসদের হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (পিএসি)

২০২২ সালে সংসদের হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (পিএসি) নিরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করে এবং ২০২১ সালে ২২ হাজারের বেশি পর্যবেক্ষণের মধ্যে ৩৫৭টি সমাধান করে, যার মোট মূল্য ১০ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৪ হাজার ৫২ কোটি টাকা পুনরুদ্ধার বা সমন্বয় করা হয়। লক্ষণীয় যে, পুনরুদ্ধারকৃত অর্থের প্রায় অর্ধেক সড়ক, পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা যথাযথভাবে পুনরুদ্ধার ও হিসাবভুক্ত করা হয়। পিএসির রেকর্ড অনুযায়ী, এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে ২০০ দিনের বেশি সময় লেগেছে। উচ্চ সংখ্যক নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ প্রতি বছর কার্যকরভাবে সমাধান করা পিএসির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ, শুধুমাত্র ২০০৭-২০০৮ সালের মধ্যে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। যদিও দুদকের স্বাধীন-নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার কথা, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিক প্রভাব অতিক্রম করতে পারেনি।

২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দুদকে অভিযোগের সংখ্যা ২৯% কমেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের হার মাত্র ৫% এবং মন্ত্রণালয়সমূহে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরিত মামলার হার ২০১৯ সালের ১৭% থেকে ২০২৩ সালে ৫%-এ নেমে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে কমিশনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করার ক্ষমতার ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। যা দেশে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ। অন্যদিকে, দুদক রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পে অসংখ্য টাকা আত্মসাৎ হওয়ার তথ্য প্রকাশ পেলেও, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) দায়ীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

করেনি বা সামান্য উদ্যোগ নিয়েছে। এই জবাবদিহিতার অভাব দুদকের কার্যকারিতা ও সরকারি তহবিল রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। যা উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন পর্যায় তদারকি করে এবং সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর ব্যাপক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। আইএমইডি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলোচনায় এবং বিভিন্ন মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকল্প বিলম্ব ও ব্যয় বৃদ্ধির কয়েকটি প্রধান কারণ চিহ্নিত হয়েছে।

এই সমস্যার মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, (ক) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা ও সংশ্লিষ্ট মামলা; (খ) নিম্নমানের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ভুল ব্যয় অনুমান; (গ) চুক্তিগুলো ছোট অংশে বিভক্ত করা, যা প্রায়শই অদক্ষ বাস্তবায়নের দিকে নিয়ে যায় এবং স্থানীয় চাঁদাবাজি ও রাজনৈতিক নেতাদের অর্থপ্রদান সংক্রান্ত সমস্যার সাথে যুক্ত থাকে; (ঘ) নির্মাণ সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান ব্যয়; (ঙ) রাস্তা নির্মাণের সময় অপরিাপ্ত নিষ্কাশন নকশার কারণে জলাবদ্ধতার ফলে ক্ষয়ক্ষতি; (চ) প্রকল্প পরিচালকদের ঘন ঘন বদলি।

এই সমস্যাগুলো অনেকটাই দুর্নীতির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। যদিও এই সম্পর্কটি তাদের প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, বাস্তবায়ন মনিটরিং এবং মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) ২০১২ সাল থেকেই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অপ্রতুল খরচ এবং নিম্নমানের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বিষয়ে প্রতিবেদন দিয়েছিলো। তবে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে এই ক্ষেত্রে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। উন্নতির অভাব এখনও প্রকল্পের খরচ বাড়ানোর কারণ।

এছাড়াও, রোড ডিজাইনে যথাযথ ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকার বিষয়টি অনেক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে, তবে এই সমস্যা এখনো সমাধান হয়নি। যার ফলে নতুনভাবে নির্মিত সড়কগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং প্রকল্পগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাড়ছে। মূল্যায়ন রিপোর্টগুলো ভবিষ্যতের সদৃশ প্রকল্প নকশার জন্য মূল্যবান উপকরণ হিসেবে কাজ করার কথা, তবে মন্ত্রণালয়ে এই প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের অভাব স্পষ্ট।

৭.৭ দুর্নীতির মূল কারণ বোঝা: পদ্ধতিগত সমস্যা ও ব্যর্থতা

বাংলাদেশে সরকারি ব্যয়ে দুর্নীতির মাত্রা মূল্যায়নের জন্য তত্ত্বাবধায়নে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষণ ও কার্যক্রমের ধারা পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান হয় অকার্যকর-অদক্ষ অথবা প্রয়োজনীয় দক্ষতা-প্রযুক্তিগত সক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। ফলে সরকারি অর্থের অপচয় ও দুর্নীতির প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত হয় না। তবুও, এই প্রতিষ্ঠানসমূহ পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সমস্যা, ব্যয়ের বাধা এবং সম্পদের অপব্যবহারজনিত প্রবণতার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে।

সরকারি ব্যয়ের ওপর পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক নজরদারির অভাব, অপরাধীদের জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি এবং দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ার পাশাপাশি জাতীয় ও স্থানীয় স্তরে চাঁদাবাজি—এসবকিছু মিলিয়ে বড় আকারের সরকারি অর্থ আত্মসাতের সুযোগ তৈরি করেছে।

সরকারি দপ্তরসমূহে প্রকল্পের ব্যয় নিরূপণ ও ডিজাইনে অদক্ষতা এবং রাজনীতিক, আমলা ও ঠিকাদারদের চক্রবদ্ধ যোগসাজশ পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তুলেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারি ব্যয় বাড়ার সাথে সাথে এই দুর্নীতির চক্রও আরও তীব্র হয়েছে। এমনকি বলা যেতে পারে, দুর্নীতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থই ক্রমবর্ধমানভাবে বড় প্রকল্পের জন্ম দিয়েছে— যাকে “বিপরীত

কার্যকারণ” (reverse causality) বলা যায়। এর ফলে একটি পুনরাবৃত্তিমূলক চক্র (vicious cycle) তৈরি হয়েছে। যেখানে দুর্নীতির জন্য অর্থ ব্যয় বাড়ছে, আর সেই বাড়তি ব্যয় আবার দুর্নীতিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এই অবস্থা ক্ষমতা ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর বৈষম্যপূর্ণ চরিত্রের প্রতিফলন। যেখানে প্রভাবশালী কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত লাভের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নানা উদ্যোগকে অপব্যবহার করছেন। জনসম্পদে অর্থায়িত বিদেশ সফরগুলোতে প্রকৃত প্রশিক্ষণপ্রার্থী ও উপকারভোগীরা উপেক্ষিত থেকে যান। বরং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাই অংশ নেন। এতে করে সফরগুলো হয়ে ওঠে নিরর্থক বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ মাত্র।

প্রায়শই এই সফরগুলোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন থাকে এবং এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে অস্বচ্ছতা ও যোগসাজশ বিদ্যমান, তা আরও উদ্বেগজনক। শুধু আমলা নয়, তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা ও ব্যক্তি বিশেষও অনেক সময় এই প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকেন, ফলে পুরো ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

একটি পরামর্শমূলক সভায় জানানো হয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) “Access to Information (A2I)” প্রকল্পের সহায়তায় অনলাইন ভ্যাট রিটার্ন জমার জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরি করে। যা ব্যবসায়ীদের জন্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়েছিল। কিন্তু ব্যবহারকারীরা জানান, সেই সফটওয়্যারে “SUBMIT” বোতামই ছিল না— ফলে তা ব্যবহারযোগ্য হয়নি।

এটি হয় সফটওয়্যারের নকশাগত দুর্বলতা। নয়তো আরও ভয়াবহ, ইচ্ছাকৃতভাবে সফটওয়্যারকে একেজো রাখার চেষ্টা—যাতে ব্যবসায়ীরা দুর্নীতির মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ দিতে বাধ্য হয়। এই ত্রুটি সংশোধন না করা এবং কোনো ব্যাখ্যা বা দুঃখপ্রকাশ না করাই অভিযোগটিকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।

বাংলাদেশ সরকার ২০১৩-২০১৮ মেয়াদে “Leveraging ICT for Growth, Employment, and Governance” নামে একটি জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। যার প্রারম্ভিক বাজেট ছিল ৫২১.৯৭ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকৃত ব্যয় দাঁড়ায় ৭৭৪.৭২ কোটি টাকায়— যা প্রাথমিক বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ৪৩% বেশি। এই বৃহৎ প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রসার এবং ৩০,০০০ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের জন্য প্রস্তুত করা।

যদিও আইএমইডির মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রকল্পের সাফল্য সম্পর্কে উচ্চ সম্ভ্রুতি প্রকাশ করা হয়েছে। তবে, সেই প্রতিবেদনে অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান উপেক্ষা করে প্রকল্পের প্রভাব একচেটিয়াভাবে এই উদ্যোগের কৃতিত্ব হিসেবে দেখানো হয়।

এছাড়া, প্রতিবেদনের মান ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ এটি ৩০,০০০ প্রশিক্ষিত ব্যক্তির প্রভাবকে আইসিটি খাতের সামগ্রিক অগ্রগতির সাথে বিশ্লেষণ করে পৃথক করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এই ধরনের বিশ্লেষণী দুর্বলতা প্রকল্পের প্রকৃত প্রভাব মূল্যায়নে ব্যর্থ হয় ফলে, উন্নয়নে প্রভাব নেই এমন আরও অনেক প্রকল্প চলমান থাকে। ভবিষ্যতের কোনো প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আরও দৃঢ়, বাস্তবভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত, যাতে প্রকল্পের সত্যিকারের প্রভাব ও অবদান পরিমাপ করা যায়।

৭.৮ সরকারি ব্যয়ে দুর্নীতির মাত্রা পরিমাপ

গবেষণার সংক্ষিপ্ত সময়সীমার মধ্যে পরিচালিত পরামর্শমূলক আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য এবং মতামতের ভিত্তিতে দুর্নীতির মাত্রার একটি আনুমানিক পরিসংখ্যান দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুসন্ধানের সময় সরকারি কর্মকর্তা, সামাজিক নেতা, স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তি এবং তরুণদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার অপব্যবহার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের

অনিয়মের কারণে দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এই ব্যাপক সমস্যাটি আইনশৃঙ্খলার অনুপস্থিতি এবং সমাজে ন্যায়বিচারের অভাবে আরো প্রকট হয়েছে। অনেক ব্যক্তি বিদ্যমান পরিস্থিতিকে অসহনীয় মনে করেন। তবে, বাংলাদেশে প্রশাসনিক স্বচ্ছতার অভাবে তারা পরিবর্তন আনতে পারেন না। সরকার কোনো স্তরেই জনগণের জবাবদিহিতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়। প্রকল্প নকশায় জনসাধারণের মতামত নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং প্রকল্পগুলোর ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সাধারণ জনগণের জন্য প্রায়শই গোপন রাখা হয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দীর্ঘদিন ধরে দেশে দুর্নীতির নানান বিষয় চিহ্নিত করার কাজ করেছে। ২০২৪ সালে তাদের অবকাঠামোগত প্রকল্প সম্পর্কিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ঠিকাদাররা প্রকল্প খরচের প্রায় ৫-৬% প্রকল্প দলের সদস্যদের ঘুষ দেন। ৬-৮% ঘুষ পেয়ে থাকেন মাঠ পরিদর্শন দলের সদস্যরা। এর ফলে, মোট প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ১১-১৪% শুধুমাত্র ঘুষ হিসেবেই দিতে হয়।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, সড়ক ও অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে প্রায় ১০-২০% স্থানীয় রাজনীতিবিদ, অন্যান্য ঠিকাদার ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দেওয়া হয়। যা দরপত্র প্রক্রিয়ার সময়ই যোগসাজশ বা আঁতাতের মাধ্যমে ঠিক করা হয়। দরপত্র লাইসেন্স ভাড়া, কার্যাদেশ বিক্রয়, সমঝোতা, যোগসাজশমূলক বা জোরপূর্বক কার্যক্রমের জন্য ২-৬% ব্যয় করা হয়। ফলে নির্মাণ প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে দুর্নীতির হার প্রায় ২৩-৪০%। সরকারের উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে প্রায় ৮০% প্রকল্প পণ্য ও সেবার ক্রয়ের সাথে সংযুক্ত। যার মধ্যে রয়েছে নির্মাণ, ভূমি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদি এবং বাকিগুলো সক্ষমতা বৃদ্ধি বা কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এই পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায়, সরকার ২০১২ সালে ১০টি প্রকিউরমেন্ট এজেন্সির মাধ্যমে ই-প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনা (ই-জিপি) পোর্টাল চালু করে এবং ২০০৮ সালে সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর) প্রবর্তন করে।

ই-জিপি তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পরিবহন খাতে মূলত ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। যদিও ২০১৯ সালে ই-জিপি ব্যবহারের হার সর্বোচ্চ ছিল, এরপর থেকে এটি কমতে শুরু করেছে। আরও বিশদ অনুসন্ধান দেখা যায়, ই-জিপি সিস্টেম অনুসরণ করার পরও; প্রায় ৭০% চুক্তি স্থানীয় ঠিকাদারদের দেওয়া হয়েছে। এই প্রবণতা ইঙ্গিত করে যে, স্থানীয় ঠিকাদারদের মধ্যে একটি শক্তিশালী আঁতাত বা যোগসাজশ রয়েছে। যা ক্রয় প্রক্রিয়ার দীর্ঘস্থায়ী অনিয়মগুলোকে প্রতিরোধ করা কঠিন করে তুলেছে।

এই সব অনিয়ম-অপপ্রয়োগ সরকারি তহবিলের ব্যাপক অপচয়ের কারণ হয়েছে। গত ১৫ বছরে প্রায় ৭ লাখ কোটি টাকা বিভিন্ন পণ্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে সড়ক, সেতু, বিদ্যুৎ অবকাঠামো, হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণসহ অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প। অনুমান করা হয়, এই বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ১,৬১,০০০ কোটি থেকে ২,৮০,০০০ কোটি টাকা বিভিন্ন স্তরে ঘুষ-চাঁদা হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে, ৭৭ হাজার কোটি টাকা থেকে ৯৮ হাজার কোটি টাকা সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। ৭০ হাজার কোটি টাকা থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা রাজনীতিবিদ ও তাদের সহযোগীরা চাঁদাবাজি করেছেন। আর বাকি অর্থ চক্রান্তের মাধ্যমে যোগসাজশমূলক লেনদেনে ব্যয় হয়েছে।

দেশে ও বিদেশে উভয়ক্ষেত্রেই অর্থের বেশিরভাগই জিনিস কিংবা নগদে দেওয়া হয়েছে। ঠিকাদারদের মাধ্যমে আমলা ও রাজনীতিবিদদের পরিবারের প্রবাসী সদস্যদের কাছে অর্থ পরিশোধ করা হয়। এই পন্থাটি দেশের বাইরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দুর্নীতির টাকা পাচার সহজ করেছে। অন্যদিকে, দেশে এই অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আবাসন, মৎস্য খাত, কৃষি ও পরিবহন খাতে বিনিয়োগ করা হয়। এই বিনিয়োগগুলো প্রায়শই প্রযুক্তিগতভাবে অনুসন্ধানযোগ্য নয়। এই ধরনের স্বচ্ছতার অভাব অর্থের উৎস ও প্রবাহ চিহ্নিত করা চ্যালেঞ্জিং করে তোলে। যার ফলে সম্পদের সম্ভাব্য অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়।

৭.৯ সমাধান যাত্রা: সরকারি ব্যয়ে দুর্নীতি মোকাবিলায় কৌশলসমূহ

যদিও বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রস্তাব করা চ্যালেঞ্জিং, তবুও কিছু সাধারণ বিষয় উঠে এসেছে। এই আলোচনা এবং পরামর্শের মাধ্যমে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো প্রস্তাব করা হলো।

সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গি

সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্বের অভাব রয়েছে। যা প্রকল্প ব্যয় কম করে অনুমান করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের হার (আইআরআর) অতিরিক্ত দেখানোর প্রবণতা তৈরি করে। এই পন্থা অবলম্বনের কারণ হলো, সহজে একনেকের অনুমোদন নেওয়া। যদিও সরকার দক্ষ প্রকল্প নকশার জন্য তহবিল বরাদ্দ করে, এটি প্রায়শই দ্রুততার সাথে এবং যথাযথ পেশাদারিত্ব ছাড়াই সম্পন্ন হয়। বিশেষ করে সরকারি অর্থায়নের প্রকল্পগুলো দাতাসংস্থার অর্থায়নের প্রকল্পগুলোর তুলনায় কম মানসম্পন্ন হয়। ২০২১ সাল থেকে একনেক সব প্রকল্পের জন্য অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। তবে, ব্যয় অনুমানে চলমান ভুলের কারণে, এই শর্তটি কার্যকর নাও হতে পারে। সমস্ত প্রকল্প ব্যয় ও সুবিধা স্থিতিশীল মূল্যে পরিমাপ করা উচিত এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের জন্য বাস্তব ছাড়ের হার ব্যবহার করা উচিত।

সততা নিশ্চিতকরণ: প্রকল্প নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস

প্রকল্প নির্বাচন প্রায়শই রাজনৈতিক কারণে হয়ে থাকে। এটি স্বীকার করা হলেও; এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে, নির্বাচিত প্রকল্পগুলো যেন সরকারি তহবিলের অপব্যবহার বা বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য ঋণের ফাঁদ সৃষ্টি না করে। লক্ষণীয় যে, অনেক প্রকল্প শুধুমাত্র সরকারের রাজনৈতিক সাফল্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনামন্ত্রী এবং পরিকল্পনা বিভাগকে অবশ্যই পেশাদারিত্ব বজায় রেখে কাজ করতে হবে। তাদের দক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। এছাড়াও, প্রতিটি লাইন মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ইউনিটগুলোকে দক্ষ পেশাদারদের সমন্বয়ে শক্তিশালী দলের সহায়তা দেওয়া উচিত। যাতে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সরকারি সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়। এজন্য, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

আঁতাত বা জোট ভাঙা: সিভিল আমলা, ঠিকাদার ও রাজনীতিবিদদের জোট ভাঙা

যদিও এটি ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক শক্তি চাঁদাবাজি করে। তবুও গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে সিভিল আমলা, ঠিকাদার এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ স্পষ্ট হয়। যা সরকারি তহবিল অপব্যবহার এবং ব্যক্তিস্বার্থে হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। এই জোট দুর্নীতির একটি মৌলিক চালিকা শক্তি। জাতীয় পর্যায়ে এই জোট ভাঙা প্রয়োজন।

শক্তিশালী যোগসাজশ ও অনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বেসামরিক ও সামরিক আমলারা বিপুল সম্পদ অর্জন করছে, যা রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনপরামর্শ সভার সময় ব্যাপক ঐকমত্য গড়ে ওঠে যে, গত ১৫ বছরে সরকারি কর্মকর্তারা ক্রমবর্ধমানভাবে রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়েছে, যা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও একইভাবে ঘটছে। এর ফলে একটি ধারণা তৈরি হচ্ছে যে, আমলা-ব্যবসায়ীরা সংসদে আসন দখল করার জন্য নিজেদের অবস্থান তৈরি করছে, যা দুর্নীতির কাঠামোকে আরও সুসংহত করছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন: দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উচিত এই যোগসাজশ দূরীকরণে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা। যেন এটি কেবল প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতাদের টার্গেট করতে ব্যবহৃত না হয়। সিভিল আমলা, ঠিকাদার এবং রাজনীতিবিদ-এই তিনটি স্তরে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে দুদক আরও কার্যকরভাবে দুর্নীতি মোকাবিলা করতে পারে এবং প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

কমিউনিটির ক্ষমতায়ন: প্রকল্প নকশায় জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ

বেসামরিক প্রশাসনের স্বচ্ছতার অভাব এবং দুর্নীতিপূর্ণ অভিপ্রায় প্রায়শই জনগণের কাছ থেকে তথ্য গোপনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয় জনগোষ্ঠী হলো সেই প্রকল্পগুলোর চূড়ান্ত উপকারভোগী, যা তাদের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। জনপরামর্শ সভায় প্রকাশ পায় যে, অনেক ব্যয়বহুল প্রকল্প যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাক্ষিত সুবিধা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, চট্টগ্রামে কর্ণফুলী টানেল প্রযুক্তিগতভাবে একটি উন্নত প্রকল্প। কিন্তু, এটি যেখানে নির্মাণ করা হয়েছে, তা স্থানীয়দের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কারণ, তারা প্রকল্পটির সম্পূর্ণ পরিকল্পনা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পায়নি। তাদের কাছে এটি কর্ণফুলী নদীর দুই প্রান্তের জন্য কোনো কার্যকর উপযোগিতা রাখে না। যা জনগণের মধ্যে সরকারি তহবিলের অপচয় হিসেবে দেখার প্রবণতা তৈরি করেছে। অনুরূপভাবে, সিলেট ও রাজশাহীতে হাইটেক পার্ক নির্মাণ করা হলেও এখন পর্যন্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো স্পষ্ট সুবিধা দিতে পারেনি।

জনগণের এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকল্প পরিকল্পনাকারীদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। কারণ, জনগণ এমন উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে না। যা তাদের দীর্ঘমেয়াদে উপকার করতে পারে। এই সমস্যা সমাধানে অনেক দেশে প্রকল্প সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সময় বাধ্যতামূলক জনপরামর্শ প্রক্রিয়া চালু আছে, যা বাংলাদেশের সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য গৃহীত হওয়া উচিত। এই ধরনের পরামর্শ সভা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। এবং প্রকল্পগুলো যে সামাজিক সুবিধা দিতে পারে, সে সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে।

আইআরআর, বিসিআর ও এনপিডি বিষয়ে সংবেদনশীল বিশ্লেষণ

অনেক প্রকল্প দুর্বল ব্যয় অনুমানের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত হয়, বাস্তবায়নের সময় সেগুলোর মোট ব্যয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। এছাড়াও, প্রকল্পগুলোর স্থানীয় চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য আনতে প্রায়ই সংশোধনের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি মহাসড়ক যদি স্থানীয় বাজারের মধ্য দিয়ে যায়, তবে এটি যানজট তৈরি করতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত প্রকল্প নকশায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য করতে পারে, যেমন একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ। এই ধরনের পরিবর্তন প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে, প্রকল্পের ব্যয় অনুমানসহ অন্যান্য সমস্ত মাপকাঠির ওপর সংবেদনশীল বিশ্লেষণ চালানোর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা জরুরি। এই বিশ্লেষণ প্রকল্প ব্যয়ের সুস্পষ্ট ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করবে, যা প্রকল্প দল এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে স্বচ্ছতা ও দিকনির্দেশনা দেবে। সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটি আরও তথ্যভিত্তিক হবে। যা প্রকল্প সংশোধনের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করবে এবং আর্থিক সমন্বয়গুলো যে বাস্তবিক মূল্যায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করবে।

স্বচ্ছতার আহ্বান: বিদেশে গচ্ছিত সম্পদ যাচাই বাছাই

বহুল প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, অনেক ঘুষ ও চাঁদাবাজির লেনদেন বিদেশে সম্পন্ন হয়। যার ফলে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশ থেকে পাচার হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থার নজরদারি এড়ানো সম্ভব হয়। সরকারি কর্মকর্তা, যারা প্রায়শই এই দুর্নীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে, তারা সম্পদ বিবরণী প্রকাশে অনীহা দেখিয়েছে। তবে, স্বচ্ছতার জন্য ক্রমবর্ধমান জনসচেতনতা ও চাপ ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের দুর্নীতিগ্রস্ত তহবিল লুকিয়ে রাখার নিরাপদ উপায় খোঁজার দিকে পরিচালিত করেছে।

কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর এবং যুক্তরাজ্যের মতো দেশগুলো প্রায়ই এই ধরনের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার কারণে সমালোচিত হয়। সরকারি সংস্থাগুলোর পর্যবেক্ষণ এড়াতে, অনেক দুর্নীতির লেনদেন বিদেশে সম্পন্ন হয়। তাই, সরকারি কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক ও মন্ত্রীদের নামে বা তাদের পরিবারের যে কারোর নামেই বিদেশে রক্ষিত থাকা সম্পদের জনতদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

অধ্যায়-৮: উচ্চ ঝুঁকিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা*

- আমলা ও রাজনীতিবিদরা কৃষি ও মৎস্য খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদকে বৈধ করেছে
- ব্যাংক কর্মকর্তারা কৃষি ঋণের ৬.৮২% অর্থ ঘুষ হিসেবে নিয়ে থাকেন
- মিলাররা চালের বাজারে শক্তিশালী সিডিকেট গড়েছে
- টিসিবির ডিলাররা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী
- রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন কৃষক সম্প্রদায় সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত
- শস্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনতে বহুমুখী বিনিয়োগ প্রয়োজন
- কৃষির উপখাতগুলোয় উন্নয়ন বরাদ্দ বৈষম্যমূলক
- শ্রমশক্তির ৪০% কৃষিতে নিয়োজিত; খাদ্য নিরাপত্তায় অগ্রগতি, পুষ্টি নিরাপত্তা বড় বাধা
- চালের দামের মাত্র ৭-২৯% পায় কৃষক
- দারিদ্রতা থেকে বের হতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি সহায়ক নয়
- কৃষকের পণ্য উৎপাদন সহায়তা কার্যক্রমে ভিন্নতা আনতে হবে
- কৃষিতে নারী শ্রমিক বাড়লেও তাঁরা তুলনামূলকভাবে মজুরি কম পান
- কৃষি শ্রমিকের ঘাটতি উসকে দিচ্ছে শস্যের মুনাফাহীনতা
- বর্তমানে সবচেয়ে গরিব ও কম শিক্ষিত মানুষের জীবিকার উৎস কৃষি
- এখন অনেকটাই ভঙ্গুর দেশের আবাদি জমির স্বাস্থ্য

৮.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও গ্রামীণ উন্নয়নে কৃষি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ১৪% এবং শ্রমশক্তির প্রায় ৪০% কর্মসংস্থানের যোগান দেয় কৃষি খাত। পুরুষ ও নারীর কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ১৭ কোটি ২০ লাখ মানুষের প্রধান খাদ্য সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করছে কৃষি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটের বর্তমান চ্যালেঞ্জিং প্রেক্ষাপটে টেকসই ও স্থিতিশীল অভ্যন্তরীণ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কৌশলের জন্য কৃষি খাত অপরিহার্য। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা কমানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত্যতার ক্ষেত্রে কৃষি নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দক্ষিণ এশিয়ার ধান উৎপাদনে শীর্ষ দেশগুলোর কৃষি উৎপাদন মূলত সার ও সেচের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের কৃষি খাত নানা ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন। এর মধ্যে রয়েছে— কৃষি উপকরণের অপরিাপ্ততা, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, সম্পদের অপরিাপ্ততা এবং ফসলের বৈচিত্র্যের অভাব। জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের কারণে কৃষি জমি সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। তাই উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের উন্নয়ন করা প্রয়োজন। ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মৎস্য খাতের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ৬%, যা ২০২৩ সালে ৩%-এ নেমে এসেছে। ফসল উপখাতে ২০১২-১৩ এবং ২০১৫-১৬ সালে কম প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। যা ২০১৩-১৪ সালে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ২০২২-২৩ সালে ৩% এ স্থিতিশীল হয়েছে। প্রাণিসম্পদ উপখাত ২০১০-১১ থেকে ৩% প্রবৃদ্ধি বজায় রেখেছে।

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ২০২৩ সালের গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স অনুযায়ী বাংলাদেশ এখনো গুরুতর ক্ষুধার স্তরে রয়েছে। দেশে অপুষ্টির হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে তবে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি (যা লুকানো ক্ষুধা হিসাবে পরিচিত) বাংলাদেশে এখনও একটি অন্যতম সমস্যা।

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন অধ্যাপক এ কে এনামুল হক, ডেপুটি ভাইস চ্যান্সেলর, ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ক্যাম্পাস এবং পরিচালক, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ ঢাকা।

৮.২ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার পথচলা

স্বাধীনতার পর থেকে দেশে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে খাদ্যের উৎপাদন। পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে দেশে চালের উৎপাদন বেড়েছে চারগুণ। তবে জমির নানামুখী ব্যবহার ও জনসংখ্যা আড়াইগুণ বেড়ে যাওয়ায় কৃষিজমি কমেছে। তবে চাল ব্যতীত অন্যান্য শস্যের ক্ষেত্রে এখনো উৎপাদন ঘাটতি রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গম, ভুট্টা, ডাল, তেলবীজ এবং পেঁয়াজ। ২০২২ সালে কৃষি শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বেড়েছে। এই সময়ে একজন শ্রমিকের দৈনিক গড় মজুরি দিয়ে প্রায় ১১.৪ কেজি চাল কেনা সম্ভব হয়েছে। এটি ২০১৬ সালে ছিল মাত্র ৪.৮ কেজি। গ্রামীণ বাংলাদেশের অ-কৃষি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক মজুরি বৈষম্য রয়েছে। ২০১০ সালে পুরুষের তুলনায় নারীরা ২২.৯% কম আয় করেছে। ২০১৬ সালে তা ৬২.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

কৃষি খাতে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ খাদ্য নিরাপত্তায় বড় বাধা হিসেবে কাজ করেছে। বৈশ্বিক সংঘাত, খাদ্যের উচ্চমূল্য এবং রাজনৈতিক মেরুকরণের ফলে খাদ্য নিরাপত্তার অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। দরিদ্র পরিবারের পুষ্টির অবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন এবং আবাদযোগ্য জমি হ্রাস, উৎপাদনশীলতা হ্রাস, সামুদ্রিক চাষের চ্যালেঞ্জ এবং লিঙ্গভিত্তিক মজুরি বৈষম্য খাদ্য নিরাপত্তা এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর জীবিকার ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলছে।

৮.৩ কৃষি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন (এডিপি) ব্যয়

দেশের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং গ্রামীণ এলাকায় কৃষকের আয় বাড়ানো। গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের প্রবণতা বাড়ছে। কৃষি খাতের জন্য এটি বড় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে। যখন গ্রামীণ জনসংখ্যা কমে যায়, তখন সাধারণত খামারে শ্রমিকের সংকট দেখা দেয়, যা কৃষি উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে। শহরে লোক বাড়লে সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অপ্রতুল বাসস্থান এবং জনসেবা ব্যবস্থার উপরও বাড়তি চাপ আসে।

কৃষিতে সামগ্রিক উন্নয়ন ও সরকারের নানামুখী লক্ষ্য অর্জনে কৃষি খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এর প্রতিফলন ঘটে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ এবং ব্যবহারে। এই বিনিয়োগগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলো প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করতে, কৃষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিতে এবং নতুন কৃষি প্রযুক্তির গ্রহণে সহায়তা করে। উন্নত অবকাঠামো, যেমন: সেচ ব্যবস্থা এবং পরিবহন নেটওয়ার্ক, কৃষকদের আরো কার্যকরভাবে ফসল চাষ করতে এবং বাজারে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। এ ধরনের কৌশলগত বিনিয়োগ শুধুমাত্র খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্যই নয়, বরং গ্রামীণ পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট দেখা যায়, ২০১৫-১৬ সাল থেকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। এটি প্রমাণ করে, বন্যা এবং পানি সংকটের মতো প্রচলিত সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে, কৃষি-মৎস্য-পশুপালন মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ একইভাবে বাড়তে দেখা যায়নি। এই বৈষম্য কৃষি খাতের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। কৃষি-মৎস্য-পশুপালন খাতে সীমিত বরাদ্দের ফলে গুরুতর প্রতিকূল প্রভাব পড়তে পারে। কৃষি খাতে বিনিয়োগ কেবল খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর বিষয় নয়। গ্রামীণ জীবনের সামাজিক অবকাঠামো রক্ষার এবং সমস্ত কৃষকের সফল হওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করার বিষয়।

৮.৪ কৃষিতে মূল্য সংযোজন ও দাম

কৃষিতে কম আয়ের অন্যতম কারণ হলো পাইকারি এবং খুচরা বাজারে বড় মূল্য পার্থক্য। বাংলাদেশে কৃষকরা চাল উৎপাদনের মূল্য থেকে মাত্র ৭-২৯% পায়। ক্ষুদ্র ধানচাষিরা বিভিন্ন কারণে দাম থেকে বঞ্চিত হয়। যার মধ্যে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে সীমিত ঋণ প্রাপ্তি, অনানুষ্ঠানিক বাজার থেকে উচ্চ সুদের ঋণে বাধ্যতামূলক নির্ভরতা। কৃষিপণ্যের দামে অস্থিরতা এবং অন্যান্য উৎপাদন ঝুঁকি। ফলে, প্রান্তিক কৃষক স্বল্পমূল্যে চাল এবং

অন্যান্য কৃষিপণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়। দেশের বাজারে প্রায়ই 'সিডিকেট' থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়। তারা বাজার ক্ষমতা ব্যবহার করে কৃষকদেরকে ফসলের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত করে। মিলাররা চালের বাজার ও মূল্য সংযোজনে সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী। মিলাররা মোট চাল বাণিজ্যের বড় অংশ লাভ করে।

যদিও মিলাররা সুপারমার্কেট মূল্য শৃঙ্খলার জন্য নির্দিষ্ট গুণমানের বৈশিষ্ট্যসহ বিভিন্ন ধরনের চাল তৈরি করে। এই মূল্য পার্থক্য মূলত বৃহত্তর শ্রেণির (যেমন: উন্নত, মাঝারি এবং সাধারণ মানের) উপর ভিত্তি করে থাকে এবং এটি খামারের স্তরে কৃষকদের জন্য খুব কম উপকার নিয়ে আসে। ফলস্বরূপ, এই মূল্য পার্থক্যের প্রধান সুবিধাভোগী হল মিলাররা এবং অন্যান্য নিম্নস্তরের অংশগ্রহণকারীরা, যেমন পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা এবং সুপারমার্কেট। বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, ধানচাষিরা উৎপাদনের সর্বোচ্চ ঝুঁকি বহন করেও মূল্য শৃঙ্খল থেকে সবচেয়ে কম সুবিধা পায়।

খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা: অত্যাৱশ্যকীয় পণ্যের মূল্য ওঠানামা মোকাবিলায় এবং প্রয়োজনীয় পণ্য সুলভমূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করে সরকার খাদ্য বিতরণ করে। দুইভাবে এই খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- অর্থায়িত চ্যানেল। যেখানে ভর্তুকি মূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রি করা হয়। এই কার্যক্রমে সামরিক বাহিনী, পুলিশ এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের জন্য অত্যাৱশ্যক অগ্রাধিকার কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া সরকারি কর্মচারী, কারাগার এবং হাসপাতালের জন্য অন্যান্য অগ্রাধিকার কর্মসূচি, শিল্প এলাকা ও চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য কর্মসূচি রয়েছে। এছাড়াও খোলা বাজারে বিক্রি (ওএমএস) এবং খাদ্য বাস্কব কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের জন্য খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা হয়। অন্যদিকে, অ-অর্থায়িত চ্যানেলগুলো খাদ্যনির্ভর নিরাপত্তা নেট প্রোগ্রামের মাধ্যমে দরিদ্রদের সেবা দেয়। যেমন: ফুড ফর ওয়ার্ক, জিআর, ভিজিডি এবং ভিজিএফ কর্মসূচি। মূলত খাদ্য মন্ত্রণালয় অর্থায়িত চ্যানেল পরিচালনা করে। অ-অর্থায়িত চ্যানেলগুলো একাধিক মন্ত্রণালয় পরিচালনা করে থাকে।

গবেষণায় দেখা গেছে, সরকারের খাদ্যবাস্কব কর্মসূচিগুলো যথেষ্ট পরিকল্পিত নয়। দরিদ্র জনগণের দারিদ্র্যের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট নয়। যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের খুচরা মূল্য বাড়ে, তখন শুল্লের বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং প্রায়ই বাজারে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করেন। মাঠ পর্যায়ের তদন্তে দেখা গেছে, ওএমএস পরিচালনার ক্ষেত্রেও সিডিকেট তৈরি হয়েছে। প্রতিযোগী ওএমএস অপারেটরদের সিডিকেট এলাকায় প্রবেশ করতে দেয় না। এসব সিডিকেট কিংবা বিক্রেতাদের অনেকেই শাসক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারদের পারিবারিক সদস্য।

ডিমের বাজার: সম্প্রতি ডিমের দামে উল্লেখযোগ্য ওঠানামা লক্ষ্য করা গেছে। যা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বিরতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে। গত চার বছরের ডিমের দামের তুলনা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০২১ থেকে ২০২২ সালে ডিমের দাম ২৬% বেড়েছে। ২০২২ থেকে ২০২৩ সালে ২০ শতাংশ এবং ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবরে দাম বেড়েছে ১৬%।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালের আগস্ট, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে ডিমের দামে পরিবর্তন ছিল যথাক্রমে -২%, -১%, এবং ২%। যদিও বাজারে ২০১০ সাল থেকে ডিমের দাম ঐতিহাসিকভাবে বেড়েছে। বছরের পর বছর ডিমের দাম বৃদ্ধির এই প্রবণতা সরবরাহ সংকটের কারণে হয়েছে। তবে, তা উৎপাদনের ক্ষেত্রে না কি সরবরাহে সেটি গবেষণা করা প্রয়োজন। ডিমের সরবরাহ বাড়তে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে আরো দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। বাজার স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল। বাজারে এ ধরনের ব্যর্থতা দুটি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাবকে তুলে ধরে।

৮.৫ কৃষিতে সহনশীলতা ও পণ্য উৎপাদনে মুনাফা

কৃষি খাতে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আয় ও ব্যয়ের অনুপাত (বিসিআর) বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আয়ের তুলনায় ব্যয় কেমন সেটি বিশ্লেষণ করলে কোন পণ্য উৎপাদন কৃষকের জন্য লাভজনক তা বোঝা যাবে। বিসিআর এর মান ১ থেকে ৩ এর মধ্যে ওঠানামা করে। ১ হলো অপেক্ষাকৃত কম লাভজনক এবং ৩ হলো অধিক লাভজনক। গবেষণায় দেখা গেছে, আউশ ধানে বিসিআর হলো ১ এবং মুগ ডালে ৩ এর বেশি। প্রাণিসম্পদ খাতে পণ্যগুলোর মধ্যে ছাগল পালনে ১.৮, ব্রয়লার মুরগিতে ১.৭। বাদাম এবং মসলার মধ্যে, মটরশুঁটি সবচেয়ে কম লাভজনক, আর আদা সবচেয়ে লাভজনক পণ্য। মৎস্যচাষে কই মাছ সবচেয়ে কম লাভজনক, যেখানে রুই মাছ সবচেয়ে লাভজনক। অন্যদিকে ফল উৎপাদন বিশেষভাবে লাভজনক।

মাঠ ফসলের মধ্যে (যা কৃষি মূল্য সংযোজনের প্রায় ৪৪%) সবচেয়ে কম লাভজনক পণ্য হলো ধান এবং সবচেয়ে লাভজনক পণ্য হলো মাষকলাই। মুগ, রসুন এবং আদা সবচেয়ে লাভজনক ফসল। এসব ফসলের বিসিআর ২ এর বেশি। অন্যদিকে, চীনাবাদাম, তিল, পেঁয়াজ, সরিষা, সয়াবিন, হলুদ এবং মরিচ এর বিসিআর ২ এর কম। ফলের মধ্যে পেয়ারা, আনারস, আম এবং কমলার বিসিআর ২ এর বেশি। যে কোনো বাণিজ্যিক কৃষি এগিয়ে নিতে হলে অপেক্ষাকৃত কম লাভজনক ফসল পিছিয়ে থাকবে। এর অর্থ হলো পেঁয়াজ, মরিচ, সরিষা এবং অন্যান্য ফসলের উৎপাদনে ঘাটতি প্রত্যাশিত। কৃষকরা পেঁয়াজ, মরিচ, সরিষা এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদন থেকে সরে আসতে পারে। এই পরিবর্তন খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রধান ফসলের বাজারে মূল্য স্থিতিশীলতার জন্য ঝুঁকি তৈরি করে।

এর অর্থ হলো, সব কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে সমান সহায়তা দিয়ে বাজার স্থিতিশীল করা সম্ভব নয়। বিশেষ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ বা আলাদা সহায়তা প্রয়োজন। যেমন: পেঁয়াজ, চালের মতো ফসলের ক্ষেত্রে কৃষকদের জন্য পৃথকীকৃত সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। যাতে তারা এই পণ্যগুলিকে আরও লাভজনক বলে বিবেচনা করতে পারে। পেঁয়াজ এবং মরিচের চাষকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করতে পারে।

একইভাবে, প্রাণিসম্পদ খাতে মুরগির মাংস এবং ডিম সবচেয়ে কম লাভজনক পণ্য। খামারিদের যদি সহায়তা বাড়ানো না হয় তাহলে এসব পণ্যের সরবরাহ কমে যাওয়া বা সরবরাহে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। এই পণ্যগুলোর উৎপাদন বাড়াতে সহায়তা বাড়ানো বা প্রণোদনার মাধ্যমে কৃষক ও খামারিদের উদ্দীপনা বাড়াতে হবে।

৮.৬ মুনাফা হ্রাস এবং শ্রমের গতিশীলতা পরিবর্তন

বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশের প্রধান শস্য বা পণ্য বিশেষ করে ধান, পেঁয়াজ এবং মুরগির মাংস ও ডিমের উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম লাভজনক। ফলে এসব পণ্য উৎপাদনকারী কৃষক ও খামারিরা অন্যদের তুলনায় কম আয় করে। এটি কৃষি শ্রমিকদের জীবন-জীবিকায় প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করে। কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের পতনের কারণে এটি আরো জটিল হচ্ছে। কৃষিতে কর্মসংস্থান এবং কৃষির উপর নির্ভরশীলতা তেমন কমছে না। কৃষি উপকরণ বিশেষ করে পানি, বীজ, সার এবং কীটনাশকের মতো অপরিহার্য উপকরণের ক্রমবর্ধমান খরচের সম্মুখীন হচ্ছেন। এর ফলে কৃষক ও খামারিদের লাভ কমে যাচ্ছে। কৃষি খাত একটি যান্ত্রিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে কৃষি যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরতা বাড়ছে।

অন্যদিকে, কৃষিকাজে কম আয়ের কারণে এই খাতে পুরুষ শ্রমিক কমছে, বিপরীতে নারী শ্রমিক বাড়ছে। যদিও নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কম মজুরি পান। বাংলাদেশে কৃষি শ্রমশক্তিতে এই পরিবর্তনটি অপরিহার্য প্রবণতা হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক চাপ শ্রমের গতিশীলতায় পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিবর্তনটি শেষ পর্যন্ত কৃষি খাতকে নতুন আকার দিতে পারে। যেখানে প্রচলিত মজুরি বৈষম্য সত্ত্বেও নারীরা ক্রমবর্ধমানভাবে কৃষিকাজে যুক্ত হবে। কৃষিতে কম মুনাফার কারণে ভরা মৌসুমে কৃষি শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

৮.৭ কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ: প্রতিশ্রুতি, ভর্তুকি এবং দুর্নীতি

কৃষি খাতে যান্ত্রিকীকরণ উৎসাহিত করতে সরকার বিভিন্ন ভর্তুকি কর্মসূচি চালু করেছে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য ৫০ শতাংশ এবং হাওর এলাকার জন্য ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। এই ভর্তুকি কর্মসূচির আওতায় কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন: ট্র্যাক্টর, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার এবং কন্সট্রাক্ট হারভেস্টার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই কর্মসূচির এক প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ৩ হাজার ২০ কোটি টাকা। ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ১২টি শ্রেণিতে ৫১ হাজার ৩০০ ইউনিট কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ২০২১ অর্থবছরে ২,৩০০ ইউনিট কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করেছে, যার মধ্যে ১,৭৬২টি কন্সট্রাক্ট হারভেস্টার ছিল। তবে, এসব প্রণোদনা অনেক সময় দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের হাতে চলে গেছে। যা কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণে বড় দুর্নীতির কেলঙ্কারি সৃষ্টি করেছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের একটি প্রতিবেদনের পরে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে দুর্নীতি দমন কমিশন (এসিসি) খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত শুরু করে। তদন্তে এই প্রকল্প তহবিল আত্মসাতের জন্য প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুর্ভাগ্যবশত, রাজনৈতিক নেতা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত আমলারা কৃষিকে তাদের অবৈধ সম্পদ বৈধ করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করছেন। একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যিনি ব্যাপক সম্পদ অর্জন করেছিলেন। পরে, তার একটি অংশ মৎস্য খাতে বিনিয়োগ করে 'বৈধ' করেছেন। যদিও ওই কর্মকর্তা ২০২০-২১ সালে 'ইনটিগ্রিটি অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছিলেন।

৮.৮ দুর্নীতি, চাঁদাবাজি এবং উৎপাদনশীলতার উপর প্রভাব

বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে জীর্ণ এবং কম লাভজনক খাত হওয়া সত্ত্বেও কৃষি দেশের ১৭ কোটি ৩০ লাখ মানুষের খাদ্য সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই খাতটি সবচেয়ে গরিব এবং কম শিক্ষিত মানুষের জীবিকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যারা মূলত বেঁচে থাকার জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তারপরও কৃষি খাত ব্যাপক ঘুষ এবং চাঁদাবাজির শিকার। দুর্নীতি এই খাতের সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষদের সমস্যাগুলো জটিল করে তুলছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, সরকারি ডিলারদের মাধ্যমে সার বিতরণে দুর্নীতির কারণে আমন মৌসুমে প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদনশীলতা ৫৯% কমে যায়। বোরো মৌসুমে এটি ১৮% কমে। সার সংক্রান্ত দুর্নীতির কারণে প্রান্তিক কৃষকরা বড় কৃষকদের তুলনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০১৬-১৭ সালে সরকার কৃষকদের জন্য প্রায় ১৭ হাজার ৬০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেছিল। গবেষণায় দেখা গেছে, মোট বিতরণকৃত অর্থের প্রায় ৬.৮২% শতাংশ বা প্রায় ১২০০ কোটি টাকা ব্যাংক কর্মকর্তাদের ঘুষ দিতে হয়েছিল। সরকারের ধান-চাল সংগ্রহ নিয়ে কৃষকের ওপর ইতিবাচক তথ্য উঠে এসেছে। তবে, ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রমে ঘুষ এবং চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে।

৮.৯ মাটির গুণগত মানের উপর প্রভাব

গত কয়েক দশকে কৃষি খাতে উৎপাদন বেড়েছে। অনেক সাফল্য সত্ত্বেও, ফসল উৎপাদন বৈচিত্র্যকরণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো; মাঠে একক ফসলের চাষ, বিশেষ করে ধান চাষের আধিক্য। যা মাটির স্বাস্থ্য ও পুষ্টিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। শস্যের ক্ষেত থেকে প্রাণিসম্পদের খাদ্যের জন্য ফসলের অবশিষ্টাংশ অপসারণ করার কারণে মাটির জৈব পদার্থ কমে যায়। সারের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির জৈব পদার্থ ঘাটতি পূরণ করতে হবে। যদিও এতে কৃষকের উৎপাদন খরচ বাড়বে। দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মাটিতে তীব্র জৈব পদার্থের ঘাটতি রয়েছে।

জিঙ্ক উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য একটি অপরিহার্য ক্ষুদ্র পুষ্টি উপাদান। জিঙ্কের অভাবে উদ্ভিদের পাতা ছোট হয়ে যেতে পারে, পরিপক্কতায় দেরি হতে পারে এবং পাতা পচনশীল হয়ে যেতে পারে। যার ফলে গাছগুলো রোগ ও কীটপতঙ্গের প্রতি বেশি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। যে কারণে, উৎপাদন ও শস্যের পুষ্টিমানে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি হতে পারে। জিঙ্কের অভাব গাছের বৃদ্ধি রুদ্ধ করতে, পরিপক্কতা দেরি করতে এবং ধান চাষে উৎপাদন কমাতে পারে। দেশের আবাদি জমিতে জিঙ্কের পরিমাণ কমছে। ২০১০ সালের তুলনায় ২০২০ সালে এটি আরো ভয়াবহ হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি জমিতে জিঙ্কের অভাব অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছে।

৮.১০ চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ

কৃষি খাত বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এর মধ্যে ক) প্রান্তিক কৃষক এবং অনিশ্চিত জমির মালিকানা ব্যবস্থা, খ) কম শ্রম উৎপাদনশীলতা, যা কম মজুরি সৃষ্টি করে, গ) ধান উৎপাদনে অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং সীমিত বৈচিত্র্য, যার ফলে মাটির গুণগত মানের ক্ষতি, ঘ) কৃষি উৎপাদনে স্থবির প্রবৃত্তি, ঙ) বেশিরভাগ ভূমিহীন কৃষকের জন্য আর্থিক সুবিধার সীমিত প্রবেশাধিকার, চ) অপরিপাক বা নির্বাচনী কৃষি সম্প্রসারণ সেবা, ছ) কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং জ) সারের ঘাটতি বা অপ্রাপ্যতা। তবে বেশিরভাগ নিরক্ষর কৃষক যারা সরকারের ক্ষমতার কাঠামোর সাথে সংযুক্ত নয়, প্রায়ই তারা নির্ধারিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই, টেকসই কৃষি প্রবৃত্তি এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য নিচের কৌশলপত্র সুপারিশ করা হলো।

পণ্যের দামের অস্থিরতা কমানো: প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যে ওঠানামা সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দামের অস্থিরতা নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের পরিবার বিশেষ করে যারা নির্ধারিত বেতনের ওপর নির্ভরশীল, তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এই সমস্যা সমাধানে, দামের অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে কার্যকর কৌশল হলো, মধ্যমত্বভোগীদের প্রবেশগত প্রতিবন্ধকতা দূর করা। স্থানীয়ভাবে যাদের 'সিন্ডিকেট' বলা হয়— তারা বাজারে শক্তিশালী অবস্থানে থাকে।

- সরকারকে সমস্ত শুল্ক, যেমন: ভ্যাট বা আমদানি শুল্ক অপসারণের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। সম্ভাব্য সংকটের অন্তত ৪৫ দিন আগেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। পূর্বনির্ধারিত সীমা অনুযায়ী ট্যারিফ কমিশনকে গবেষণা পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা দেয়া উচিত। একটি স্বয়ংক্রিয় করছাড়ের ব্যবস্থা তৈরি করা প্রয়োজন। বাজারের দাম নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছালে আমদানি বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হবে। এতে ন্যায্য মূল্যস্তর বজায় থাকবে। যা নিম্নআয়ের ভোক্তাদের রক্ষা করবে এবং কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্বীপনা তৈরি করবে।

ধানের মূল্য সংযোজনে কৃষকের অংশগ্রহণ শক্তিশালী করা

- ধানের মূল্য সংযোজনে কৃষকদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে অন্তর্ভুক্ত করা। কৃষকদের বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ানো, মধ্যস্থতাকারীদের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে উৎপাদনকে ভোক্তাদের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা। এতে, কৃষকরা আরো স্থিতিশীল আয় এবং ভালো দাম পেতে পারবে।
- মূল্য সংযোজনে সরাসরি অংশ নেওয়া কৃষকদেরকে সেবা চাষ প্রথা এবং গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে তারা পণ্যের গুণমান উন্নত করতে পারে এবং প্রক্রিয়াকরণ ও ব্র্যান্ডিংয়ের মতো মূল্য সংযোজন কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে, যা উচ্চ মুনাফা লাভের মার্জিন তৈরি করবে।
- সহযোগিতামূলক মডেলগুলো উৎসাহিত করা, যেমন: সমবায়। এই সমবায় প্রথা কৃষকদের দর কষাকষির শক্তি বাড়ায়, সম্পদ ভাগাভাগি সহজ করে এবং অর্থায়নে প্রবেশাধিকার তৈরি করে। ফলে, টেকসই প্রথা প্রচারিত হয় এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ন্যায়সঙ্গত প্রবৃদ্ধিতে মূল্য সংযোজনে সহযোগিতা বৃদ্ধি

- মূল্য সংযোজনে কৃষকের আরো শক্তিশালী অংশগ্রহণ বাড়ানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কৌশল হতে পারে, কৃষক গোষ্ঠী বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) গঠন করতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মীদের কাজে লাগানো। এর মাধ্যমে কৃষকদের দর কষাকষির সক্ষমতা বাড়িয়ে, উৎপাদন খরচ কমাতে সহায়তা করবে।
- কৃষক এবং কৃষি ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক বাড়ানো; বিশেষ করে খুচরা বিক্রেতা ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সাথে হতে পারে। এর মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থা একীভূত হবে, পণ্যের গুণমান উন্নত হবে এবং বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বাড়াবে।
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন উন্নয়ন করতে সরকারকে আরো কঠোর হতে হবে। কমিশনকে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যেন একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিরোধ করা যায়। ন্যায্য প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সকল অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ন্যায্য মূল্য বণ্টন নিশ্চিত করা যায়।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পে দুর্নীতি মোকাবিলা

- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পগুলোয় দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
- কৃষি কর্মসূচিতে জড়িত সব কর্মকর্তাকে কঠোর জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।
- বিদ্যমান দুর্নীতিবিরোধী কাঠামোগুলোর উন্নতির মাধ্যমে দুর্নীতিপূর্ণ কাজ চিহ্নিত-প্রতিরোধ করতে হবে। এজন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা এবং নীতি তৈরি করা যেতে পারে।
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংক্রান্ত ক্রয় এবং অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বাড়ানো অপরিহার্য।
- দুর্নীতি রিপোর্ট করার জন্য শক্তিশালী হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা আইন চালু করা যেতে পারে।

ফসল বৈচিত্র্যকরণ এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি

- ধানের বাইরে ফসলের বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করে এমন উদ্যোগগুলো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। টেকসই কৃষি ও কৃষকদের আয় বৃদ্ধির জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চমূল্য ফসল, ফল, শাকসবজি, মসলা আবাদে বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।
- সরকার এবং কৃষি সংস্থাগুলোকে উচ্চ-মূল্যের ফসল চাষ বেশি প্রচার করা উচিত। কৃষক প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে এই প্রচারণা চালানো যেতে পারে। ফসলে বৈচিত্র্য আনতে পারলে মূল্য অস্থিরতা কমানো ও পুষ্টির বৈচিত্র্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
- পোস্ট হারভেস্ট লস বা ফসলোত্তর ক্ষতি কাটাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন।
- ফল, শাকসবজি এবং মসলা প্রক্রিয়াকরণের সাথে শিল্পগুলোর সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। এতে ফসলগুলোর মান বৃদ্ধি পেতে পারে। স্থানীয় প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক মুনাফার বড় অংশ লাভ করতে পারে। কৃষক পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

কৃষি উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামোতে বিনিয়োগ

গ্রামীণ অবকাঠামোতে বিনিয়োগ ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎপাদনশীলতা এবং অর্থনৈতিক কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ হলো-

- শক্তিশালী সেচ ব্যবস্থার প্রচলন করা। এতে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে। বছরব্যাপী ধারাবাহিক উৎপাদন নিশ্চিত করবে। এ খাতে বিনিয়োগ খরার প্রভাব কমাতে এবং খাদ্য নিরাপত্তা বাড়াতে সাহায্য করবে।
- গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ ও উন্নত করতে বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। এর মাধ্যমে কৃষকদের জন্য বাজারে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে ফসল ওঠানোর পর ক্ষতি কমাতে পারে। কৃষকদের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- কৃষিপণ্যের গুদামজাতকরণ ও স্টোরেজ সুবিধা বাড়ানো। ফসল সংগ্রহের ক্ষতি কমাতে এটি অপরিহার্য। পচনশীল পণ্যের গুণমান সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। কৃষকরা তাদের পণ্য যথাযথ সময়ে সঠিক মূল্যে বিক্রি করতে পারেন।
- পশুসম্পদ ও মৎস্যখাতে রোগ প্রতিরোধে দক্ষ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করতে হবে। কৃষকদের ক্ষতি কমাতে এবং ফলন বাড়াতে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- পরিবেশবান্ধব মৎস্য চাষ প্রযুক্তির প্রচারণা জরুরি। যাতে মৎস্য চাষের স্থানীয় প্রথাগুলি পরিবেশের ক্ষতি না করে। মৎস্য খাতের খামারিদের টেকসই চাষাবাদের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

প্রাথমিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ও দুর্যোগ মোকাবিলা উন্নতকরণ

- কৃষিক্ষেত্রে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় এবং লবণাক্ততার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব কমাতে আগাম সতর্কতার ব্যবস্থা এবং দুর্যোগ মোকাবিলা পদ্ধতি উন্নত করা প্রয়োজন। কৃষকদের প্রস্তুতি এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ নিতে সক্ষম করার জন্য চাষাবাদ প্রক্রিয়ায় সম্পর্কিত আধুনিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।
- দুর্যোগ মোকাবিলা প্রোটোকলগুলো শক্তিশালী করতে হবে। এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য সমন্বিত পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে স্থানীয় রেসপন্স টিমগুলোর প্রশিক্ষণ এবং দ্রুত তথ্য প্রেরণের জন্য যোগাযোগ নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করতে হবে।
- টেকসই ভূমি ব্যবহার প্রথার প্রচারণা বাড়াতে হবে। অ্যাগ্রোফরিস্ট্রি ও সংরক্ষণমূলক কৃষিকে এগিয়ে নিতে হবে। এর মাধ্যমে পরিবেশগত প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই উদ্যোগগুলোকে অগ্রাধিকার দিলে কৃষকদের প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে পারে। জীবিকা সুরক্ষিত রাখতে এবং বাড়তে থাকা জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকির মুখে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে অভিযোজন

- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে, অভিযোজনমূলক প্রথা গ্রহণে সহায়ক হতে আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ জরুরি। ঘাত সহিষ্ণু বীজ বিতরণের মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলা সম্ভব। এছাড়া বিমা স্কিমের মাধ্যমে কৃষকদের আবহাওয়ার কারণে ফসলের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

- প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণ প্রচার করা এবং লক্ষ্যভিত্তিক অভিযোজন কৌশল উন্নয়নে সহায়তা করা। জাতীয় কৃষি নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমানোর ক্ষেত্রে সমন্বিত এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা এবং শিক্ষায় বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় অভিযোজন কৌশলগুলোর জন্য স্থানীয়দের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। সুপারিশগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে নীতি গ্রহণ ও কর্মকান্ড পরিচালনা করলে অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই এবং প্রতিরোধী কৃষি খাত গড়ে তোলা সহজ হবে। যা গ্রামীণ মানুষের জীবিকায়নে সাহায্য করবে। এছাড়া সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

অধ্যায় ৯: বিনিয়োগের খোঁজে*

- বাংলাদেশের সার্বিক ব্যবসা পরিস্থিতির উন্নয়নে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি জরুরি গভীর কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। নিয়ন্ত্রক সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতির মোকাবিলা, ও আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সহজীকরণের মাধ্যমে একটি প্রতিযোগিতামূলক ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা এখন সময়ের প্রয়োজন
- চামচা পুঁজিবাদের (Crony Capitalism) ছত্রছায়ায় ক্ষমতাসালী ব্যবসায়ীগোষ্ঠী নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়াকে নিজ স্বার্থে প্রভাবিত করেছে এবং নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে বিপুল পরিমাণে ঋণ নিয়েছে। এই ধরনের পুঁজিবাদ বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি বিদেশি বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করেছে
- রাজনৈতিকভাবে যুক্ত বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী অনেক সময় কর ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে বিভিন্ন সুবিধা আদায় করেছে। অন্যদিকে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) এবং নতুন উদ্যোক্তারা জটিল ও অস্বচ্ছ করব্যবস্থার কারণে ক্রমাগত চাপের মুখে পড়েছে
- ব্যয়বহুল স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্প—যেমন মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) অনলাইন প্রকল্প ও আয়কর স্বয়ংক্রিয়করণ—প্রত্যাশিত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ত্রুটিপূর্ণ কর ব্যবস্থা ও কর-ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত জটিলতা ও ভোগান্তি সৃষ্টি করেছে
- স্বজনতোষী পুঁজিবাদ, রাজনৈতিক খবরদারি ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের অনেকেরই সক্রিয় সাহসী ভূমিকার অভাবের কারণে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর কার্যকারিতা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে

৯.১ ভূমিকা

বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) ২২-২৩ শতাংশের আশপাশে আটকে ছিল। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশীয় বেসরকারি বিনিয়োগ ও বিদেশি বিনিয়োগের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু উল্লেখ করার মতো কোনো অর্জন ছিল না।

দেশীয় বেসরকারি বিনিয়োগ যেমন প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি, তেমনি বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য হারে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণেও ব্যর্থ হয়। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) ছিল জিডিপি'র অনুপাতে ১ শতাংশের কম। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলোর একটি ভিয়েতনাম। তারা বছরে গড়ে ১৫০০ কোটি ডলার বিদেশি বিনিয়োগ পেয়েছে। বিপরীতে বাংলাদেশ পেয়েছে মাত্র ৩০০ কোটি ডলারের মতো।

বাংলাদেশের পাওয়া বিদেশি বিনিয়োগের বড় অংশ ছিল মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ। মানে হলো, দেশে কর্মরত বিদেশি কোম্পানিগুলো তাদের মুনাফা থেকে বিনিয়োগ করেছে। নতুন কোম্পানির বিনিয়োগ কম এসেছে।

প্রত্যাশা অনুযায়ী বিদেশি বিনিয়োগ না পাওয়ার কারণ অনেক। বড় কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, দেশে ব্যবসার পরিবেশ ভালো নেই, সরকারি নীতির ধারাবাহিকতা কম, ব্যবসার বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার অভাব, আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা এবং বিনিয়োগ আকর্ষণের দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা ঘাটতি। অন্যদিকে, বাংলাদেশে যথেষ্ট বেসরকারি বিনিয়োগ হয়নি বলে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানও তৈরি করা যায়নি।

এই অধ্যায়ে বেসরকারি বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হবে এবং কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হবে।

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন ফেরদৌস আরা বেগম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ ফর লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিব্‌ড)।

৯.২ ব্যবসার পরিবেশ প্রতিকূলই রয়ে গেল

বিগত সরকারের আমলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন নিয়ে অনেক বাগাড়ম্বর হয়েছে। কিন্তু দিন শেষে দেখা গেছে, বেসরকারি খাতের জন্য ব্যবসার পরিবেশ অনুকূল নয়। বিভিন্ন বৈশ্বিক সূচকে এই বিপরীতমুখী চিত্র উঠে এসেছে এবং শেকড় গেঁড়ে থাকা কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধাগুলোও সামনে এনেছে।

যেমন: বিশ্বব্যাংকের সহজে ব্যবসা সূচক-২০২০ অনুযায়ী, ওই বছর ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৬৮তম। আঞ্চলিক প্রতিযোগীরা বাংলাদেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে। ভারতের অবস্থান ৬৩, ভিয়েতনামের ৭০তম।

বিগত সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগে বেশি জোর দিয়েছিল। বলা হতো, এর উদ্দেশ্য ছিল শিল্প খাতকে এগিয়ে নেওয়া। কিন্তু ব্যবসার পরিবেশের উন্নয়নে সংস্কারের ওপর জোর দেওয়া হয়নি, যা জরুরি ছিল। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচক-২০১৯ এ এটাই উঠে আসে। এই সূচকে ১৪১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ পেয়েছিল ১০৫তম অবস্থান। প্রতিবেদনটিতে আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা, দুর্নীতি ও সরকারি নীতির ধারাবাহিকতার অভাবকে বেসরকারি খাতের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এতে তুলে ধরা হয়েছিল, ভিয়েতনাম সরকারি নীতিকাঠামো সুবিন্যস্ত করে আকর্ষণীয় ব্যবসার পরিবেশ তৈরি করেছিল। ফলে ডব্লিউইএফের সূচকে তারা পায় ৬৭তম অবস্থান।

বিশ্বব্যাংকের আরেকটি প্রতিবেদনের নাম ‘বি-রেডি’ (প্রস্তুত হও)। ২০২৪ সালের এই প্রতিবেদনে ৫০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ পায় ৩৪তম অবস্থান। সূচকটি তৈরির মাপকাঠির মধ্যে একটি ছিল সরকারি সেবা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পেয়েছিল ১০০’র মধ্যে ৪১ দশমিক ৪৬ নম্বর, যা প্রতিযোগীদের চেয়ে অনেক কম। এই সূচকে পরিচালনগত দক্ষতা মাপকাঠিতে বাংলাদেশ মোটামুটি ভালো করেছিল। খরাপ করেছিল আইনি ও নিয়ন্ত্রণগত কাঠামোর দিক দিয়ে।

বাংলাদেশের আইনি ও নিয়ন্ত্রণগত পরিবেশের উন্নতি, স্বচ্ছতা বাড়ানো ও ব্যবসার পরিবেশ সহজ করা কতটা জরুরি, তা এই সব সূচক দেখে বোঝা যায়।

দুর্নীতিও ব্যবসার বড় বাধা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) দুর্নীতির ধারণা সূচক প্রতিবেদন (২০২৩) অনুযায়ী, ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৯তম। মানে হলো, বাংলাদেশ উচ্চমাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত একটি দেশ। প্রশাসনের উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ে ঘুষ লেনদেন ব্যবসার খরচ বাড়িয়ে দেয় এবং আইনি ও নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থার ওপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিপরীত চিত্র ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়ায়। দেশ দুটি মোটামুটি ভালো শাসন নিশ্চিত করেছে, দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিয়েছে; ফল হিসেবে তারা বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতি দেখতে পেয়েছে।

বিগত সরকার বেসরকারি খাত নির্ভর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নানান উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু তারা ব্যবসার ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করে ব্যর্থ হয়েছে।

৯.৩ স্বজনতোষী পুঁজিবাদের প্রাধান্যে বঞ্চিত প্রকৃত বিনিয়োগকারীরা

বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা স্বজনতোষী পুঁজিবাদ বা ক্রোনি ক্যাপিটালিজম। ব্যবসায়ীদের একটি অংশ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেন। বিগত এক দশকে তাঁরা ঠিকাদারি কাজ বেশি পেয়েছেন, ভতুর্কি মূল্যে সরকারি সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন; তাঁদের জন্য নিয়মকানুন শিথিল করা হয়েছে, বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক খাতেও তারা বেআইনি সুবিধা নিতে পেরেছেন। নিয়ম না মেনে বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে বড় অংকের ঋণ দেওয়া হয়েছে। ফলে ছোট ব্যবসায়ীরা বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁদের অসম প্রতিযোগিতায় পড়তে হয়েছে।

বিগত সরকার বিভিন্ন সময় ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন প্রণোদনা দিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা কাজ করেনি। অথবা, তা শুধু একটি গোষ্ঠীকে সুবিধা দিয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যখনই আগ্রহ নিয়ে কোনো খাতে বিনিয়োগের চেষ্টা করেছেন, তখনই তাদের সামনে নানা বাধা এসেছে। ফলে তারা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করেননি।

স্বজনতোষী পুঁজিবাজার সবচেয়ে প্রকট দিকটি ছিল, প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে সরকারের নীতি প্রণয়ন করাতে পারতেন। একে বলা হয় ‘রাষ্ট্র প্রভাবশালীদের কজায় চলে যাওয়া’। টেলিযোগাযোগ, রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক (আরএমজি), ব্যাংক, আবাসন ও জ্বালানি খাতে প্রবণতাটি দৃশ্যমান ছিল। যেখানে গুটিকয়েক প্রভাবশালী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষা করে সরকারি সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতা ও উদ্ভাবনের বদলে নীতিকাঠামোতে প্রভাব বিস্তার করে ব্যবসায়িক সুবিধা নিত। তাদের এই তৎপরতা সমতাভিত্তিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং জাতীয় স্বার্থের বদলে সরকারের নীতি নেওয়া হয়েছে গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূর্ণ স্বার্থে।

বিনিয়োগ বাড়ানো ও সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির দায়িত্বে থাকা সরকারি সংস্থাগুলো অনেকক্ষেে সংকীর্ণ স্বার্থাশ্রেষ্টী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি তৈরি হয় এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয়। সংস্থাগুলো যথাযথ ভূমিকা রাখতে না পারায় গুটিকয়েক ব্যবসায়ীর স্বার্থ রক্ষা হয়। বিপুল জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। বাধাগ্রস্ত হয় অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

৯.৪ করব্যবস্থায় অসাম্য

ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলা ব্যবসায়ীদের জন্য বাংলাদেশের করব্যবস্থা ছিল অস্বাভাবিক রকম সুবিধাজনক। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বেসরকারি খাতের জন্য করব্যবস্থা ছিল বোঝার মতো। বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলো কর অবকাশ ও ছাড় পেত। কিছু ক্ষেত্রে কর আইন এমনভাবে প্রয়োগ করা হতো, যেন তাদের সুবিধা হয়। কিন্তু এতে প্রতিযোগিতার পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হয় এবং নৈতিক পথে ব্যবসা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বেশিরভাগ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (এসএমই) এবং নতুন বিনিয়োগকারীদের জন্য কর ব্যবস্থা ছিল জটিল, অস্বচ্ছ ও দুঃসহ। এমন ব্যবস্থার মধ্যে থেকে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবসার পরিকল্পনা করা সহজ নয়। কারণ আইন-কানুন মেনে চললে ব্যবসার ব্যয় ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। সরকারি নীতিমালা অসংলগ্নভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ (সবার জন্য সমান সুযোগ) না থাকায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য দমবন্ধ পরিবেশ তৈরি হয়। বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও নিরুৎসাহিত হয়েছেন। কারণ তাঁরা (বিদেশি বিনিয়োগকারী) সমান সুযোগ না থাকাকে বিনিয়োগের বড় ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করেন।

করনীতি ও কাস্টমসের জটিল প্রক্রিয়া বাংলাদেশে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের জন্য বড় বাধা হিসেবে রয়ে গেছে।

বাংলাদেশের করের বোঝাও বেশি। অগ্রিম আয়কর (এআইটি), উৎস কর (টিডিএস) ও করপোরেট কর মিলিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট করভার ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশে দাঁড়ায়। উচ্চ হারে কর ব্যবসা সহায়ক নয়। কিন্তু বড় ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা বিশেষ সুবিধা ঠিকই পেতেন। ফলে তাঁরা ভালো করেছেন। অন্যদিকে ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কৌশলগত খাতগুলোতে বিনিয়োগ কম হয়েছে।

বাংলাদেশ মূল্য সংযোজন করের (মুসক/ভ্যাট) মতো পরোক্ষ করের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। এ ধরনের কর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ক্রেতার বোঝা বাড়িয়ে দেয়। পরোক্ষ কর বেশি হলে তার চাপে মানুষ চাহিদা কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। সংসারের দৈনন্দিন খরচের বাইরে বাড়তি কোনো ব্যয়ের মতো অর্থ তাঁদের হাতে থাকে না।

সব মিলিয়ে ধারণা তৈরি হয়, বাংলাদেশের কর ব্যবস্থা অসম। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতার অভাবও ছিল। দুয়ে মিলে ব্যবসার পরিবেশ নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়। এসব আসলে সেই ব্যবস্থাগত সমস্যা, যা বেসরকারি বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করেছে। নইলে উদ্ভাবন, কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ আরও বড় ভূমিকা রাখতে পারত।

ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য সরকার যদি কর ব্যবস্থায় সংস্কার আনতে চায়, তাহলে মূল কাজ হওয়া উচিত ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা ফেরানো। পাশাপাশি, কর ব্যবস্থায় চটজলদি পরিবর্তনের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। যেন তা ভবিষ্যতের জন্য অনুমানযোগ্য থাকে।

কর খাত সংস্কারে বিদেশি ঋণে বেশকিছু ব্যয়বহুল প্রকল্প নেওয়া হয়। ভ্যাট অনলাইন, ইনকাম ট্যাক্স অটোমেশন, ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাইজড ল্যান্ড ম্যানেজমেন্টের মতো প্রকল্পগুলো উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এসব অটোমেশন (স্বয়ংক্রিয়করণ) কার্যক্রম অর্ধসমাপ্ত থাকায় ব্যবসার বোঝা আরও বেড়ে যায়। বেশিরভাগ কোম্পানিকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া, সনদপ্রাপ্তি ও নিবন্ধনের জন্য একই কাজ দুইবার করে করতে হয়। প্রথমে আধা সমাপ্ত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে, দ্বিতীয়বার সনাতন পদ্ধতিতে। এই অদক্ষ ব্যবস্থা অটোমেশনের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দিয়েছে।

জটিলতা আরও বাড়িয়েছে কাস্টমসের নিয়মকানুন। আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে ইমপোর্ট জেনারেল ম্যানিফেস্টের (আইজিএম) ক্ষেত্রে নিয়মিত এইচএস কোডের (বাণিজ্যে ব্যবহৃত পণ্য শনাক্তকরণ নম্বর) অমিল দেখা যায়। এতে সময় বেশি লাগতে শুরু করে।

বিনিয়োগকারীদের আরও সমস্যা রয়েছে। যেমন: বাংলাদেশে ব্যবসারত বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মূল প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে চায়। কিন্তু এক্ষেত্রে সুবিন্যস্ত কোনো নির্দেশিকা নেই। এতে প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সহায়তা পেতে বিলম্ব হয়। বন্দরে জটের কারণে পণ্য আটকে থাকে। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোতে (ইপিজেড) পণ্য রাখার জন্য পর্যাপ্ত সক্ষমতার মজুতগার নেই। আমদানি কন্টেইনার পুনর্ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় রপ্তানিকারকদের অযথা ব্যয় বাড়ে।

কিছু বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কারখানা করে, বিদেশে রপ্তানি করতে চায়। পাশাপাশি তারা দেশীয় বাজারেও পণ্য বিক্রিতে আগ্রহী। কিন্তু বাংলাদেশে রপ্তানিকারক ও অভ্যন্তরীণ বাজারমুখী কারখানার শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান অনমনীয়। এ কারণে একইসঙ্গে দুই বাজারে কাজ করতে আগ্রহীরা বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে, সরবরাহ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বন্দ সুবিধাসম্পন্ন পণ্য মজুতগার, আমদানি করা কন্টেইনার পুনর্ব্যবহার ও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো সুবিধার সম্প্রসারণ জরুরি।

৯.৫ দুর্বল পুঁজিবাজার বেসরকারি বিনিয়োগ এগিয়ে নিতে ব্যর্থ

সবাই জানে, অতীতে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে নানান অনিয়ম হয়েছে। ফলে, পুঁজিবাজার বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের মূলধনের জোগান দেওয়ার সক্ষমতা দেখাতে পারেনি। ঋণের জন্য বেসরকারি খাত ছিল অতিমাত্রায় ব্যাংকনির্ভর। দুর্নীতি, অস্বচ্ছতা; বিশেষ করে, কোম্পানির তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাবে পুঁজিবাজারে বিদেশি বিনিয়োগ তেমন একটা আসেনি। পুঁজিবাজার থেকে গেছে মূলত দেশীয় বিনিয়োগকারী নির্ভর।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে এখন ৬৭৭টি সিকিউরিটিজ, ৩৬০টি কোম্পানি, ৩৭টি মিউচুয়াল ফান্ড, ২০টি এসএমই এবং ২৩৬টি সরকারি সিকিউরিটিজ নিবন্ধিত। তবে বুধে ওঠা কঠিন, এদের মধ্যে কয়টি আসলে লাভজনক। কারণ মূল্যায়ন ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য নয়। এই অস্বচ্ছতা বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমিয়ে দেয় এবং বাজারের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করে।

বাজারের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার কাজটি বাংলাদেশ সিকিউরিটির এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি)। কিন্তু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর চাপে তারা কাজটি করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাজারে নতুন শেয়ার ছাড়ার সুযোগ দেওয়া বা প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (আইপিও) ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঠিক রীতি-নীতি মেনে হয়নি। সেকেন্ডারি বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও কমিশনের জবাবদিহির ঘাটতি ছিল। সব মিলিয়ে পুরো ব্যবস্থার প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থার সংকট তৈরি হয়।

৯.৬ বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো অকার্যকর

বাংলাদেশের বিনিয়োগ এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করে না। তারা নিজেদের মতো করে কাজ করে। বিনিয়োগ এগিয়ে নেওয়ার মূল দায়িত্ব বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা)। কিন্তু অন্যান্য বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং নিয়ন্ত্রক ও সেবাদানকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব বিডার কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও বিনিয়োগকারীদের জন্য এক দরজায় সব সেবা বা ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার (ওএসএস) চালু হয়েছিল। কিন্তু নানা সমস্যায় তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়নি। স্বচ্ছতা ফেরানো ও লাল ফিতার দৌরাড়্য কমানোর জন্য মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর-দুবাইয়ে এমন ওএসএস রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার না দেওয়ায় ওএসএস ও বিডা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

নীতির ধারাবাহিকতার অভাব ও প্রক্রিয়াগত অদক্ষতা বিনিয়োগকে আরও বাধাগ্রস্ত করেছে। যেমন: বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশে কাজের অনুমতি দিতে বিডার নির্দেশিকা রয়েছে। অন্যদিকে, আয়কর আইনে বাংলাদেশে বসবাস সংক্রান্ত সংজ্ঞা রয়েছে। এই দুটির মধ্যে অনেক অসঙ্গতি। ফলে, বিদেশিদের বাংলাদেশে কাজের অনুমতি পেতে অনেক সময় লেগে যায়। কখনো কখনো লাগে ১২ মাস। এতে বিনিয়োগকারীরা হতাশ হয়ে পড়েন। ভারত ও থাইল্যান্ডের মতো দেশগুলো ভিসা ও কাজের অনুমতির নীতিমালা সমন্বয় করেছে। এতে দক্ষতা এবং বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ বাড়ে।

মাকাতা আমলের আইন বাংলাদেশের বিনিয়োগের পরিবেশ কঠিন করে তুলেছে। যেমন: বিদেশি বিনিয়োগ এগিয়ে নেওয়া এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনটি ১৯৮৯ সালের। সম্পত্তি স্থানান্তর আইনটিও ১৮৮২ সালের। কিছু কিছু আইন নতুন। কিন্তু এমন কিছু বিধিবিধান করা হয়েছে, যা বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত করে। যেমন: বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ আইন করা হয়েছে ২০১৯ সালে। এতে ৫০ শতাংশ পণ্য দেশীয় জাহাজ দিয়ে পরিবহনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দেশে জাহাজে পণ্য পরিবহন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বা শিপিং লাইনের সংখ্যা কম। এতে পণ্য পরিবহন নিয়ে সংকট তৈরি হয়।

বিনিয়োগকারীদের এখনো বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স ও অনুমতি পেতে সংস্থায় সংস্থায় দৌড়াতে হয়। একটি নতুন প্রতিষ্ঠান খুলতে ২৩টি সরকারি সংস্থার কাছ থেকে ১৫০ ধরনের অনুমোদন লাগে। কিছু কিছু লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়া অনলাইনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রক্রিয়াটি অসমাপ্ত এবং এখনো লাইসেন্স পেতে প্রচুর নথি জমা দিতে হয়। বাংলাদেশে ৪৪টি মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখভাল করে। কিন্তু সিঙ্গাপুরের মত দেশ বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার কাজ গুটিকয়েক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমিত করে ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করতে পেরেছে।

বাংলাদেশের বিনিয়োগের হিসাব রাখে বিভিন্ন সংস্থা। এসব সংস্থার দেওয়া তথ্য-উপাত্তে অসামঞ্জস্য রয়েছে। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বিডায় নিবন্ধিত ৩ হাজার ১১১টি বিনিয়োগ প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অনেক বিনিয়োগকারী ১৫ কোটি টাকার কম বিনিয়োগ করেছেন। প্রশ্ন ওঠে, এত ছোট বিনিয়োগ কেন বিডায় নিবন্ধিত হতে হবে? এসব বিনিয়োগ তো ট্রেড লাইসেন্স দিয়েই করার সুযোগ থাকা উচিত। পাশাপাশি আলোচনার সময় ইঙ্গিত এসেছে যে, বিডায় নিবন্ধিত অনেক কারখানা আসলে সচল নেই।

শুরুতে একটি কেন্দ্রীয় ওএসএস-ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যা বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (বেপজা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ও বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে একত্রিত করে সমন্বিত সেবা দেবে। ফলে তথ্য-উপাত্তের অসামঞ্জস্য হবে না। কিন্তু তা হয়নি। সমস্যা আরও আছে। অগ্নি নিরাপত্তা, কর ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোতে অনুমোদন ও ছাড়পত্র দেওয়ার মতো যথেষ্ট সংখ্যক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই। ফলে জটিলতা আরও বাড়ে।

প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর পৃথক শনাক্তকরণ নম্বর (বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর) তৈরি করা যেতে পারে। এতে প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বাড়বে। একই কাজ দুইবার করার বামেলা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে।

৯.৭ মুনাফার পুনর্বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল বিদেশি বিনিয়োগ

বাংলাদেশে এফডিআই আসে মূলত বর্তমানে ব্যবসারত বিদেশি কোম্পানিগুলোর আয় থেকে। নতুন মূলধন বিনিয়োগ কম। এথেকে বোঝা যায়, নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশ ভালো করতে পারেনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশে এফডিআইয়ের বড় অংশ টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, আর্থিক সেবা খাতে ব্যবসারত বিদেশি কোম্পানিগুলোর মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ। মানে হলো, বর্তমান বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের বাজারে ভালো মুনাফা করতে পারছেন। এ কারণে তাঁরা বিনিয়োগ বাড়চ্ছেন। কিন্তু নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশের সক্ষমতার অভাব রয়েছে। এর কারণ আইনের অস্বচ্ছতা, আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা, দুর্বল অবকাঠামো ইত্যাদি। বলা যায়, বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য দেশে ইতিমধ্যে বিনিয়োগ করা বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভরশীল, যারা কঠিন পরিস্থিতিতে টিকে থাকার সঙ্গে পরিচিত।

বাংলাদেশে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ও চুক্তির বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আইনি কাঠামো এখনো অনুন্নত। এটা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা মারাত্মকভাবে কমিয়ে দেয় এবং তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর খাতে উদ্ভাবনী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে। কারণ বিনিয়োগকারীরা সব সময় মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের সুযোগ চায়। বাংলাদেশ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি বলে বিদেশি বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি স্থানান্তর নিরুৎসাহিত হয়েছে।

মুনাফার পুনর্বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীলতা বিনিয়োগ পরিবেশের ক্ষেত্রে গভীর কাঠামোগত সমস্যা তুলে ধরে। সমপর্যায়ের অর্থনীতির দেশ ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার মতো বাংলাদেশ বিনিয়োগকারীদের পছন্দের গন্তব্য হতে পারেনি। কারণ এদেশে আইনি কাঠামো প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে না এবং বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে উদ্যোগও কম। নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হলে সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে।

৯.৮ বড়দের চেয়ে ছোটরা বেশি চ্যালেঞ্জ

বিগত এক দশক ব্যবসা পরিচালনা ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দেশের এসএমই খাত বড়দের চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে ছিল। তাদের বড় সমস্যা, সহজে ব্যাংক ঋণ না পাওয়া। ছোটরা জামানত দিতে পারে না বলে, ব্যাংকগুলো ঋণ দিতে আগ্রহী হয় না। অন্যদিকে বড়রা ঋণের ক্ষেত্রে সব সময়ই অগ্রাধিকার পায়।

জটিল নিয়ন্ত্রণকাঠামো ছোটদের ব্যবসা করা কঠিন করে তোলে। লাইসেন্স ও অন্যান্য অনুমোদনের জন্য তাদের দিনের পর দিন ঘুরতে হয়। কারণ এসব অনুমোদনের প্রক্রিয়া জটিল করে রাখা হয়েছে। সরকারি সংস্থাগুলোর সহায়তা সাধারণত তারা পায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ করতে পারে না। কারণ তাদের যথেষ্ট অর্থ থাকে না। যদিও বিশ্বায়িত বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ জরুরি।

দেশে যদি অবকাঠামোর ঘাটতি থাকে, তাহলে বেশি ভুগতে হয় এসএমই খাতকে। বিদ্যুৎ সংকট, দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থা, আধুনিক সরঞ্জাম সুবিধার অভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা ইত্যাদি এসএমইদের ব্যবসার

খরচ বাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি ব্যবসা সম্প্রসারণ সক্ষমতা কমিয়ে দেয়। একই ধরনের সমস্যার মধ্যে থাকলেও, বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো বিকল্প খুঁজে নিতে বিনিয়োগ করতে পারে অথবা সরকারের কাছ থেকে অগ্রাধিকার আদায় করে নিতে পারে।

বিনিয়োগ পরিবেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হলে নীতিনির্ধারকদের এসএমই খাত নিয়ে ভাবতে হবে। তাদের ঋণসুবিধা, অবকাঠামো ও ব্যবসা সহজ করার মতো বিশেষ চাওয়াগুলো পূরণ করতে হবে। সুবিধাগুলো পেলে তারা অর্থনীতিতে আরও বেশি অবদান রাখতে পারবে।

৯.৯ বাণিজ্য সহজ করার পদক্ষেপ বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য যথেষ্ট নয়

বাণিজ্য সহজ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ২০২৩ সালে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (এনএসডব্লিউ) প্রকল্প নিয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে বাণিজ্য প্রক্রিয়া অনলাইনে নেওয়ার কথা। এতে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বাড়বে, কাজ সহজ হবে, সময় ও খরচ বাঁচবে। প্রকল্পটি শেষ হবে ২০২৬ সালে।

যদিও ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো ব্যবস্থা কার্যকর করা নিয়ে সংশয় রয়ে গেছে। কারণ, অতীত অভিজ্ঞতা ভালো নয়। এর আগে কাস্টমসের তথ্য-উপাত্ত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার আওতায় নিতে ‘অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড’ চালু হয়। কিন্তু তারপরও নথিগত কাজ করতে দীর্ঘসময় লাগছে এবং একই কাজ দুইবার (স্বয়ংক্রিয় ও সনাতন) করতে হচ্ছে। বাংলাদেশে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নথিগত কাজ করতে যে সময় লাগে তা ভিয়েতনামের দ্বিগুণ এবং ভারতের তিনগুণ।

ফলে বোঝাই যাচ্ছে যে, বাণিজ্য সহজ করতে বাংলাদেশকে কাজ করে যেতে হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ‘ন্যাশনাল ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন’ কমিটির কার্যক্রম ধীরগতিতে চলছে। কিছু সংস্কার দ্রুত করা জরুরি। এর মধ্যে রয়েছে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠা, পণ্য আসার আগে নথিগত কাজ শেষ করে রাখা বা প্রি-অ্যারাইভাল প্রসেসিং ব্যবস্থা চালু, অহেতুক পরিদর্শন বন্ধ করা ইত্যাদি। সংস্কারগুলো করতে পারলে বাণিজ্য সহজ হবে এবং সময় কম লাগবে।

চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্র বন্দর, বেনাপোল স্থলবন্দর ও ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাস্টমস প্রক্রিয়া জটিল ও কষ্টসাধ্য। বিধিবিধানও স্বচ্ছ নয়। বন্দরগুলোতে অবকাঠামো ঘাটতি আছে। এসব সমস্যা বাণিজ্যের দক্ষতা কমিয়ে দেয় এবং দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করে। আমদানি-রপ্তানিকারকদের তখন ঘুষ দিয়ে ‘ফাঁদ’ থেকে বের হতে হয়। সবকিছুই বাণিজ্যে বাধা আরও বাড়িয়ে দেয়।

৯.১০ নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুতির অভাব

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি-৯ (শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো) ও এসডিজি-১২ (দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন)—দুই ক্ষেত্রেই লক্ষ্য পূরণে বেসরকারি খাতের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এসডিজি অর্জনের গতিপথ বোঝার জন্য সরকার জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক বা ন্যাশনাল প্রায়োরিটি ইন্ডিকেটর (এনপিটি) চিহ্নিত করেছে। যদিও এসডিজি অর্জনে বেসরকারি খাতের কৌশলগত অংশগ্রহণ এখনো যথেষ্ট নয়।

এসডিজি-১২ অর্জনের অংশ হিসেবে টেকসই ভোগ ও উৎপাদন নিশ্চিত করতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) একটি নীতিমালা করেছে। এই নীতিমালায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ওপর এই নীতিমালার বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে। কারণ বাংলাদেশের মোট পোশাক রপ্তানির ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ যায় ইউরোপের বাজারে।

ইইউর নীতিমালায় বস্ত্র ও সংশ্লিষ্ট পণ্য আরও দীর্ঘসময় ব্যবহারের জন্য স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা, পুনর্ব্যবহার এবং বস্ত্র শিল্পের পরিবেশগত প্রভাব কমিয়ে আনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে জাতীয়ভাবে এমন নীতিকৌশল নিতে হবে। ইউরোপের পরিবর্তনের সাথে বাংলাদেশকে খাপ খাওয়াতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করে। এর মধ্যে অনেকগুলো আবার একই রকম। নজর থাকে মূলত নিম্ন-দক্ষতা (লো-স্কিল) উন্নয়নের দিকে। নতুন যেসব চ্যালেঞ্জ আসছে, তা মোকাবিলায় এমন ব্যবস্থা দরকার যেখানে সংস্থাগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করবে এবং বেসরকারি খাত নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকবে।

২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে যাবে। পরবর্তীতে বিনিয়োগ আকর্ষণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যথেষ্ট প্রস্তুতি না থাকা এখন বড় উদ্বেগের বিষয়। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করতে হবে। সেকেলে আইনকানুন হালনাগাদ করতে হবে। অবকাঠামো ঘাটতি পূরণ করতে হবে, প্রক্রিয়া সুবিন্যস্ত করতে হবে।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর; বাংলাদেশকে অর্থনীতির গতি ধীর হয়ে যাওয়া, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে যাওয়া, বদলে যাওয়া বৈশ্বিক বাজারব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দরকার কার্যকর নীতি ও বড় ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা।

৯.১১ বেসরকারি খাতে সুশাসন

সাধারণভাবে বলা যায়, ব্যবসায়ীদের সমিতিগুলো বিনিয়োগ এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখে। কারণ তারা ব্যবসায়ীদের হয়ে কাজ করে, সমস্যাগুলো তুলে ধরে সমাধানের চেষ্টা করে। যেন বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হয় ও ব্যবসা সহজ হয়। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরকারের সংলাপ ও নীতি আলোচনার ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর নির্বাচনও প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। সরকারের পছন্দের লোকেরাই নেতা হতেন। ফলে সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়ীদের সহায়তায় সংগঠনগুলো ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হয়।

বাংলাদেশে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নীতি সংস্কার প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। বিশেষ করে কর ছাড়, সহজে ঋণ পাওয়া, লাইসেন্সিং সহজ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে। সমস্যা সমাধানে তারা সরকারি সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করে। অবশ্য অনেকক্ষেত্রেই সমস্যার সমাধান হয়নি, সুবিধা পেয়েছে গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান।

সরকার বাজেটের সময় বেসরকারি খাত থেকে প্রস্তাব নেয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের কথা শোনা হয় না। এই সমস্যা সমাধানে আরও শক্তিশালী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব দরকার। অংশীদারত্বের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার সঙ্গে তথ্য-উপাত্ত ভাগাভাগি করে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৯.১২ উপসংহার

বাংলাদেশে জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগের হার বিগত এক দশক ধরে স্থবির হয়ে আছে। এর বড় কারণ ব্যবসার প্রতিকূল পরিবেশ। ব্যবসার পরিবেশ ভালো না হওয়ার কারণ আবার ব্যবস্থাগত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, যা দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করছে।

বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে এবং অর্থনীতিতে নতুন করে চাঞ্চল্য আনতে একটি বহুমুখী নীতিভঙ্গি দরকার। নিচে কিছু সুপারিশ রইলো—

ব্যবসার প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ উৎসাহিত করা: কিছু ধনী আর ক্ষমতাবাহীরা (ক্রোনি) সুবিধা দিলে ব্যবসার পরিবেশ খারাপ হয়। আর যারা সত্যিকার অর্থে বিনিয়োগ করতে চায়, তারা পিছিয়ে যায়। এটাই বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা। সরকারের উচিত শক্তভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং ব্যবসার নিয়মকানুন স্বচ্ছ করা। প্রতিযোগিতা বাড়াতে সংশ্লিষ্ট আইনকানুনের কঠোর প্রয়োগ, আইনি কাঠামোর উন্নতি এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব দূরে রেখে ব্যবসার প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ উৎসাহিত করা যায়।

গুটিকয়েক নয়, সবাইকে সহায়তা দিতে কর খাতে সংস্কার: বর্তমান করব্যবস্থায় কিছু লোক সুবিধা পায়। কিন্তু এসএমই খাতের জন্য এটা দমনমূলকই রয়ে গেছে। করব্যবস্থা ন্যায্য ও ব্যবসাবান্ধব করতে সংস্কারে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। করপোরেট কর হার পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে করছাড় দিতে হবে। এবং এসএমই খাতের জন্য কর কম হতে হবে। কর দেওয়ার প্রক্রিয়াও সহজ করতে হবে।

পুঁজিবাজারের উন্নয়ন: পুঁজিবাজার থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো মূলধন সংগ্রহ করে। কিন্তু বাংলাদেশের পুঁজিবাজার এখনো অনুন্নত। এটা বেসরকারি বিনিয়োগের বড় বাধা। পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা বাড়ানো, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা ও শেয়ারবাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে সরকারকে কৌশল ঠিক করতে হবে। একটি প্রাতিষ্ঠানিক বন্ড বাজার থাকা উচিত, যার মাধ্যমে বেসরকারি খাত অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে; বিশেষ করে এসএমই খাত।

বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সংস্কার: আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বিনিয়োগ এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলো অনেকটা অকার্যকর। এসব সংস্থার সংস্কার করে কার্যকারিতা ফেরানো জরুরি। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। নির্দিষ্ট খাতকে নির্দিষ্টভাবে সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিও জরুরি। বাধাগুলো চিহ্নিত করা এবং বেসরকারি খাতকে কী কী প্রণোদনা দিতে হবে, তা ঠিক করতে টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে।

এসএমই খাতের সমস্যা সমাধান: নীতিনির্ধারকদের উচিত এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে এসএমই খাত সহজে ঋণ পাবে, কারিগরি সহায়তা পাবে এবং দেশি ও বিদেশি বাজারে পণ্য বিক্রির সুযোগ পাবে। এসএমই খাতের ওপর থাকা নিয়ন্ত্রণের বোঝা দূর করতে বিশেষ কর্মসূচি দরকার।

বাণিজ্য সহজ করা: ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ করার জন্য যেসব পদক্ষেপ দরকার, তা যথেষ্টভাবে নেওয়া হয়নি। এর ফলে বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর খারাপ প্রভাব পড়ছে। কাস্টমসের প্রক্রিয়া যৌক্তিক করার উদ্যোগ দরকার। বন্দরের অবকাঠামো আধুনিক করা জরুরি। সরঞ্জাম (লজিস্টিকস) সুবিধা বাড়াতে হবে। সব মিলিয়ে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পরিবেশ ভালো করতে হবে। কাস্টমসের কার্যক্রম ডিজিটাল করা এবং আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের দক্ষতা বাড়াতে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি: জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তি দ্রুত বদলে যাওয়া, বৈশ্বিক বাণিজ্যে রূপান্তরের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি থাকা দরকার। নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবসায় টিকে থাকার উপায় হতে পারে উদ্ভাবন, গবেষণা ও প্রযুক্তির ব্যবহারে জোর দেওয়া। আধুনিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক চাহিদার জন্য মানবসম্পদে আরও বিনিয়োগ করতে হবে।

ব্যবসায়ী সংগঠনের ভূমিকা: বাংলাদেশে বাণিজ্য ও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো সাধারণত বিনিয়োগ এগিয়ে নেওয়া, নীতি উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপন ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরকারের সংলাপে ভূমিকা রাখে। যদিও তারা নানা সমস্যার মুখে পড়ে। তার মধ্যে রয়েছে স্বজনতোষী পুঁজিবাদ, আমলাতান্ত্রিক ধীরগতি এবং অনিশ্চিত আইনি কাঠামো। বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পূর্বশর্তের মধ্যে রয়েছে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদার এবং চেম্বারগুলোতে ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা কাটানোর পথটি চেনা। সেটি হলো, বাংলাদেশকে অধিকতর স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবসার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এজন্য দরকার নীতি সংস্কার। একটি ব্যবসা-সহায়ক পরিবেশ বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে। এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে, উদ্ভাবন জোর পাবে, কর্মসংস্থান বাড়বে। সেটা করতে পারলে বাংলাদেশ তার প্রকৃত সম্ভাবনা বুঝে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারবে। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে জরুরিভাবে যা যা প্রয়োজন, তার একটি বিনিয়োগ।

অধ্যায়-১০: ব্যাংকিং খাত: গভীর অঙ্ককূপে পতিত*

- অঙ্ককূপে পড়ে গেছে ব্যাংক খাত
- অর্থনৈতিক দমনমূলক নীতি ও স্বজনপ্রীতিভিত্তিক ব্যবসা জনপ্রিয়তা পেয়েছে
- ব্যাংকিং খাতে অঘোষিত 'ঢাকা কনসেনসাস' গড়ে উঠেছে
- ব্যাংকের সম্পদ প্রায় সাড়ে ২৫ লাখ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৪৭%
- ব্যাংকে জনগণের আমানত প্রায় সাড়ে ১৮ লাখ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৩৪%
- ব্যাংক খাতে সামগ্রিক সূচকের যা প্রকাশ পেয়েছে, তারচেয়ে বেশি গোপন রাখা হয়েছে
- দেউলিয়াত্বের দ্বারপ্রান্তে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত-বিশেষায়িত-বেসরকারি ব্যাংক
- নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা ও কারসাজির মাধ্যমে ব্যাংকগুলোতে মুনাফা বেশি দেখানো হয়েছে
- ২০২২ সালে ৭৭.৩% খেলাপি ঋণের বিপরীতে যথাযথ প্রভিশন রাখা হয়নি
- ২০২৪ এর জুন শেষে ব্যাংকগুলোর মোট ঋণের ৩১.৭ শতাংশই সংকটাপন্ন
- বেসরকারি ব্যাংকের লাইসেন্স মূলত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার হাতিয়ারে পরিণত হয়
- ব্যাংক খাতে ২৪টি বড় কেলেক্সারিতে ৯২ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ

অধ্যায়ের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু

২০২৪ সালের জুন মাসের শেষে ব্যাংকিং খাতে খারাপ ঋণের পরিমাণ ছিল মোট ব্যাংক ঋণের ৩১ শতাংশেরও বেশি। যা দিয়ে ১৪টি মেট্রোরেল এবং ২৩টি পদ্মা সেতু তৈরি করা সম্ভব। যদিও এই হিসাবটি কিছুটা রক্ষণশীল। কারণ এতে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাব অন্তর্ভুক্ত নয়। রাঘব বোয়ালরা আর্থিক ব্যবস্থার সব অংশ থেকেই বিশাল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেছে।

রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী অলিগার্কদের আর্থিক প্রতারণা, জালিয়াতি এবং খেলাপি ঋণ থেকে দায়মুক্তি নিশ্চিতে বিভিন্ন আর্থিক নীতি এবং তার প্রয়োগ করা হয়েছে। অতিমারীতে অর্থনীতি যে চাপে পড়েছিল, বড় বড় ঋণ বারবার পুনঃতফসিলীকরণে তা আরো ঘনীভূত হয়েছে।

একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে, সংঘবদ্ধ ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক, আমলা এবং রাজনীতিবিদরা একসাথে মিলে স্পষ্ট এবং পরোক্ষভাবে কর্পোরেট এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। এই খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে শক্তহাতে সংস্কার প্রয়োজন।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বিগত সরকারের রেখে যাওয়া অত্যন্ত সংকটাপন্ন আর্থিক খাত হাতে পেয়েছে। বিশেষত ব্যাংক ও শেয়ারবাজার মূলত বিশ্বাসের সংকটে ভুগছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন আখ্যানে একসময় আর্থিক খাত অত্যন্ত উজ্জ্বল অবস্থানে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তবে, সেই অবদান টেকসই হয়নি। ঘন ঘন নীতি পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার নানাবিধ অনিয়মের ফলে ঋণ খেলাপি, প্রতারণা, কেলেক্সারি এবং অনৈতিক ব্যাংকিং কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বেড়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে দমনমূলক নীতি ব্যবহার আবার ফিরে এসেছে। স্বজনপ্রীতিভিত্তিক ব্যবসা মডেল জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

এই অধ্যায়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ব্যাংককে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, সেখানে এর সামষ্টিক গুরুত্ব কোনোভাবেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। এখানে ব্যাংকগুলোর স্থিতিশীলতা ও তারল্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাদের ব্যালাঙ্গশিটের গভীরে গিয়ে দেউলিয়াত্বের মাত্রা, তারল্য সংকট এবং খারাপ ঋণের বাস্তবতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ দীর্ঘদিন ধরে এ

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন ড. জাহিদ হোসেন, সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বাংলাদেশ।

খাতের সমস্যা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে আসছে। ফলে কীভাবে ব্যাংকিং খাত এই গভীর অন্ধকূপে পড়েছে এবং এখান থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী— সে বিষয়ে একটা অঘোষিত মতৈক্য তৈরি হয়েছে।

১০.১ ব্যাংকিং ব্যবস্থার সামষ্টিক পর্যালোচনা

বাংলাদেশের তফসিলি ব্যাংকগুলো মূল আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। ২০২৪ সালের জুন মাসের শেষে ব্যাংকগুলোতে মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৫,৪৬২.৬০ বিলিয়ন টাকা। যা দেশের জিডিপি ৪৭ শতাংশের সমান। ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ মোট সম্পদের ৬৬ শতাংশ। আর বাকি অংশ সরকারি সিকিউরিটিজ এবং নগদ বিনিয়োগে রাখা হয়েছে। ২০২৪ সালের জুন মাসের শেষে ব্যাংকিং খাতে মোট আমানতের পরিমাণ (আন্তঃব্যাংক আমানত বাদে) ছিল ১৮,৪১২.৩৮ বিলিয়ন টাকা। যা জিডিপি ৩৪ শতাংশের সমান। ১৯৯০ এর দশকের শুরুর দিকে বাপক আর্থিক উদারীকরণের ফলে বেসরকারি খাতভিত্তিক বেশকিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কর্পোরেট কাঠামোয় নতুনভাবে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলো (এসওবি) কিছু সময়ের জন্য ভালোভাবে পরিচালিত হলেও পরে লুটপাটের শিকার হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, সময়ের সাথে সাথে বেসরকারি ঋণ প্রবৃদ্ধির গুরুত্ব বেড়েছে। ২০০১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে বেসরকারি ঋণের সম্পর্ক সূচকের মান প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। জিডিপিতে ব্রড মানি ও বেসরকারি ঋণের অনুপাত বাড়ার সাথে সাথে বেসরকারি বিনিয়োগ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও মাথাপিছু আয় বাড়তে থাকে। ৯০ দশকের শুরুর দিক থেকে বাজারভিত্তিক নমনীয় সুদহার ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য কার্যকর পদ্ধতি ছিল।

তবে গত এক দশকে এই অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। প্রাইভেট ক্রেডিট টু জিডিপি অনুপাতের পরিবর্তনের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত ক্রেডিট ইমপালস এবং প্রকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্প্রতি হ্রাস পেয়েছে। এটি এমন এক সময় ঘটেছে, যখন প্রবৃদ্ধির জন্য ঋণনির্ভরতা বেড়েছে— যা সম্পদের ক্রমবর্ধমান অপব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়। ২০১০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে হঠাৎ হঠাৎ আরোপিত বিভিন্ন ধরনের আর্থিক নীতির কারণে আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ২০১০-এর দশকের শুরু থেকে নির্দেশিত ঋণের (Directed credit) আওতা বৃদ্ধি পায় এবং মাঝামাঝি সময়ে যা আরো সহজ করা হয়। ২০১০ এর মাঝামাঝি সময় থেকে ঋণের পুনঃতফসিলীকরণ ও পুনর্গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়, ফলে একই ঋণ একাধিকবার পুনঃতালিকাভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে ঋণের ক্ষেত্রে ৯ শতাংশ সুদহারের সীমা নির্ধারণ করা দেওয়া হয়। অতিমারীর প্রেক্ষিতে চালু হওয়া ঋণ পরিশোধ স্থগিতাদেশ পরবর্তীতে একটি স্থায়ী রূপ লাভ করে। যা ব্যাংক খাতের স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলে।

২০২৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি) স্বল্প সময়ের জন্য “স্মার্ট” নামে পরিচিত একটি ক্রলিং সুদহার ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক প্রয়োগের পর তা আবার বাজারনির্ধারিত পদ্ধতিতে ফিরে যায়। বাস্তবে আইএমএফ কর্মসূচির আওতায় নীতিগত কৌশলের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক নৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সুদের হারে অদৃশ্য ১৪ শতাংশের একটি উর্ধ্বসীমা চাপিয়ে দেয়। আইএমএফ এই সীমা তুলে দেওয়ার জন্য চাপ দিলে বাংলাদেশ ব্যাংক তা কাগজে-কলমে মেনেও নেয়। যদিও এই অদৃশ্য উর্ধ্বসীমার বিষয়টি সবার জানা ছিল। কিন্তু আইএমএফের পক্ষে তা প্রমাণ করা সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নেতৃত্ব জুলাই-আগস্ট মাসে দ্রুত তাদের নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণে পরিবর্তনের সংকেত দেয়। এখন ধারণা করা হচ্ছে যে খুচরা ঋণের হার ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে বাজারের খেলায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মূল ঋণের হার (real lending rate) এবং নীতি সুদহার (real policy rate) দীর্ঘ সময় ধরে ঋণাত্মক অবস্থায় রয়েছে। নীতিগত সুদহার বৃদ্ধি এবং আর্থিক ব্যবস্থায় তারল্য সংকটের কারণে রিটেইল সুদহার বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা গেছে। সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাংক ও খাতভেদে এই হার ১১ শতাংশ থেকে ১৬ শতাংশের মধ্যে

পরিবর্তিত হয়েছে। ২০২২ সালের মে মাস থেকে নীতি হার ক্রমাগত ৫২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বর্তমানে ১০ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই স্থিতিশীলতা ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ না মুদ্রাস্ফীতির তথ্যে বড় পরিবর্তন হয় এবং যে কোনো দিকে সামঞ্জস্যের প্রয়োজন পড়ে। ন্যূনতম হার বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাস্তব নীতি হার এবং বাস্তব ওয়েটেড এভারেজ ঋণ ও আমানত হার নেতিবাচক রয়েছে। তবে, গত ১২ মাসে সরকারি ট্রেজারি বিলের হার মুদ্রাস্ফীতির চেয়ে এগিয়েছে।

ব্যাংক খাতে সামগ্রিক সূচকগুলো যতটুকু প্রকাশ করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি গোপন রাখা হয়েছে। ২০২৪ অর্থবছরের শেষে অ্যাডভান্স-টু-ডিপোজিট অনুপাত (এডিআর) ৮০.২% ছিল, যা প্রচলিত ব্যাংকগুলোর জন্য নির্ধারিত ৮৭% নিয়ন্ত্রণ সীমার নিচে। নেতিবাচক বাস্তব আমানত হার, বড় আকারের জালিয়াতির অভিযোগ থেকে সৃষ্ট আস্থার সংকট এবং নন-পারফর্মিং লোন (এনপিএল) বৃদ্ধির কারণে আমানত প্রবৃদ্ধি কমে গেছে। ঋণের মান এমন পর্যায়ে অবনতি ঘটেছে যে, সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাত কার্যত পুঁজি সম্পর্কিত সক্ষমতার মানদণ্ড লঙ্ঘনের কাছাকাছি চলে এসেছে। নগদ অর্থ ব্যাংকে না রাখা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সরকারি ঋণ নেওয়ার কারণে তারল্য আরও কমে গেছে। যা বেসরকারি ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিবেদনগুলিতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়নি।

১০.২ স্থিতিশীলতা ও তারল্য

পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব: ২০২৪ সালের জুন মাসে মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত (সিআরএআর) ১০.৬৪ শতাংশ, যা ন্যূনতম ১০ শতাংশ নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার তুলনায় সামান্য বেশি। এটি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের ১১.৬৪ শতাংশ থেকে কমেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক (এসওবি), বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক (এসডিবি) এবং বেশ কয়েকটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (পিসিবি) দেউলিয়াত্বের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, ব্যাংকগুলোর সিআরএর নির্ধারিত ২.৫% অতিরিক্ত মূলধনের ঘাটতিতে রয়েছে, যা মূলধন সংরক্ষণ। বাফার (সিসিবি) হিসেবে প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

মোট সিআরএর নির্ধারিত নিরাপত্তা বাফার (Capital Conservation Buffer - CCB) ২.৫ শতাংশ অতিরিক্ত মূলধন সংরক্ষণের শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যাংকগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক। যখন কোনো ব্যাংকের সিসিবি প্রত্যাশিত সীমার নিচে নেমে যায়, তখন ব্যাংকগুলো তাদের লভ্যাংশ ও বোনাস দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

প্রকৃত চিত্র প্রকাশিত তথ্যের চেয়ে ভিন্ন: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাংক খাতের মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CRAR) বৃদ্ধির পেছনে প্রধান কারণ ছিল, কর পরবর্তী নিট মুনাফার (Net Profit After Tax) বৃদ্ধি— যা এমন এক সময়ে ঘটেছে, যখন ব্যাংক খাতের সম্পদের প্রবৃদ্ধি ও গুণগত মান উভয়ই অবনতির দিকে ছিল। প্রকাশিত নিট মুনাফার হিসাব বাস্তবতার তুলনায় অতিরঞ্জিত ছিল। যার পেছনে দায়ী ছিল দুর্বল নিয়ন্ত্রক মানদণ্ড এবং এসব মানদণ্ডের অপব্যবহার। ২০২২ সালে খেলাপি ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত সংরক্ষণ (Provisioning) না রাখার পরিমাণ ছিল প্রকাশিত মুনাফার ৭৭.৩ শতাংশ।

এর আগের দুই বছরে ঋণ নিরাপত্তা সংরক্ষণের ঘাটতি বা প্রভিশন শর্টফল বৃদ্ধি পেয়েছে। যা পরে কোনো সমন্বয় ছাড়াই চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক দুই বছর আগেই সতর্ক করেছিল, যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক শিথিল ঋণ সংরক্ষণ নীতি প্রত্যাহার করে; বর্তমান সিআরএর স্তর ধরে রাখা সম্ভব নাও হতে পারে। পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন রেয়াত বা সুবিধার মাধ্যমে নিয়মিত ঋণ হিসেবে দেখানো আদায় না হওয়া ঋণসমূহ প্রকাশ হওয়ার কারণে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে খেলাপি ঋণ বেড়ে যায়। এই ধরনের ঋণের অবমুক্ত প্রকাশ (unedited disclosures) খেলাপি ঋণের পরিসংখ্যানে আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। আগামী সময়েও খেলাপি ঋণ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ ঋণ শ্রেণিকরণের মানদণ্ড আরও কঠোর করা হচ্ছে। বর্তমানে ৩৬ মাস বা তার বেশি সময় ধরে ঋণ পরিশোধ না হওয়াকে খেলাপি ঋণ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

ঋণ খেলাপির কারণে স্থিতিশীলতা বিনষ্ট: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ (এনপিএল) নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা ২০২১ সালের জুনে ৭.৯% থেকে ২০২৪ সালের জুনে ১২%-এর ওপরে পৌঁছেছে। এটি এখন ২.১১ ট্রিলিয়ন টাকারও বেশি- যা একটি রেকর্ড। এই খেলাপি ঋণসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচলিত নমনীয় ঋণ শ্রেণিকরণ নীতিমালার আওতায় স্বীকৃত ঋণ। অর্থাৎ এখনও অনেক দুর্বল ঋণ খেলাপির পরিসংখ্যানে যুক্ত হয়নি। অনাদায়ী ঋণের ৮৮ শতাংশেরও বেশি সবচেয়ে খারাপ ক্যাটেগরিতে পড়ে, যা মন্দ ঋণ বা ব্যাড লোন নামে পরিচিত। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ এবং তার চেয়েও বেশি পরিমাণ খেলাপি ঋণ রয়েছে। তবে, তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের অস্বচ্ছতা বা একচেটিয়া অবস্থান এখন আর নেই— অন্যান্য ব্যাংকও এ ধরনের অনিয়মে যুক্ত হয়েছে।

ব্যাংক খাতে তারল্য সংকট: ব্যাংকগুলোর মধ্যে তারল্য ঘাটতির মাত্রা ব্যাপক। ইসলামিক বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর (ইসলামিক পিসিবিস) তারল্য ঘাটতি সবচেয়ে বেশি। বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক (এফমিবিএস) সবচেয়ে বেশি তারল্য সংরক্ষণ করেছে। এর পরে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক (এসওবি) এবং কিছু সাধারণ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (পিসিবিএস)। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত খাতটি সর্বনিম্ন আবশ্যিক নগদ সংরক্ষিত অনুপাত (সিআরআর) এবং আইনানুগ তারল্য অনুপাত (এসএলআর) বজায় রাখতে সক্ষম ছিল। তবে, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে এসওবি এবং ইসলামিক পিসিবির কারণে তারল্য পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে গেছে। বর্তমানে প্রতিদিনের ভিত্তিতে ব্যাংক খাতে দেশীয় মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিলের ঘাটতি প্রায় ১৫-২০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত চলছে।

একাধিক বেসরকারি ব্যাংক কার্যত ‘মৃত’ কিন্তু এখনো তারা চলেফিরে বেড়াচ্ছে। এসব ব্যাংক তাদের প্রকৃত সম্পদ মূল্য এবং তারল্য অতিরঞ্জিতভাবে দেখিয়েছে। ঋণের ক্ষেত্রে বাজারের ৩৩ শতাংশ এবং আমানতের ক্ষেত্রে ৩২ শতাংশ বাজার অংশীদারত্ব রয়েছে ১০টি ব্যাংকের। তাদের সম্পদের পুনরুদ্ধারযোগ্যতা এবং তারল্য নিয়ে সামান্য ঘাটাঘাটি করলেই দেখা যায়— এতদিন যেসব ব্যাংকের নিট সম্পদ ইতিবাচক হিসেবে দেখানো হচ্ছিল, তা আসলে অত্যন্ত নেতিবাচক অবস্থানে রয়েছে। একইভাবে, মোটামুটি স্বস্তিদায়ক তারল্য পরিস্থিতি যে আটটি ব্যাংকে দেখানো হচ্ছিল, প্রকৃত চিত্র হলো- তারা তারল্য সংকটে ভুগছে। উল্লেখ্য, এসব ব্যাংকের অনেকগুলো শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং মডেল অনুসরণ করে। যা নৈতিকভাবে বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করেছে শরিয়াহ সম্মত আর্থিক নীতির প্রতি বিশ্বাসের কারণে। কিন্তু এসব ব্যাংকের কেলেঙ্কারি, জালিয়াতি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে অর্থ আত্মসাতের ঘটনা সর্বজনবিদিত। ব্যাংক মালিকরা আমানতকারীদের ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে নৈতিকভাবে মুনাফা অর্জন করেছে।

১০.৩ সংকটের গভীরতা

বিদ্যমান পরিস্থিতি যতটা খারাপ বলে মনে হচ্ছে, আসল পরিস্থিতি তার চেয়েও তিনগুণ বেশি খারাপ। এনপিএলের উইন্ডো ড্রেসিং করা অংশগুলি হলো, পুনঃতফসিলকৃত বা পুনর্গঠিত ঋণ। কারণ, সেগুলো অতীতে খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। এবং অবলোপিত ঋণের (রাইটেন অফ) পরিমাণ, কারণ সেগুলি ব্যাড লোন হিসেবে ব্যালেন্সশিটে দীর্ঘ সময় ধরে থাকার কারণে বাদ পড়েছে। এইসব ক্যাটেগরি সময়ের সাথে সাথে বেড়েছে। স্বীকৃত এনপিএলের সাথে অবলোপিত এবং পুনঃতফসিলকৃত ঋণের অ-শ্রেণিবদ্ধ অংশ যোগ করলে, জুন ২০২৪-এর শেষে “সংকটাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ” সম্পদের পরিমাণ ছিল মোট ব্যাংক ঋণের ৩১.৭%।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মার্চ ২০২৩ এ সংকটাপন্ন ঋণের পরিমাণ ২,০৭,৩৬১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। যা ডিসেম্বর ২০২২-এর শেষে ১,৬৬,৬৮৮ কোটি টাকা ছিল। যদিও এখানে আদালতে আটকে থাকা বা বিচারাধীন থাকা ঋণের পরিমাণ হিসেবে নেওয়া হয়নি। এছাড়াও, স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্টে থাকা ঋণগুলো সম্ভবত সংকটাপন্ন হবে। এগুলো হলো ডিমান্ড এবং টার্ম লোন। যা ৬০ দিন বা তার বেশি সময় ধরে ওভারডিউ রয়েছে। এসওবি এবং পিসিবি এই ক্যাটেগরিতে ঋণের একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ ধারণ করে। ব্যাংকিং

খাতে কী পরিমাণ অর্থ ব্যাকহোলের মধ্যে রয়েছে সেটি দেখা যেতে পারে। জুন ২০২৪-এর শেষে ব্যাংক খাতে স্বীকৃত এনপিএ ছিলো ২,১১,৩৯১ টাকা। পুনঃতফসিলকৃত ও পুনর্গঠিত ঋণ ২,৭২,৮৫৬ টাকা, অবলোপিত ঋণ ৭৫,৩৮৯ টাকা, স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্ট ৩৯,২০৯ টাকা, আদালতের স্টে অর্ডার ৭৬,১৮৫ টাকা। সবমিলিয়ে ৬,৭৫,০৩০ কোটি টাকা। এই পরিমাণ টাকা দিয়ে ১৩.৫টি টাকা মেট্রোরেল এবং ২২.৫টি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা যেত। ব্যাংক খাত বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার কারণে বা কেবলমাত্র কয়েকটি দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য এত গভীর সংকটে পড়েনি। বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল নিয়ন্ত্রক কাঠামো বিভিন্নভাবে এই অনিয়মের সুযোগ তৈরি করেছে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত এই ধরনের চরম চাপ মোকাবিলার জন্য যথাযথভাবে প্রভিশনিং (সংরক্ষণ) করতে ব্যর্থ হয়েছে। ২০২৪ সালের জুন শেষে স্বীকৃত প্রভিশনিং ঘাটতির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৯,২৬১ কোটি টাকা। যা পরিস্থিতির তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। প্রকৃত প্রভিশনিংয়ের আকার হতবাক করার মতো। ২০২৪ সালের জুন শেষে ১০০ শতাংশ প্রভিশনিংয়ের আওতাধীন খারাপ ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৬৭,৮৮৯ কোটি টাকা। অথচ, সেই তুলনায় প্রকৃত প্রভিশনিং ছিল ৮৯,৩৫৫.৮ কোটি টাকা। যা কেবল খারাপ ঋণের প্রভিশনিংয়ের প্রয়োজনীয়তার তুলনায় অনেক কম। এরকম বিশাল পার্থক্যের পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে অভিযোগ রয়েছে যে, কিছু নির্দিষ্ট ব্যাংক আত্মীয়প্রীতি নির্ভর প্রভিশনিং স্থগিত সুবিধা (Provisioning Deferral Facility) দিয়েছে। এই সুবিধার ফলে, ব্যাংকগুলো তাদের প্রকৃত খেলাপি অবস্থান আড়াল করতে পেরেছে, ফলে ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি আরও গভীরতর হয়েছে।

ব্যাংক খাতের সংকট আরও গভীর হয়, যখন ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (এনবিএফআই) অনাদায়ী ঋণের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের ৩৫টি এনবিএফআইয়ের ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর শেষে ২১,৬৫৮ কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণ ছিলো। যা তাদের বিতরণকৃত ঋণের ২৯.৮ শতাংশ। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাদের অনাদায়ী ঋণের হার ছিল ২৫ শতাংশ। পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এবং ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ কেলেঙ্কারির কথা সবাই জানে। কিন্তু নিয়ন্ত্রক সংস্থা কার্যকর ব্যবস্থা না নিয়ে মাঝে মাঝে শুধু ছোট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে।

১০.৪ সংকটের কারণ

ব্যাংকিং খাতের যে সংকট তার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা সবাই শক্তিশালী ও প্রভাবশালী। যারা সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান তাদের অনিয়মের মাত্রাও সবচেয়ে বেশি। অনাদায়ী ঋণ যেখানে বেশি কেন্দ্রীভূত, সেখানেই ঋণের ঘনত্বও সবচেয়ে বেশি। মোট বিতরণকৃত ঋণের ৪৯ শতাংশই পেয়েছে দ্রুত বর্ধনশীল বিভিন্ন উৎপাদন খাত। একইসাথে, মোট অনাদায়ী ঋণের ৫৫ শতাংশও তাদের দখলে। তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল, জাহাজ নির্মাণ এবং জাহাজ ভাঙা শিল্পে এই বৈষম্য আরও প্রকট। ঋণের কেন্দ্রীকরণ, ঋণ খেলাপির প্রবণতা এবং ব্যাংকের ধরন (মালিকানা, প্রজন্ম) এই তিনটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র বিদ্যমান। প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যাংকিং খাতে যে সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। যার ফলে বর্তমান সংকট সৃষ্টি হয়েছে। অপারেশনাল ও বিনিয়োগ বরাদ্দের অদক্ষতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করেছে। যেসব উদ্যোক্তার বিনিয়োগযোগ্য জামানত নেই, তাদের জন্য নতুন উদ্ভাবন ও স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠার সুযোগ সংকুচিত হয়ে গেছে। প্রশাসনিক ছাড়, বিশেষ সুবিধা এবং নানা ধরনের অনিয়ম আইনজীবী, হিসাবরক্ষক, নিরীক্ষক এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার তদারককারীদের জন্য অনৈতিক অর্থপ্রাপ্তির পথ তৈরি করেছে।

এই একই শক্তিশালী গোষ্ঠী শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থাও ধ্বংস করেছে। বাজার কারসাজি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েকজন শক্তিশালী বিনিয়োগকারী ও প্রতিষ্ঠান সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন করে একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে শেয়ারমূল্য বাড়িয়েছে। শেয়ার বাজারে বুক-বন্ডিং প্রক্রিয়া এতটাই বিকৃত করা হয়েছে যে, এটি এখন আর কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বাজারমূল্য নির্ধারণ করতে পারছে না। আইপিও মূল্যায়নে অস্বাভাবিকতা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কম মূল্য নির্ধারণ, সাধারণ বিনিয়োগকারীদের চেয়ে

স্পন্সরদের বেশি সুবিধা দিচ্ছে। শেয়ারবাজার থেকে ট্রিলিয়ন টাকা জালিয়াতি, কারসাজি, প্লেসমেন্ট শেয়ার এবং প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে। একটি বৃহৎ কারসাজি নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। যেখানে প্রভাবশালী উদ্যোক্তা, ইস্যু ম্যানেজার, নিরীক্ষক এবং নির্দিষ্ট শ্রেণির বিনিয়োগকারী জড়িত। শেয়ারবাজারের মধ্যস্থতাকারীরা ১৩,০০০ কোটি টাকা লোকসানসহ দেউলিয়া হয়ে গেছে। এর মধ্যে মার্চেন্ট ব্যাংকারদের লোকসান ৭,০০০ কোটি টাকা এবং ব্রোকারেজ হাউসগুলোর লোকসান ৬,০০০ কোটি টাকা।

নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান এখানে রক্ষাকবচ হয়ে উঠতে পারেনি: নিয়ন্ত্রক সুরক্ষাগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে অকার্যকর করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের শীর্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রভাবশালী শক্তির যোগসাজশের বিষয়টি ২০১৫-২০২৪ সময়কালের আগে অতোটা প্রকাশ্য ছিল না। বাংলাদেশ ব্যাংকের শীর্ষ ব্যক্তির যখন রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, ঠিক তখনই দেশের মন্ত্রিসভার সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের একধরনের সমঝোতা তৈরি হয়। স্বার্থের এই জোট কীভাবে ব্যাংকিং নীতিমালা নিজেদের পক্ষে নিয়ে নিয়েছিল, তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ ২০২৩ সালের ২১ জুন পাসকৃত ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন ২০২৩। এই সংশোধনী ব্যাংকের স্পন্সর পরিচালকদের মেয়াদ ১২ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। এর আগে, ২০১৮ সালে ব্যাংক কোম্পানি আইন ২০১৩ সংশোধন করে পরিচালক পদের মেয়াদ ৯ বছর করা হয়েছিল।

সম্ভবত লোক দেখানোর জন্য, বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে একই পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ থেকে কমিয়ে ৩ করা হয়। যদিও ১৯৯১ সালের আইন অনুযায়ী এটি সর্বোচ্চ ২ থাকার কথা ছিল। যা ২০১৮ সালে ৪ এ উন্নীত করা হয়। ২০২৩ সালের সংশোধনী বাংলাদেশ কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডের মূলনীতিগুলোকে দুর্বল করে দেয়। যেখানে তালিকাভুক্ত ব্যাংক, ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা কোম্পানি এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে কমপক্ষে ৫ এবং সর্বোচ্চ ২০ জন পরিচালক থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। যার মধ্যে প্রতি পাঁচজনের একজনকে স্বাধীন বা নন-এক্সিকিউটিভ পরিচালক হতে হতো। কিন্তু, ২০২৩ সালের সংশোধনী সর্বনিম্ন ২ জন স্বাধীন পরিচালক রাখার বিধান অনুমোদন করে।

এই সংশোধনীর ফলে ‘ইচ্ছাকৃত’ এবং ‘অনিচ্ছাকৃত’ ঋণখেলাপীদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। যেখানে ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপীদের অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে— যারা “পরিশোধ করতে সক্ষম হলেও পরিশোধ করেন না”। ফলে এই ব্যাখ্যার জন্য বিচার বিভাগের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এই সংশোধনী যে কোম্পানিগুলোর খেলাপি হয়েছে তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে নতুন ঋণ পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। তবে এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে।

ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপীদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির মধ্যে ছিল বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা, ব্যবসার লাইসেন্স না দেওয়া, নতুন কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি না দেওয়া এবং পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। কার্যত খুবই হালকা ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য বা তাদের আত্মীয়দের জামানত, বন্ড বা নিরাপত্তার শর্তে ঋণ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। এই পরিবর্তনগুলোর ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থার আইনের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এটি “শাসকদের আইন” এ পরিণত হয়।

আইনের প্রয়োগ অত্যন্ত শিথিল ছিল। বিশাল পরিচালনা পর্ষদে স্বতন্ত্র পরিচালক কম থাকার কারণে, সেখানে স্পন্সরদের ইচ্ছাই শুধু বাস্তবায়ন হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব এবং বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের গঠনে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের যুক্ত করা হয়নি। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরীক্ষকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতারও প্রভাব ছিল না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে বেসরকারি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকে গুরুতর অনিয়ম হয়েছে। ফলে চলমান এবং ভবিষ্যৎ ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ করা যায়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের বিরুদ্ধে তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। যদিও তারা বছরের পর বছর নীতিমালা লঙ্ঘন করে আসছে এবং কোনো শাস্তির সম্মুখীন হয়নি। কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে ছিল অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপর।

লাইসেন্স দেওয়া হতো লেনদেনের ভিত্তিতে। সুযোগসন্ধানীরা অনায়াসে লাইসেন্স পেয়ে গেছেন। বর্তমানে যে ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে কোনো স্বচ্ছতা নেই। “ফিট অ্যান্ড প্রপার” মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রধান শেয়ারহোল্ডারের যোগ্যতা নির্ধারণের বাধ্যবাধকতা নেই এবং চূড়ান্ত সুবিধাভোগী মালিকের তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা নেই।

বেসরকারি ব্যাংকের লাইসেন্সিং মূলত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। অর্থনৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে অনেকের প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও, মালিকানা মূলত রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছেই গেছে। বেসরকারি ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ ছিল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের আরেকটি দৃষ্টান্ত।

প্রভাবশালী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ

বড় খেলোয়াড়রা বড় অংকের অর্থ আত্মসাৎ করেছে। ভুয়া কোম্পানি খুলে বা যথাযথ নথিপত্র ছাড়াই বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বড় অংকের অর্থ আত্মসাৎ করেছে বড় ঋণগ্রহীতারা। ২০০৮-২০২৩ সময়কালে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ২৪টি অনিয়মের ঘটনা নথিভুক্ত করেছিল। যার মধ্যে রয়েছে জালিয়াতি, আত্মসাৎ, প্রতারণা, চুরি, অর্থপাচার, অর্থের অপব্যবহার এবং বিভিন্ন অনিয়ম। প্রতারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হলো হলমার্ক গ্রুপ, বিসমিল্লাহ গ্রুপ, অ্যাননটেক্স, রিজেন্ট হাসপাতাল, এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক ইত্যাদি। যেগুলো সবই বড় প্রতিষ্ঠানের তালিকায় পড়ে। এই ২৪টি কেলেঙ্কারির মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৯২২.৬ বিলিয়ন টাকা, যা প্রতিটির ক্ষেত্রে গড়ে ৩.৮৬ বিলিয়ন টাকা বা ৩২ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু আয় প্রায় ২৬০০ ডলার। যদি গড়ে একজন ব্যক্তি ৫০ বছর ধরে বার্ষিক ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হারে এই আয় করে, তবে তার জীবদ্দশায় মোট উপার্জন হবে ০.৩১ মিলিয়ন ডলার। প্রতিটি কেলেঙ্কারিতে চুরি হওয়া অর্থের পরিমাণ গড় বাংলাদেশির সম্ভাব্য আজীবন আয়ের ১০৫ গুণের কাছাকাছি।

এসব প্রভাবশালীরা নানাবিধ সম্পর্ক কাজে লাগিয়েছে। নিজেদের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে তারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে। সম্পর্কিত পক্ষের লেনদেনে বিধিনিষেধ এখানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। পরিচালকরা এমন ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারে, যার পরিচালনা পর্ষদে তারা নেই। ফলে, এধরনের ঋণদান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ আটটি ব্যাংকের পরিচালকদের পারস্পরিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৫,০০০ কোটি টাকা। এই ব্যাংকগুলো নিয়ন্ত্রকের নজরদারির মধ্যে থেকেও নিয়ম ও মানদণ্ড লঙ্ঘন করেছে। ওই আট ব্যাংকের পরিচালকদের ঋণদাতা ব্যাংকগুলোর পরিশোধিত মূলধনে অবদান ছিল মাত্র ৫ শতাংশ। অথচ, তারা একে অপরের কাছ থেকে যে ঋণ নিয়েছে তা এই মূলধনের তুলনায় অনেক গুণ বেশি।

“নিয়ন্ত্রণমূলক স্বার্থ”, “চূড়ান্ত সুবিধাভোগী মালিকানা” এবং “সম্পর্কিত পক্ষ” সংজ্ঞাগুলো জটিল আন্তঃপারিবারিক সম্পর্কগুলোর ব্যাখ্যা করতে পারে না। যার ফলে সম্পর্কিত পক্ষের ঋণের প্রকৃত পরিমাণ গোপন থাকে। সম্পর্কিত পক্ষের ঋণ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থাও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

টেকনোক্র্যাটিক ব্যাখ্যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ঘাটতি বা আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার উপর ভিত্তি করে কেবলমাত্র লক্ষণগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। অন্যদিকে ব্যাংক মালিক, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, রাজনীতিবিদ এবং আমলাদের স্বার্থের পারস্পরিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারলে প্রকৃত চিত্র উঠে আসে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা, ক্ষমতাবাহী সরকারি ব্যক্তি এবং ব্যাংক মালিকদের প্রভাবে কর্পোরেট গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার পতন ঘটেছিল। ২০১৭ সালে একটি মাত্র বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী সাতটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। অবিবেচনাপ্রসূত ঋণ অনুমোদন নীতির ফলে তৃতীয় প্রজন্মের বেশ কয়েকটি সাধারণ বেসরকারি ব্যাংকে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাদের মালিক ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা কোনো শাস্তির সম্মুখীন না হয়ে নির্বিঘ্নে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মালিকরা বহু ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে ছিলেন। যেখানে স্বতন্ত্র পরিচালকেরা কার্যকর ভূমিকা পালন করেননি। ব্যবসায়িক প্রভাবশালীরা শক্তিশালী রাজনীতিবিদ ও আমলাদের সঙ্গে অবাধ লবিং করে ক্ষমতা বজায় রেখেছিলেন। যাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো নীতিগত ব্যবস্থা নেওয়া না হয়।

১০.৫ ঢাকা কনসেনসাস

আর্থিক ব্যবস্থার দুরবস্থা নিয়ে খুব একটা বিতর্ক নেই। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সামগ্রিকভাবে আর্থিক ব্যবস্থার এবং বিশেষভাবে ব্যাংকিং খাতের দুর্দশা সম্পর্কে একটি ঢাকা কনসেনসাস উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে।

ব্যাংক ব্যবস্থা মূলধন সংকট, তারল্য সংকট এবং অনিয়মে নিমজ্জিত। মূলধন সংকট ও তারল্য সংকটের প্রকৃত মাত্রা অনুমানের ওপর নির্ভরশীল, মূলধনের পর্যাপ্ততা ও তারল্য সম্পর্কে অতিরঞ্জিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। গত দেড় দশকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিপর্যস্ত সম্পদের পরিমাণ বহুগুণে বেড়েছে। যা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ও বেসরকারি উভয় খাতকে এবং প্রচলিত ও অধিকাংশ শরিয়াহ ব্যাংককে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিমা খাতও কার্যত দেউলিয়ার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। শেয়ারবাজার আর্থিক দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। কোম্পানির মৌলিক আর্থিক অবস্থা তাদের শেয়ারের বাজার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে একদমই প্রাসঙ্গিক ছিল না। যা উন্নত দেশের শেয়ারবাজারে দেখা সাধারণ ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অর্থনীতি নয়, বরং দুর্নীতিই প্রধানত বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী। বাংলাদেশের আর্থিক খাতের সংকট কোনো অর্থনৈতিক বিপর্যয়, আর্থিক সংকট বা এমনকি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থেকে উদ্ভূত হয়নি। বাণিজ্য, রেমিট্যান্স, বিনিয়োগ, মুদ্রাস্ফীতি, পণ্যদ্রব্যের মূল্য, বিনিময় হার এবং সুদের হার ইত্যাদি অর্থনৈতিক উপাদানগুলো দীর্ঘস্থায়ী ক্ষয় এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতি আস্থার সংকটের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কর্পোরেট ও নিয়ন্ত্রক গভর্ন্যান্সের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সরকারি অর্থ লুটপাটের জন্য একটি সুসংগঠিত ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, আমলা ও রাজনীতিবিদদের নেটওয়ার্ক সুস্পষ্ট ও গোপন উভয়ভাবেই আর্থিক ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের তাৎক্ষণিক ও ভবিষ্যৎ লেনদেনের ক্ষেত্রে এই ত্রিমুখী শক্তির স্বার্থ রক্ষায় আইন ও বিধিবিধান সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক জবাবদিহির ব্যবস্থা কার্যত অচল অবস্থায় পৌঁছেছে। বিরোধ নিষ্পত্তি, বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সম্পদের বণ্টনের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জনগণের আস্থা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে।

কয়েকটি সুস্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং উদ্ধার প্রত্যাশা ব্যাংক পরিচালনা ঠেকিয়ে রেখেছে। ত্রিমুখী এই শক্তিকে আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা ধরে রাখতে আর্থিক খাতের প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন ছিল, যাতে তাদের পঞ্জি স্কিম কার্যকর থাকে। এজন্য পেশাদারদের নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনার জন্য কিছুটা জায়গা দিতে হয়েছে। পেশাদাররা নিজেদের দক্ষতায় বহু প্রতিকূলতা অতিক্রম করে টিকে ছিল। প্রচলিত ব্যাংকিং, ক্ষুদ্র ঋণ এবং মোবাইল আর্থিক পরিষেবার কিছু সফল প্রতিষ্ঠান টিকে থাকায় এবং কোনো সরকারই আর্থিক ব্যবস্থা ধ্বংসের ঝুঁকি নেবে না এমন বিশ্বাসের ওপরে ব্যাংকগুলো টিকে ছিল। এর ফলে, আমানতকারীরাও ততটা উদ্বিগ্ন ছিল না। আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং সামগ্রিকভাবে আর্থিক খাত, বিশেষত ব্যাংকিং খাত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই প্রবৃদ্ধিকে টিকিয়ে রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।

ব্যাংকিং খাতে অলিগার্কদের ক্ষমতা মোকাবিলার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কীভাবে এই ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করে ঝুঁকি প্রশমন করা যায় এবং পরিবর্তিত সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিষেবা প্রদান করা যায়, তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতির সুস্থ বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির পরিবর্তন কীভাবে পরিচালনা করা উচিত, এ নিয়েও ভিন্নমত রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন একটি সুযোগ তৈরি করেছে। এখন ব্যাংকিং খাতে অলিগার্কদের চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক ও কিছু বেসরকারি ব্যাংককে

আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিতে পরিণত করা এই অলিগার্করা বর্তমানে গা ঢাকা দিয়েছে। তবে এখনো তারা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। যে সংস্কারগুলো দীর্ঘদিন আগে কার্যকর হওয়া উচিত ছিল, সেগুলো এখন এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যেন নতুন অলিগার্করা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে। এবং পূর্বসূরীদের খেলা পুনরায় শুরু করতে না পারে।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানগত ঝুঁকি হ্রাস করাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। সাম্প্রতিক শক থেরাপিগুলোর কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল নিশ্চিত করতে হলে চিন্তাশীলভাবে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন। যাতে প্রচলিত ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন আনা যায়। আন্তর্জাতিক মান ও বিধিনিষেধ থেকে সরে আসার ফলে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তা সংশোধনের লক্ষ্যে আইএমএফ কর্মসূচির অধীনে গৃহীত পূর্ববর্তী পদক্ষেপ ও বিশ্বব্যাংকের বাজেট সহায়তার আওতায় কিছু সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তবে এগুলোর মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের দায়মুক্তির সংস্কৃতি বদলানো সম্ভব হবে না। বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের মালিক ও পরিচালকের ক্ষমতা হারানোর পর ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠনের জন্য কিছু জরুরি ব্যবস্থা নিয়েছে। তবে সামনের পথ দীর্ঘ ও কঠিন। এখানে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যা ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে অনিয়মের সংস্কৃতি থেকে সুশাসনের ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য অপরিহার্য।

অধ্যায়-১১: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত: দুর্নীতির পরিকল্পিত ব্যবস্থা*

- উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলনের ওপর নির্ভর করে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা নির্ধারণ
- প্রয়োজনের চেয়ে ২০% বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা
- পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের ব্যর্থতা
- বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট মালিকদের সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের সম্পর্ক দুর্নীতির জন্ম দিয়েছে
- বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরিতে নজর দেওয়া হলেও পরিসংখ্যানীয় যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থার বিদ্যুতের ক্ষতি হয়েছে ১০.০৬%
- নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে লক্ষ্য আকাশচুম্বী কিন্তু অর্জন সামান্য
- নির্মাণ খরচের দিক দিয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল প্রকল্প
- রূপপুরের বিনিয়োগের টাকায় ৬-৮ হাজার মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য, গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন সম্ভব
- জ্বালানি বৈচিত্র্যের নামে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ছিল সরকারের ভুল সিদ্ধান্ত
- কিউইইইএস আইনে সামিটকে ১৫% বেশি দামে এলএনজি আমদানির সুযোগ দেওয়া হয়েছে
- রাজনৈতিকভাবে গ্যাস পরিসংখ্যান লাইন সম্প্রসারণের কারণে আর্থিক ক্ষতি বাড়ছে
- আমদানিনির্ভর জ্বালানির কারণে তিন বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে
- বিপিডিবিকে ২০০৮-০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১,৪৪,৪৫০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে
- রাজনৈতিক প্রভাব এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপে দুর্বল হয়ে পড়েছে জ্বালানি খাত
- কাল্পনিক ও অযৌক্তিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাক্কলিত অবাস্তব চাহিদাকে সামনে রাখে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে
- রাজনৈতিক অনুগতদের সুযোগ দিয়ে করা চুক্তির মাধ্যমে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে
- গ্যাস চুরির মাধ্যমে দেশে বছরে ক্ষতি হচ্ছে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতে দুর্নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন জ্বালানি উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা
- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে কোনো পূর্ণকালীন মন্ত্রী নিযুক্ত ছিল না
- কিউইইইএস বিশেষ বিধান আইন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রণীত সবচেয়ে বিতর্কিত আইন যার সুবিধা নিয়েছে অনেক প্রভাবশালী
- গত ১৪ বছরে বেসরকারি খাতে ক্যাপাসিটি মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার কোটি টাকা
- প্রভাবশালীরা বিদ্যুৎ প্রকল্প ব্যয়ের ১০ শতাংশ কমিশন বা ঘুষ হিসেবে নিয়েছে
- বিদ্যুতে ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের মধ্যে প্রায় ৩০০ কোটি ডলার গেছে ঘুষ ও কমিশনে
- বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির প্রকৃত পরিমাণ ও ব্যাপ্তি বোঝার জন্য জরুরিভাবে ফরেনসিক তদন্তের প্রয়োজন

১১.১ নীতিগত ভুল এবং দুর্নীতি বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ নিম্ন জ্বালানি নিঃসরণকারী দরিদ্র (এলইইপি) দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। যেখানে মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রতি ঘণ্টায় মাত্র ৪৬৫ কিলোওয়াট। যার বৈশ্বিক গড় প্রতি ঘণ্টায় ৩,০০০ কিলোওয়াটের কম। বিগত সরকার ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির দাবি করেছে। যেখানে উৎপাদন সক্ষমতা ৫,৭১৯ মেগাওয়াট থেকে ৩২,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, দেশে এখনও ঘন ঘন লোডশেডিং হয় এবং তীব্র গ্যাস সংকট রয়েছে। আমদানি নির্ভরতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে গুরুতর জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এরইমধ্যে গ্যাস ও বিদ্যুতের শুল্ক বৃদ্ধি

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন ড. ম. তামিম, অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

পেয়েছে, যা নাগরিকদের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়েছে। যদিও ৯৯ শতাংশ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। তবে অনিয়মিত সরবরাহ ব্যবস্থা, ব্যয়বহুল ও অস্থিতিশীল থাকার কারণে খাতটি টেকসই উন্নয়ন অসম্ভব (এসডিজি) অর্জনের পথে বড় বাধা। বিশেষ করে নিম্নমানের বিদ্যুৎ সরবরাহ ও পর্যাপ্ত গ্যাসের অভাবে শিল্প খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব সমস্যার পেছনে অযৌক্তিক নীতি ও এই খাতের ব্যাপক দুর্নীতি প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী। ভবিষ্যতে অগ্রসর হতে হলে অতীতের নীতি, বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিদ্যুৎ খাতের কার্যকারিতা নিয়ে গভীর ও সুপরিকল্পিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা রয়েছে। ২০১০ সালে তেলনির্ভর ভাড়াভিত্তিক উৎপাদন ইউনিট নির্মাণে সরকার আগ্রহী হয়। এর ফলে তেলনির্ভর স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী (আইপিপি) কোম্পানির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তেলের উপর নির্ভরতা বাড়ে। দুর্ভাগ্যবশত, এই সময়ে গ্যাস, কয়লা বা নবায়নযোগ্য জ্বালানির স্থানীয় সরবরাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি বিশেষভাবে কঠিন ছিল। কারণ তৎকালীন সরকার বিরোধীদলে থাকা অবস্থায় ফুলবাড়ীতে একটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতা করেছিল। নতুন বেজলোড পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোর উন্নয়নে বেশ বিলম্ব করা হয়েছিলো। যা তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এবং আমদানি করা কয়লার উপর নির্ভরশীল ছিল। এর ফলে পুরো বিদ্যুৎ খাত আন্তর্জাতিক জ্বালানি সরবরাহ এবং মূল্যের ওঠানামার উপরে অত্যন্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এছাড়া ২০১০ ও ২০১৬ সালের পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্লানে (পিএসএমপি) যথাক্রমে ৩৩,৭০০ মেগাওয়াট এবং ২৭,১০০ মেগাওয়াট পিক পাওয়ার চাহিদার প্রক্ষেপণ থাকা সত্ত্বেও, সরকার ২০৩০ এবং ২০৪০ সালের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৪০,০০০ মেগাওয়াট ও ৭৯,০০০ মেগাওয়াট (যা পরবর্তীতে ৬০,০০০ মেগাওয়াটে সংশোধন করা হয়) পর্যন্ত বাড়ায়। পুনর্বিবেচিত পিএসএমপি ২০১৬ পরিকল্পনার অধীনে এই সংশোধনের যৌক্তিকতা হিসেবে সরকার উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতের উচ্চ প্রত্যাশার যুক্তি তুলে ধরে। এর ফলে, বিদ্যুৎ বিভাগ এমন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে; যার মাধ্যমে উৎপাদন ইউনিটগুলো লাগামহীন সম্প্রসারণের অনুমতি পায়। ২০১০ সালের “বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ দ্রুত বৃদ্ধির (বিশেষ বিধান) আইন” প্রণয়নের ফলে দুর্নীতি বেড়ে যায় এবং ইউনিটগুলোর অনিয়মিত বরাদ্দ পাওয়া সহজ হয়।

বিদ্যুৎ খাতে চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা গেছে। নির্ধারিত সক্ষমতা প্রকৃত চাহিদার তুলনায় বেশি হয়ে গেছে। একইসঙ্গে, এই কৌশল বিদ্যুৎ খাতকে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের প্রতি নির্ভরশীল করে তুলেছে। কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এলএনজি এবং কয়লা আমদানি করা হয়েছে। এই বর্ধিত সক্ষমতাকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য চাহিদার পূর্বাভাস পুনর্বিবেচনার মধ্য দিয়ে দুর্নীতিকে উসকে দেওয়া হয়েছে।

১১.২ বর্তমান এবং প্রত্যাশিত বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা

বর্তমানে, বাংলাদেশে কার্যকর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৬,৭০০ মেগাওয়াট। যার মধ্যে মাত্র ৮৯৩ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে আসে। যার মধ্যে একটি পুরানো ২৩০ মেগাওয়াটের জলবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট অন্তর্ভুক্ত। এই পরিসংখ্যানে ৩,৭০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তেলনির্ভর চুক্তিভিত্তিক এবং স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদক (আইপিপি) প্ল্যান্টগুলো অন্তর্ভুক্ত নয়। যেগুলো তাদের চুক্তি শেষ হওয়ার পর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, ২০৩০ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৬,০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা যোগ হওয়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে, যার মধ্যে ২,৪০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক শক্তি অন্তর্ভুক্ত।

যৌথ সাইকেল গ্যাস টারবাইন (সিসিজিটি) প্ল্যান্টের জন্য চুক্তির মেয়াদ ২২ বছর এবং কয়লা প্ল্যান্টের চুক্তির মেয়াদ ২৫ বছর। যদি বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (বিপিডিবি) মালিকানাধীন কিছু পুরানো প্ল্যান্ট

বন্ধ করা হয় এবং কিছু আইপিপি চুক্তি শেষ হয়। তবে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৩০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতায় পৌঁছাবে। যা মূলত জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভর করবে। এছাড়াও, ২০৪০ সাল এবং তার পরবর্তী সময় পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্ল্যান্টগুলোর জন্য ২৫,০০০ মেগাওয়াটেরও বেশি চুক্তিভিত্তিক শর্তারোপ করা হয়েছে।

অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক চাপ

সম্প্রতি সব চুক্তিভিত্তিক এবং কিছু স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদক (আইপিপি) প্ল্যান্ট বন্ধ হওয়া এবং সরকারি মালিকানাধীন অকার্যকর প্ল্যান্টগুলো বন্ধ হওয়ার পরেও, প্রায় ৩২,০০০ মেগাওয়াট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছিল। তবে, কিছু অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে এই ক্ষমতা প্রায় ৩০,০০০ মেগাওয়াটে নেমে এসেছে। ২০২৪ সালের গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ চাহিদার সময় বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ১৭,০০০ মেগাওয়াট। যেখানে সর্বোচ্চ উৎপাদন পৌঁছায় ১৬,৪৭৭ মেগাওয়াটে। যদি মোট ক্ষমতার ১০% সংরক্ষণ করা হয় জরুরি বিদ্যুতের জন্য এবং আরও ১০% রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ করা হয়, তবে অবশিষ্ট ৮০% সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন ক্ষমতা হবে ২৫,৫০০ মেগাওয়াট। ফলে, দেশে প্রায় ৫,০০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। যা প্রয়োজনের চেয়ে ২০% বেশি। এর ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ক্যাপাসিটি চার্জ তৈরি হয়েছে, যা গ্রাহকদের জন্য বড় আর্থিক চাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থাপিত ক্ষমতা প্রকৃত চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি এবং খাতটি আমদানি করা প্রাথমিক জ্বালানির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হওয়ায় পুরো অর্থনীতি ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। বিশেষত, বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় আমদানির অর্থায়নের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি রয়েছে। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, যার দায়িত্ব ছিল উৎপাদকদের উপর নজরদারি করা এবং ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা করা। তবে প্রতিষ্ঠানটি এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে এবং বারবার বিদ্যুতের গুরুত্ব বাড়ানোর পক্ষে ন্যায্যতা দেখিয়েছে। এর ফলে অর্থনীতির উপর বিরাট চাপ তৈরি হয়েছে এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা এবং তৈরি পোশাক খাতের প্রতিযোগিতার সক্ষমতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।

একইসঙ্গে, এই অসমাপ্তসত্যের ফলে বিদ্যুৎ খাতে প্রায় ৪.৪৮ বিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত বিনিয়োগ ঘটে। যেহেতু প্রায় সব বেসরকারি খাতের স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদক (আইপিপি) বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের মালিকানাধীন, তাই এই অতিরিক্ত বিনিয়োগ বাংলাদেশের বৈশ্বিক ঋণ বাজারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলেছে। উপরন্তু, অনেক বিনিয়োগেই সার্বভৌম জামানতের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়েছে। যা দেশের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতাকে আরও বাড়িয়ে বৈশ্বিক ঋণের ঝুঁকিতে ফেলেছে।

পরিচালনাগত সীমাবদ্ধতা এবং রাজনৈতিক প্রভাব

শীর্ষ ও নিম্ন চাহিদার সময় বিদ্যুৎ সরবরাহের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো সাধারণত বেজলোড উৎস হিসেবে কাজ করে। এবং অধিকাংশই গ্যাস ও ডুয়েল-ফুয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (CCGT)। যা মূলত বেজলোড উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পিক এবং মধ্যবর্তী চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় গ্যাস টারবাইনভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রাপ্যতা সীমিত। জ্বালানি ঘাটতি ও গ্রিডের সীমাবদ্ধতার কারণে, তেল-চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর উপর নির্ভর করতে হয়েছে, যা বেজলোড এবং পিক— উভয় চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয়েছে।

যথাযথ গ্যাস সরবরাহ থাকলে, CCGT কেন্দ্রগুলো তাদের উৎপাদন সামঞ্জস্যের মাধ্যমে মধ্যবর্তী ও পিক লোড পরিচালনা করতে পারে। ফলে তেল-চালিত কেন্দ্রের বিকল্প হয়ে ওঠে এবং খরচ শাস্ত্রীয় হয়। পাশাপাশি, সৌরবিদ্যুৎ দিনের বেলা তেল-চালিত কেন্দ্রের উপর নির্ভরতা কমিয়ে উৎপাদন ব্যয় কমাতে সহায়ক হয়।

তবে, পিক চাহিদা পূরণে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া এবং তাড়াহুড়ো করে কেবলমাত্র বেজলোড কেন্দ্র স্থাপন করায় পরিকল্পনায় গুরুতর ব্যর্থতা প্রতীয়মান হয়। অনেকের মতে, এটি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের লক্ষণ। যেখানে অপেশাদার গোষ্ঠী বিদ্যুৎকেন্দ্রের ধরন ও অবস্থান নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই নীতি-অসামঞ্জস্যতা অপারেশনাল চাপ সৃষ্টি করেছে এবং উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়েছে। বিশেষত বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকদের সাথে ক্ষমতাসীন সরকারের রাজনৈতিক সম্পর্ক বিবেচনায় এমন অভিযোগকে বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়।

১১.৩ জ্বালানির প্রয়োজনীয়তা ও জ্বালানির বোঝা

বিদ্যুৎ খাতে জ্বালানির পরিবর্তনশীল মিশ্রণ দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভেও প্রভাব ফেলেছে। গ্যাসভিত্তিক ক্ষমতা, যা ডুয়েল-ফুয়েল প্ল্যান্টসহ বর্তমানে ১১,৩০০ মেগাওয়াট; পূর্ণ ক্ষমতায় চালাতে দৈনিক ১.৮ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রয়োজন—বাৎসরিক চাহিদা ৬৫০ বিলিয়ন ঘনফুটের বেশি। এর প্রায় ৭০% গ্যাস আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির (IOC) মাধ্যমে উৎপাদন অংশীদারি চুক্তি (PSC) অনুসারে সংগ্রহ করা হয়। যেখানে, দাম মেটানো হয় বিদেশি মুদ্রায়। সিঙ্গাপুর স্পট মার্কেটে অপরিশোধিত তেলের সমপরিমাণ মূল্যের ভিত্তিতে, PSC-তে নির্ধারিত সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে।

আদানী বিদ্যুৎকেন্দ্র বাদ দিয়ে ৫,৬৭০ মেগাওয়াট পরিচালনার জন্য বছরে প্রায় ১.৮ কোটি টন কয়লা প্রয়োজন। তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বেসরকারি খাত ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ সালে যথাক্রমে ২.৮৪ এবং ১.০৯ মিলিয়ন টন হেভি ফুয়েল অয়েল (HFO) আমদানি করা হয়। একই সময়ে, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (BPC) ০.৪৩ এবং ০.৬৬ মিলিয়ন টন HFO সংগ্রহ করে। অক্টোবর ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত, BPC ০.৫৫ মিলিয়ন টন HFO এবং ০.১ মিলিয়ন টন ডিজেল আমদানির পরিকল্পনা করে, যার আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা।

২০১৮ সাল থেকে, বাংলাদেশ কাতার-ওমান এবং স্পট মার্কেট থেকে মোট ১,৩৬০ মিলিয়ন MMBTU এলএনজি কিনেছে, যার মোট ব্যয় হয়েছে ১,৬৪,০০০ কোটি টাকা (১৭% VAT এবং অগ্রিম আয়করসহ)। আমদানিকৃত এলএনজি মোট গ্যাস চাহিদার প্রায় ২৫% পূরণ করেছে।

ফলে অতিবিনিয়োগের চাপ ছাড়াও, বিদ্যুৎ খাতকে এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট বার্ষিক ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধের বাড়তি দায়ভার বহন করতে হচ্ছে।

স্থানান্তর এবং বণ্টনে সীমাবদ্ধতা: দক্ষিণের সমস্ত বড় বেজলোড কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং মেঘনাঘাট এলাকায় তিনটি নতুন যৌথ সাইকেল গ্যাস টারবাইন (সিসিজিটি) কেন্দ্র, স্থানান্তর ও বণ্টন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং জ্বালানির ঘাটতির কারণে সম্পূর্ণ কার্যক্ষমতা ব্যবহার করে কাজ করতে পারছে না। উপরন্তু, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানান্তরের পথ এখনো অসম্পূর্ণ, যে কারণে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিলম্বে চালু হতে পারে। এটি একটি উদাহরণ, যেখানে বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে; অথচ জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

২০২৬ সাল থেকে এই প্রকল্পের জন্য নেওয়া ঋণের বার্ষিক কিস্তি পরিশোধে বাংলাদেশকে প্রতি বছর ৫০০ মিলিয়ন ডলার দিতে হবে। বেশ কয়েকটি এলাকায় ৪০০/১৩২ কেভি এবং ২৩০/১৩২ কেভি ট্রান্সফরমার অতিরিক্ত লোড বহন করছে, যার কারণে ১৩২ কেভি লাইনে স্থিতিশীলতা এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে স্থানীয়ভাবে তেল উৎপাদন প্রয়োজন। যদি এই তেলচালিত প্ল্যান্ট এবং অন্যান্য পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো পূর্ণ জ্বালানি সরবরাহ পায়, তবে দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ হবে। ২০২৩-২৪ সালে ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থার ক্ষতি ছিল ১০.০৬%। তবে চুরি প্রতিরোধ এবং গ্রিড আধুনিকায়নের মাধ্যমে এই ক্ষতি এক অংকে নামিয়ে আনা সম্ভব।

নবায়নযোগ্য শক্তি: নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও সংস্থার লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে ৩৭০০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি যুক্ত করার লক্ষ্য রয়েছে; ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-এ ২০৪১ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নবায়নযোগ্য শক্তি সংযোজনের কথা বলা হয়েছে। সর্বশেষ মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্লানে (২০২২-২০৪১) ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০% নবায়নযোগ্য শক্তি অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, PSMP ২০১৬ ও পার্সপেকটিভ প্ল্যান ২০২১-এ ২০৪১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি অর্জনের কোনো নির্দিষ্ট সুযোগ উল্লেখ নেই। তবে বিকল্পভাবে ১০% ও ২০% নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাব্য দৃশ্যপট দেখানো হয়েছে। নতুন ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টারপ্ল্যান (IEPMP) ২০২৩ অনশোর এবং অফশোর উইন্ড পাওয়ার সম্পর্কে সতর্কভাবে আশাবাদী হলেও, ২০৪১ সালের জন্য সৌরশক্তির লক্ষ্য খুব বেশি অনুকূল নয়।

ফলে গবেষক, বিনিয়োগকারী ও নীতিনির্ধারকেরা নিজেদের সুবিধামত সংখ্যাগুলো ব্যবহার করে থাকেন। জলবায়ু ও পরিবেশকর্মীরাও উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য স্থির করেন। যা সাধারণ মানুষকে আরও বিভ্রান্ত করে।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB) এবং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশের (PGCB) প্রকৌশলীদের মতে, বিদ্যমান পাওয়ার গ্রিড অবকাঠামো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সর্বমোট ৪০০০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি যুক্ত করতে সক্ষম। তবে বিশেষ করে পারমাণবিক শক্তি অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে স্থিতিশীল ফ্রিকোয়েন্সি ও ভোল্টেজ বজায় রাখতে প্রচুর স্পিনিং এবং নন-স্পিনিং রিজার্ভ (ব্যাটারিসহ) প্রয়োজন হবে। গ্রিড আধুনিকায়নের মাধ্যমে আরও ৬০০০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য শক্তি অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।

তবে, বর্তমানে মাত্র ৬০০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য শক্তি গ্রিডে সংযুক্ত রয়েছে— যা গত দশকে নবায়নযোগ্য শক্তির প্রতি পূর্ববর্তী সরকারের অবহেলাই স্পষ্ট করে।

পারমাণবিক শক্তি: ২০১৬ সালের মে মাসে রাশিয়ার সাথে ১২.৬৫ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি চূড়ান্ত হয়, যার অধীনে রূপপুরে ১,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ভিভিইআর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। রাশিয়া ১১.৩৮৫ বিলিয়ন ঋণ হিসেবে দেবে। যা লাইবর প্লাস ১.৭৫ শতাংশ সুদে প্রস্তাব করা হয় এবং সর্বাধিক সুদ হবে ৪%। বাংলাদেশকে এই ঋণ ২৮ বছরে পরিশোধ করতে হবে। প্রথম ১০ বছর থাকবে গ্রেস পিরিয়ড।

প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত ৫৫০ মিলিয়ন ব্যয়ের সাথে মোট ব্যয় ইতোমধ্যে ১৩.২ বিলিয়ন ছাড়িয়েছে। তবে অনেকেই এই চুক্তিকে অত্যধিক খরচসাপেক্ষ বলে দাবি করেছেন। এটি বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল বিদ্যুৎকেন্দ্র। ভারতে যেখানে ইউনিটপ্রতি খরচ ৩.৩৫০/কিলোওয়াট, সেখানে রূপপুরের ইউনিট প্রতি খরচ ৫.৫০০/কিলোওয়াট। উচ্চ খরচ ছাড়াও, একটি স্বাধীন ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার (এনএলডিসি) এবং এর স্বয়ংক্রিয়করণ ছাড়া জাতীয় গ্রিড পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনায় প্রস্তুত নয়। এর ফলে, বড় ধরনের কার্যক্রমগত সমস্যা তৈরি হবে এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রটি চালু হতে বিলম্ব হবে। জ্বালানি বৈচিত্র্যের নামে পারমাণবিক শক্তিকে বেছে নেওয়া ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। একই বিনিয়োগে ৬,০০০ থেকে ৮,০০০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য, গ্যাস বা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা যেত।

১১.৩ গ্যাস সংকট এবং অব্যবস্থাপনা

২০০৭ সালের গ্যাস সংকটে দৈনিক ৩০০ এমএমসিএফডি (মিলিয়ন কিউবিক ফুট পার ডে) ঘাটতি ছিল, তাই সমাধান করা যায়নি। বর্তমানে, গ্যাসের দৈনিক ঘাটতি আনুমানিক ১০০০ থেকে ১৫০০ এমএমসিএফডি। ২০০৯-১০ সালে, পেট্রোবাংলা গ্যাস সংকট সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং নতুন গ্যাসের মজুত অনুসন্ধান ও বিদ্যমান উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনাও করেছিল। যদিও তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফডি এলএনজি আমদানি করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।

২০১০ সালের মধ্যে, প্রথম এলএনজি রিগ্যাসিফিকেশন প্ল্যান্টের প্রস্তাব করা হয়। যা ২০১২ সালের মধ্যে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। ২০০৯ সালে পেট্রোবাংলা এবং আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর (আইওসি) দৈনিক যৌথ উৎপাদন প্রায় ২০০০ এমএমসিএফডি ছিল। যা ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে দৈনিক ২৬৫০ এমএমসিএফডিতে পৌঁছায়। এরপর থেকে পেট্রোবাংলার উৎপাদন কমতে শুরু করে। তবে আইওসি কম গ্যাসের মজুতের মধ্যেও দৈনিক ১২০০ থেকে ১৫০০ এমএমসিএফডি গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত রাখে।

২০১৮ সাল থেকে, পেট্রোবাংলা গ্যাস সরবরাহের ঘাটতি পূরণে এলএনজি আমদানি শুরু করে। বর্তমানে, আইওসিসহ পেট্রোবাংলা মজুত থেকে দৈনিক প্রায় ২০০০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করে এবং আমদানিকৃত এলএনজি থেকে দৈনিক ৫০০ থেকে ৭০০ এমএমসিএফডি সরবরাহ করে। তবে, এলএনজি সরবরাহ কখনো কখনো ব্যাহত হয়। উচ্চ মূল্যের কারণে বা ফ্লোটিং স্টোরেজ এবং রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিটের (এফএসআরইউ) প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে এলএনজি সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয়। বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা দৈনিক কমপক্ষে ৪০০০ এমএমসিএফডি। উল্লেখযোগ্যভাবে, বাকি উৎপাদনযোগ্য ২পি (প্রভেন+প্রবেবল) গ্যাসের মোট মজুত ৮.৬৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ)।

যার মধ্যে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর দখলে রয়েছে ২.৬২ টিসিএফ। আর বাকি ৬.০৪ টিসিএফ পরিচালনা করছে পেট্রোবাংলা। পেট্রোবাংলা বিতর্কিত কুইক এনহ্যান্সমেন্ট অব ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড এনার্জি সাপ্লাই (কিউইইইএস) আইন ২০১০ অনুসারে বৈশ্বিক মূল্যের তুলনায় বেশি দামে এলএনজি আমদানি চালিয়ে যাচ্ছে। এই আইন বাংলাদেশের ঋণ সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলছে। সামিট গ্রুপের সাথে করা চুক্তি অনুযায়ী, এলএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে বৈশ্বিক দীর্ঘমেয়াদি হারের চেয়ে ১৫% বেশি মূল্যে। যদি বিদ্যমান মজুত থেকে উৎপাদন বাড়ানো না হয় বা নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কার না হয়, তাহলে আগামী পাঁচ বছরে দেশীয় গ্যাস সরবরাহ দ্রুত হ্রাস পাবে এবং ব্যাপক পরিমাণ এলএনজি আমদানি বাধ্যতামূলক হয়ে উঠবে।

গ্যাসের চাহিদা-সরবরাহ পরিকল্পনা: পেট্রোবাংলার গ্যাস চাহিদার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ২০২৯-৩০ সালের জন্য তিনটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে দৈনিক ৩০০০ এমএমসিএফডি থেকে ৬৬০০ এমএমসিএফডি পর্যন্ত চাহিদা পরিবর্তিত হতে পারে। সবচেয়ে সম্ভাব্য চাহিদা দৈনিক প্রায় ৫০০০ এমএমসিএফডি হতে পারে, যা বিদ্যুৎ খাতের পুরো চাহিদা পূরণ করবে। স্থানীয় গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যে গ্যাস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড তৈরি করা হয়েছিল, তা এলএনজি আমদানির জন্য ব্যবহার করা হয়। যার ফলে কোনো গ্যাস অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। বাপেক্সের নতুন উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা থেকে ওয়ার্কওভার দিয়ে প্রায় ৩০০ এমএমসিএফডি এবং নতুন আবিষ্কার থেকে প্রায় ৮১০ এমএমসিএফডি আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৮ সালের মধ্যে মোট ১০০টি কূপ খননের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যার মধ্যে ৫৪টি অনুসন্ধানমূলক, ১৫টি উন্নয়নমূলক এবং ৩১টি ওয়ার্কওভার কূপ অন্তর্ভুক্ত। এটি প্রায় অবাস্তব কর্মসূচি। ১৯৫০-এর দশকে অনুসন্ধান শুরুর পর থেকে বাংলাদেশে মোট ৯৩টি অনুসন্ধানমূলক কূপ খনন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের অফশোর বিডিং প্রক্রিয়ায় নয়টি অগভীর এবং ১৫টি গভীর সমুদ্র ব্লক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সাতটি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি বিড ডকুমেন্ট কিনেছে।

গ্যাস পরিবহন ও বিতরণ: স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত গ্যাস এবং এলএনজি সারা দেশে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেডের (জিটিসিএল) মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। এই কোম্পানির দৈনিক ৪০০০ এমএমসিএফডি গ্যাস পরিচালনার সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এটি মাত্র ২১০০ এমএমসিএফডি গ্যাস পরিবহন করে। এর ফলে তাদের মোট সক্ষমতার প্রায় ৫০% অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। যা কোম্পানিটিকে লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করছে। কিছু বিতরণ কোম্পানি এবং পেট্রোবাংলা নিজেই গ্যাস পরিবহনের কিছু লাইন পরিচালনা করে। যা মোট গ্যাসের ৩০% সামলায়। বিগত সরকারের শাসনামলে জ্বালানি খাতের অনেক সিদ্ধান্তই রাজনৈতিকভাবে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গ্যাস পরিবহন লাইন রাজশাহী, খুলনা এবং সৈয়দপুরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এলএনজি আমদানির প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে। বর্তমানে এই পাইপলাইনগুলো প্রায় ফাঁকা পড়ে আছে। যার ফলে কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে এবং সরকারের উপর আর্থিক বোঝা বাড়ছে।

বিদ্যুতের জন্য তেল আমদানি: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং বেসরকারি খাতের বিদ্যুৎ উৎপাদকেরা তেল-চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এইচএফও (হেভি ফুয়েল ওয়েল) আমদানি করে। সরকার ২০১১ সালে কিছু অপারেটরের জন্য বেসরকারি এইচএফও আমদানির অনুমতি দেয়। পরবর্তীতে, অধিকাংশ বেসরকারি এইচএফও বিদ্যুৎকেন্দ্র অপারেটরদের ৯% অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জসহ এইচএফও আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়। এই অতিরিক্ত চার্জ লাভজনক ছিল। কারণ মোট পরিবহন খরচ, কর এবং ক্ষতি ৫% এর বেশি ছিল না। তবে ২০২১ সাল থেকে বেসরকারি আমদানিতে ৩৪% কর দিতে হয়, যা আগে মওকুফ করা হয়েছিল। এই কর আরোপের ফলে এইচএফওভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বেড়ে যায়। ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বিপিসি এর মাধ্যমে আমদানিকৃত এইচএফওর গড় খরচ ছিল প্রতি মেট্রিক টনে ৫০০-৬০০ ডলার।

১১.৪ ব্যয় এবং মূল্য নির্ধারণ

বিদ্যুৎ: কম সক্ষমতার তরল জ্বালানির ধারাবাহিক ব্যবহার (ডিজেল প্লান্ট ফ্যাক্টর ১০% এর কম) এবং আমদানি করা জ্বালানি থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির (বর্তমানে প্রায় ৬৫%) কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ সালে উৎপাদন ব্যয় ছিল ৬.৬১ টাকা/কিলোওয়াট-ঘণ্টা। যা ২০২৩-২৪ সালে এসে ১১.৫১ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

এলএনজি আমদানি বৃদ্ধির কারণে, পেট্রোবাংলা বিদ্যুৎ খাতের জন্য গ্যাসের মূল্য ৪.৫ টাকা/ঘনমিটার থেকে ১৫.৫ টাকা/ঘনমিটার করেছে, যা উৎপাদন ব্যয়ে বড় প্রভাব ফেলেছে। ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন ৮৫ টাকা থেকে ১২০ টাকা হওয়ায় উৎপাদন ব্যয় আরও বেড়েছে। যে সমস্ত চুক্তিতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল না, সেখানে ডলারের হিসাব চালু রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বিতরণ সংস্থাগুলোর জন্য গড় পাইকারি বিক্রয়মূল্য ৭.০৪ টাকা/কিলোওয়াট-ঘণ্টায় উন্নীত করা হলেও ৪.৪৭ টাকা/কিলোওয়াট-ঘণ্টা লোকসান গুনতে হচ্ছে। ২০০৮-০৯ সাল থেকে, বিপিডিবি মোট ১,৪৪,৪৫০ কোটি টাকা ভর্তুকি পেয়েছে। গত দুই বছরে বার্ষিক ভর্তুকি প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। যা আর্থিকভাবে টেকসই সমাধান হতে পারে না।

বর্তমানে আইপিপি, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যুৎ আমদানির জন্য মোট বকেয়া ৩৯,৭৫২ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ সালে বিপিডিবি নগদ ও বন্ডসহ মোট ৩৩,০০০ কোটি টাকা ভর্তুকি পেলেও, এটি মোট বকেয়া পাওনার বাইরে ২৫,৪২০ কোটি টাকা লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। ভর্তুকি কমানোর জন্য আমদানিনির্ভরতা হ্রাস, পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শুল্কহার বৃদ্ধির সংমিশ্রণ প্রয়োজন।

জ্বালানি: এলএনজি আমদানির জন্য ২০১০ সালের বিশেষ বিধান আইনের আওতায় ৩.৬ মিলিয়ন টন বার্ষিক ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি এফএসআরইউ স্থাপন করা হয়েছে। প্রথম এলএনজি চালান ২০১৮ সালে এসেছে। ২০১৯-২০ সাল থেকে জাতীয় গ্রিডে প্রতিদিন ৫৫০ থেকে ৬৭৫ এমএমসিএফডি এলএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে। এর ফলে, গ্যাসের গড় বিক্রয় মূল্য ২০১৯-২০ সালে ৯.৭ টাকা/ঘনমিটার থেকে ২২.৮৭ টাকা/ঘনমিটার করা হয়েছে, যা মূল্যের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। বর্তমানে গ্যাসের গড় ক্রয়মূল্য (দেশীয় গ্যাস, আইওসি গ্যাস এবং এলএনজি) ২৪.৩৮ টাকা/ঘনমিটার, যা বার্ষিক প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা লোকসান সৃষ্টি করছে। মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে, পেট্রোবাংলা নিজস্ব গ্যাস ১.০ টাকা/ঘনমিটারে (বাপেক্সের জন্য ৪ টাকা/ঘনমিটার), আইওসি গ্যাস ৮.৬১২ টাকা/ঘনমিটার এবং এলএনজি প্রায় ৫৫ টাকা/ঘনমিটার দরে কিনছে। গ্যাসের মিশ্রণে এলএনজির অংশ বাড়ার ফলে, ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাবে। এলএনজি এবং আইওসি গ্যাস ক্রয়ের জন্য মোট বকেয়া যথাক্রমে ২২৩.১৪ মিলিয়ন ডলার এবং ১৮২.৬ মিলিয়ন ডলার। আইওসি গ্যাস ক্রয় এবং এলএনজি আমদানির জন্য এনবিআরের কাছে দেশীয় ভ্যাট/এসডি বাবদ ১৯,৭০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য এনবিআরের কাছে পেট্রোবাংলা ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ ১৫,১৩৬ কোটি টাকা ঋণী রয়েছে। অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে মোট বকেয়ার পরিমাণ আনুমানিক ৫০,০০০ কোটি টাকা (৪.১৬ বিলিয়ন)। এতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পাওনা অন্তর্ভুক্ত নয়। ২০২৩ সালে, তৎকালীন সরকার দাবি করেছিল, ২০০৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে মোট ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে।

১১.৫ চুক্তি এবং নীতি

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সংস্কার একচেটিয়াত্ব রোধ এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উভয় খাতেই প্রশাসনিক এবং কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন। বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো রাজনৈতিক প্রভাব এবং স্বার্থাশ্রয়ে গৌষ্ঠীর হস্তক্ষেপে দুর্বল হয়ে পড়েছে। বিপিডিবি এবং পেট্রোবাংলার হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে একচেটিয়া পরিবেশ তৈরি হয়েছে। উৎপাদনের জন্য জ্বালানি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটি শিল্পখাতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। ফলে, এই সংস্থাগুলোর পরিচালনা পর্ষদে স্বতন্ত্র পরিচালক থাকা উচিত। যারা ভোক্তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবেন। পর্ষদে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যারা জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া, পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা বোর্ডগুলোর হাতে না রেখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনকে (বিইআরসি) শক্তিশালী করা দরকার। যেন কমিশন স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যেমনটি একটি আদর্শ একচেটিয়া নিয়ন্ত্রক সংস্থা করে থাকে। মূলত, প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র এবং রাজনৈতিক অনুগত ব্যক্তিদের নিয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের সিদ্ধান্তের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) এবং পেট্রোবাংলা: বিপিডিবি বিদ্যুৎ খাতের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে এবং এটি বাজারের একমাত্র ক্রেতা হিসেবে বিদ্যুতের শুদ্ধ ও চুক্তি নির্ধারণ করে। পূর্ববর্তী সরকার কাল্পনিক ও অযৌক্তিক উপাত্ত ব্যবহার করে চাহিদার আবাস্তব পূর্বাভাস তৈরি করেছিল। এর মাধ্যমে একের পর এক বিদ্যুৎকেন্দ্র সংযোজন করে গিয়েছিল। বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর ধরন ও অবস্থান অনেকক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতির চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না; বরং রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত ছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক অনুগতদের চুক্তি দেওয়া এবং দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করা। বিপিডিবি ও পাওয়ার ডিভিশন জ্বালানি বিভাগের সঙ্গে যথাযথ সমন্বয় না করেই বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র অনুমোদন করেছিল। যেখানে প্রয়োজনীয় জ্বালানির (বিশেষ করে এলএনজি) সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়নি। অনেক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ট্রান্সমিশন লাইন যথাসময়ে সম্পন্ন না করায় বিশাল পরিমাণ ক্যাপাসিটি মূল্য দিতে হয়েছে (যেমন: পায়রা, এসএস পাওয়ার, মাতারবাড়ি)।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত আবার রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হতে পারে। এজন্য, একটি জাতীয় পর্যায়ের (কেবলমাত্র ইউটিলিটি পর্যায়ের নয়) স্বাধীন সংস্থা গঠন করা দরকার। যা বিদ্যুতের চাহিদা-সরবরাহ পরিস্থিতি, ট্রান্সমিশন ও বিতরণ অবকাঠামোর চাহিদা, নবায়নযোগ্য জ্বালানির সংযোজন, সম্পদের সুস্থ বণ্টন, বিকেন্দ্রীভূত জ্বালানি ব্যবস্থার মূল্যায়ন এবং অন্যান্য সমন্বিত সম্পদ পরিকল্পনা পরিচালনা করবে। বিপিডিবি কেবলমাত্র এই স্বাধীন সংস্থার নির্দেশে পরিচালিত হবে।

পেট্রোবাংলা ও গ্যাস খাতের অব্যবস্থাপনা: পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানিগুলো, বিশেষ করে বাপেক্স মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বায়ত্তশাসিতভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। বাপেক্সের কাজ হওয়া উচিত কেবল অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রমে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা। কোম্পানিটির উৎপাদন শাখা বিদ্যমান উৎপাদন কোম্পানিগুলোর হাতে ন্যস্ত করা উচিত। পেট্রোবাংলা ভবিষ্যৎ এলএনজি পুনরায় গ্যাসীকরণ প্রকল্পের ভিত্তিতে (যেগুলো তখনও পরিকল্পনার পর্যায়ে ছিল এবং অনিশ্চিত ছিল) অন্তত পাঁচটি এলএনজিভিত্তিক সিসিজিটি (কম্বাইন্ড সাইকেল গ্যাস টারবাইন) বিদ্যুৎকেন্দ্র অনুমোদন দিয়েছিল। বর্তমানে এই ৩,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো প্রায় অকেজো অবস্থায় রয়েছে। কারণ এলএনজি সরবরাহের অভাবে তারা সম্পূর্ণ উৎপাদনে যেতে পারছে না। ফলে কয়েক হাজার কোটি টাকা ক্যাপাসিটি মূল্য বাবদ ব্যয় হচ্ছে। এই অব্যবস্থাপনার জন্য পেট্রোবাংলাকে দায়ী করা উচিত। কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্র অনুমোদন দেওয়ার আগে সঠিক জ্বালানি সরবরাহ চুক্তি থাকা বাধ্যতামূলক করা উচিত। এছাড়া, পেট্রোবাংলার মতো একটি উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর আমলাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির টেকসই পরিকল্পনা: বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উৎপাদন, ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ একে অপরের থেকে পুরোপুরি আলাদা নয়; বরং এদের কার্যক্রম একে অপরকে প্রভাবিত করে। ফলে, বিনিয়োগ পরিকল্পনা, সম্পদ বরাদ্দ এবং চাহিদা বিশ্লেষণসহ সমগ্র নীতিমালার কাঠামো নির্ধারণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীন সংস্থা গঠন করা প্রয়োজন। বিপিডিবি এবং পেট্রোবাংলা এই সংস্থার নির্দেশে পরিচালিত হবে। অবশেষে, বিপিডিবি ও পেট্রোবাংলার প্রযুক্তিগত সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে। যেন তারা এমন প্রযুক্তি নির্বাচন করতে পারে, যা দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য উপযুক্ত এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধান দিতে সক্ষম হয়।

পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড (আরইডি): পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড হলো জাতীয় গ্রিডের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ গ্রাহক। এটি দেশের ১০০% বিদ্যুতায়নের লক্ষ্য পূরণ করেছে। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার এই সাফল্যের পরও ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির (পিবিএস) মধ্যে মাত্র ১৩টি উদ্বৃত্ত আয় করতে পেরেছে। পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড এবং পিবিএস-এর মধ্যে দ্বৈত কর্তৃত্ব রয়েছে এবং উভয়ের মধ্যে আরও বেশি সমন্বয় ও আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি): শক্তিশালী ও স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যবসায়ী ও ভোক্তা উভয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। বাংলাদেশে জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ বরাবরই ছিল বিতর্কিত। প্রতিবার আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্যবৃদ্ধির যুক্তি দেখিয়ে তেল, গ্যাস, এবং বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়। কিন্তু, মূল্যবৃদ্ধির স্বচ্ছ ব্যাখ্যা জনগণের সামনে প্রকাশ করা হয় না। ২০২২ সালের ৫ আগস্ট জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ের সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে। বিইআরসিকে বিইআরসি আইন-২০০৩ অনুসারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত এবং প্রয়োজনে আরও শক্তিশালী করা দরকার।

কিউইইইএস (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ এবং দুর্নীতি: কিউইইইএস (বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ ত্বরান্বিতকরণ) বিশেষ বিধান আইন ২০১০ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রণীত সবচেয়ে বিতর্কিত আইনগুলোর মধ্যে একটি। প্রাথমিকভাবে চার বছরের জন্য প্রণীত এই আইনকে বারবার নবায়ন করা হয়েছে। যার ফলে ব্যাপক দুর্নীতি এবং স্বৈচ্ছাচারিতা দেখা গেছে। বহু আন্দোলনের পরেও এই আইনের বিরুদ্ধে আদালতে কোনো আইনি চ্যালেঞ্জ আনা হয়নি। বর্তমানে এই আইন স্থগিত রয়েছে এবং এটিকে সম্পূর্ণ বাতিল করা উচিত। বিশেষ বিধান আইনের অধীনে ২০১০ সালে জনপ্রশাসন ক্রয়নীতি (পিপিআর) লঙ্ঘন করে ১৭টি চুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বরাদ্দ দেওয়া হয়। এই কেন্দ্রগুলোর ক্যাপাসিটি মূল্যের হার ছিল অত্যন্ত বেশি। এগুলো আইন লঙ্ঘন করে সরকারকে বিশাল পরিমাণ ক্যাপাসিটি মূল্য দিতে বাধ্য করেছে এবং কোম্পানিগুলোকে অবাধ মুনাফার সুযোগ দিয়েছে। এই চুক্তিগুলো বহুবার নবায়ন করা হয়েছে, যদিও প্রাথমিক চুক্তির সময়সীমা শেষে এগুলো 'বিদ্যুৎ নেই তো অর্থ নেই' ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল। এই দুর্নীতিগুলো একটি বিশেষ শ্রেণির স্বজনতন্ত্র তৈরি করেছে। যারা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় লাভবান হয়েছে এবং দেশ থেকে সম্পদ পাচারেও যুক্ত ছিল।

গ্যাজপ্রম এবং কেলেঙ্কারি: গ্যাজপ্রম (রাশিয়ান সরকারি কোম্পানি) বিশেষ বিধান আইনের অধীনে, বাপেক্স, বিজিএফসিএল এবং এসজিএফএলের জন্য ২০টি গ্যাস কূপ খননের কাজ পেয়েছিল। গ্যাজপ্রমের প্রতি কূপ খনন খরচ ছিল ২২ মিলিয়ন (ভ্যাট ও কর ব্যতীত)। অন্যদিকে বাপেক্স একই ধরনের কূপ খনন করে মাত্র ১০ মিলিয়নে। একটি প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে দেশের কয়েক মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হতে পারত। স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী চুক্তি (আইপিপি) এবং বিশেষ বিধান আইন-২০১০ এর অধীনে ৪১টি আইপিপি বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিগুলো মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির (ওটিএম) উচ্চতম মূল্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। যা সরকারকে বিশাল অংকের অনাকাঙ্ক্ষিত খরচ বহন করতে বাধ্য করেছে।

ক্যাপাসিটি এবং জ্বালানি চুক্তি: ক্যাপাসিটি চুক্তিগুলোকে কখনো কখনো মাসিক ডাটা প্যাকেজের সাথে তুলনা করা হয়। যেখানে বিদ্যুৎ চুক্তিতে 'যত ব্যবহার তত পরিশোধ' পদ্ধতির পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হয়। বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পিপিএ) এর মাধ্যমে ব্যবহার করা হোক বা না হোক নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যাপাসিটি মূল্য প্রদান নিশ্চিত করা হয়। ক্যাপাসিটি মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্য হলো, সম্পূর্ণ উৎপাদন সক্ষমতা সবসময় প্রস্তুত

রাখা। তবে এই নিশ্চিত অর্থপ্রদানের সুবিধা নিয়ে অভূতপূর্ব দুর্নীতির মাধ্যমে বাজার অতিরিক্ত সরবরাহে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তেলচালিত চুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর গড় বার্ষিক প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর বা সক্ষমতা ব্যবহারের হার ৫০% এর নিচে ছিল। সাধারণত, এগুলো পিকিং পাওয়ার সাপ্লাই (শীর্ষ চাহিদার সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ) এর জন্য ব্যবহৃত হওয়ার কথা, কিন্তু সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেজলোড প্ল্যান্ট হিসেবে চালানোর ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি করেছিল। ফলে, ক্যাপাসিটি মূল্য পরিশোধ সরকারি ব্যয়ের উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করে। ২০১৮ সালে ১,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ছয়টি এইচএসডিভিত্তিক স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (আইপিপি) পাঁচ বছরের জন্য চুক্তি পায়। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য রেফারেন্স ক্যাপাসিটি মূল্য ছিল ২০/শড-মাস। পুরো চুক্তি সময়কালে, কোনো কেন্দ্র গড়ে ১০% এর বেশি উৎপাদন করেনি। অর্থাৎ, ১,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার জন্য ৯০% ক্যাপাসিটি মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ না কিনেই এই কেন্দ্রগুলো শুধুমাত্র কিছু চূড়ান্ত সময়ের চাহিদা পূরণে চালানো হয়েছিল। যা এইচএফও বিদ্যুৎকেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালনা করা যেত। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে এবং স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছিল।

অতিরিক্ত ক্যাপাসিটি মূল্য পরিশোধের হিসাব: অতিরিক্ত ক্যাপাসিটি মূল্য পরিশোধের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন। তবে ২০১০-১১ থেকে ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে বেসরকারি খাতে ক্যাপাসিটি মূল্য পরিশোধ হয় প্রায় ১,১৫,০০০ কোটি টাকা। সর্বমোট প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর (সম্পূর্ণ ক্ষমতার ব্যবহার শতাংশ) গত পাঁচ বছরে ৪২% থেকে ৪৬% এর মধ্যে ছিল। এটি প্রমাণ করে যে, বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ৬৫% প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর অদক্ষ ছিলো। ২০১৪-১৫ সাল থেকে বিশেষ বিধান আইনের অধীনে অনুমোদিত এইচএসডি এবং এইচএফও বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য যথাক্রমে ১৫,৫৫১ কোটি এবং ৯,১০০ কোটি টাকা ক্যাপাসিটি মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। এইচএসডি ও এইচএফও বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর গত পাঁচ বছরের গড় প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর ছিল যথাক্রমে ৩২% এবং ৯.২২%। যদি অন্তত ৬৫% প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর ধরা হয়, তাহলে এই তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর জন্য ১০,০০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ক্যাপাসিটি মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।

অতিরিক্ত মুনাফা ও আর্থিক ক্ষতি: ২০১০-১১ সালে অনুমোদিত চুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ৩৫% পর্যন্ত মুনাফা করেছে, যেখানে স্বাভাবিক মুনাফার হার ১৫%। অতিরিক্ত মুনাফা কমপক্ষে ১০,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। গ্যাস ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোরও কম ব্যবহারের কারণে ১৫ বছরে মোট অতিরিক্ত ক্যাপাসিটি বাবদ পরিশোধিত মূল্য ৩৬ হাজার কোটি টাকার কম নয়।

শুল্ক নির্ধারণ: শুল্ক নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত নয় এবং এটি মালিকানা ও চুক্তি অনুমোদন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং যৌথ উদ্যোগের (জেভি) জন্য, শুল্ক খরচের ভিত্তিতে হিসেব করা হয়। ক্যাপাসিটি মূল্য উন্মুক্ত নয় এমন অংশ দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত-

১. ঋণের অংশ প্রকৃত হার অনুযায়ী,
২. ইকুইটি অংশ, যেখানে রিটার্ন সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ১২% এবং যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে ১৬%।

রামপাল প্রকল্পের ইকুইটি রিটার্ন ছিল ১৮%। মূলধনী ব্যয় যত বেশি, তত বেশি রেফারেন্স নন-এসকেলেবল ক্যাপাসিটি মূল্য নির্ধারিত হয় এবং এর ফলে ক্যাপাসিটি পেমেন্টও বেড়ে যায়। চুক্তিগুলোতে আমদানি করা যন্ত্রপাতির অতিরিক্ত বিলিং এবং ভূমি উন্নয়নের অতিমূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উন্মুক্ত অংশ দুই ভাগে বিভক্ত-

১. স্থির অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, ২. পরিবর্তনশীল অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়

এই দুটি ব্যয়ই ডলার ও টাকার উপাদানে বিভক্ত। উন্মুক্ত ক্যাপাসিটি পেমেন্ট মুদ্রাস্ফীতি সূচকের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।

স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী (আইপিপি) এবং চুক্তিভিত্তিক কেন্দ্রের শুল্ক: আইপিপি এবং চুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর শুল্ক ‘আলোচনা’করে নির্ধারণ করা হয়, যদি না এটি উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (ওটিএম) অনুমোদিত হয়। বিনিয়োগ যাই হোক না কেন, শুল্ক আলোচনা পূর্বনির্ধারিত দরপত্র বা অন্যান্য আলোচিত চুক্তির উপর ভিত্তি করে করা হয়। এর ফলে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী, সচিব এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক ঘনিষ্ঠদের জন্য সুবিধাজনক হার, শর্ত এবং চুক্তি অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, অতিরিক্ত মুনাফার পাশাপাশি অনেক প্রকল্পের ব্যয় অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে অর্থপাচারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। শুল্ক নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি অবশ্যই একটি মানসম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে যথাযথভাবে নির্ধারণ করা উচিত।

অন্যান্য অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তির বিনিময়ে কমিশন নেওয়া সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ ছিল অন্যতম প্রধান অনিয়ম। এ ধরনের লেনদেনের কোনো আনুষ্ঠানিক নথি নেই। তবে ধারণা করা হয়, প্রকল্প ব্যয়ের অন্তত ১০% কমিশন হিসেবে নেওয়া হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে মোট ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই বিনিয়োগের মধ্যে কমপক্ষে ৩ বিলিয়ন ঘুষ বা কমিশন হিসেবে লেনদেন হয়েছে। উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির প্রভাব প্রতিটি প্রকল্পে ছড়িয়ে পড়েছে। নিচের অনৈতিক কার্যকলাপগুলো বিদ্যুৎ খাতজুড়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত।

- ১। বিজ্ঞাপন ছাড়াই এবং অবৈধ আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ।
- ২। একই গোষ্ঠীর লোকদের বিভিন্ন কোম্পানির নামে টেন্ডারসহ বা টেন্ডার ছাড়াই বারবার চুক্তি দিয়ে দুর্নীতির পথ সহজ করা হয়।
- ৩। মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, কোম্পানির বোর্ড সদস্য বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী (রাজনীতিবিদ) ব্যক্তিদের বিশেষ সুবিধা দিয়ে চাকরি বা উপ-চুক্তি প্রদান।
- ৪। সরাসরি বা ভুয়া দরপত্রের মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে জিনিসপত্র বিক্রি
- ৫। নির্দিষ্ট কিছু সরবরাহকারীর মাধ্যমে যোগসাজশে টেন্ডার দিয়ে বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পণ্য কেনা
- ৬। চুক্তি অনুমোদনের পর শর্ত পরিবর্তন। সামিট মেঘনাঘাট ৩৩৫ ডুয়াল ফুয়েল বিদ্যুৎকেন্দ্র এইচএফও থেকে এইচএসডিতে পরিবর্তন করা হয়েছিল, কিন্তু ক্যাপাসিটি মূল্য বা হিট রেট অপরিবর্তিত রাখা হয়।

বিশেষ সুবিধার নজির

১. ইউনাইটেড পাওয়ার, আইপিপি হারে (১৫.৭৫ টাকা/এম৩) গ্যাস সরবরাহ পেয়েছে, যেখানে অন্যান্য ক্যাপটিভ প্লান্টকে ৩০.৭৫ টাকা/এম৩ হারে গ্যাস কিনতে হয়েছে। ফলে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে বাণিজ্যিক হারে বিদ্যুৎ বিক্রি করে তারা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করেছে।

২. বেক্সিমকোর ২০০ মেগাওয়াট টেস্টা সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র (২০১৬ সালে অনুমোদিত) ২০২৩ সালে ০.০১৫ ডলার/কিলোওয়াট-ঘণ্টা হারে ট্যারিফ পেয়েছে, যেখানে অন্য সব বিদ্যুৎকেন্দ্র উন্নত প্রযুক্তির কারণে ০.০১০ ডলার/কিলোওয়াট-ঘণ্টা ট্যারিফে চুক্তি করেছে।

তাই, বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির পরিমাণ ও ব্যাপ্তি ব্যবস্থার গভীরে কীভাবে প্রবেশ করেছে তা বোঝার জন্য ফরেনসিক তদন্তের প্রয়োজন।

এলএনজি: সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে, রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল) ১০০টি টেন্ডারের মাধ্যমে ৭৪ কার্গো এলএনজি কিনেছে। ২৩টি কোম্পানি শর্ত পূরণ করলেও, মাত্র ১২টি কোম্পানিকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এই ১২টি কোম্পানির মধ্যে মাত্র ৩টি কোম্পানিই ৫৯টি কার্গোর আদেশ পেয়েছে। যা

বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তি বা যোগসাজশের ইঙ্গিত দেয়। গ্যাসের প্রতি ইউনিট মূল্যে কয়েক সেন্ট অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করলেও অসাধু পক্ষগুলোর জন্য কোটি কোটি ডলার লাভ নিশ্চিত করা হতো। আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত, স্পট মার্কেট থেকে ২২৫.৪ মিলিয়ন এমএমবিটিইউ এলএনজি আমদানি করা হয়। যার গড় মূল্য ছিল ১৬/এমএমবিটিইউ, মোট ব্যয় ৩.৬ বিলিয়ন। শুধুমাত্র ৫০ সেন্ট কমিশন পেলেও এতে ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ লেনদেন সম্ভব। স্থানীয় গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির পরিবর্তে আমদানির প্রতি ঝোঁককে বরাবরই দুর্নীতিপ্রবণ স্বার্থ হিসেবে দেখা হয়েছে। বাংলাদেশ দুইটি এফএসআরইউর জন্য বছরে মাত্র ৪ মিলিয়ন টন এলএনজি আমদানির দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করেছিল। বাকি ৩.২ মিলিয়ন টনের ক্ষমতা স্পট মার্কেট থেকে কেনার জন্য রেখে দিয়েছিল।

১১.৬ ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা: বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত দুর্নীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। যার প্রধান কারণ হলো ২০১০ সালের বিশেষ বিধান আইন থেকে উদ্ভূত জবাবদিহিতার অভাব। এই আইনের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতাদের যে দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা তাদের লোভ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সে সময়, রাজনৈতিক সংযোগ না থাকলে অনেক প্রধান ব্যক্তি ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ফলস্বরূপ, কেবল বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পায়নি; বরং এই পরিস্থিতি রপ্তানি শিল্পকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দিয়েছে।

এছাড়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন এবং বিদেশে গিয়ে নাগরিকত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রকৃতপক্ষে, সরকার পতনের আগেই (২০২৪ সালের ৫ আগস্টের অনেক আগে) জড়িতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন। এর ফলে, দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের আর্থিক চাপ ও সম্পদের স্থানান্তর ঘটেছে, যা বাংলাদেশের জন্য দ্বিগুণ বিপদের কারণ হয়েছে।

এদিকে, দেশের অর্থনৈতিক সংকট, টাকার অবমূল্যায়ন, এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির উচ্চ মূল্যের কারণে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে আরও চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে জ্বালানির ঘাটতি, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, এবং লোডশেডিং পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। তাই আগামী পাঁচ বছরের জন্য সঠিক পরিকল্পনা নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ চাহিদা ও পরিকল্পনা: ধারণা করা হচ্ছে, ২০৩০ সালের সন্ধ্যার শীর্ষ বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ২৬,০০০ মেগাওয়াট হবে, যা ৭% প্রবৃদ্ধি হারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে। এই চাহিদা বিদ্যমান জীবাশ্ম-জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার মাধ্যমে মেটানো সম্ভব হবে। এছাড়াও, নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করলে, দিনের শীর্ষ বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো যাবে। তবে, ২০২৯ সালের পর থেকে গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যার শীর্ষ চাহিদা পূরণে বর্তমান ও পরিকল্পিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট হবে না। ফলে, কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারের সামনে পাঁচ বছরের সময় আছে।

আশঙ্কা করা হচ্ছে, ১৫০০ মেগাওয়াট থেকে ২৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের ঘাটতি হতে পারে। যদি পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা সঠিকভাবে গ্রিডে সংযুক্ত করা না হয় এবং নতুন সিঙ্গেল-সাইকেল গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বা ব্যাটারি সংযোজিত নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প বাস্তবায়িত না হয়, তাহলে সন্ধ্যার শীর্ষ চাহিদা পূরণের জন্য ৪৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এইচএফও প্লান্ট স্থাপন করতে হবে। এছাড়া, দৈনিক কয়লার চাহিদা হবে ৪০,০০০ টন এবং গ্যাসের চাহিদা হবে ১.৮ (বিলিয়ন ঘনফুট/দিন)। তাই, স্থানীয় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এখন জরুরি; অন্যথায়, বিদ্যুৎ খাতের চাহিদা পূরণের জন্য বিদ্যমান এলএনজি আমদানি অবকাঠামোকে উন্নত করতে হবে।

উৎপাদন খরচ হ্রাস: একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কমানো। বিশেষ করে ২০১০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত স্বাক্ষরিত বিভিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি চুক্তির কারণে যে বৃদ্ধি ঘটেছে, তা কমাতে হবে। তবে,

যদি আমদানি করা এলএনজির পরিবর্তে স্থানীয় গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করা যায় এবং বাপেক্স আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান ও খনন কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহিত হয়, তাহলে খরচ কমানো সম্ভব হবে। এছাড়া, অফশোর অনুসন্ধান ও ড্রিলিং কার্যক্রম বৃদ্ধি করা জরুরি, যাতে দীর্ঘমেয়াদে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। একইসঙ্গে, সিঙ্গেল-সাইকেল গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র অথবা ব্যাটারি সংযোজিত নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে, এইচএফওর উপর নির্ভরতা মোট শক্তি মিশ্রণের মাত্র ৫%-এ নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। এছাড়া, প্রযুক্তিগত অপচয় হ্রাস, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, এবং যৌথ তাপ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রচার করা হলে উৎপাদন খরচ আরও কমানো সম্ভব।

গ্যাস ব্যবস্থার ক্ষতি: বাংলাদেশের গ্যাস খাতের মোট পরিবহন ও বিতরণ ক্ষতি উচ্চ সরবরাহের সময় ১০-১২% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যার মধ্যে কমপক্ষে ৭-৮% গ্যাস চুরি হয়। এর অর্থ হলো, দৈনিক ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস হিসাবের বাইরে থেকে যায়। যা এলএনজি আমদানি ব্যয়ের হিসেবে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতির সমান। তবে, শুধু অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, এর জন্য বরাদ্দ ও মূল্য নির্ধারণ নীতিতে সংস্কার প্রয়োজন। আমদানি সমমানের মূল্যে মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্যাস সংযোগ চালু করা হলে অবৈধ সংযোগ নির্মূল করা সম্ভব হতে পারে।

আন্তঃদেশ বিদ্যুৎ বাণিজ্য: ভারতীয় বিদ্যুৎ এক্সচেঞ্জ থেকে বিদ্যুৎ আমদানি বাংলাদেশের জন্য লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। একইভাবে, নেপালের সঙ্গে নবস্বাক্ষরিত জলবিদ্যুৎ আমদানির চুক্তিটিও বাংলাদেশের জন্য উপকারী। ভবিষ্যতে, নেপাল, ভুটান ও ভারত থেকে আরও নবায়নযোগ্য শক্তি আমদানি করা সম্ভব। যা উৎপাদন খরচ কমানোর পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তবে, আদানী গ্রুপের সঙ্গে করা বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি ছিল ব্যতিক্রমী আন্তঃসীমান্ত সরকার-টু-বিজনেস (G2B) চুক্তি। এ ধরনের অনিয়মিত চুক্তি রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়া সম্ভব ছিল না। যেহেতু আদানী গ্রুপ যুক্তরাষ্ট্রে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে, তাই এই চুক্তির স্বচ্ছতা ও প্রক্রিয়া পুনরায় পর্যালোচনা করা জরুরি। বিশেষত এই চুক্তি খুব দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছিল। ভবিষ্যতে এ ধরনের তাড়াহুড়োর চুক্তি এড়াতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। গত সরকার আমলে, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে কোনো পূর্ণকালীন মন্ত্রী ছিল না। প্রধানমন্ত্রী নিজেই ২০০৯ সাল থেকে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। এতে করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্য, লবিস্ট, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী ও স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীরা (আইপিপি) এই খাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। যা সঠিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ও জবাবদিহিতা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। এই খাতে দুর্নীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে জ্বালানি উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী ও বিদ্যুৎ বিভাগ। ছোট সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে শুরু করে আদানীর মতো বিশাল প্রকল্প পর্যন্ত প্রতিটি চুক্তিই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদনে সম্পাদিত হয়েছে।

বেসরকারি মালিকদের ভূমিকা: বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিদ্যুৎ প্রকল্পের মালিকরা অন্যতম প্রধান স্বার্থাশ্রেণী গোষ্ঠী।

- ছোট বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকদের অনেকেই বিদ্যুৎ খাতে পূর্ব কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই সরকারের ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সুবিধা নিতে আগ্রহী ছিলেন।
- অপরদিকে, বড় বিনিয়োগকারীরা স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন (আইপিপি) প্রকল্প পাওয়ার জন্য সরকারি অনুমোদন পেতে সচেষ্ট ছিলেন।

প্রথমদিকে, ১০০ মেগাওয়াটের কম ক্ষমতাসম্পন্ন ছোট তেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হলেও, পরবর্তীকালে বড় আকারের কয়লা ও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। উদাহরণস্বরূপ:

- সামিট, রিলায়েন্স ও ইউনাইটেড গ্রুপ ৩৫০+ মেগাওয়াটের গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পায়।
- কিন্তু এস আলম গ্রুপের মতো নতুন একটি প্রতিষ্ঠান ১৩২০ মেগাওয়াটের কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি লাভ করে।

তবে কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা ছাড়াই অনুমোদিত হয়, যার ফলে সেগুলো বর্তমানে অচল অবস্থায় রয়েছে। যা উৎপাদন ব্যয়-খণের বোঝা-জনদুর্ভোগ বাড়িয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও রাজনৈতিক চিত্র: বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভের তথ্য যেমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিকৃত করা হয়েছিল, তেমনি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্যও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে ব্যবহৃত হয়েছে।

- ২০২১ সালের জন্য নির্ধারিত ২৪,০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে বলে দাবি করা হয়,
- কিন্তু সেই পরিসংখ্যানে ৩,০০০ মেগাওয়াট নন-গ্রিড ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং ৪৫০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ অন্তর্ভুক্ত ছিল,
- পরবর্তীতে, এই উৎপাদন ক্ষমতাগুলো সরকারিভাবে গ্রিড ক্যাপাসিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়।

এছাড়া, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদা সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য বিকৃতি ও ভুল তথ্য প্রচার চলেছে।

গত সরকার অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধির আশ্বাস দিয়ে অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি করেছিল এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা জ্বালানির ওপর নির্ভর করে জ্বালানি নিরাপত্তাভর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বর্তমানে,

- দেশের মোট প্রাথমিক জ্বালানির ৬৫% আমদানি করতে হচ্ছে, যার বার্ষিক ব্যয় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- ২০৩০ সালের মধ্যে এই ব্যয় ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে।
- এর ফলে, বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভে চরম সংকট সৃষ্টি হবে এবং বিশাল অংকের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা তৈরি হবে।

ট্রানজিশন পরিকল্পনা: জনসাধারণের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ না থাকায়, স্বৈরাচারী সরকার এসব বিষয়ে খুব কম মনোযোগ দিয়েছে এবং নিজেদের পথেই এগিয়ে গেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, যেখানে সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবাদ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তবে মূলধারার স্থানীয় রাজনৈতিক বিরোধীরা এই সুযোগটি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়।

- বিশ্ব এখন নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে, এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানো কেবল পরিবেশের জন্যই নয়, স্থায়িত্বের জন্যও অপরিহার্য। বিদ্যুৎ খাতের মাস্টারপ্ল্যান এবং নতুন ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টারপ্ল্যান বিদেশি পরামর্শকদের সহায়তায় প্রণয়ন করা হয়েছিল, যারা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলেন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে। যেহেতু এই পরিকল্পনাগুলি কখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি, তাই উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।
- এছাড়াও, সরকার সাফল্য প্রদর্শনের জন্য উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। যা বিদ্যুৎ বিভাগকে বিনিয়োগ পরিকল্পনা শুরু করতে বাধ্য করেছিল। এসব কারণে উৎপাদন এবং ট্রান্সমিশন ও বিতরণ উভয় ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। ফলস্বরূপ, একটি অত্যধিক উচ্চাভিলাষী বিনিয়োগ কৌশল বিদ্যুৎ ও জ্বালানির খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে। সর্বোপরি, ২০১০ সালের বিশেষ বিধান আইনের অধীনে প্রদত্ত তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল এবং তাদের রাজনৈতিক মিত্র ও অর্থদাতাদের জন্য একটি সুবিধাজনক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করেছে।

অধ্যায়-১২: বৈদেশিক বাণিজ্যের ফাঁদ*

- পূর্ববর্তী সরকার বৈদেশিক বাণিজ্যের সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে সমাধানে ব্যর্থ
- বাণিজ্যে ভুল ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে প্রতি বছর গড়ে ৮.২৭ বিলিয়ন ডলার পাচার
- বাণিজ্যের সঠিক তথ্যের জন্য এনবিআর, ইপিবি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন
- রাজনৈতিক চাপ মোকাবিলায় স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সব ব্যয় অডিট করতে হবে
- বাংলাদেশ ব্যাংকের চেয়ে ইপিবি রফতানির তথ্য ১৩.৮ বিলিয়ন ডলার বেশি দেখানো হয়েছে
- বিজিএমইএ শক্তিশালী রাজনৈতিক লবি গ্রুপ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে
- অর্থপাচার রোধে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করতে হবে

১২.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য বেশ কিছু গুরুতর প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য অভিযুক্তের ক্রমাগত অবনতি, রপ্তানির বৈচিত্র্যের সীমাবদ্ধতা, পুঁজি পাচারের উদ্বেগ, তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা, শুল্ক উদারীকরণের বাধা এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে (এফটিএ) দুর্বল অংশগ্রহণ। ২০২৬ সালের নভেম্বরে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই চাপ আরো তীব্র হবে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন সামগ্রিক নীতি সংস্কার, কৌশলগত বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্তিশালী সম্পৃক্ততা। দুর্ভাগ্যবশত, পূর্ববর্তী সরকার এই সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে সমাধানে ব্যর্থ হয়। যার ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য খাত ঝুঁকিতে রয়েছে এবং টেকসই ও বৈচিত্র্যময় প্রবৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

১২.২ সাতটি কাঠামোগত সমস্যা

বাণিজ্য অভিযোজনে ক্রমাগত অবনতি: বাংলাদেশের বাণিজ্য উন্মুক্ততার দুর্বল অবস্থান রয়েছে। ভিয়েতনাম ও ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের বাণিজ্য-জিডিপি অনুপাত ক্রমাগত কমছে। ভিয়েতনামের বাণিজ্য-জিডিপি অনুপাত ১৫০% ছাড়িয়ে গেছে, যা তাদের রপ্তানিভিত্তিক শিল্প কৌশল এবং উল্লেখযোগ্য বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের (এফডিআই) মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারে শক্তিশালী একীভূতকরণের ইঙ্গিত দেয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশের অনুপাত গড়ে মাত্র ৩০% এর কাছাকাছি, যা বাণিজ্যিক একীভূতকরণের সীমাবদ্ধতা প্রতিফলিত করে। বাংলাদেশের মাঝারি বাণিজ্য-জিডিপি অনুপাত বাণিজ্য বৈচিত্র্যকরণের ক্ষেত্রে বাধা। বিশেষ করে পোশাক খাতের উপর নির্ভরশীলতা সংকীর্ণ রপ্তানি ভিত্তির ইঙ্গিত দেয়। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, বাংলাদেশের বাণিজ্য-জিডিপি অনুপাত ২০১২ সালের ৪৮.১% থেকে কমে ২০২২ সালে ৩৩.৮% এ নেমে এসেছে।

রপ্তানি ঝুড়ি অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত অবস্থায় রয়েছে: বাংলাদেশের অর্থনীতি তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, যা মোট রপ্তানি আয়ের ৮৫% এরও বেশি অংশ দখল করে আছে। যদিও এই খাতটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রেখেছে। তারপরও, একটি মাত্র শিল্পের উপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করে। বিশেষ করে অতিমারীর মতো বাহ্যিক ধাক্কা বা ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা বাণিজ্যকে প্রভাবিত করলে পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ। ২০১০-এর দশকের শুরু থেকে তৈরি পোশাক খাত মোট রপ্তানির ৭৭% অংশীদার। ২০২৩ সালে তা বেড়ে ৮৬% এ পৌঁছেছে, যা বৈচিত্র্যকরণ প্রচেষ্টায় খুব সীমিত সাফল্যকে তুলে ধরে।

চামড়া, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ এবং হালকা প্রকৌশল খাতকে উন্নীত করার উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও, এই শিল্পগুলো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে এবং উন্নয়নশীল অবস্থায় রয়েছে। চামড়া শিল্প, যা রপ্তানির ৩-৪% অবদান রাখে, পরিবেশগত মান পূরণ এবং দক্ষ শ্রমিকের অভাবে সংগ্রাম করছে। একইভাবে, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ খাত সরবরাহ

*এই অধ্যায়ে প্রস্তুত করেছেন ড. সেলিম রায়হান, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্বাহী পরিচালক, সানেম।

চেইনে অদক্ষতা, প্রযুক্তি গ্রহণের অভাব এবং মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর উচ্চ শুল্কের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে, যা এর বৃদ্ধিকে সীমিত করেছে।

বৈচিত্র্যকরণের প্রধান বাধাগুলোর মধ্যে রয়েছে উচ্চ শুল্ক, জটিল কাস্টমস পদ্ধতি, রপ্তানি-বিরোধী এবং বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) বিরোধী মনোভাব, অতিমূল্যায়িত মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থা। এই সমস্যাগুলো প্রায়শই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিজাতদের স্বার্থের সাথে যুক্ত ছিল। অন্যদিকে সরকার বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর দিকে মনোযোগ দিয়ে খাত-নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলোকে উপেক্ষা করেছে। এছাড়াও, উচ্চ ব্যবসায়িক খরচ, পুরানো কাস্টমস পদ্ধতি এবং অপরিপূর্ণ বাণিজ্য সুবিধা পোশাক খাতের বাইরের খাতগুলোর উপর অসমভাবে প্রভাব ফেলেছে। এই কাঠামোগত এবং নীতি-প্ররোচিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন ছিল, যা অনুপস্থিত। ফলে বৈচিত্র্যকরণের অগ্রগতি আরও বিলম্বিত হয়েছে (রায়হান, ২০২৪)।

বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। যা রপ্তানি পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যকরণ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের এফডিআই টু জিডিপি অনুপাত ক্রমাগত ১%-এর নিচে নামছে। যা ভিয়েতনাম এবং ভারতের মতো আঞ্চলিক প্রতিযোগীদের তুলনায় পিছিয়ে। ভিয়েতনাম এবং ভারতের এফডিআই অনুপাত যথাক্রমে প্রায় ৪.৫% এবং ১.৫%। এই সীমিত এফডিআই প্রবাহ প্রযুক্তি স্থানান্তর, শিল্প উন্নয়ন এবং উচ্চ-মূল্যের রপ্তানি সম্প্রসারণের সুযোগকে সীমিত করেছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গুভার ও আন্ডার ইনভয়েসিং-এর মাধ্যমে পুঁজি পাচার: গত এক দশকে বাংলাদেশ বড় আকারের পুঁজি পাচারের অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি রিপোর্ট অনুযায়ী, বাণিজ্যে ভুল ইনভয়েসিং-এর মাধ্যমে গড়ে বছরে ৮.২৭ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে। এটি অবৈধ পুঁজি পাচারের একটি সাধারণ পদ্ধতি। আইএমএফও ২০২২-২৩ অর্থবছরে আর্থিক হিসাব থেকে উল্লেখযোগ্য অর্থপ্রবাহের কথা উল্লেখ করেছে। যা জিডিপি ০.৫% এবং অপ্রাপ্ত রপ্তানি আয় বৃদ্ধির সাথে মিলে পুঁজি পাচারের সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

এই সমস্যা সমাধানে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি), বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য সংগ্রহ, যাচাইকরণ এবং প্রতিবেদন তৈরির ক্ষমতা শক্তিশালী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে, ইপিবি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগত অসঙ্গতিগুলো এই অসামঞ্জস্যতার কারণ। উদাহরণস্বরূপ, ইপিবি প্রধানত রপ্তানিকারকদের স্ব-প্রতিবেদিত তথ্যের উপর নির্ভর করে। যা কখনও কখনও অনুকূল ঋণের শর্ত পাওয়া বা ক্লায়েন্ট আস্থা বজায় রাখার মতো বিভিন্ন কারণে অতিরঞ্জিত হতে পারে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ করে। যা প্রকৃত রপ্তানি কার্যক্রমের একটি নির্ভরযোগ্য কিন্তু বিলম্বিত তথ্য প্রদান করে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রযুক্তিগত অবকাঠামো এবং সমন্বয় উন্নত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি সঠিক এবং সময়োপযোগী রপ্তানি তথ্য নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, রপ্তানি এবং পেমেন্টের রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিংয়ের জন্য ডিজিটাল সরঞ্জাম একীভূত করা এবং ইপিবি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে ক্রস-যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চালু করা রিপোর্টিং ত্রুটিগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে। এছাড়াও, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মানবিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যাতে ডেটা ব্যবস্থাপনা সিস্টেমগুলি বৈশ্বিক বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান জটিলতা সামলাতে পারে।

একইভাবে, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক চাপ থেকে স্বাধীনতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যা কখনও কখনও অর্থনৈতিক সূচকগুলোকে অতিরঞ্জিত করে অনুকূল চিত্র উপস্থাপনের প্রেরণা দেয়। তথ্য

সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং স্বাধীন সংস্থার মাধ্যমে নিয়মিত অডিট এই ঝুঁকিগুলো হ্রাস করতে এবং রপ্তানি খাতের প্রকৃত অবস্থার একটি সঠিক চিত্র পেতে সহায়তা করতে পারে।

রপ্তানি তথ্যের অসামঞ্জস্য: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে রপ্তানি পরিসংখ্যানের মধ্যে ব্যবধান ১২ বিলিয়ন ডলার। এই পার্থক্য প্রতিবছরই বাড়ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে যা ছিল ৪.৭৩ বিলিয়ন ডলার। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে, বাংলাদেশ ব্যাংক সংশোধিত তথ্য প্রকাশ করে। সেই প্রতিবেদনে দেখা যায় জুলাই ২০২৩ থেকে এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত প্রকৃত রপ্তানি ছিলো ৩৩.৬৭ বিলিয়ন ডলার, অন্যদিকে ইপিবির রিপোর্ট অনুসারে যা ছিলো ৪৭.৪৭ বিলিয়ন ডলার। ফলে দুটি সংস্থার মধ্যে পার্থক্য ১৩.৮ বিলিয়ন ডলার। এই ধরনের অসামঞ্জস্য নীতিনির্ধারক এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে জটিল করে এবং রপ্তানি খাতের প্রকৃত অবস্থাকে অস্পষ্ট করে। এটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং বাহ্যিক ঋণের প্রতি স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায়। এই অসামঞ্জস্য রপ্তানি প্রতিবেদনের সঠিকতায় গভীর পদ্ধতিগত সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। পর্যবেক্ষকরা উল্লেখ করেছেন, রপ্তানি পরিসংখ্যান প্রায়শই অতিরঞ্জিত হয়। রপ্তানিকারকরা উচ্চ শক্তির মূল্য, মজুরি বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাতের কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির সাথে সংগ্রাম করছে। এছাড়াও, শ্রম-নিবিড় পণ্য, বিশেষ করে পোশাকের চাহিদা আরও টেকসই এবং নৈতিকভাবে উৎসারিত পণ্যের দিকে সরে যাওয়ায় বৈশ্বিক ক্লায়েন্ট ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, অনেক আরএমজি কারখানা অপরিপূর্ণ অর্ডার এবং বর্ধিত মান পূরণের খরচের কারণে উৎপাদন কমিয়েছে। অতিরঞ্জিত রপ্তানি তথ্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্তের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। সঠিক রপ্তানি পরিসংখ্যান বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহ অনুমানের জন্য অপরিহার্য, যা মুদ্রানীতি এবং মুদ্রার মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে। রপ্তানি অতিরঞ্জিত করা দেশের অর্থপ্রবাহ ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা সম্পর্কে অবাস্তব প্রত্যাশা তৈরি করে, যা রাজস্ব এবং মুদ্রানৈতিক পরিকল্পনাকে জটিল করে তোলে।

এই সমস্যাগুলো সমাধানে, এনবিআর, ইপিবি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য সংগ্রহ, যাচাইকরণ এবং প্রতিবেদন তৈরির ক্ষমতা শক্তিশালী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়; ইপিবি রপ্তানিকারকদের স্ব-প্রতিবেদিত তথ্যের উপর নির্ভর করে, যা কখনও কখনও অতিরঞ্জিত হতে পারে, অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের তথ্য ব্যবহার করে, যা প্রকৃত কার্যক্রমের একটি নির্ভরযোগ্য। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক একটু দেরিতে তথ্য প্রকাশ করে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রযুক্তিগত অবকাঠামো এবং সমন্বয় উন্নত করা সঠিক এবং সমন্বয়যোগ্য রপ্তানি তথ্য নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানি এবং পেমেন্টের রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিংয়ের জন্য ডিজিটাল সরঞ্জাম একীভূত করা এবং ক্রস-যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চালু করা রিপোর্টিং ত্রুটিগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে। তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের জন্য প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করাও প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রয়োজনীয়, যাতে তারা বৈশ্বিক বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান জটিলতা সামলাতে পারে।

রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যকরণের জন্য বাংলাদেশের আরএমজি মডেল টেকসই পথ প্রতিষ্ঠায় বার্থ হয়েছে (রায়হান, ২০২৪)। যদিও প্রায়শই ধারণা করা হয়, তৈরি পোশাক খাত শুধুমাত্র অনুকূল অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতির কারণে সফল হয়েছে। সাফল্যের পেছনে আরও বেশকিছু কারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে আরএমজি খাতকে রপ্তানি প্রণোদনা এবং শিল্প ও বাণিজ্য নীতির প্রধান সুবিধাভোগী হিসেবে অগ্রাধিকার দেওয়া, এই খাতের সাথে জড়িত অভিজাতদের মধ্যে অনুবকূল রাজনৈতিক সমঝোতা যাতে জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক সংঘাত এই খাতকে প্রভাবিত না করে, এবং সাবকন্ট্রাক্টিং ফার্মগুলোর উত্থান। যা অনেক আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণমূলক সমস্যা এড়াতে সক্ষম হয়েছিল। তৈরি পোশাক খাত শ্রম ব্যবস্থাপনায় অভিজাতদের মধ্যে একটি “রাজনৈতিক সমঝোতা” থেকেও লাভবান হয়েছিল, যেখানে ন্যূনতম মজুরি দমন,

শ্রমিকদের অধিকার সীমিতকরণ এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও কারখানা মান পূরণের দুর্বল তদারকি, নিয়ন্ত্রণমূলক প্রয়োগের অভাব এবং আরএমজি উপজাত পণ্যের মাধ্যমে ভাড়া আহরণ এই সমস্যাগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) একটি শক্তিশালী লবি গ্রুপ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা এই খাতের অনুকূল নীতি প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এই খাতের প্রভাব রাজনীতিতেও প্রসারিত হয়েছে, যেখানে বেশ কয়েকটি গার্মেন্টস মালিক মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য হয়েছেন, যা তৈরি পোশাক শিল্পের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্যাপচারের একটি রূপ নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের আরএমজি খাতের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশের আরএমজি খাত তার প্রবৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতা ধরে রাখতে উল্লেখযোগ্য অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। অভ্যন্তরীণভাবে, শ্রমিক অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চার মিলিয়নেরও বেশি শ্রমিক, যার মধ্যে প্রায় ৬০% নারী, নিয়োগ করা সত্ত্বেও এই খাতটি দুর্বল কাজের পরিবেশের জন্য সমালোচিত হয়েছে। যা ২০১৩ সালের রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি দ্বারা উন্মোচিত হয়েছিল। বাংলাদেশ অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্সের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে কারখানার নিরাপত্তায় কিছু অগ্রগতি হলেও, কম মজুরি, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা এবং অপরিপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিত্বের মতো শ্রমিক অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি এখনও উদ্বেগের কারণ (আইএলও, ২০২২)।

পরিবেশগত মান পূরণ আরেকটি জরুরি বিষয়। বৈশ্বিক ক্রেতারা টেকসই পণ্যের উপর জোর দেওয়ায়, আরএমজি কারখানাগুলোকে সবুজ অনুশীলন গ্রহণের চাপের মুখে পড়তে হয়। তবে অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উচ্চ খরচ এবং সবুজ অর্থায়নে সীমিত প্রবেশাধিকারের কারণে সংগ্রাম করে। একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অভাব টেকসই উৎপাদনের দিকে পরিবর্তনকে আরও জটিল করে তোলে (লাইট ক্যাসল, ২০২৪)।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা: আন্তর্জাতিকভাবে, বাংলাদেশের আরএমজি খাত ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়ার মতো কম খরচের উৎপাদকদের সাথে প্রতিযোগিতা করে। ভিয়েতনাম, অনুকূল বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং বাজার প্রবেশাধিকার দিয়ে শক্তিশালী প্রতিযোগী হয়ে উঠেছে (টেক্সটাইল টুডে, ২০২০)। এছাড়াও, বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে ব্যাঘাত এবং নিয়ারশোরিং বা ফ্রেন্ড-শোরিং প্রবণতা। যেখানে ক্রেতারা তাদের বাড়ির বাজারের কাঁচামাল দেশ থেকে পণ্য সংগ্রহে মনোযোগ দেওয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। (ম্যাককিনসে, ২০২২)।

টেকসই পোশাকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা: ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার মতো বাজারে টেকসই পোশাকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা আরও চাপ সৃষ্টি করে। আসন্ন আইউ কর্পোরেট সাসটেইনেবিলিটি ডিউ ডিলিজেল ডাইরেক্টিভ সরবরাহ শৃঙ্খলকে কঠোর মান পূরণের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করবে, যা পূরণ না হলে ক্রেতা হারানোর ঝুঁকি বাড়াবে।

আরএমজি রপ্তানিতে সীমিত বৈচিত্র্য: বাংলাদেশের আরএমজি রপ্তানিতে সীমিত বৈচিত্র্য রয়েছে। মাত্র ১০টি আরএমজি পণ্য বাংলাদেশের মোট আরএমজি রপ্তানির ৭০% অর্জন করে (রায়হান, ২০২৪)। যেহেতু আরএমজি শিল্প কটন-ভিত্তিক পোশাক উৎপাদনে ক্রমবর্ধমানভাবে স্যাচুরেটেড হয়ে উঠছে, তাই উৎপাদকদের অ-কটন-ভিত্তিক পোশাক, বিশেষ করে ম্যান-মেড ফাইবারে (এমএমএফ) বৈচিত্র্য আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাত, বাংলাদেশ বৈশ্বিক বাজারে দ্বিতীয় বৃহত্তম আরএমজি রপ্তানিকারক হিসেবে তার অবস্থান ধরে রাখতে পারে।

বৈশ্বিক বাণিজ্য উত্তেজনা এবং এলডিএস উত্তরণ: বৈশ্বিক বাণিজ্য উত্তেজনা, বিশেষ করে মার্কিন-চীন বিরোধ, কাঁচামাল সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটায়। একই সময়ে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তিগুলো শ্রম এবং পরিবেশগত মানের উপর জোর দেয়, যা বাংলাদেশি উৎপাদকদের মান পূরণের অনুশীলন আপগ্রেড করতে বাধ্য করে। ২০২৬ সালে

বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ বড় চ্যালেঞ্জ, যা পছন্দসই বাণিজ্য সুবিধা শেষ করবে, রপ্তানি খরচ বাড়াবে এবং প্রতিযোগিতামূলকতা হ্রাস করবে (রায়হান ও অন্যান্য, ২০২২)।

শুল্ক উদারীকরণের চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশ শুল্ক উদারীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। যা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলকতা বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্য নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যদিও শুল্ক কমানো আমদানিকৃত কাঁচামালের খরচ কমাতে পারে, যা রপ্তানি-ভিত্তিক শিল্পগুলোর জন্য সহায়ক, এটি স্থানীয় শিল্পগুলোকেও সম্ভাব্য আমদানির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। এটি স্থানীয় শিল্প রক্ষা এবং রপ্তানি ও বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার মধ্যে একটি নীতি দ্বন্দ্ব তৈরি করে। ঐতিহাসিকভাবে, বাংলাদেশের শুল্ক নীতিগুলো দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় অসঙ্গত এবং প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে সমালোচিত হয়েছে (সাত্তার, ২০২৪)।

শুল্ক হারের তুলনা: বাংলাদেশের বর্তমান গড় শুল্ক হার ২৭%, যা অন্যান্য আয় গোষ্ঠীর গড় হারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। নিম্ন-আয়ের দেশগুলোর জন্য ৯.৭৯%, নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর জন্য ৭.২%, উচ্চ-আয়ের দেশগুলোর জন্য ২.০২%, এবং বৈশ্বিক গড় ৬%। গত এক দশকে, প্যারাসুল্ক বৃদ্ধি এবং কাস্টমস শুল্কের সমন্বয়ে সামগ্রিক নামমাত্র সুরক্ষা হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

উচ্চ শুল্ক হারের কারণ: দেশের উচ্চ গড় শুল্ক হারের আরেকটি কারণ হলো অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণে দুর্বল পারফরম্যান্সের পাশাপাশি সরকারের কাস্টম শুল্ক থেকে রাজস্ব আহরণের উপর উচ্চ নির্ভরতা। এছাড়াও, গত এক দশকে পূর্ববর্তী সরকারের অবকাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দেওয়ার কারণে ইম্পাত, সিমেন্ট এবং নির্মাণ সামগ্রীর মতো আমদানি-প্রতিস্থাপনকারী খাতগুলো উচ্চ শুল্ক হারের মাধ্যমে সুরক্ষার পক্ষে সমর্থন করেছে। এডিবল অয়েল, চিনি, বিস্কুট, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং পোল্ট্রির মতো অন্যান্য আমদানি-প্রতিস্থাপনকারী খাতগুলোও উচ্চ শুল্ক সুরক্ষার পক্ষে রয়েছে।

রপ্তানির প্রতি পক্ষপাতহীনতা (অ্যান্টি-এক্সপোর্ট বায়াস): এই উচ্চ সুরক্ষার মাত্রা “রপ্তানির প্রতি পক্ষপাতহীনতা” তৈরি করেছে। যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলো বেশি লাভজনক অভ্যন্তরীণ বাজারের দিকে মনোযোগ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আরএমজি খাত আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর শুল্ক হ্রাস থেকে লাভবান হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) আমদানিকৃত পণ্যের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করতে সংগ্রাম করে। বিশেষ করে হালকা প্রকৌশল এবং ইলেকট্রনিক্সের মতো খাতগুলোতে।

শুল্ক কাঠামোর প্রভাব: শুল্ক কাঠামোর উচ্চ সুরক্ষার মাত্রা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নতুন রপ্তানি বাজার অনুসন্ধান এবং উদ্ভাবনের প্রতি নিরুৎসাহ তৈরি করে। যা খাতের বাইরে রপ্তানি বৈচিত্র্যকে সীমিত করে। যদিও আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য পর্যায়ক্রমিক শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে, তবে এগুলো প্রায়শই উচ্চ সম্পূরক শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন করের মতো অ-শুল্ক বাধা দ্বারা অফসেট হয়। এই ধরনের ব্যবস্থা স্থানীয় শিল্পগুলোর জন্য স্বল্পমেয়াদী সুরক্ষা প্রদান করে, কিন্তু একটি প্রতিযোগিতামূলক, রপ্তানি-ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার বৃহত্তর লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্ত করে।

কাস্টমস পদ্ধতির জটিলতা: বাংলাদেশের শুল্ক ব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক কাস্টমস পদ্ধতির কারণে আরও জটিল হয়ে উঠেছে, যা বাণিজ্যের খরচ এবং সময় বাড়িয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াগুলো সহজীকরণের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, বাধা অব্যাহত রয়েছে। যা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অভ্যন্তরীণ বাজারের দিকে মনোযোগ দেওয়ার দিকে পরিচালিত করে, যেখানে প্রশাসনিক বাধা কম।

জাতীয় শুল্ক নীতি ২০২৩: সমস্যা সমাধানে, জাতীয় শুল্ক নীতি ২০২৩ শুল্ক কাঠামো যুক্তিসঙ্গতকরণ, চূড়ান্ত পণ্যের সুরক্ষা হ্রাস এবং কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্ক হ্রাসের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই নীতি রপ্তানিকারকদের উৎপাদন খরচ হ্রাস, প্রতিযোগিতামূলকতা বৃদ্ধি এবং একটি স্বচ্ছ শুল্ক পরিবেশ তৈরি করে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

সফল বাস্তবায়নের শর্ত: যে কোনো নীতির সাফল্য কার্যকর বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে। যা প্রায়শই উচ্চ সুরক্ষার স্তর থেকে লাভবান স্বার্থাশ্রয়ী গোষ্ঠী দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সরকারি সংস্থা, শিল্প এবং বাণিজ্য সংস্থাগুলোর মধ্যে শক্তিশালী রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং সহযোগিতা ধীরে ধীরে হ্রাস এবং সমন্বয়ের জন্য অপরিহার্য। যা অভ্যন্তরীণ শিল্পগুলোর প্রতিযোগিতামূলকতা উৎসাহিত করবে। এছাড়াও, ব্যবসায়িক খরচ হ্রাস, লজিস্টিক উন্নয়ন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তিশালীকরণের মতো পরিপূরক সংস্কারগুলি শুষ্ক উদারীকরণের সাফল্য নিশ্চিত করতে এবং রপ্তানির প্রতি পক্ষপাতহীনতা কাটিয়ে উঠতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, কৌশলগত শুষ্ক উদারীকরণ নীতি প্রমোট করা উচিত, পুরোপুরি উদারীকরণ নয়।

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে (এফটিএ) সীমিত অংশগ্রহণ: বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে (এফটিএ) সীমিত অংশগ্রহণের কারণে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিবেশে এফটিএ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি বাজার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করে, বাণিজ্য বাধা কমায় এবং রপ্তানির জন্য পছন্দসই সুবিধা নিশ্চিত করে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান উন্নত করে। এই সুবিধাগুলো থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশ ভারত ও ভিয়েতনামের মতো আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় এফটিএ স্বাক্ষর ও আলোচনায় ধীরগতির কারণে বৈশ্বিকভাবে অনকূল বাজার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এই কম অংশগ্রহণের পেছনে ছয়টি প্রধান কারণ রয়েছে:

(১) **জিএসপি সুবিধার প্রতি পক্ষপাত:** বাংলাদেশ ইইউর মতো প্রধান বাজার থেকে প্রদত্ত জিএসপি সুবিধা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়, যা এফটিএর তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয়।

(২) **রাজস্ব হারানোর ভয়:** রাজস্বের একটি বড় অংশ আসে শুষ্ক থেকে, তাই বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা আশঙ্কা করেন যে এফটিএ, যা সাধারণত শুষ্ক হ্রাসের সাথে জড়িত, সরকারের আয়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

(৩) **বাণিজ্য আলোচনা সক্ষমতা:** জটিল বাণিজ্য চুক্তিগুলোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও আলোচনা দক্ষতা উন্নত হয়নি।

(৪) **অভ্যন্তরীণ শিল্পের জন্য উদ্বেগ:** অনেক অভ্যন্তরীণ আমদানি-প্রতিস্থাপনকারী শিল্প প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির আশঙ্কায় এফটিএর পক্ষে নয়।

(৫) **সীমিত রপ্তানি বাস্কেট:** বাংলাদেশের রপ্তানি তুলনামূলকভাবে সীমিত, যেখানে পোশাক শিল্প প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, এবং একটি বৈচিত্র্যময় শিল্প ভিত্তির অভাবে অন্যান্য বাজার বা খাত খোলার জন্য খুব কম প্রেরণা রয়েছে।

(৬) **রাজনৈতিক ও কৌশলগত কারণ:** আঞ্চলিক গতিশীলতা ও মিত্রতা বাংলাদেশের সতর্ক পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে এশিয়ার প্রতিবেশী ও বাণিজ্য অংশীদারদের সাথে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে।

এফটিএ বিবরণ: এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (এপিটিএ) পূর্বে ব্যাংকক চুক্তি নামে পরিচিত। এপিটিএ বাংলাদেশ, চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, লাওস ও শ্রীলঙ্কাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বাণিজ্য চুক্তি। এটি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শুষ্ক ছাড় দেয়। দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (সাফটা) সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একটি আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি। যার মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান অন্তর্ভুক্ত। এটি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শুষ্ক হ্রাস করে বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্য রাখে। ভুটানের সাথে পছন্দসই বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) বাংলাদেশ ভুটানের সাথে একটি পিটিএ স্বাক্ষর করে, যা তার প্রথম দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি। এই চুক্তি দুই দেশের মধ্যে অনেক পণ্যে শুষ্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়।

বাংলাদেশের আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিগুলোতে অংশগ্রহণ নিরাশাজনক। দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (স্যাফটা) এবং বঙ্গোপসাগরীয় বহুমুখী প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা উদ্যোগ (বিমস্টেক) এফটিএর মতো চুক্তিগুলোতে অগ্রগতি সীমিত। স্যাফটা, যা ২০০৪ সালে স্বাক্ষরিত হয়, শুষ্ক হ্রাস ও আঞ্চলিক বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্য রাখে। কিন্তু অ-শুষ্ক বাধা ও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে এর অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত। বিমস্টেকও একইভাবে সংগ্রাম করেছে, জাতীয় স্বার্থের পার্থক্যের কারণে চুক্তি চূড়ান্তকরণে বিলম্ব হয়েছে।

২০২০ সালে ভুটানের সাথে পছন্দসই বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) স্বাক্ষর করে বাংলাদেশের একমাত্র উল্লেখযোগ্য দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য অর্জন হয়েছে। যা নির্বাচিত পণ্যগুলোর জন্য শুষ্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেবে। তবে, চুক্তিটির সুযোগ সীমিত, ছোট বাণিজ্য পরিমাণ কভার করে, এবং ভুটানের বাজার আকারের কারণে অর্থনৈতিক সুবিধাও সীমিত। বাংলাদেশ এখনও ইইউ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীনের মতো প্রধান বাণিজ্য অংশীদারদের সাথে ব্যাপক এফটিএ স্বাক্ষর করতে পারেনি, যা তার দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক কৌশলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

এফটিএর অনুপস্থিতি বাংলাদেশের রপ্তানি খাতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। এফটিএ ছাড়া, বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্য প্রায়শই ভিয়েতনামের মতো প্রতিযোগীদের তুলনায় উচ্চ শুল্কের মুখোমুখি হয়। যারা সিপিটিপিপি এবং ইইউ-ভিয়েতনাম এফটিএর মতো অসংখ্য এফটিএ থেকে উপকৃত হয়। এফটিএ ভিয়েতনামকে টেক্সটাইল, ইলেকট্রনিক্স ও কৃষি খাতে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা দিয়েছে। বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) অবস্থান থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, এবং জেনারেলাইজড সিস্টেম অফ প্রেফারেন্সেস (জিএসপি) অধীনে বাণিজ্য সুবিধা হারানো এই চ্যালেঞ্জকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

সমস্যাগুলো সমাধানে বাংলাদেশকে এফটিএতে কৌশলগত সম্পৃক্ততাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেখানে পোশাক, চামড়া ও কৃষি প্রক্রিয়াকরণের মতো তুলনামূলক সুবিধাসম্পন্ন খাতগুলোর উপর ফোকাস করতে হবে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর সাথে চুক্তি অন্বেষণ করে রপ্তানি বাজার বৈচিত্র্যকরণের চেষ্টা করা উচিত। অভ্যন্তরীণ শিল্পগুলোর সাথে ব্যাপক পরামর্শও অপরিহার্য। যাতে এফটিএ দুর্বল খাতগুলোর জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা দেয় এবং প্রযুক্তি, দক্ষতা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান উন্নত করে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ আঞ্চলিক ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব (আরসিইপি) এবং আসিয়ানে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আরসিইপির সদস্যপদ বাংলাদেশকে প্রসারিত বাজার— বিশেষ করে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং আসিয়ান সদস্যদের মতো প্রধান অর্থনীতিগুলোতে প্রবেশাধিকার দেবে। বাংলাদেশ অন্যান্য কিছু দেশের সাথে এফটিএ আলোচনাও বিবেচনা করছে।

তবে, আরসিইপির বৈচিত্র্যময় বাণিজ্য সহায়তা থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি লাভবান হবে। বাংলাদেশকে তার বাণিজ্য আলোচনা সক্ষমতা শক্তিশালী করতে হবে। পোশাক খাতের বাইরে রপ্তানি বৈচিত্র্য আনতে হবে এবং আঞ্চলিক মানদণ্ড পূরণের জন্য অবকাঠামো উন্নত করতে হবে। এছাড়াও, বাণিজ্য নীতি, শুষ্ক কাঠামো এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামোতে সংস্কার, প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান উন্নত করার জন্য অপরিহার্য।

বাংলাদেশ সার্ক এবং বিবিআইএন প্রক্রিয়াগুলোকে সক্রিয় করতে পারে এবং বাণিজ্য সহায়তা, সীমান্ত-পরবর্তী সংযোগ এবং সরলীকৃত কাস্টমস প্রক্রিয়ার উপর আলোচনার নেতৃত্ব দিয়ে বিমস্টেক এফটিএ ত্বরান্বিত করতে পারে। পারস্পরিক অর্থনৈতিক লাভকে অগ্রাধিকার দিয়ে, বাংলাদেশ যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্প, সমন্বিত নিয়মাবলী এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ প্রস্তাব করতে পারে। স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে কূটনৈতিক চ্যানেলে অগ্রগতি এবং আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে পারে।

১২.৩ মূল বার্তা

১. রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ: সরকারকে তৈরি পোশাক খাতের বাইরে অন্য খাতের উন্নয়নে লক্ষ্যযুক্ত নীতি ও পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এতে আমদানিকৃত মূলধনী পণ্যের উপর শুল্ক হ্রাস, কর প্রণোদনা এবং উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান উন্নত করতে প্রযুক্তি আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টায় সহায়তা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

২. পোশাক খাত-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা: পোশাক খাতের স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে অ-কটন এবং ম্যান-মেড ফাইবার (এমএমএফ) টেক্সটাইলে বৈচিত্র্য আনতে হবে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলার জন্য আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে। প্রযুক্তি উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং টেকসই অনুশীলন সমর্থনের জন্য গ্রিন ফাইন্যান্স ফান্ড গঠন করতে হবে। শ্রম মানদণ্ড জোরদার করতে হবে এবং নৈতিক অনুশীলন নিশ্চিত করতে বিশ্বব্যাপী সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা করে ক্রেতাদের আস্থা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. শুল্ক কাঠামো সহজীকরণ: সরকারকে বর্তমান উচ্চ-শুল্ক ব্যবস্থা সংস্কার করে তুলনামূলকভাবে “রপ্তানি-বিরোধী পক্ষপাত” দূর করতে হবে। বিশেষ করে কাঁচামাল এবং মধ্যবর্তী পণ্যের জন্য। এছাড়াও, পুরোপুরি নয় কৌশলগত শুল্ক উদারীকরণ নীতি প্রচার করা গুরুত্বপূর্ণ।

৪. তথ্য নির্ভুলতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ: নির্ভুল তথ্যের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করতে ইপিবি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে প্রযুক্তির সমন্বয় ও সংহতকরণ প্রয়োজন, যাতে রপ্তানি প্রতিবেদনে অসঙ্গতি কমে। এক্ষেত্রে, রপ্তানির রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিংয়ের জন্য ডিজিটাইজড ব্যবস্থার পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহ ও বৈধকরণে প্রশিক্ষণ দিয়ে নির্ভুলতা ও স্বচ্ছতা বাড়ানো যেতে পারে।

৫. বাণিজ্য মনিটরিং জোরদার করে মূলধন পাচার মোকাবিলা: বাণিজ্য মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করে বাণিজ্য ভুল-ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে মূলধন পাচার কমানো যেতে পারে। এতে এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা জোরদার, ডেটা বৈধকরণ প্রক্রিয়া উন্নত, উন্নত ডিজিটাল ট্র্যাকিং সিস্টেম বাস্তবায়ন এবং বাণিজ্য লেনদেনের নিয়মিত অডিট অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

৬. কৌশলগত এফটিএ আলোচনা: বাংলাদেশের উচিত ২০২৬ সালে এলডিসি বাণিজ্য সুবিধা হারানোর সম্ভাবনার প্রস্তুতি হিসেবে, প্রধান বাণিজ্য অংশীদারদের সাথে কৌশলগত এফটিএ আলোচনা করা। এই আলোচনা খাতভিত্তিক হতে হবে, তুলনামূলক সুবিধাগুলোর উপর ফোকাস করতে হবে; সরকারকে অনুকূল বাণিজ্য শর্তের জন্য আলোচনা সক্ষমতা ও কৌশল গড়ে তুলতে হবে।

৭. এফডিআই বাড়াতে কৌশল উন্নয়ন: সরকারের অবকাঠামোগত বাধা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা এবং উচ্চ-সম্ভাবনাময় খাতগুলোতে উপযুক্ত প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করার প্রচেষ্টা বাংলাদেশকে এফডিআইর আরও আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করবে। পোশাক খাতের বাইরে বৈচিত্র্যময় শিল্পের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল বরাদ্দ করাও এফডিআই আকর্ষণ এবং খাতভিত্তিক বৈচিত্র্য আনতে গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক খাত

অধ্যায় ১৩: দারিদ্র্য, বৈষম্য, এবং দুর্বলতা: একটি ভঙ্গুর গৌরবের গল্প*

- দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব উন্নয়ন কোনো সরকারের একক অবদান নয়, বিভিন্ন সরকারের আমলেই দেশের উন্নয়ন হয়েছে
- উন্নয়নের সন্তোষজনক গতি বজায় থাকলেও সময়ের সাথে অর্থনৈতিক দারিদ্র্য বিমোচনের গতি কমে আসছে
- বহুমুখী (আর্থ-সামাজিক) দারিদ্র্য সূচকে উন্নতি অব্যাহত আছে, কিন্তু বণ্টনে ন্যায্যতা রক্ষিত হয়নি
- নারী ও পুরুষের উন্নয়ন সমহারে হয়নি
- সামাজিক ভাতার পরিমাণ প্রয়জনের তুলনায় অনেক কম
- ডিজিটাল সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ব্যবধান এখনো অনেক বেশি এবং নারীদের মোবাইল ফোনের মালিকানা এখনো পুরুষদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম

১৩.১ সূচনা

গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের উন্নতি নিয়ে সাবেক সরকার যে গৌরবের বয়ান তৈরি করেছিল, প্রতিবেদনের এই অংশে শ্বেতপত্র কমিটি তার বিশদ বিশ্লেষণ করেছে। ২০১৬ ও ২০২২ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপ, আলাপ-আলোচনা ও এ বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উন্নতির এই আখ্যান অনেকটাই ভঙ্গুর।

উচ্চহারের প্রবৃদ্ধির সঙ্গে দ্রুতহারে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব উন্নয়নের যে গাঁথা প্রচার করা হয়েছে, কমিটির বিবেচনায় তা কোনো সরকারের একক অবদান নয়, বরং বিভিন্ন সরকারের আমলেই দেশের উন্নয়ন হয়েছে। আবার দেখা গেছে, যে সত্য সরকারের জন্য সুবিধাজনক, সেটা তুলে ধরার পাশাপাশি পরিসংখ্যানের অপব্যবহার করা হয়েছে। উন্নতির যে চিত্র দেখানো হয়েছে, সেখানে এর দুর্বলতা দেখানো হয়নি। বর্ণনার দুর্বলতা তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখি যে, দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসা মানুষেরা এখনো দারিদ্র্যসীমার খুব কাছে অবস্থান করছে। যেকোনো আঘাতে তারা আবার দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যেতে পারে। সম্প্রতি বিষয়টি আরও তীব্র ও জটিল হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন ছিল বৈষম্যপূর্ণ। বিগত সরকার একটি বয়ান জোরেশোরে প্রচার করেছিল যে, প্রবৃদ্ধির যখন বাড়তে থাকে তখন বৈষম্যও বেড়ে যায়। এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া- ভবিষ্যতে উন্নতি হলে বৈষম্য কমে আসবে। কিন্তু এই দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ বৈশ্বিক পরিসরে খুঁজে পাওয়া যায় না। অসমতা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সবচেয়ে অসম দেশগুলোর কাতারে চলে এসেছে। ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের নিরিখে বাংলাদেশে সম্পদের অসমতা চরম আকার ধারণ করেছে। সম্পদের চরম অসাম্য কমানোর ব্যবস্থা না নেওয়া হলে এই অসমতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহন করতে হবে এবং পরিণামে সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবে।

সবশেষে, সাবেক সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে নিজেদের জনগণের প্রতি যত্নশীল বলে দাবি করত। কিন্তু শ্বেতপত্র কমিটির ভাষ্য হলো, রাজনীতিককরণ, জবাবদিহিতার অভাব ও অদক্ষতাসহ নানা কারণে এই কর্মসূচি অনেকাংশে প্রকৃত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায়নি। তাছাড়া বিভিন্ন ভাতার পরিমাণ একেবারেই কম। সামাজিক নিরাপত্তা সেবাউন্নয়নে যে ডিজিটাল পদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল, তাও যথেষ্ট নয়। ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের এই অঙ্গীকার ছিল অনেকটা কাল্পনিক এবং একইসাথে ব্যবহার ছিল খুবই কম। বরঞ্চ এর ফলে অনেকক্ষেে দুর্নীতির নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন ড. ইমরান মতিন, নির্বাহী পরিচালক, বিআইজিডি।

এই অধ্যায়কে মোট পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। দারিদ্র্য ও প্রবৃদ্ধি প্রবণতা খতিয়ে দেখার মধ্য দিয়ে এর শুরু; এরপর অসমতার বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি দারিদ্র্য ও প্রবৃদ্ধির সংযোগের সঙ্গে এর সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে মানব পুঁজি ও সামাজিক সুরক্ষা খাতের প্রবণতা খতিয়ে দেখা হয়েছে; দারিদ্র্য ও অসমতা দূর করতে এগুলোর ভূমিকা ও আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কথা আমলে নেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ের সমাপ্তি টানার আগে তথ্য-উপাত্তের ওপর আমাদের পর্যবেক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

১৩.২ দারিদ্র্যবিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা

১৯৯০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে দেশে দারিদ্র্যের হার ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ, অর্থাৎ দারিদ্র্য মোট কমেছে ৩৮ শতাংশীয় পয়েন্ট। এই ৩২ বছরে গড়ে বার্ষিক ১ দশমিক ২ শতাংশীয় পয়েন্ট হারে দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে। তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার অনেকটা বাড়লেও দারিদ্র্য বিমোচনের হার কমেছে। গত এক দশকে দেশের প্রবৃদ্ধি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ২০১২ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) তিনগুণের বেশি বেড়েছে; ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে যা বেড়েছিল ৮৮ শতাংশ এবং ১৯৯০-এর দশকে মাত্র ৪০ শতাংশ। কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচনের হার সবচেয়ে বেশি ছিল ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে। প্রতি বছরে গড়ে ১ দশমিক ৭৪ শতাংশীয় পয়েন্ট। তার অর্থ হল গত এক দশকে জাতীয় আয় ও ভোগে যে উন্নতি হয়েছে, দরিদ্র মানুষের জীবনে তার প্রভাব কম।

দারিদ্র্য ও মাথাপিছু জিডিপির দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতার তুলনা করতে গিয়ে দুটি বিষয় বিবেচনা করা জরুরি। প্রথমত, বাংলাদেশ বুরো অব স্ট্যাটিস্টিক্স জিডিপি পরিমাপের ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ সাল থেকে পরিবর্তন করে ২০১৫-১৬ সাল নির্ধারণ করেছে। জিডিপির হিসাবে নতুন নতুন সেক্টর যোগ করা হয়েছে এবং আগের সেক্টরগুলোর হিসাবে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতে ২০১৬ সালে ২০১৫ থেকে মোট জিডিপি এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়েছে যার ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ও মাথাপিছু জিডিপিও উল্লেখযোগ্যহারে বেড়েছে। অন্যদিকে, ভোগের পরিবর্তিত বাস্তবতার ভিত্তিতে মানুষের জীবনমানের যথাযথ প্রতিফলন নিশ্চিত করতে দারিদ্র্যসীমার হিসাবে নতুন নতুন খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য যোগ করা হয়েছে।

নতুন এই হিসাব অনুযায়ী ২০১০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত দারিদ্র্য বিমোচনের বার্ষিক হার ছিল ১ দশমিক ৫৩ শতাংশীয় পয়েন্ট। এবং ২০১৬ থেকে ২০২২ সালের দিকে তাকালে দেখতে পাই, বার্ষিক গতি ১ দশমিক ৩ শতাংশীয় পয়েন্টে নেমে এসেছে। আমরা আগেই বলেছি ২০০০-২০১০ এ জিডিপি বৃদ্ধির হার গত দশকের চেয়ে কম হলেও দারিদ্র্যবিমোচনের হার ছিল বেশি (১ দশমিক ৭৪ শতাংশীয় পয়েন্ট)। তার অর্থ বর্তমান বছরগুলোতে দারিদ্র্যবিমোচনের গতি শ্লথ হয়ে আসছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দারিদ্র্যবিমোচনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভূমিকা আগের চেয়ে যে কমেছে; এ বিষয়ে বৃহত্তর ঐকমত্য গড়ে উঠেছে। ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশগত ঝুঁকি, ও পক্ষপাতমূলক নীতির মতো বিষয়গুলো দারিদ্র্যবিমোচনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভূমিকা খর্ব করেছে। বিগত দশকে শুধু চরম দারিদ্র্য নয়, মধ্যম দারিদ্র্য নিরসনেও প্রবৃদ্ধির ভূমিকা কমেছে; কিন্তু এই বাস্তবতার ভিত্তিতে তেমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ওপর অতিমারীর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং তা দারিদ্র্যের সূচকে যথেষ্ট প্রতিফলিত হয়নি। তার ফলে ভবিষ্যতের দারিদ্র্য ও প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক নির্ণয় আরো জটিল হয়ে যাবে। এবং, ২০২২ সালে প্রবৃদ্ধির ও দারিদ্র্যের সরকারি হিসাবে অতিমারীর প্রভাব যথাযথভাবে পরিমাপ করা হয়েছে কি না, বিশেষত জনগণের অতিমারীর ধাক্কা সামাল দেওয়ার কৌশল এবং মুদ্রাস্ফীতি—তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে মনে করে শ্বেতপত্র কমিটি।

দারিদ্র্যের হার নির্ধারণে শুধুমাত্র দারিদ্র্যসীমার নিচে কারা আছে সে হিসাব করা হয়। তাদের অরক্ষিত জীবনের বাস্তবতা দারিদ্র্যবিমোচনের চিত্রে প্রতিফলিত হয়নি। শ্বেতপত্রের গবেষকগণ দেখেছেন, এই দারিদ্র্যসীমা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করলেই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী বিপজ্জনকভাবে দারিদ্র্যসীমার কাছাকাছি চলে আসে। যদি দারিদ্র্যসীমা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয় তাহলে মধ্যম ও চরম এই উভয়রকম দারিদ্র্যই দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যায়। এই বিশ্লেষণের আলোকে শ্বেতপত্র কমিটি বলছে, দারিদ্র্যবিমোচনের ধারাবাহিকতায় দারিদ্র্যসীমা মোটামুটি বাড়লেও দারিদ্র্যের হার নাটকীয়ভাবে বেড়ে যেতে পারে। এই বিশ্লেষণ দারিদ্র্যসীমার কাছাকাছি থাকা বিশাল জনগোষ্ঠীর ঝুঁকির প্রতি ইঙ্গিত করছে।

২০১০ থেকে মাথাপিছু আয় নির্ভর দারিদ্র্য নিরসনের হার কমলেও বহুমুখী দারিদ্র্যের সূচকের উন্নতি হয়েছে। তবে সেক্ষেত্রেও তথ্য হালনাগাদ করা দরকার। মাল্টিডাইমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স (এমপিআই) বা বহুমুখী দারিদ্র্য সূচক ২০১০-এ ছিল শূন্য দশমিক ২৯, ২০২০ সালে তা শূন্য দশমিক ১০-তে নেমে এসেছে। এমপিআই অনুযায়ী ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ১৯ মিলিয়ন বা এক কোটি ৯০ লাখ মানুষ বহুমুখী দারিদ্র্যের চক্র থেকে বেরিয়ে এসেছে।

বহুমুখী দারিদ্র্য সূচকের এই উন্নতির পেছনের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল দেশের মানুষের পুষ্টিমানের উন্নতি। ২০১০ সালে অপুষ্টির হার ছিল ৩৬ দশমিক ৫ শতাংশ, ২০২০ সালে তা ৯ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। কিন্তু শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে, অতিমারীর ধাক্কা ও বিগত কয়েক বছরের উচ্চ মূল্যফীতির কারণে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে যা এই সূচকে ফুটে ওঠেনি।

এই সূচকের উন্নতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রের ভূমিকাও বেশ বড়, তবে সেখানেও সমস্যা আছে বলে শ্বেতপত্রের গবেষকগণ মনে করেন। ২০১০ সালে পরিবারের অন্তত একজন সদস্য ষষ্ঠ শ্রেণির পড়াশোনা সম্পন্ন করেননি- এমন পরিবারের সংখ্যা ছিল ২৪ শতাংশ; ২০২০ সালে তা ১৭ শতাংশে নেমে এসেছে। কিন্তু একইসাথে শিক্ষার মানের ক্রমশ পতন হচ্ছে, যার ফলে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা শেষ করলেও তার মান কমে গেছে। অধ্যায়ের পরের অংশে দারিদ্র্য ও অসমতার ওপর পতনশীল শিক্ষার মানের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নারীর কর্তৃত্বে থাকা পরিবারে আর্থিক দারিদ্র্য থাকার সম্ভাবনা কম, পরিসংখ্যান তাই বলে। তবে দারিদ্র্যের লৈঙ্গিক বিশ্লেষণে সমাজে নারীদের অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে, যেমন-নারীর প্রতি সহিংসতা। সহিংসতা ও নিরাপত্তার অভাবে অনেক নারীর অর্থনৈতিক ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নীতিগত অনেক উন্নয়ন হলেও দেশে নারী প্রতি সহিংসতার উচ্চহার বজায় রয়েছে। স্বামীর দ্বারা যৌন ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার নারীর সংখ্যা দরিদ্র পরিবারে অনেক বেশি (৬১ দশমিক চার শতাংশ) যা ধনী পরিবারের প্রায় দ্বিগুণ। এছাড়া ঘরে ও ঘরের বাইরে সহিংসতার শিকার হওয়ার ভয়ে অনেক নারীর চলাফেরা বিঘ্নিত হয়, ফলে তাদের শিক্ষা ও কর্মজীবন, এমনকি স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও ইউনিসেফের ২০১৯ সালে করা এক জরিপে দেখা গেছে, এখনো ২৫ শতাংশ নারী ঘরের বাইরে যেতে অনিরাপদ বোধ করেন। বিশেষ করে তরুণীদের (১৮-১৯) ক্ষেত্রে এই ভীতি বেশি (৩৬%)। অতিমারীর সময় বিশেষ করে নারী প্রধান পরিবারে এই ভীতি আরো প্রকট হয়ে উঠেছিল। যারা একদিকে পরিবারের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করতে হিমশিম খেয়েছে, আরেকদিকে মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গলদঘর্ম হয়েছে। নিরাপত্তাহীনতার বোধ থেকে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়; বিয়ের পর তাদের শিক্ষাগ্রহণ থেমে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এবং সবচেয়ে গরিব পরিবারগুলোতে এই ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

দেশে নারী নির্যাতন রোধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, গৃহ সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন হলেও এখনো অনেকে মনে করেন, বিয়ে পবিত্র ও একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। ফলে সেবাদানকারী সংস্থা ও আইনি

প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে গড়িমসি করে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এসব আইন আরও কার্যকর করতে বাস্তবায়নকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতিনীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে।

১৩.৩ ক্রমবর্ধমান অসমতা: উচ্চবিত্তের ক্রমান্বিত

উচ্চহারের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে গেলে অসমতা বাড়বে, এই তত্ত্ব মেনে নিলে দরিদ্ররাই সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাম্প্রতিকালে নীতিনির্ধারক এবং সাংবাদিক মহল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ধারণা তৈরি হচ্ছে যে— জাতীয় আয় বৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ে অসমতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে পরবর্তীতে অসমতা কমে আসে। এই তত্ত্বের যুক্তিযুক্ত সমালোচনা করা যায়। এক্ষেত্রে, সবচেয়ে বড় যুক্তি হল; বর্তমান বিশ্বে এই তত্ত্বের কোনো বাস্তব প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশে অসমতা বাড়তে বাড়তে বিশ্বের সবচেয়ে অসম দেশগুলোর কাতারে নেমে এসেছে। খানা আয়-ব্যয় জরিপের উপাত্ত ব্যবহার করে শ্বেতপত্র কমিটি দেখিয়েছে, ২০২২ সালে বাংলাদেশের জিনি সহগ (অসমতার মানদণ্ড) ছিল শূন্য দশমিক ৫০। ২০২১ সালে বিশ্বব্যাংকের হিসাবে কেবল পানামা, ব্রাজিল ও কলাম্বিয়ার সহগ ছিল শূন্য দশমিক ৫০-এর বেশি।

সম্পদের অসমতা আয়ের অসমতার চেয়ে অনেক বেশি। ২০১৬ সালে দেশে সম্পদের জিনি সহগ ছিল শূন্য দশমিক ৮২; যা ২০২২ সালে শূন্য দশমিক ৮৪ তে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সম্পদশালী পরিবারের তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে, সে কারণে সম্পদ অসমতার প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০২২ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপে দেশের শীর্ষ ১০ শতাংশ ধনী পরিবারের গড় সম্পদমূল্য দেখানো হয়েছে মাত্র ৭ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। গ্রামাঞ্চলের শীর্ষ ১০ শতাংশ ধনী পরিবারের গড় সম্পদমূল্য ছিল ৪ লাখ ১৭ হাজার টাকা এবং শহরাঞ্চলের পরিবারের ক্ষেত্রে তা ছিল ১২ লাখ ২৬ হাজার টাকা। শ্বেতপত্র কমিটি বলছে, রিপোর্টকৃত সম্পদমূল্যের সঙ্গে বাস্তবতার অমিল অনেক বেশি। অর্থাৎ বোঝা যায়, জরিপে সম্পদমূল্য অনেক কম দেখানো হয়েছে। এতে সম্পদের অসমতার মূল চিত্রটি পরিষ্কার হচ্ছে না।

সম্পদের পূর্ণ বিবরণ না থাকলেও যতটুকু রিপোর্ট করা হয়েছে, তার অর্ধেকের উৎস ভূমি এবং বাড়ির মতো স্থাবর সম্পত্তি। জমির মূল্যমান দুই দিক থেকে আসে, জমির পরিমাণ ও মূল্য। স্বাভাবিকভাবেই ২০১৬ ও ২০২২ এর জমির মালিকানার গড় পরিমাণে তেমন পার্থক্য তৈরি হয়নি। আয় অনুযায়ী জমির মালিকানা গড় পরিমাণের পার্থক্যও খুব বেশি নয়। দেশের সবচেয়ে ধনী ২০ শতাংশ পরিবারের গড় জমির পরিমাণ মাত্র শূন্য দশমিক ০৩ একর। মূল পার্থক্য দেখা যায় সম্পদের মূল্যে। ধনী পরিবারের সম্পদমূল্য কেবল ২০১৬ সালেই অনেক বেশি ছিল তাই নয়, বরং ২০২২ সালে তা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। জমির অবস্থান ও অবকাঠামোগত সুবিধার ওপর জমির দাম নির্ভর করে। জমির দাম বৃদ্ধির এই পার্থক্য দেখে বোঝা যায়, অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরকার যে বিনিয়োগ করে, ধনীরা তা থেকে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে লাভবান হয়। একদিকে সম্পদ নির্দিষ্ট কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত, অন্যদিকে সম্পদের দ্রুত মূল্যবৃদ্ধির কারণে সম্পদের ক্ষেত্রে অসমতা বাড়ছে। ধনীরা আবার বিভিন্ন লাভজনক খাতে সম্পদ বিনিয়োগ করেন, যেমন: স্টক, বন্ড, সোনা। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের মানুষের সম্পদ হচ্ছে গৃহস্থালির সামগ্রী, যেমন: টিভি। যেগুলোর মূল্য সময়ের সঙ্গে কমে; কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, যেমন: গবাদিপশু। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের মানুষের সম্পদ থেকে আয়ও হয় না। ফলে অসমতা আরো বাড়ছে।

আর্থিক সম্পদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যবধান সব শ্রেণির মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং উভয় ক্ষেত্রেই নারীরা পিছিয়ে আছে। আবার যেসব নারী আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তাদের অন্তর্ভুক্তির মাত্রা অতটা গভীর নয়। পুরুষদের মধ্যে ৩২ শতাংশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাত্রা গভীর, অর্থাৎ তারা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবা গ্রহণ ও ব্যবহার করে থাকেন। নারীদের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ১৮ শতাংশ। আর্থিক খাতে নারীদের কার্যক্রম সীমিত। তবে প্রথাগত ব্যাংক হিসাবের তুলনায় মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শ্রেণি নির্বিশেষে নারী-পুরুষের ব্যবধান কম। তবে স্বল্প সুদের ঋণ পাওয়া বা লাভজনক বিনিয়োগ করতে পারার ক্ষমতার তুলনায় শুধুমাত্র অ্যাকাউন্ট থাকাটা বৈষম্যের প্রাথমিক স্তর।

শ্বেতপত্র কমিটি মনে করছে, বিদ্যমান অসমতা ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে বাধা হতে পারে। খানা আয়-ব্যয় জরিপের এই চিত্র সমস্যাসংকুল বাস্তবতার কথা বলে, যে বিষয়টি সাধারণত খবরে উঠে আসে না। এসব সমস্যার সমাধান না হলে আয় ও সম্পদ অসমতার চিত্র আরও তীব্র হবে।

১৩.৪ মানব পুঁজির বৈষম্য ও অসমতার আরও অবনতির আশংকা

উচ্চদক্ষতাভিত্তিক উন্নয়নের স্বাদ এখনো নিতে পারেনি বাংলাদেশ। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে তার মূল চালিকাশক্তি ছিল তৈরি পোশাক খাতের মতো নিম্ন দক্ষতানির্ভর ও শ্রমঘন খাত। শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উৎপাদনশীলতা বিকাশে বিনিয়োগ করা হলে উচ্চ দক্ষতানির্ভর অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। দেশে সাক্ষরতা ও বিদ্যালয়ে ভর্তির হার, পুষ্টি, ও মানুষের আয় বাড়লেও শিক্ষার মান কমছে এবং বাজারের চাহিদার সঙ্গে শ্রমশক্তির দক্ষতার ব্যবধান বাড়ছে।

২০১৬ থেকে ২০২২ সালে প্রকৃত মজুরির যে পরিবর্তন হয়েছে তা আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করছে। গরিবদের অন্য সম্পদ নেই, সে জন্য তাদের শ্রমের ওপরই নির্ভর করতে হয়, সেটা জীবন চালাতেই হোক বা অবস্থার উন্নতি করতেই হোক। মজুরিভিত্তিক শ্রমে নিয়োজিত মানুষের মজুরি ২০১৬ সালে ছিল ৪ হাজার টাকা; ২০২২ সালে যা ৬ হাজার ৯০০ টাকায় উন্নীত হয়। শ্বেতপত্র কমিটি মনে করে, মজুরি সবচেয়ে বেশি বেড়েছে উচ্চ আয়ের মানুষের; এক্ষেত্রে অবশ্য নারী-পুরুষের ভেদ দেখা যায়নি। মধ্যম আয়ের মানুষের মজুরি বেড়েছে মাঝারি হারে এবং দরিদ্র মানুষের মজুরি বেড়েছে সবচেয়ে কম হারে। ২০১৬ ও ২০২২ এই দুই সময়েই সবচেয়ে কম আয়ের শ্রেণিতে নারীদের আয় ছিল পুরুষের অর্ধেক। উচ্চ আয়ের মানুষের শ্রেণিতেও এই বৈষম্য আছে, তবে তা অতটা তীব্র নয়। সামগ্রিকভাবেই মজুরি কম। আয়ের দিক থেকে সবচেয়ে ওপরে থাকা ২০ ভাগ মানুষের গড় মাসিক আয় মাত্র ৩১ হাজার টাকা। সবচেয়ে ওপরের ২০ শতাংশ ও সবচেয়ে নিচের ২০ শতাংশ মানুষের আয়ের অনুপাত দুই সময়ে অপরিবর্তিত থেকে গেছে, যা হল ৪ দশমিক ৭ গুণ।

শিক্ষার বর্তমান মানের দিকে তাকালে অদূর ভবিষ্যতে উৎপাদনশীলতা বাড়ার সুযোগ কম। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা ও মূল্যস্ফীতির কারণে নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষে বাচ্চাদের শিক্ষায় বিনিয়োগ করা কঠিন। দুই পর্বের এক জরিপে দেখা গেছে, মৌলিক শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত কম দরিদ্র পরিবারের শিশুদের চেয়ে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা পিছিয়ে। শ্রেণিভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ধনী ও দরিদ্র পরিবারের শিশুর মধ্যে ব্যবধান প্রথম শ্রেণি থেকেই শুরু হয় এবং এই ব্যবধান উপরের শ্রেণিগুলোতে ক্রমাগত বাড়তে থাকে। দরিদ্র শিশুদের জন্য দারিদ্র্য থেকে চিরস্থায়ীভাবে বের হয়ে আসার প্রধান উপায় শিক্ষা। কিন্তু মানসম্মত শিক্ষা পাওয়া তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে। ফলে ভবিষ্যতে দেশে অসমতা আরো বাড়তে পারে।

একদিকে শিক্ষার মানে বৈষম্য বিরাজমান। অন্যদিকে সাধারণভাবেও শিক্ষার মান খারাপ। দেখা গেছে, আয়ের দিক থেকে সবচেয়ে ওপরে থাকা ২০ শতাংশ পরিবারের মাত্র ৩৬ শতাংশের শিশুদের তাদের ক্লাসের জন্য নির্ধারিত ইংরেজি জ্ঞান আছে, বাংলা (৭২%) ও গণিতে (৬২%) একটু ভাল অবস্থা হলেও তা সন্তোষজনক নয়। শ্বেতপত্র কমিটি মনে করছে, বিদ্যালয়ে ভর্তি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বেশি পাস করানো ও পরিকল্পনাহীনভাবে কারিকুলামে পরিবর্তন আনার কারণে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এতে যেমন শিক্ষার মান পড়ে গেছে, তেমনি ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাও ব্যহত হচ্ছে।

১৩.৫ সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা: পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল

সামাজিক নিরাপত্তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা জরুরি; এক্ষেত্রে উন্নতির যথেষ্ট অবকাশ আছে। দারিদ্র্য, সম্পদের অসমতা, এসব বাস্তবতা বিবেচনা করলে সুষ্ঠু পরিকল্পনাপ্রসূত সামাজিক নিরাপত্তা সেবা প্রণয়ন, প্রয়োজনভিত্তিক টার্গেটিং এবং দারিদ্র্যবিমোচন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২০০৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা গ্রহীতার সংখ্যা অনেক বেড়েছে। যদিও চ্যালেঞ্জ আছে। যেমন: ভাতা পাওয়ার যোগ্য মানুষের ভাতা না পাওয়া, একজনের একাধিক ভাতা পাওয়া, কারচুপি, দুর্নীতি, ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি। আরও যথযথভাবে ভাতা গ্রহীতা নির্বাচন, আঞ্চলিক পর্যায়ে নির্বাচন ও দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের কৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

শ্বেতপত্র কমিটি বলছে, দেশে সামাজিক ভাতাভোগীর সংখ্যা অনেকে বেড়েছে সত্য; কিন্তু ভাতার পরিমাণ অপ্রতুল এবং মুদ্রাস্ফীতির সাথে তাল রেখে এগুলো বাড়ানো হয়নি। যেমন: বয়স্ক ভাতার পরিমাণ মাসে ৫০০ টাকা; প্রতিবন্ধী ভাতা ৭৫০ টাকা। বিদ্যালয়ের ভাতা বা উপবৃত্তির পরিমাণ মাসে মাত্র ১৫০ টাকা। এই ভাতা দিয়ে সমাজে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব নয়। শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা এখানে প্রাধান্যযোগ্য, যা মাসে ২০ হাজার টাকা।

যদিও সামাজিক নিরাপত্তা ভাতার লক্ষ্য থাকে আর্থিকভাবে দুর্বল বা ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী, বাস্তবে তার প্রয়োগ ঘটে না। ভাতা প্রাপ্তির সাথে আয়ের সম্পর্ক খুবই দুর্বল। যেসব ভাতা সর্বজনীন, যেমন: উপবৃত্তি এবং যেসব ভাতা পরিষ্কারভাবে দরিদ্রদের জন্য উল্লেখিত, এই দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রেই ভাতা পাচ্ছে সব শ্রেণির মানুষ। শহরাঞ্চলে ভাতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা পরিবারের সংখ্যা কম। তবে সেখানেও এই প্রাপ্তিতে ধনী-গরিবে কোনো পার্থক্য নেই। তবে শ্বেতপত্র কমিটি মনে করে, যেহেতু বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার খুব কাছাকাছি অবস্থান করে, তাই এখানে দারিদ্র্যসীমাভিত্তিক টার্গেটিংয়ের উপর নির্ভর করলে অনেক যোগ্য ব্যক্তি (যারা প্রায় দরিদ্র এবং অসহায়) বাদ পড়ে যেতে পারে।

বিদ্যমান তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী আরও সূচারুভাবে নির্বাচন করা যায়। যেহেতু ব্যক্তিপর্যায়ে টার্গেটিং অনেক ব্যয়সাপেক্ষ, ভৌগোলিক বিবেচনায় উপকারভোগী নির্বাচন করা শাশ্বত। যদিও এলাকাভিত্তিক (উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে) দারিদ্র্য নিরূপণ আরো সূক্ষ্মভাবে করার সুযোগ আছে। শ্বেতপত্র কমিটি মনে করে, ২০১৬ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপের তথ্য ব্যবহার করে জেলা পর্যায়ে দারিদ্র্যের অবস্থা নিরূপণ করা সম্ভব এবং সেই অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা বণ্টন করা উচিত। কিন্তু বর্তমানে জেলা পর্যায়ের দারিদ্র্য হারের সঙ্গে উপকারভোগীর হারের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। বিভিন্ন মাধ্যমে থেকে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে আরও কার্যকরভাবে উপকারভোগী নির্বাচন করা সম্ভব।

উল্লেখ্য, উপকূলীয় যেসব জেলা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের ঝুঁকিতে আছে, সেসব জেলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য জেলার দরিদ্রদের চেয়ে এই অঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা বেশি সুবিধা পাচ্ছেন। একইভাবে বিদ্যমান তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে অন্যান্য অঞ্চলেও ভৌগোলিক পদ্ধতিতে উপকারভোগী নির্বাচন করা সম্ভব। এছাড়া তথ্যের অন্যান্য অতিরিক্ত উৎস, যেমন: রাত্ৰিকালীন বাতি ব্যবহার, মোবাইল ফোন ব্যবহারের তথ্য-উপাত্তের সঙ্গে শুমারি ও খানা আয়-ব্যয় জরিপের তথ্য ব্যবহার করে শাশ্বত পদ্ধতিতে উপকারভোগী নির্বাচন করা সম্ভব। তবে, এসব উন্নত পদ্ধতি গ্রহণে তেমন একটা অগ্রগতি হয়নি।

১৩.৬ ডিজিটাল ব্যবস্থা থেকে বিযুক্তি: অসম সমাজের এক নতুন মাত্রা

ডিজিটাল সাক্ষরতা ও সরাসরি ডিজিটাল সেবা গ্রহণের সুযোগ সীমিত। ২০১৯ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের প্রায় সব পরিবারে অন্তত একটি মোবাইল ফোন থাকলেও মাত্র ৪১ শতাংশ পরিবারের স্মার্টফোন আছে। আরও দেখা গেছে, বেশিরভাগ মানুষ সরকারের বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা সম্পর্কে বা “ডিজিটাল” শব্দের সঙ্গে পরিচিত হলেও তারা অনেকেই জানেন না ঠিক কোন কোন সেবা ডিজিটালি পাওয়া সম্ভব। সেই সাথে দেখা যায়, বিপুলসংখ্যক মানুষ এসএমএস পড়তে বা পাঠাতে পারে না। যা ডিজিটাল সেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৯ সালের এই জরিপে আরো দেখা যায়, দেশের যেসব অঞ্চলে ইন্টারনেটের সংযোগ সীমিত (যেমন: রংপুরের গ্রামাঞ্চল) সেসব অঞ্চলের মানুষ ডিজিটাল সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

ডিজিটাল ব্যবস্থার সাথে পরিচয় না থাকার কারণে সেবা ব্যবহারে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। সে কারণে মধ্যস্বত্বভোগীদের (ইন্টারমিডিয়ারি) ওপর নির্ভরশীলতা তৈরি হচ্ছে। ২০১৯ সালের এক জরিপে দেখা যায়; ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা সরকারের বিভিন্ন ওয়েব পোর্টালে থেকে সফলভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এবং অনেকেই কম্পিউটার দোকানদারদের মতো মধ্যস্বত্বভোগীদের সাহায্যে ডিজিটাল সেবা ব্যবহারের কথাও বলেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, জরিপে ৫০ শতাংশ মানুষ মধ্যস্বত্বভোগীদের সেবা ব্যবহার করেছে বলে জানান। ডোর-টু-ডোর এজেন্টরা যেমন: অনলাইনে বিল পরিশোধের জন্য ন্যূনতম ফি ধার্য করেন এবং স্থানীয় বিকাশ এজেন্টরা শিক্ষার্থীদের স্কুলের বৃত্তি বিতরণের ব্যবস্থা করে দেয়। ২০২১ সালের ফলো-আপ জরিপে দেখা যায়, অনেকেই তাদের ডিভাইসের পরিবর্তে মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধনের মতো সেবাও নিয়ে থাকে। মোবাইলে আর্থিক সেবার প্রসার ঘটলেও উত্তরদাতাদের অনেকেই এখনো লেনদেনের ক্ষেত্রে এজেন্টদের ওপর নির্ভর করে। বিষয়টি হলো, মানুষের তার নিজ প্রয়োজনেই বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা ব্যবহার করে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষের কাছেই সেবা সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য নেই। এই পরিস্থিতি অতিক্রম করতে ব্যাপক পরিসরে প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি ব্যবহারকারীবান্ধব পদ্ধতি প্রচলন করতে হবে।

ডিজিটাল সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যবধান এখনো অনেক বেশি। নারীদের মোবাইল ফোনের মালিকানা এখনো কম। সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়লেও এখনো লিঙ্গ, আয় ও শিক্ষাভিত্তিক বৈষম্য বিদ্যমান। জিজিআইএফআই (GgiFI) শীর্ষক জরিপে দেখা গেছে, ৮৩ শতাংশ পুরুষ মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ব্যবহার করে। অন্যদিকে মাত্র ৪৭ শতাংশ নারী এই সুবিধা ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে।

১৩.৭ তথ্য ও নিরপেক্ষতা বিষয়ক পর্যবেক্ষণ

এই অধ্যায়ে মূলত খানার আয় ও ব্যয় জরিপের (HIES) তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এর ভিত্তিতে কার্যকরভাবে দারিদ্র্যের আনুমানিক হিসাব করা গেলেও উচ্চ আয়ের পরিবারের নমুনা সংগ্রহে ও তথ্যের সম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি রয়ে গেছে। যেমন: কৌশলগতভাবে কর ফাঁকির দেয়ার উদ্দেশ্যে আয় সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য গোপন করার জন্য এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্যা দূরীকরণে সরকারের অন্যান্য শাখা থেকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বা বিবিএসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া জনসাধারণের ব্যক্তিগত তথ্য-উপাত্ত সংশ্লিষ্ট গবেষণা কাজ ব্যতীত অন্যকোনোভাবে অপব্যবহার করা হবে না— এ বিষয়ে মানুষের আস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

এই অবস্থায় শ্বেতপত্র কমিটির পরামর্শ হলো; অধিকতর জরিপ করা, স্থানীয় পর্যায়ে আরও জরিপ পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব নিশ্চিত করা ইত্যাদি। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে খানা আয়-ব্যয় জরিপে যে প্রায়ই পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনা হয়, তা পূর্ণাঙ্গ নথিভুক্তকরণ প্রয়োজন।

১৩.৮ উপসংহার: একটি ভঙ্গুর গৌরবের আখ্যান

মানব উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। পরিকল্পিতভাবে প্রণীত নীতি ও কর্মসূচি ছিল এই উন্নতির চালিকাশক্তি। কিন্তু এই সফলতাকে অনেক ক্ষেত্রেই অতি সরলীকৃত রাজনৈতিক আখ্যানের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা বাস্তববিরজিত ছিল। নিরপেক্ষ গবেষণায় শ্বেতপত্র কমিটি পেয়েছে যে, প্রায়-দরিদ্র মানুষদের যে কোনো দুর্যোগ বা আঘাত থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বিনষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে, অতিমারীর পলি-ক্রাইসিসের প্রেক্ষাপটে এই পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। এতে বোঝা যায়, বাংলাদেশের দারিদ্র্যবিমোচন প্রক্রিয়ার ভিত্তি দুর্বল ছিল। কিন্তু সরকারি পরিসংখ্যানে এই দুর্বল ও অরক্ষিত বাস্তবতার চিত্র পুরোপুরি উঠে আসেনি। এ বিষয়ে সরকার নিরপেক্ষ গবেষণাভিত্তিক সমালোচনা উপেক্ষা করেছে।

আয় ও সম্পদের অসমতা ব্যাপ্যক আকারে বেড়েছে। পুঁজি ও সম্পদের ওপরে বিভবানদের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় এই ১০ শতাংশ মানুষের হাতেই সবকিছু কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তাদেরই প্রকৃত মজুরি বাড়ে; তথ্যগত ও পুঁজিগত নানান সুবিধা পাওয়ায় তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। মধ্যম শ্রেণির মানুষের তেমন উন্নতি হয় না, বিশেষ করে সম্পদ আহরণে। ফলে অসমতা বৃদ্ধি পায়। শৈশবকাল থেকে শিখন ব্যবধান থাকায় দীর্ঘস্থায়ীভাবে দরিদ্রদের মাঝে বৈষম্য আরও বৃদ্ধি হচ্ছে। যার ফলে জাতি নিম্নমুখী মানব উন্নয়নের ফাঁদে পড়ছে।

এসব বিষয় আমলে নিতে মানব সম্পদকে পুঁজিতে পরিণত করে আগামীর উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এ জাতীয় কৌশল বাংলাদেশে নতুন চলার পথ সৃষ্টি করতে পারে— যা বৈষম্য কমাতে, দারিদ্র্যবিমোচনে, সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধিতে এবং নাগরিকদেরকে সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে।

অধ্যায় ১৪: মানব উন্নয়নের বাস্তবতা: ফাঁক ফোকড়গুলোও মাথায় রাখতে হবে*

- বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয় দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম; চিকিৎসা ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশই জনগণের নিজেদেরই মেটাতে হয়। স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন ব্যয় একেবারেই হতাশাজনক। বাংলা-গণিতে শিক্ষার মান উদ্বেগজনকভাবে নিম্নমুখী। প্রাথমিক শিক্ষায় অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার্থী মৌলিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।
- কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনের ওপর নির্ভরতা পরিবারের ব্যয় বাড়ায়। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হ্রাস পেয়েছে। প্রায় অর্ধেক মানুষকে সরকারি চিকিৎসা সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ দিতে হয়েছে।
- শিক্ষক সংকট ও প্রশিক্ষণের অভাব নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে ঝুঁকি তৈরি করেছে।
- স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ক্রয়, আউটসোর্সিং চুক্তি প্রদান, ঔষধ শিল্প ও ডায়াগনস্টিক শিল্পের মধ্যে যোগসাজশ এবং পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতি নিত্যকার সম্ভাব্যতা হিসেবে বিরাজমান।
- নীতির সমন্বয়হীনতা এবং অভিজ্ঞতা দুর্বল হবার কারণে অর্থনীতির মূল ধারায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এখনও সীমিত— নিবন্ধিত মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ও বিনিয়োগ এবং দুর্নীতি রোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ছাড়া মানব উন্নয়ন টেকসই হবে না। স্বাস্থ্যখাতে উচ্চপর্যায়ে দুর্নীতি নিয়ে হাইকোর্ট উদ্বেগ প্রকাশ করলেও এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ অত্যন্ত দুর্বল।

অধ্যায় ১৪.ক: স্বাস্থ্য ও পুষ্টি: সাফল্য অর্জনে পিছিয়ে

১৪.ক.১ সূচনা

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার বিস্তারে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রাণধানযোগ্য। অনেক বছর ধরেই এটা ঘটছে। টিকাদানের মতো প্রয়োজনীয় জনস্বাস্থ্যসেবার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। টিকাদানের কারণে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমেছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি হলেও মধ্যম ও উচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা সীমিত। শ্বেতপত্র কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যসেবায় বাংলাদেশ সরকারের ব্যয় দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম। দক্ষিণ এশিয়ার গড় ব্যয়ের তুলনায় বাংলাদেশ সরকারের গড় স্বাস্থ্য ব্যয় এক শতাংশীয় পয়েন্ট কম। এক্ষেত্রে ব্যক্তির পকেট থেকে যে ব্যয় হয়, তা দক্ষিণ এশিয়ার গড় মানের তুলনায় ২০ শতাংশীয় পয়েন্ট বেশি।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা এখনো সেবার পরিসরের মধ্যে ঘুরপাক খায়। সেবা অত্যন্ত নিম্নমানের; এই ব্যবস্থার জবাবদিহিতা ও নির্ভরযোগ্যতা কম। পৃথিবীতে যেসব দেশে সরকারের স্বাস্থ্য ব্যয় সবচেয়ে কম—বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। ফলে রোগশোকের কারণে পরিবারের আর্থিক সুরক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেসব পদ্ধতিগত কারণে মানুষ মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়, এই অধ্যায়ে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

১৪.ক.২ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা: সুবিধা কম এবং নজরদারি দুর্বল

বাংলাদেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় চারটি পক্ষ জড়িত, যাদের মধ্যে একটি হলো সরকার। বাকি তিনটি হলো, মুনাফাভিত্তিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও উন্নয়ন অংশীদার। নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয় সরকার; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার সেবা তদারকিও করে।

গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ১৪ হাজার ৩২৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছে। কিন্তু ওষুধের ঘাটতি আছে। দেখা যায়, ৮৮ শতাংশ কমিউনিটি ক্লিনিকের উপকরণ নিম্নমানের এবং

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোম্মী, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৯ শতাংশ ক্লিনিকের ওষুধ নিম্নমানের। ইউনিয়ন পর্যায়ে মৌলিক উপকরণের অভাব আছে। দেশের মাত্র ১৮ শতাংশ উপজেলা স্বাস্থ্য ক্লিনিকে কার্যকর এক্স-রে মেশিন ও ১৪ শতাংশ ক্লিনিকে আল্ট্রাসাউন্ড যন্ত্র আছে। এছাড়া বছরে দেশের ২৮ দশমিক ৬ শতাংশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের (নিপোর্টের গত এক বছরের জরিপ) একটি না একটি ওষুধের মজুত শেষ হয়ে যায়; অনেক কমিউনিটি ক্লিনিকের বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।

১৪.৩ যৌন, প্রজনন, মাতৃ, নবজাতক, শিশু ও কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্যসেবা

মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাসে বাংলাদেশ প্রণিধানযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ২০১১ সাল থেকে মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাসের গতি উল্লেখযোগ্যহারে কমেছে। শিশুর জন্মের পর মায়ের মৃত্যুর ক্ষেত্রে কোনো উন্নতি হয়নি। মাতৃ মৃত্যুর ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৭৩ শতাংশ মায়ের মৃত্যু হয় সন্তান জন্মদানের ৪২ দিনের মধ্যে; ৫৬ শতাংশের মৃত্যু হয় জন্মদানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। মূল কারণ হলো রক্তক্ষরণ, এক্সাম্পসিয়া; অজানা রোগ এবং অব্যবস্থাপনাজনিত অসংক্রামক রোগে মৃত্যু হয় ১০ শতাংশের।

সন্তান জন্মদানের আগে যে সেবা, তাও খুব বেশি নারীরা পাচ্ছেন না; এই হার মাত্র ১৭ দশমিক ৭ শতাংশ। ৪৭ শতাংশ শিশুর জন্ম হচ্ছে অদক্ষ হাতে। বার্ষিক তিন মিলিয়নের মধ্যে ৫০ শতাংশ (১.৫ মিলিয়ন) প্রসব বাড়িতে হয়। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (নিপোর্ট) একটি জরিপের মতে, জাতীয় পর্যায়ে হাসপাতালে ৩৩ শতাংশ নারীর প্রসবের সময় সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার করা হয়। যদিও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এই হার ৮৪ শতাংশ, যার বেশিরভাগই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। যেসব সেবাকেন্দ্রে স্বাভাবিক প্রসব সেবা দেওয়া হয়, তার মধ্যে মাত্র চার শতাংশ কেন্দ্র এই সেবাদানের মানদণ্ড পূরণ করে। বাড়িতে প্রসবের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মাত্র ৭ শতাংশ শিশু জন্মোত্তর সেবা পেয়ে থাকে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১৮ সাল থেকে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ধাত্রীর ব্যবস্থা চালু করেছে।

গর্ভাবস্থায় শিশু মৃত্যুর হার ধীরে ধীরে কমে আসছে; পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে নবজাতক মৃত্যুর হার ৬৭ শতাংশ। ২০২৬ সালে GAVI (the Vaccine alliance)-র আওতা থেকে বেরিয়ে যাবে বাংলাদেশ। এই বাস্তবতায় নিয়মিত টিকার সংস্থান সরকারকে করতে হবে। সেই সঙ্গে নতুন টিকা ও এইচপিভি টিকার সংস্থানও সরকারকেই করতে হবে।

বাংলাদেশের টিকাদান বা ইপিআই কর্মসূচির সফলতা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। কিন্তু দেশের দুর্গম অঞ্চলে (যেমন: হাওর, পাহাড়ি অঞ্চল ও চরাঞ্চলে) ইপিআই কর্মসূচি অতটা বিস্তৃত নয়। এমনকি কিছু সিটি করপোরেশনের এলাকায় এই কর্মসূচি অতটা সফল হয়নি। ২০১৯ সালেও দেখা গেছে, দেশের বিভিন্ন সিটি করপোরেশনে ইপিআই সেবা সমহারে বিস্তৃত হয়নি। যেমন: রাজশাহীতে এর বিস্তৃতি ৯২ দশমিক ৪ শতাংশ হলেও সিলেটে মাত্র ৬৩ দশমিক ৮ শতাংশ। আবার দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে ইপিআই কর্মসূচির বিস্তৃতি ৯১ দশমিক ৮ শতাংশ হলেও শহরাঞ্চলে মাত্র ৭৯ দশমিক ২ শতাংশ।

গত ১৫ বছরে নগরায়নের অংশ হিসেবে সরকার বেশকিছু নতুন সিটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এসব পরিকল্পনা যথাযথভাবে করা হয়নি। ফলে নতুন সিটি করপোরেশনগুলোর সেবা দেওয়ার প্রস্তুতিতে ঘাটতি আছে। দেখা যায়, শহরাঞ্চলে সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সীমিত। ফলে এই শূন্যস্থান পূরণ করছে মূলত এনজিও আর বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক।

বিষয়টি হলো, স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) ও স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইনে ২০০৯-এ বলা আছে, নাগরিকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার দায়িত্ব সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার। কিন্তু সীমিত বাজেট, আর্থিক সংগতির অভাব ও যথেষ্ট লোকবল না থাকায় সিটি করপোরেশন এলাকায় এই সেবাদান ব্যাহত হচ্ছে।

যেসব কারণে স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো অভিবাসন। তরুণী মায়েরা গ্রাম ছেড়ে শহরে কাজ করতে আসলেও শহরাঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। সন্তান জন্মদানের হার সবচেয়ে বেশি কিশোরীদের। প্রতি বছর যত শিশুর জন্ম হয়, তার মধ্যে ১৮ দশমিক ৩ শতাংশের জন্ম হয় এই কিশোরীদের গর্ভে। কিন্তু যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা মূলত বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের ওপর নির্ভর করে।

আরেকটি বিষয় হলো, যৌন, প্রজনন, মাতৃ, নবজাতক, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় দক্ষতার ঘাটতি আছে। এ ক্ষেত্রে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস (ডিজিএইচএস) ও ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফ্যামিলি প্ল্যানিং (ডিজিএফপি) জড়িত। এই দুই সংস্থার কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট নয়। দেখা যায়, একই কাজ উভয় সংস্থাই করছে। এই দ্বৈততার কারণে সম্পদের স্বল্পতা আরও ঘনীভূত হয়। এই যৌন, প্রজনন, মাতৃ, নবজাতক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ অসম হওয়ার কারণে সেবার মান ব্যাহত হচ্ছে। ফলে অদক্ষতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যেমন: কোথাও বেশি কর্মী থাকে আবার কোথাও কর্মীর স্বল্পতা, তথ্যের ঘাটতি ইত্যাদি।

১৪.ক.৪ পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে গতি দরকার

বাংলাদেশের মানুষের টোটাল ফার্টিলিটি রেইট (টিএফআর) কমেছে; ২০১০ সালে যা ছিল ২ দশমিক ১২, ২০২০ সালে তা ২ দশমিক ০৪-এ উন্নীত হয়। ২০২১ সালে বিবিএসের হিসাবে দেখা গেছে, দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার ছিল ৬৩.৯ শতাংশ। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফ্যামিলি প্ল্যানিং (ডিজিএফপি)। অতিমারীর কারণে ২০২০-২১ সালে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর ব্যবহার কমেছে। ফলে অনাকাজিষ্ট গর্ভধারণ বেড়েছে। এছাড়া দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহারের হার এখনো ২০১৭ সালের পর্যায়ে ফেরত যায়নি। বিবাহিত নারীদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের অপূরিত চাহিদা প্রায় ১২ শতাংশ। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার ত্যাগের হারও বেড়েছে, ২০১৪ সালে যা ছিল ৩০ শতাংশ, ২০১৭ সালে তা ৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

বিবাহিত নারীদের মাসিক নিয়মিতকরণ সেবা গ্রহণসহ আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ আছে। সামাজিক কারণে এই সেবা বিষয়ক তথ্য প্রচার চ্যালেঞ্জিং। এছাড়া অবিবাহিত নারীদের সরকারি জন্মবিরতি সেবার বাইরে রাখার কারণেও নানা সমস্যা হয়। সন্তান জন্মের পর বিবাহিত নারীদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণের হার অনেক কম। বিশেষ করে যে ৫০ শতাংশ নারী বাড়িতেই সন্তান জন্ম দেন, তাদের ক্ষেত্রে। একদিকে দক্ষ সেবাকর্মীর অভাব, আরেকদিকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের যথাযথ লোকবল না থাকার কারণে সেবা প্রদান ব্যাহত হয়।

এই ঘাটতি ঘোচাতে এনজিওদের দুর্গম অঞ্চলে সেবা দিতে পাঠানো হয়। কিন্তু এনজিও আর বেসরকারি সেবাদাতাদের সবার মান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

১৪.ক.৫ কার্ঠামোগত সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতির মুখে পুষ্টি কর্মসূচি

বাংলাদেশে শিশু মাতৃ পুষ্টির ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হলেও এখনো দেশের ৪৮ লাখ শিশু খর্বকায় এবং ১৬ লাখ শিশু ওজনের ঘাটতিতে ভুগছে। এই অতি অপুষ্টিজনিত খর্বকৃতি ও তার জেরে ওজনের ঘাটতিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা গত দুই দশকে অপরিবর্তিত রয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অর্ধেকেরই ওজন কম; কিশোরীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের উচ্চতা ১৪৫ সেন্টিমিটারের কম। ফলে তারা পুষ্টিমানের দিক থেকে ঝুঁকিতে আছে। কিশোরীদের গর্ভধারণ ও জন্মকালীন ওজনের ঘাটতি অনেকটা বেশি।

এই শিশু ও মাতৃ পুষ্টির মানোন্নয়নের পেছনে দরিদ্রবান্ধব উন্নয়ন ও পুষ্টি নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভূমিকা আছে। এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে মানুষের আয় বৃদ্ধি, ছোট পরিবার, সন্তান জন্মের মধ্যকার সময় বেড়ে যাওয়া ও পিতামাতার শিক্ষা, বিশেষ করে মায়ের শিক্ষা। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবার পরিধি বৃদ্ধির ভূমিকাও আছে।

চরম অপুষ্টিজনিত খর্বাকৃতি হ্রাসের হার গ্রামাঞ্চলে বেশি। যদিও গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মানুষের অপুষ্টির ত্রিমুখী চাপে আছে। সেগুলো হলো- পুষ্টির অভাব, অনুপুষ্টির ঘাটতি ও স্থূলতা। স্থূলতার বিষয়টি যদিও শহরাঞ্চলে বেশি দেখা যায়। শহরের বস্তুতে খর্বাকৃতি ও ওজনের ঘাটতিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা বেশি। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী খর্বাকৃতির শিশুর সংখ্যা ২৮ শতাংশ, যদিও দক্ষিণ এশিয়ায় এর গড় হার ২১ দশমিক ৮ শতাংশ। ভৌগোলিক ব্যবধানও দৃষ্টিগ্রাহ্য। সিলেট বিভাগে অপুষ্টির হার সবচেয়ে বেশি।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টি প্রাপ্তির পরিসর অত্যন্ত সীমিত। আবার যা আছে, তাও ঠিকমতো ব্যবহৃত হয় না। কারণ স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি না হলে মানুষ সাধারণত এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায় না। আবার দেখা যায়, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিভিন্ন পর্যায়ের সেবাকেন্দ্রে এসব পুষ্টি সেবা দিয়ে থাকে। এতে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

অভিযোগ আছে, হেলথ পপুলেশন নিউট্রিশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে বড় ধরনের জালিয়াতি হয়। এবং এর সঙ্গে ডিজিএইচএস ও জনস্বাস্থ্য পুষ্টি ইনস্টিটিউট জড়িত। দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এই দুর্নীতি নিয়ে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও এসবের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং অভিযোগ আছে, উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আমলাতন্ত্রের অশুভ যোগসাজশের মাধ্যমে এই দুর্নীতি হচ্ছে।

এসব দুর্নীতির কারণেই মূলত মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না; পরিণামে, পুষ্টিমানের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

১৪.ক.৬ অসংক্রামক রোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য (এনসিডি)

হৃদরোগ, ক্যানসার, ডায়াবেটিস, শ্বাসতন্ত্রের জটিল রোগ ও মানসিক রোগ সারা বিশ্বেই আকস্মিক মৃত্যুর জন্য দায়ী। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশেও এই বাস্তবতা দেখা যায়। বাংলাদেশ সরকার যে পঞ্চম স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কৌশল প্রণয়ন করেছে, সেখানে অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা নিশ্চিত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এসব রোগের চিকিৎসায় যথাযথ ব্যবস্থার অভাব আছে। অথচ এখন বাংলাদেশের ৭০ শতাংশ মানুষের মৃত্যুই হয় এসব অসংক্রামক রোগে। যদিও কয়েক দশক আগে এসব রোগে মৃত্যুর হার ছিল মাত্র ১০ শতাংশ।

২০২১ সালে বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগে ৫,৫৭,২০০ জন মানুষের মৃত্যু হয় এবং পরিণত বয়সের আগেই মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা উনিশ শতাংশ। দেশের চতুর্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচিতে এই বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। সেটা হলো, ঝুঁকির বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অসংখ্য ভোগ রোগের প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা কিন্তু দেখা গেছে এই রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা এত বেড়েছে যে, এসব কর্মসূচি অপর্যাপ্ত বা অপ্রতুল প্রমাণিত হয়েছে। এতে মানুষের স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় বেড়েছে এবং সমাজে তার প্রভাব পড়ছে।

মানসিক স্বাস্থ্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু আমাদের মতো দেশে মানসিক সমস্যা কখনো কখনো সামাজিক কারণে গুরুতর হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা এবং এসব রোগের চিকিৎসায় যথাযথ ব্যবস্থার অভাব আছে। ফলে এক্ষেত্রে বড় ধরনের ব্যবধান রয়ে গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মনে করে অবসাদ, শিশু ও কিশোর বয়সের আচরণগত সমস্যা, নিজের ক্ষতি করা, মৃগী রোগ, ভুলে যাওয়া-এসব বাংলাদেশের মানুষের প্রধান মানসিক সমস্যা।

আরেকটি বিষয় হলো, বাংলাদেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা নেই। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে মানসিক রোগ নির্ণয় ও পরামর্শের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

১৪.ক.৭ মধ্যম, উচ্চ ও বিশেষায়িত সেবার সুযোগ

মধ্যম, উচ্চ ও বিশেষায়িত সেবাকেন্দ্রগুলোতে রেফার করা রোগীদের চিকিৎসা হওয়ার কথা। অর্থাৎ যেসব রোগীর চিকিৎসা প্রাথমিক পর্যায়ে করা সম্ভব নয়, তাদের এসব কেন্দ্রে পাঠানোর কথা। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রেফারেল ব্যবস্থা কার্যকর নয় এবং বিষয়টি যে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে, তা বারবার বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রতি এক হাজার মানুষের জন্য হাসপাতালে শয্যা আছে মাত্র ০.৮—অর্থাৎ একটিরও কম। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ হচ্ছে প্রতি ১০০০ মানুষের জন্য অন্তত তিনটি শয্যা রাখতে হবে। বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালগুলো জনাকীর্ণ। ২০২২ সালে প্রতি ১০০ শয্যার বিপরীতে ১৩৭ জন মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন; মধ্যম পর্যায়ের হাসপাতালে ক্ষেত্রে তা আরও বেশি, প্রতি ১০০ আসনের বিপরীতে ১৪৭ জন। এতে ভর্তি হওয়া রোগীদের চিকিৎসার মানে প্রভাব পড়ে। এমনকি রোগীদের বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করাতে হয়। হাসপাতালের বহির্বিভাগগুলোতেও রোগীদের ভিড় লেগে থাকে। কখনো কখনো সেখানে এমন রোগের চিকিৎসা দিতে হয়, যেসব চিকিৎসা সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে দেওয়া সম্ভব। এতে রোগীদের যথাযথ সময় দেওয়া সম্ভব হয় না, সেবার মানে যার প্রভাব পড়ে।

বাংলাদেশের জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। মাত্র ৬৬ শতাংশ হাসপাতালে মৌলিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা উপকরণ আছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে। মাত্র ২৯ শতাংশ হাসপাতাল রক্তের শর্করা মাপার পরীক্ষা করতে পারে, এবং ৪০ শতাংশ হাসপাতাল যকৃৎ ও বৃক্ক নালির পরীক্ষা করতে পারে।

আরও দেখা যায়, ২৪ শতাংশ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ ফুরিয়ে যায় এবং সেখানে বৃদ্ধদের চিকিৎসা ও উপশম সেবা নেই। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার কোয়ালিটি স্ট্র্যাটেজিতে এসব সেবার মান উন্নয়নের নির্দেশনা আছে। কিন্তু মধ্যম উচ্চ ও বিশেষায়িত সেবা প্রাপ্তির সুযোগ এখানে কম।

১৪.ক.৮ দুর্নীতি: চাহিদার দিক থেকে চিহ্ন

দুর্নীতিতে বাংলাদেশ এর আগে অনেকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষকে কম বেশি দুর্নীতির মুখোমুখি হতে হয়, চিকিৎসা খাতও এর ব্যতিক্রম নয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশের যেসব পরিবার চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে; তাদের ৪৮.৭ শতাংশ পরিবার দুর্নীতির সম্মুখীন হয়েছে। এক্ষেত্রে, গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার হওয়া পরিবারের সংখ্যা বেশি; শহরাঞ্চলে যা ৫১ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে তা ৪৫ শতাংশ।

চিকিৎসা সেবা নেওয়া ৬.২ শতাংশ পরিবার ঘুষ দিয়েছে, যার গড় পরিমাণ ৬৮০ টাকা। সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি দেখা যায় জেলা সদর বা সাধারণ হাসপাতালে, যদিও সবচেয়ে বেশি রোগী (৩২.২%) চিকিৎসা নেয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ঘুষ দেওয়ার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ১২ শতাংশ পরিবার এসব জায়গায় ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে। ঘুষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি জেলা সদর বা সাধারণ হাসপাতালে, টাকার অংকে যা ৭০৪ টাকা, সবচেয়ে কম কমিউনিটি ক্লিনিকে, টাকার অংকে যা ১৭ টাকা।

সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির সম্মুখীন হতে হয় মানুষকে। সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হতে হয় পথ্য গ্রহণের (৬৬.৪ %) ক্ষেত্রে। ট্রলি বা হুইল চেয়ার (৫৬.৫ %), সেলাই, ব্যান্ডেজ ও ড্রেসিং (৫৫.১ %) সার্জিক্যাল অপারেশন (৪৮.৫ %)—সবক্ষেত্রেই মানুষকে দুর্নীতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। এমনকি কোভিড

টিকা নিবন্ধন বা টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রেও মানুষকে এই পরিস্থিতির মুখের পড়তে হয়েছে। ট্রলি ও ছইলচেয়ার সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বার ঘুষ দিতে হয়েছে। ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে এই ঘুষ দিতে হয়েছে এবং যার গড় পরিমাণ হচ্ছে ১৪১ টাকা। সবচেয়ে বেশি অংকের ঘুষ দিতে হয়েছে সন্তান প্রসব ও সি-সেকশন সেবার ক্ষেত্রে— যার পরিমাণ ২ হাজার ২৫৬ টাকা।

১৪.ক.৯ স্বাস্থ্য খাতের পদ্ধতিগত দুর্নীতি বাড়ছে: ক্রয় ও সরবরাহ ব্যবস্থায় দুর্নীতি

স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে মূলত ওষুধসহ বিভিন্ন উপকরণের ওপর। এই কাজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের। তাদের অধীনস্থ ৬০টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই কাজ করে থাকে। অতিমারীর আগে কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতো। তবে অতিমারীর পর বাস্তবতার নিরিখে এই দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ও অন্যান্য সরঞ্জাম কেনাকাটা পর্যবেক্ষণ করে থাকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; এর সঙ্গে আরও যুক্ত থাকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার ও বিভিন্ন জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি, যেমন: এনটিপি, এনএনএস ইত্যাদি।

বাংলাদেশের রীতি হলো, সরকারি হাসপাতালগুলোতে শয্যাসংখ্যা ও কর্মী সংখ্যার ভিত্তিতে তহবিল বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু বাজেট বরাদ্দের সময় সেবার মান, রোগের ধরন ও ব্যয়ের অন্যান্য খাত অনেক সময় বিবেচনা করা হয় না। ফলে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় এক ধরনের অদক্ষতা ও অসমতা সৃষ্টি হয়। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে হাসপাতালের ক্রয়ের সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় সরকারি বরাদ্দ ঠিকঠাক ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের ক্রয় উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে হলেও এই প্রক্রিয়ায় অনেক দুর্নীতি হয়। দেখা যায়, ১২০০ শয্যার হাসপাতালে ৩ হাজার রোগীও ভর্তি থাকে, কিন্তু সেখানে উপকরণ আসে সেই ১ হাজার ২০০ শয্যার ভিত্তিতে। ফলে চিকিৎসার মানে প্রভাব পড়ে। হাসপাতালে সব সময় প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর ঘাটতি দেখা যায়। ফলে আরও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। টিআইবি ও হাইকোর্টের মতো প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য খাতের ব্যাপক দুর্নীতির বিষয়টি তুলে ধরেছে। এই খাতে জবাবদিহির অভাবের বিষয়টি উঠে এসেছে।

দুর্নীতির কারণে এখানে প্রায়ই দেখা যায়, টেন্ডারে বর্ণিত নেই এমন ওষুধ ও উপকরণও চলে আসে।

বিষয়টি হলো, বাংলাদেশের চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্টদের এই কম বাজেট ও বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জের মধ্যে কাজ করতে হয়। তবে দুর্নীতির ব্যাপকতা হ্রাস করা গেলে তাঁদের এই প্রচেষ্টা আরও ফলপ্রসূ হতো।

সেবার আউটসোর্সিং

হাসপাতাল পরিচালনা

হাসপাতাল পরিচালনায় ও বিভিন্ন সেবাদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালগুলো আউটসোর্সিং ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ দিয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াতেও অনেক দুর্নীতি হয়। সরকারি হাসপাতালগুলোতে সেবার কাঙ্ক্ষিত মান পাওয়া যায় না।

তরুণ চিকিৎসকদের ক্যারিয়ারের গতি ও ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে সংযোগ

মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে বেরোনের পর বাংলাদেশের তরুণ চিকিৎসকেরা আর্থিক অসংগতির মধ্যে পড়ে যান। উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সময় তাঁরা তেমন একটা উপার্জন করতে পারেন না এবং একইসঙ্গে তাঁদের

আবাসিক সুবিধাও থাকে না। এই বাস্তবতায় তাঁদের পক্ষে বেসরকারি হাসপাতালে কাজ নেওয়া ছাড়া গতি নেই। এসব হাসপাতালে তাদের আট থেকে দশ ঘণ্টা কাজ করতে হয় ৮০০ টাকার বিনিময়ে; ৮ ঘণ্টার কাজ ১০ ঘণ্টা হয়ে গেলেও সম্মানী বাড়ে না। এই বাস্তবতায় তরুণ চিকিৎসকদের পক্ষে কাজ করা খুব কঠিন। অথচ এই বয়সে অন্যান্য সাধারণত বিয়ে করে সংসার শুরু করে।

আরেকটি বিষয় হলো, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ওষুধ কোম্পানিগুলো প্রতিনিধিদের মাধ্যমে চিকিৎসকদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। এর মাধ্যমে তারা চিকিৎসকদের জেনেরিক ওষুধের পরিবর্তে ব্র্যান্ডের ওষুধ সেবনের পরামর্শ দিতে প্রলুব্ধ করে।

রোগ নির্ণয় ও বেসরকারি হাসপাতাল

স্বাস্থ্যসেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হলো উন্নত প্রযুক্তি, অপরিপূর্ণ বিনিয়োগ এবং আধুনিক উপকরণ ও দক্ষ কর্মীর অভাব। দেশের শহরাঞ্চলে ব্যাণ্ডের ছাতার মতো রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে গজিয়ে উঠেছে। গ্রামাঞ্চল থেকে মানুষ শহরে এসে চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং এসব কেন্দ্রে রোগ নির্ণয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করাচ্ছেন কিন্তু এগুলোর মান নির্ণয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। অভিযোগ আছে, চিকিৎসকেরা ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে যোগসাজশের ভিত্তিতে অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষার পরামর্শ দেন, বিনিময়ে চিকিৎসকদের আর্থিক প্রাপ্তি ঘটে। এসব পরীক্ষার নিরীক্ষার ব্যয় কত হবে, তারও ঠিক ঠিকানা নেই। ফলে এসব কেন্দ্রের জবাবদিহি নেই। সরকারি হাসপাতালে উন্নতমানের রোগ নির্ণয়ের যন্ত্রপাতি থাকলেও রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি আছে।

স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি ব্যয় অপ্রতুল হওয়ায় বর্তমানে এই খাতে যত ব্যয় হয়, তার ৭৬ দশমিক ৮৭ ভাগ বেসরকারি হাসপাতালে হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৮১ দশমিক ৯৫ ভাগ হচ্ছে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ঘাটতি পূরণ করলেও এই খাতের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই এবং এসব কেন্দ্রে যে খরচ হয়, তাতে নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন: ওষুধের মান ও দাম নিয়ে জনমনে উদ্বেগ আছে। পেশাদারি ও নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে এসব বেসরকারি খাতের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠতে দেওয়া হয়েছে কেবল মুনাফার লোভে।

অতিমারীর সময় রিজেন্ট গ্রুপের জালিয়াতির যে খবর প্রকাশিত হয় তা থেকে বোঝা যায়, এই খাতে জালিয়াতি কত দূর বিস্তৃত। সবচেয়ে বড় কথা, এই খাতে সরকারের নজরদারি দুর্বল। মান নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সক্ষমতার ঘাটতি আছে। সামগ্রিকভাবে যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এখানে হচ্ছে, তাতে পরিস্থিতির আরও অবনতি হচ্ছে। সবকিছু মিলে দেশের বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় এক ধরনের দায়মুক্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, ছুটির আবেদন মঞ্জুরের মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগে অনিয়ম নতুন কিছু নয়। বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এটা আমাদের জীবনের অংশ হয়ে গেছে বলে মনে করা হয়। দলীয় রাজনীতির প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, সুবিধাবাদ ও বিভিন্ন ধরনের অবৈধ লেনদেনের মতো বিষয়গুলো আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে ফেলা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আইন-কানুন ভঙ্গ হচ্ছে, এগুলো তার মূল কারণ।

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সুপার স্পেশালাইজড বা অতি বিশেষায়িত হাসপাতাল; কিন্তু প্রয়োজনীয় লোকবল ও জনশক্তির অভাবে প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যেও তা কার্যকর হতে পারেনি।

- এই হাসপাতালের ১৫৭ জন কর্মীকে (যার মধ্যে ৫২ জন চিকিৎসক, ২৯ জন কর্মকর্তা, ৫৩ জন নার্স ও ২৩ জন টেকনিশিয়ান) দুই থেকে চার মাসের প্রশিক্ষণে দক্ষিণ কোরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ছয়জন চিকিৎসক, পাঁচজন কর্মকর্তা, ৫০ জন নার্স ও ১১ জন টেকনিশিয়ান ফেরত

আসেন; বাকি ৮৫ জন চিকিৎসক ও কর্মকর্তা ফিরে আসেননি। এই খরচ হাসপাতাল দিয়েছে, কিন্তু যারা ফেরত আসেনি, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

- বেশ কয়েকটি দামি যন্ত্র, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, লিফট ও চিকিৎসা সরঞ্জাম স্থাপনের পর পরই অকার্যকর হয়ে যায়; এগুলো নিম্নমানের ছিল। অব্যবস্থাপনার কারণে বেশকিছু সরঞ্জামের বাক্সই খোলা হয়নি।
- সাবেক ভিসি সারফুদ্দিনের বিরুদ্ধে ১০ থেকে ২০ লাখ ঘুষের বিনিময়ে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ আছে।
- অভিযোগ আছে, শর্ত পূরণ করতে না পারলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাপ্তি ওষুধের দোকান স্থাপনের অনুমতি দেয় কর্তৃপক্ষ।
- সব স্তরেই অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে, নিয়োগ, ক্রয় ও জায়গা ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে।

এখানেই শেষ নয়, এমনকি বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক সংগঠনের ব্যানারে এই মর্মে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য সাবেক ভিসি অর্থের বিনিময়ে শতাধিক শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন।

শ্বেতপত্র কমিটি বলছে, এসব বরফখণ্ডের চূড়ামাত্র। বাস্তবে দুর্নীতি কী পরিমাণে হয়েছে, তার কূল কিনারা নেই। এমনকি চিকিৎসকদের জিম্মি করে রাখা হয়েছে বা নিজের পকেটের অর্থের বিনিময়েও তাঁদের পেশাদার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে দেওয়া হয়নি। এতে যে শুধু আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে তাই নয় বরং স্বজনপ্রীতি, সুবিধাবাদ ও রাজনৈতিক দুর্নীতির অবকাশ তৈরি হয়েছে।

১৪.ক.১০ স্বাস্থ্য অর্থায়ন: অপরিপাক এবং বাস্তবায়নও দুর্বল

বাংলাদেশের মোট স্বাস্থ্য ব্যয় স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যয় ছাড়াও সামগ্রিক বিনিয়োগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও গবেষণার ব্যয় যুক্ত করে নির্ধারিত হয়। স্বাস্থ্য খাতের মোট ব্যয় ছিল ৭৭৭ বিলিয়ন বা ৭৭ হাজার ৭০০ কোটি টাকা; স্বাস্থ্য খাতের বর্তমান ব্যয় ৭১৯ বিলিয়ন বা ৭১ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। ২০২০ সালের বাজেটে জিডিপি'র অনুপাতে বাংলাদেশের মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের অনুপাত ছিল ২ দশমিক ৮ শতাংশ এবং বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যয়ের অনুপাত ২ দশমিক ৬ শতাংশ। হিসাবে দেখা যায়, ২০২০ সালে জনপ্রতি মোট স্বাস্থ্য ব্যয় ছিল ৪ হাজার ৫৭৮ টাকা এবং জনপ্রতি বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যয় ৪ হাজার ২৩৯ টাকা। গত এক দশকে বাংলাদেশের মোট স্বাস্থ্য ব্যয় জিডিপির তিন শতাংশের আশপাশেই রয়েছে।

এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যয় প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেকটাই কম। এবং একইসঙ্গে অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের তুলনায় কম। সে কারণে বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য বাবদ পকেট ব্যয় অনেক বেশি; এলডিসিভুক্ত নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশগুলোর মধ্যে যেসব দেশে স্বাস্থ্য ব্যয় সবচেয়ে বেশি, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত সরকারের বিশেষ আনুকূল্য পায় না। দেখা গেছে, গত ২০ বছর ধরে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বাজেট জিডিপির এক শতাংশেরও কম। সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, অনুন্নয়ন ব্যয় উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশি হারে বেড়েছে। ফলে এখন বাজেটের একটি বড় অংশ অনুন্নয়ন ব্যয় বাবদ বরাদ্দ করা হয়। ২০০৯ সালে সরকারের অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল মোট বাজেটের ৪১ শতাংশ, ২০২৪ সালে যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২ শতাংশ। অর্থাৎ বাজেটের উন্নয়ন ব্যয় অনুন্নয়ন ব্যয়ের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ব্যয় ও মানুষের পকেট ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান থেকে বোঝা যায়, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো কতটা চাপের মধ্যে আছে।

অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও নতুন অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্টের (পিএফডি) অধীনে পরিচালিত হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের বড় অংশই পায় এই বিভাগের অপারেশন প্ল্যান বা ওপির এইচইডি। চতুর্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর প্রোগ্রামের (HPNSP) মোট উন্নয়ন বাজেটের ২৩.৬৫ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটের ২৪ শতাংশ এরাই পেয়েছে। এছাড়া দেশের আরও ৩৭টি নতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণের পৃথক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। দেখা যায়, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন পরিকল্পনার সক্ষমতার ঘাটতি থাকায় ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের বরাদ্দ বেড়ে যায়; এডিপি পুনর্বিবেচনার সময় এটি ঘটে থাকে। কিন্তু এই রীতির কারণে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত যত তহবিল ছাড়া হয়েছে, তার ৩২ শতাংশ পেয়েছে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ এবং চতুর্থ এইচপিএনএসপির তহবিলের ৩০ শতাংশ তহবিল তারাই ব্যয় করেছে। এই অগ্রাধিকার সত্ত্বেও গত এক দশকে বাজেট বাস্তবায়ন পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। সেই সঙ্গে ঋণ ও অন্যান্য মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

১৪.ক.১১ স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে এনজিওর ভূমিকা

স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার অনেক দিন ধরেই এনজিওদের সঙ্গে কাজ করছে। বেশকিছু রোগের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার এনজিওদের সঙ্গে কাজ করছে যেমন: যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, টিকাদান, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি কর্মসূচি। নগর দরিদ্রদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে এনজিওরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া জনস্বাস্থ্য সেবা ও বিভিন্ন রোগের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও তারা ভূমিকা পালন করে।

১৯৯৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট স্বাস্থ্যব্যয়ের ৬ দশমিক ৭ শতাংশই হতো এনজিওদের মাধ্যমে। এই টাকা যেমন তাদের নিজেদের সম্পদ থেকে আসত, তেমনি উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকেও আসত। ২০২০ সালে দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যয়ের ৩৭ শতাংশই করেছে এনজিওরা, টাকার অংকে যা ৩৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা। এছাড়া তারা সারা দেশে ১ হাজার ৬১৪টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিচালনা করে, সেগুলোর মধ্যে অনেক কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত; এই সময় হাসপাতালের মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ২০ শতাংশ এসব হাসপাতালে হয়েছে।

বাংলাদেশের এনজিওগুলো বিকল্প পদ্ধতিতে সেবা দেওয়ার ধারা চালু করেছে; এসব পদ্ধতির মধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ সরকার আরও উন্নত করেছে। এছাড়া মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদেরও তারা গুরুত্বপূর্ণ সেবা দিয়ে থাকে। সরকার বাজেট থেকে এনজিওদের সহায়তা করে থাকে। সেই সঙ্গে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকেও এনজিওগুলোকে তহবিল দেওয়া হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এনজিওগুলোকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণে ৬৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা দিয়েছে।

১৪.ক.১২ উপসংহার

জনস্বাস্থ্য ও সেবায় বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য বলেই মনে করে শ্বেতপত্র কমিটি। সরকার, এনজিও ও উন্নয়ন অংশীদারদের সম্মিলিত প্রয়াস ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন কর্মসূচির কল্যাণে তা সম্ভব হয়েছে। তবে, সম্প্রতি এই অগ্রগতির ধার কমে গেছে। সরকার যে এত দিন স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ, অবকাঠামোর উন্নয়ন ও ডিজিটাইজেশনের আখ্যান প্রচার করেছে, তার সঙ্গে এই অর্জন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

শ্বেতপত্র কমিটির মতে, এই খাতের মূল চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে অসম সুযোগ (বিশেষ করে নগর দরিদ্রদের)। সেই সঙ্গে আছে সেবার নিম্ন মান, স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিপরীতে যথাযথ আর্থিক সংস্থান না থাকা। এসব কারণে মানুষ কখনো কখনো দারিদ্র্যের কবলে পড়ে। মানুষের পকেট ব্যয় বেশি হওয়ার কারণে একদিকে ব্যক্তি খাতে অনিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, আরেকদিকে স্বাস্থ্য খাতের অপ্রতুল বাজেট বাস্তবায়নে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। দুর্নীতি তো আছেই।

শ্বেতপত্র কমিটি মনে করে, জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে-রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্কোন্নয়নেও তা জরুরি। সে জন্য জরুরি সংস্কার প্রয়োজন; দরকার উদ্ভাবনী অংশীদারি ও রাষ্ট্রের শক্তিশালী নেতৃত্ব।

অধ্যায় ১৪.খ: বাংলাদেশের শিক্ষাখাত যেন ‘হীরক রাজার দেশে’ সিনড্রোমে ভুগছে: যত কম জানে, তত বেশি মানে

১৪.খ.১ সূচনা

বাংলাদেশের অর্থনীতি নিম্ন মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়ে গেছে। শ্রম ও পুঁজির ওপর অতি নির্ভরতার কারণে অর্থনীতি এই ফাঁদে পড়েছে। অর্থনীতি সূত্রানুসারে, এই দুটি বিষয়ের ওপর অতি নির্ভরতার কারণে এক সময় তা থেকে প্রাপ্তির হার কমে যাবে। এই বাস্তবতায় প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখতে বাংলাদেশকে টোটাল ফ্যাক্টর প্রোডাকটিভিটি বা টিএফপি বাড়াতে হবে, বিশেষ করে শ্রমের উৎপাদনশীলতা। সেজন্য শিক্ষার মান ও দক্ষতা বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশে শিক্ষার হার বেড়েছে। এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় শতভাগ শিশু ভর্তি হচ্ছে; সেই সঙ্গে পূর্ণ বয়স্ক মানুষের সাক্ষরতার হারও বেড়েছে। কিন্তু এত দিন শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের বদলে শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর সরকার বেশি মনোযোগ দিয়েছে। যেমন, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে (পিইডিপি) শিক্ষার মানের চেয়ে ভর্তি ও শিক্ষা সম্পন্ন করায় বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে।

শ্বেতপত্র কমিটি মনে করছে, বাংলাদেশের শিক্ষা খাত নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। যেমন, প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিপুল হারে অনুপস্থিতি; মাধ্যমিক পর্যায়ে বড় অংশের বারে পড়া; শিক্ষার সব পর্যায়ে গুণগত মান নিয়ে উদ্বেগ; শিক্ষাদানের পদ্ধতিগত অকার্যকারিতা; স্কুল থেকে বারে পড়া ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের যথাযথ সহায়তা না দেওয়া; উচ্চশিক্ষায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে বিরূপ শিখন পরিবেশ; শিক্ষকদের ক্রমহ্রাসমান সামাজিক মর্যাদা; পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাব ও শিখন মানে অতিমারীর নেতিবাচক প্রভাব।

শিক্ষার পরিসর অনেক বড় হলেও এই অধ্যায়ে খুব নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

১৪.খ.২ মানহীন শিক্ষা

শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেটা হলো, উচ্চশিক্ষায় বেশি বিনিয়োগ করা— নাকি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় বেশি বিনিয়োগ করা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষণায়, উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশের ক্ষেত্রেই এটা দেখা গেছে। এই সিদ্ধান্তের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বেশ গুরুতর।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উচ্চশিক্ষার প্রভাব সীমিত। মৌলিক শিক্ষা ও দক্ষতায় বুৎপত্তি না থাকলে কেবল উচ্চশিক্ষা দিয়ে বিশেষ লাভ হয় না। এই মৌলিক শিক্ষা ও দক্ষতা প্রাথমিক স্তর থেকেই অর্জন করতে হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত শক্তিশালী না হলে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা পাওয়া যায় না, বিষয়টি আবার উল্টো দিক থেকেও সত্য। অন্যদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরিতে উচ্চ শিক্ষার উচ্চমান নিশ্চিত করা জরুরি।

প্রাথমিক শিক্ষায় শিখনের বিপুল ঘাটতি

দেশে শিক্ষার্থীদের পাসের হার বেড়েছে, তারা গ্রেডও পাচ্ছে ভালো। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন কর্মসূচিতে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের শিখনে যেমন ঘাটতি আছে, তেমন তাদের গ্রেডও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। শিখনের বেলায় উন্নতি দেখা যায় না, বরং প্রত্যেক গ্রেডেই শিক্ষার্থীদের শিখন মানের অবনমন হচ্ছে।

তৃতীয় শ্রেণিতেই শিক্ষার্থীদের বড় ধরনের দক্ষতার ঘাটতি দেখা যায়। মাত্র ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলায় এই স্তরের প্রয়োজনীয় দক্ষতা রপ্ত করতে পারে; গণিতের ক্ষেত্রে তা মাত্র ৩৯ শতাংশ। শিক্ষার্থীরা যত ওপরের দিকে

উঠতে থাকে, ততই পরিস্থিতির অবনতি হয়। পঞ্চম শ্রেণিতে দেখা যায়, বাংলায় ৫০ শতাংশ ছাত্র ওই স্তরের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করলেও গণিতে করে মাত্র ৩০ শতাংশ।

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২২) ও মাধ্যমিক স্তরের শিখন মূল্যায়ন (২০১৫) থেকে দেখা যায়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের শিখন মানে ঘাটতি আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে এদের উন্নতি হয়, সেই ইঙ্গিতও এখানে নেই। মৌলিক জ্ঞান ও সাধারণ বোঝাপড়াভিত্তিক কাজে শিক্ষার্থীরা ভালো করলেও যেসব কাজে উচ্চস্তরের চিন্তা ও প্রয়োগের বিষয় থাকে, সেখানে তারা ভালো করে না।

প্রাথমিক শিক্ষায় শিখনের গুরুতর ঘাটতি

২০০১ সালে বাংলাদেশের পরীক্ষা ব্যবস্থায় গ্রেড পয়েন্ট ইভালুয়েশন সিস্টেম চালু করা হয়। সে বছর মাত্র ৭৬ জন ছাত্র জিপিএ ফাইভ পেয়েছিল; ২০২৪ সালে সেই সংখ্যা ১ লাখ ৬৩ হাজার ৮৪৫ জনে উন্নীত হয়। একই সঙ্গে পাসের হারও নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। ২০০১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৩৫.২২ শতাংশ; ২০২৪ সালে যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৩.০৪ শতাংশে। তা সত্ত্বেও শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ থেকে যায়। ২০১৬ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় জিপিএ ৫ পাওয়া অনেক শিক্ষার্থী মৌলিক ইংরেজি অনুবাদে দুর্বল এবং তাদের সাধারণ জ্ঞানের মান তৈবচ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে শ্বেতপত্র কমিটি কিছু পদ্ধতিগত বিষয় খুঁজে পেয়েছে। যার মধ্যে আছে শিক্ষকদের অনানুষ্ঠানিকভাবে বেশি নম্বর দিতে বলা ও ছাত্রদের ফেল না করাতে উদ্বুদ্ধ করা। এভাবে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত দক্ষতা ও ফলাফলের মধ্যে বড় ধরনের ঘাটতি থেকে যায়। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েই গুরুতর প্রশ্নের উদয় হয়।

শিক্ষা খাতে পকেট ব্যয়

স্বাস্থ্য খাতের মতো বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে পরিবারের ব্যয়ের বোঝা বেশ ভারী। ২০২২ সালে এডুকেশন ওয়াচের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের বার্ষিক গড় ব্যয় ১৩ হাজার ৮৮২ টাকা; মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ হাজার ৩৪০ টাকায়— এর মধ্যে আছে প্রাইভেট পড়া ও বাজার থেকে গাইড বই কেনার খরচ।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪১ শতাংশ শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৭ শতাংশ অভিভাবক বলেছেন, সন্তানপ্রতি বছরে ২০০০ টাকার বেশি ব্যয় করার সামর্থ্য তাদের নেই, যদিও বাস্তবে ব্যয় হচ্ছে এর চেয়ে অনেক বেশি।

শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে পাঠদান করার হচ্ছে না বলে ছাত্র-ছাত্রীদের গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরতা দিনকে দিন বাড়ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯২ শতাংশ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯৩ শতাংশ শিক্ষার্থী এসব গাইড বই ব্যবহার করছে। এসব গাইড বই খুব আগ্রাসীভাবে বিপণন করা হয়—বিদ্যালয় ও শিক্ষকদেরও প্রণোদনা দেওয়া হয়, যাতে তারা এসব শিক্ষার্থীদের গাইড বই ব্যবহারে উৎসাহিত করে। এতে পরিবারের আর্থিক চাপ বেড়ে যায়।

নিম্নমানের শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমতার ঘাটতি উন্মোচন

বাংলাদেশ একসময় প্রাথমিক বিদ্যালয় শতভাগ শিক্ষার্থী ভর্তির পর্যায়ে চলে গেলেও ২০১৯ সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ৮.৭ শতাংশ কমেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কমেছে চর ও উপকূলীয় অঞ্চলে, সেখানে এই হার ১৮ শতাংশ, যদিও শহরাঞ্চলে এই হার অতটা বেশি নয়, মাত্র ৩ দশমিক ৩ শতাংশ।

বাংলাদেশের বাস্তবতা হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা ভালো করে। এক্ষেত্রে ভৌগোলিক

পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দেখা যায় বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার মোট শিক্ষার্থীর ৩৫ শতাংশ; গ্রামাঞ্চল ও অন্যান্য মফস্বল শহরের তুলনায় যা অনেক বেশি। ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে ভালো করছে। ২০১২-১৩ সালের পর থেকে দেখা যায় শহরাঞ্চলের কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষার্থীরা জাতীয়কৃত বা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভালো করছে। সবচেয়ে খারাপ করছে চরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা। মৌলিক দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দেখা যায়, শহরাঞ্চলের ছাত্ররা ধারাবাহিকভাবে গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের চেয়ে ভালো করে। ফলে দুর্গম অঞ্চল, গ্রাম, শহর ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে বড় ধরনের ব্যবধান দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হচ্ছে চর ও দুর্গম অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা। আরও যেসব কারণে এই বৈষম্য বাড়ছে সেগুলো হলো, শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতার শিক্ষার মান ও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। দেখা গেছে, যেসব শিক্ষার্থীর বাবা-মা স্বল্পশিক্ষিত, তাদের শিশুনে ঘাটতি থেকে যায়; একই কথা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এসব অসমতার কারণে দারিদ্র্যের সেই দুষ্টচক্র দীর্ঘস্থায়ী হয়। আকাজক্ষা থাকা সত্ত্বেও গরিব ও সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রদের সামাজিকভাবে ওপরে ওঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিশুর সমতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ; এই অর্জন তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হয়। তারপরও সমস্যা আছে, বিশেষ করে উচ্চ পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির অনুপাত কমে যায়। দেখা যায়, বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষিত মেয়েদের বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে।

২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে তাদেরকে সরকারের নিবন্ধন নিতে হয়েছে এবং সব প্রাথমিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (নেপ) তথ্য মতে, বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩১.৩ শতাংশ শিক্ষকের ব্যাচেলর বা সম্মান ডিগ্রি নেই। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, বেতন আকর্ষণীয় না হওয়ায় এই খাতের প্রতি শিক্ষিত মানুষের আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। এছাড়া দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রভাব, নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনার কারণে এই খাতের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের নীতি অনুযায়ী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ৬০ শতাংশ অবশ্যই নারী হতে হবে; ৩০ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্ভাবনার জন্য সংরক্ষিত আর বাকি ১০ শতাংশ সবার জন্য উন্মুক্ত। ২০২১ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে ৬৪.৪১ শতাংশ ছিলেন নারী। যারা বিশেষ করে নারী অধিকার নিয়ে কাজ করেন তারা বলেন যে, স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের এই নিয়োগের কারণে তাদের ক্ষমতায়ন হয়। কিন্তু অনেক শিক্ষাবিদ বিভিন্ন সময়ে এই মডেলের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্যারিয়ারে উন্নতির সম্ভাবনা সীমিত; তারা চতুর্দশ গ্রেডে চাকরি শুরু করেন এবং অবসরে যান একাদশ গ্রেডে। অন্যদিকে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকেরা নবম গ্রেডে চাকরি শুরু করেন। তাঁদের বেতনও কম; কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন অপমানজনকভাবে কম। এই বাস্তবতায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিত নারীরা এই পেশায় আসতে চান না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নারীরা সামাজিক প্রত্যাশা অর্থাৎ কর্ম জীবনের সঙ্গে পারিবারিক জীবনের সামঞ্জস্য রাখতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা আসেন। সমালোচকেরা বলেন, বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নারীদের এই শিক্ষকতা এক ধরনের লো লেভেল ইকুইলিব্রিয়াম ট্রাপ, বা তাঁদের এক ধরনের নিম্ন দক্ষতাভিত্তিক কর্মজগতের ফাঁদে ফেলে রাখার সামিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক নেতাদেরও তেমন একটা ইচ্ছা নেই। এই বাস্তবতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকেরা গ্রেড উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন।

জাতীয় শিক্ষা ক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিদ্রোহ

গত ১৫ বছর ধরে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষার মান নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা হচ্ছে। ২০১০ এর দশকের শুরুর দিকে জাতীয় শিক্ষা গ্রহণের পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তন করে এবং সিলেবাস সেভাবে সমন্বয় করা হয়। ২০২২ সালে এনসিটিবি অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। যদিও এই ব্যবস্থা বড় ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হয়। নতুন শিক্ষাক্রমে চ্যালেঞ্জগুলো ছিল এমন:

১. বছর শেষে স্কোরভিত্তিক মূল্যায়নের অভাব।
২. শিক্ষক-ছাত্রের অপরিপাক অনুপাত, শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ঘাটতি ও বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামোর ঘাটতি।

এসব চ্যালেঞ্জের কারণে এনসিটিবি একপর্যায়ে ২০২২ সালের আগের সিলেবাসে ফিরে যায়। কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগে এই প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও বিতরণে এই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এনসিটিবি এইসব বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণে অনিয়ম করেছে; একইসঙ্গে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের কারণে বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বইয়ের ছাপার মানেরও অবনতি হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা: রহস্যবৃত্ত এবং প্রান্তিক

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তিন ধারায় বিভক্ত—বাংলা, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা ব্যবস্থা। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এই বিভক্তি সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়। নীতি আলোচনায় মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়টি সবচেয়ে উপেক্ষিত হয়। মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা আবার দুই ধারায় বিভক্ত: একদিকে আছে আলিয়া মাদ্রাসা যারা সরকারের নিবন্ধিত, আরেক দিকে আছে কওমি মাদ্রাসা, যারা নিবন্ধিত নয়। আলিয়া মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রক সংস্থা হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা পরিদপ্তর। আলিয়া মাদ্রাসায় মোট ছাত্রের সংখ্যা ৩৮ লাখ ৩০ হাজার; এর মধ্যে এবতেদায়ি শিক্ষার্থীরাও আছে। কওমি মাদ্রাসা স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়, সেখানে সরকারের অংশগ্রহণ নেই; তারাও শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি বিতর্কে উপেক্ষিত থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা প্রায় বিশ শতাংশ শিক্ষার্থী মাদ্রাসা ভর্তি হয়। বাংলাদেশের মোট মাদ্রাসার মধ্যে ৮৫.৯ শতাংশই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত।

২০১৮ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার কওমি মাদ্রাসার দাওয়ায় হাদিস সনদকে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি সাহিত্যে স্নাতকোত্তরের সমমর্যাদা দেয়। এই সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের চাকরির বাজারে টিকে থাকার মতো যোগ্যতার ঘাটতি দেখা যায়, ফলে তাঁদের কাজের সুযোগ কমে যায়। এ কারণে তাঁরা নিম্ন আয়ের ফাঁদে আটকা পড়ে যায়।

মূলত আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় বাংলাদেশের মানুষ শিশুদের মাদ্রাসায় পড়তে পাঠায়; মাদ্রাসায় পড়লে প্রাইভেট পড়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে না; তার সঙ্গে থাকে ধর্মীয় প্রগোদনা। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষার সুযোগ কম থাকার কারণে তারা শিশুদের মাদ্রাসায় পাঠিয়ে থাকে। এসব বিষয় আমলে নিলে, মাদ্রাসার শিক্ষাক্রমে বাজার সংশ্লিষ্ট দক্ষতা রপ্ত করানোর মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং শিক্ষার অন্যান্য ধরার সঙ্গে এই ধরার ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে। এতে মাদ্রাসার ছাত্রদের অর্থনৈতিক সুযোগ বাড়বে বলে মনে করে শ্বেতপত্র কমিটি।

আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা

বাংলাদেশের মাদ্রাসায় পড়াশোনা করা ৫৪ শতাংশ শিক্ষার্থী মেয়ে। আলিয়া মাদ্রাসা এনসিটিবি প্রণীত বাংলা মাধ্যমের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করলেও কওমি মাদ্রাসায় তা করা হয় না। বরং সেখানে কেবল ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে মেয়ে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও পারিবারিক মূল্যবোধ শেখানো হয়।

আলিয়া মাদ্রাসা সরকারি শিক্ষাক্রম অনুসরণ করলেও নানা চ্যালেঞ্জ থেকেই যায়। যেমন, সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার ঘাটতি আছে। বিজ্ঞান ও কলা শিক্ষা দেওয়া হয় কেবল উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে, কিন্তু বাণিজ্য শিক্ষা নেই। ঢাকা জেলার ১১৯ টি আলিয়া মাদ্রাসার মধ্যে ৭৬টি মাদ্রাসার আলিম পর্যায়ে বিজ্ঞানের কোনো শিক্ষার্থী নেই। মাত্র ২৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ মাদ্রাসায় বিজ্ঞান গবেষণাগার আছে।

এছাড়া যোগ্য শিক্ষকের অভাবে মাদ্রাসার ছাত্রদের চিন্তার বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। আলিয়া মাদ্রাসায় মাত্র ২৩ শতাংশ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ আছে; দেশের ১ লাখ ১৩৪ হাজার ৩৬৮জন মাদ্রাসা শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১৯ দশমিক ৬৬ শতাংশের এনটিআরসিএ সনদ আছে।

আরেকটি উদ্বেগের জায়গা হলো, মাদ্রাসায় মেয়ে শিক্ষার্থী বাড়লেও নারী শিক্ষকের অনুপাত অত্যন্ত কম। মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৫ দশমিক ২৪ শতাংশ হলেও নারী শিক্ষক আছেন মাত্র ১২ দশমিক ৭ শতাংশ।

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা

দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলো নিবন্ধিত নয়; এসব মাদ্রাসা মূলত মানুষের অনুদানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ব্যানবেইসের তথ্যানুসারে (২০২২), দেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ৩৬ হাজার ৫৯৭; এসব মাদ্রাসা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাক্রম ও কাঠামোগতভাবে ভিন্ন। এরা মূলত মাদানি ও দেওবন্দ ধারার শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা স্তর ছয়টি— এবতেদায়ি (প্রাথমিক) থেকে শুরু করে দাওরায় হাদিস (স্নাতকোত্তর)। সাধারণত এই শিক্ষা সম্পন্ন করতে ৭ থেকে ৮ বছর সময় লাগে। কওমি শিক্ষা সাধারণ বা আলিয়া মাদ্রাসার মতো নয়। এই শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষা নেই বললেই চলে।

এই ঘাটতি ঘোচাতে সরকার দাওরায় হাদিস সনদকে ইসলামিক স্টাডিস ও আরবিতে স্নাতকোত্তরের মর্যাদা দিয়েছে। সে কারণে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সালে কওমি জননী আখ্যা দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক আইনে কওমি ধারার সঙ্গে আলিয়া ও সাধারণ ধারার শিক্ষার ব্যবধান ঘোচানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

শ্বেতপত্র কমিটি মনে করে, মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারে সরকারকে শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান, বাংলা ও ইংরেজি যুক্ত করতে হবে; সেই সঙ্গে দিতে হবে আর্থিক সহায়তা। এতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের পথ সুগম করবে।

১৪.খ.৩ সংখ্যা ও মানের সংকট: অতিমারী উত্তর সময়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিখন পরিস্থিতি

অতিমারীর কারণে ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর এবং ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আবারও বিদ্যালয় বন্ধ রাখার কারণে ৩ কোটি ২৭ লাখ শিশুর শিক্ষা জীবন ব্যাহত হয়। অতিমারীর আগেই শিক্ষার্থীদের মৌলিক সাক্ষরতা ও সংখ্যা জ্ঞানের যে সীমাবদ্ধতা ছিল, বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় সেই পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়।

প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষায় যাওয়া

২০২০ সালে দেখা গেছে, পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী (৪.৫ শতাংশ বারে পড়া ছাড়া) সরকারি বা সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পেরেছে। এছাড়া ৬ দশমিক ৪ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষার্থী মাদ্রাসায় চলে গেছে; এই হার মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাদ্রাসায় যাওয়ার হারের চেয়ে অনেক বেশি। হতে পারে, অতিমারীর প্রভাবে দেশের অনেক পরিবার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ঝরে পড়ার উচ্চ হার

অতিমারীর প্রভাব নানাবিধ। শিক্ষা খাতেও এর বহুমাত্রিক প্রভাব পড়েছে। ফলে মানুষের সুরক্ষাহীনতা, শিশুদের মান পড়ে যাওয়া বা ঝরে পড়ার উচ্চ হার ইত্যাদি— অতিমারীর পর এসব সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। ওই সময় বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দরিদ্র শিক্ষার্থী ও যাদের দূরশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না, তাদের বিদ্যালয়ে ফেরত আসা বা বাল্য বিবাহ বা শিশু শ্রমে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল।

অতিমারীর পর ঝরে পড়ার হার

প্রাথমিক শিক্ষা: ঝরে পড়ার গড় হার ৪ দশমিক ৫ শতাংশ। দেখা যায়, মেয়ে শিক্ষার্থীদের তুলনায় ছেলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার বেশি। ছেলেদের বেলায় যা ৭ শতাংশ, মেয়েদের বেলায় তা ১ দশমিক ৭ শতাংশ। ঝরে পড়ার হার সবচেয়ে বেশি চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণিতে।

মাধ্যমিক শিক্ষা: ঝরে পড়ার গড় হার ৬ শতাংশ; এ ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বিভেদ নেই, উভয়রেই ঝরে পড়ার হার সমান। সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে অষ্টম শ্রেণিতে; এই হার ৩৭ দশমিক ২৬ শতাংশ। ঝরে পড়ার যে বাস্তবতা বা কারণ তা আগে থেকেই আছে; কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, অতিমারীর পর সেই পরিস্থিতি আরও তীব্র হয়েছে। কোভিডের পর শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার এসব কারণ দেখা যায়।

দারিদ্র্য: শহরাঞ্চলের প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের ঝরে পড়া দুই তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীর নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে এসেছে। যাদের পিতা-মাতার মাসিক আয় ১৫ হাজার টাকার কম।

লেখাপড়া চালিয়ে নেওয়ার অনীহা: বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীদের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা হয়, যেমন: শিক্ষকদের আচরণ, সমবয়সী সহপাঠীদের আচরণ ও স্বাভাবিকভাবে শিখন পরিবেশ— এসব কারণেও শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ে।

অল্প বয়সে বিয়ে: এ সমস্যা মূলত মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। মাধ্যমিক পর্যায়ের অধ্যয়নরত মেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার চল আছে। এছাড়া মেয়ে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার বিষয়ে পরিবারের সহায়তা না থাকার কারণেও অনেক ক্ষেত্রে অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়।

শিশুশ্রম ও উপার্জনমূলক কাজ: অনেক শিশুকেই শ্রমে নিয়োজিত হতে হয়। দেখা গেছে, প্রাথমিক পর্যায়ের ১৩.৭ শতাংশ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ২১.১ শতাংশ শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার পেছনে এটি মূল কারণ হিসেবে কাজ করে।

পারিবারিক দায়িত্ব: প্রাথমিক পর্যায়ের ২০.৭% এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ১০.২% শিক্ষার্থী পারিবারিক বিভিন্ন কাজে জড়িত হয়ে যাওয়ার কারণে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে।

২০২১ সালে বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক কোটি ৩৪ লাখ ৮৪ হাজার ৬১৭ ছাত্র ভর্তি ছিল; এই পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার ১৪ দশমিক ১৫ শতাংশ। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সন্তানদের পড়াশুনা চালিয়ে নিতে বাবা-মার ১১,৮৮২ টাকা খরচ হয়। এ বিষয়ে শ্বেতপত্র কমিটির সুপারিশ হচ্ছে, চিরাচরিত শিক্ষা বাজেটের চেয়ে ২.৫ শতাংশ বরাদ্দ বেশি দেওয়া; ২০২৪-২৫ সালে যার পরিমাণ ৯৪ হাজার ৭১০ কোটি টাকা। এই অতিরিক্ত অর্থায়নের মধ্য দিয়ে ঝরে পড়া সংক্রান্ত বেশকিছু ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব, যেমন: দিনে এক বেলা খাবার, দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিনামূল্যে বা ভর্তুকি মূল্যে শিক্ষা উপকরণ দেওয়া ইত্যাদি।

ক্রমবর্ধমান শিখন ঘাটতি

বাংলাদেশ এক্সামিনেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিটের এক সমীক্ষায় অতিমারী-উত্তর সময়ে বাংলাদেশের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে ৮০ শতাংশ ছাত্র বাংলায়, ৭৬ শতাংশ ইংরেজিতে আর ৬৯ শতাংশ ছাত্র গণিতে শিখন

ঘাটতির কথা বলেছে। এনসিটিবির আরেক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে; বিশেষ করে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। বিদ্যালয়ের বন্ধ হওয়ার আগে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রদের গড়পড়তা ইংরেজি দক্ষতা ছিল যেখানে ৪৯ শতাংশ, বিদ্যালয় বন্ধের পর তা ৩৬ শতাংশ নেমে এসেছে। এছাড়া পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ বাংলায় তীব্র থেকে মধ্যম শিখন ঘাটতির কথা বলেছে; ইংরেজির ক্ষেত্রে তা ৬১ শতাংশ আর গণিতের ক্ষেত্রে ৫৯ শতাংশ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ৫৪ শতাংশ, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ। এডুকেশন ওয়াচের আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, অষ্টম শ্রেণির ২৮ দশমিক ৯ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং নবম শ্রেণির ২৬ দশমিক ২ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস নম্বরও পায়নি।

প্রযুক্তিগত বিভাজন

বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত বৈষম্য আগে থেকেই আছে; অতিমারীর পর তা আরও তীব্র হয়েছে বলে দেখা গেছে। বিশেষ করে জাতিগত সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে। ২০২১ সালে ইউনিসেফের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ৫৬ শতাংশ শিক্ষার্থী অনলাইন ক্লাস বা সংসদ টেলিভিশনের ক্লাসে যোগ দেয়নি; জাতিগত সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৭৫ শতাংশ। দূরশিক্ষণের প্রভাবও একেবারেই ন্যূনতম। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯ থেকে ১১ শতাংশ এবং মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৬ দশমিক ২ শতাংশ শিক্ষার্থী টেলিভিশনের শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে। বিষয়টি হলো, ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের ক্ষেত্রে শ্রেণিগত বিভাজন আছে; সেই সঙ্গে আছে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে ভিন্নতা। এসব কারণে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট ও মাল্টিমিডিয়া সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বাজেট স্বল্পতা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

১৪.খ.৪ উচ্চশিক্ষা

২০০৯ সালের পর বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক বিস্তার হয়েছে— দেশে এখন ৬১টি পাবলিক ও সরকারি এবং ১১০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ২০২২ সালে বাংলাদেশে ৪৭ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪৭ জন ছাত্র পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হয়েছে; এর মধ্যে ১৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ ও মাদ্রাসাও আছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন বাজেট: নির্মাণের দিকে বেশি ঝোঁক

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার বাজেট বরাদ্দে বড় ধরনের ভারসাম্যহীনতা আছে। বিষয়টি হলো, বাজেটের বড় অংশই উন্নয়ন ও পরিচালনা খাতে ব্যয় করা হয়— গবেষণা খাতে বরাদ্দ একেবারেই কম। দেশে এখন ৬১টি পাবলিক ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থাৎ প্রায় প্রতিটি জেলায় এখন একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এতে অবকাঠামোগত বা উন্নয়ন খরচ বেড়েছে কিন্তু শিক্ষার মান বাড়েনি। গবেষণার বরাদ্দ অপ্রতুল এবং বিতরণও যথাযথ নয়। প্রায়ই দেখা যায়, যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে গবেষণার বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। এতে মেধাবী ফ্যাকাল্টি সদস্যরা নিরুৎসাহিত হন এবং একাডেমিক সংস্কৃতির ধারা বিনষ্ট হয়।

আরো দেখা যায়, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনের যোগ আছে। অর্থাৎ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত যত না পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনার মাধ্যমে করা হয়, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়। প্রায়ই দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে; কিন্তু যথাযথ অবকাঠামো ও সম্পদ নেই। ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চনার শিকার হয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও নির্বাচনের বছরে বিশ্ববিদ্যালয় জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির মধ্যদিয়ে উচ্চশিক্ষায় বিদ্যায়তনিক উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্য ব্যাহত হয়।

রাজনৈতিক শক্তির সামনে ইউজিসি স্বায়ত্তশাসন সমুন্নত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়। প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য ছিল, ১৯৭৩ সালের আইনের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করার পাশাপাশি একাডেমিক ও আর্থিক চাহিদা পূরণ করা। কিন্তু পরবর্তীকালে ইউজিসি সরকারের উচ্চ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের হাতیارে পরিণত হয়। কখন কখনও এই প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময়ও তা দেখা গেছে। তখন ইউজিসি দেশের সব পাবলিক ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া নির্দেশনা দেয়, এমনকি যেসব বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালের আইনে পরিচালিত হচ্ছে, সেগুলোও। এর মধ্য দিয়ে ইউজিসির ক্ষয়ের একটি চিত্র পাওয়া যায়।

বিগত সরকারের জামানায় দেখা গেছে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ভূমিকা অনেকটা সংকুচিত হয়েছে। অতীতে ইউজিসি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্যতা যাচাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন তৈরি ও উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। কিন্তু ২০০৫-০৬ সাল থেকে রাজনৈতিক প্রভাবে, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে; তখন থেকেই ইউজিসির ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়েছে।

বিষয়টি হলো, উচ্চশিক্ষায় সরকারি ব্যয় ক্রমবর্ধমান হারে স্থানীয় কায়মি শক্তি, স্থানীয় সংসদ সদস্য, আমলাতন্ত্র ও ঠিকাদারদের সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ২০১৮ সালের পর ডিপিপি বা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো অপরিপূর্ণ; এবং তাদের পরিকল্পনারও ঘাটতি আছে। রাজনৈতিক সংযোগের ভিত্তিতে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে ব্যাহত হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ অনেক বেশি করে রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে— বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় সংসদ সদস্য, স্থানীয় ঠিকাদার ও ছাত্র সংগঠনের যোগসাজশে নিয়োগ হয়েছে। অনেক শিক্ষকই এই অনিয়মিত প্রক্রিয়ায় সমর্থন ও বৈধতা দিয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ছাত্র ফাইল থেকে বাস্তবতার চিত্র পাওয়া যায় না

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার মান পড়ে গেছে— এই ধারণার ভিত্তিতে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অনেক ছাত্র স্নাতক পর্যায়ে পড়াশোনা করতে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এতে দেশের বসবাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, কারণ অনেক ছাত্রই এখন বিদেশে স্থায়ী হচ্ছে। এই ছাত্ররা পড়াশোনার খরচ চালাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে স্টুডেন্ট ফাইল খুলছে; এই হিসাবের মাধ্যমে তাঁরা বিদেশে টিউশন ফি নিয়ে যান। ২০২০ সাল থেকে ২০২৪ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৪ হাজার ৯৭৬ জন ছাত্র প্রায় ২৯০ কোটি টাকা এসব হিসাবের মাধ্যমে নিয়ে গেছে। যদিও ২০২৩ সালে ইউনেস্কোর তথ্য দেখা যায়, বাংলাদেশের ৫২ হাজার ৭৯৯ জন ছাত্র বিদেশে পড়াশোনা করে। ফলে এই দুটি সূত্রের তথ্যে বড় ধরনের ব্যবধান পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউকের মতো উন্নত দেশগুলোতে এরকম শিক্ষার হাত ধরে পুঁজি পাচার হচ্ছে বলে মনে করে শ্বেতপত্র কমিটি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের ছাত্রের সংখ্যা এখন সর্বকালের সর্বোচ্চ। ২০২৩ সালে মার্কিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলাদেশের প্রায় ১৭ হাজার ছাত্র ভর্তি হয়েছে। ২০২৪ সালের ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনাল এক্সচেঞ্জের প্রতিবেদনে এই তথ্য পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে কত ছাত্র বিদেশে যাচ্ছে তার পরিসংখ্যান প্রকাশিত; কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক বিষয়টি ধরতে পারছে না।

উচ্চশিক্ষায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য নেই

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় যত শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে, তার ৭০ ভাগ বা প্রায় ৩৬ লাখ ছাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা করছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের অনুদানে চলে না, বরং ছাত্র ভর্তি, নিবন্ধন, পরীক্ষার মাণ্ডল ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন উৎস থেকে নিজের ব্যয় নির্বাহ করে। সরকারি কলেজে শিক্ষকেরা জাতীয় পে স্কেলের মাধ্যমে বেতন পান। অন্যদিকে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকেরা যারা এমপিওভুক্ত, তারা সরকারি বেতনের কেবল মূল বেতনটা পান, তার সঙ্গে থাকে যৎসামান্য ভাতা। ছাত্ররা পকেট থেকে শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো মূলত তার নিজস্ব তহবিল থেকে নির্বাহ করা হয়। কিছু কিছু প্রকল্প সরকারি সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক ঋণে (যেমন: বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে) পরিচালিত হয়।

কিন্তু ২০২২-২৩ সালে এক আইনের বলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে এক হাজার কোটি টাকা সরকারি তহবিলে স্থানান্তর করতে হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যদিও দাবি করেছে এটা তহবিল নয়, বরং উন্নয়ন প্রকল্প, পেনশন দায় ও অবকাঠামোর মতো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ। এই অর্থ স্থানান্তরের কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বড় ধরনের আর্থিক সংকটে পড়েছে। এমনকি সাবেক সরকারের আমলে চাকরিচ্যুত ৯৮৮ জন কর্মচারীর চাকরি ফেরত পাওয়া নিয়েও সংকট তৈরি হয়েছে; বিষয়টি এখনো সুপ্রিম কোর্টের রায়ের জন্য ঝুলে আছে।

বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ শতাংশ স্নাতক বেকার

এক ফলোআপ সমীক্ষায় দেখা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ থেকে পাস করা স্নাতকদের মধ্যে ২৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ শিক্ষার্থী বেতনভোগী চাকরি করছেন; ১০ দশমিক ৯৩ শতাংশ শিক্ষার্থী আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত আর ১২ দশমিক ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী পূর্ণকালীন অথবা খণ্ডকালীন পেশায় আছেন। তবে ৪৭ দশমিক ৯১ শতাংশ এখনো বেকার। এই বেকারদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ স্নাতক পাস করার দু বছর পরেও বেকার ছিলেন। এসব কলেজের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা কেবল প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়: চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও আশার আলো দেখাচ্ছে

১৯৯২ সালে বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন হয়। দেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। শুরুর দিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মূলত উচ্চ আয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করত; এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের তুলনায় তাদের মান কম বলে মনে করা হতো। গত ১৫ বছরে বেশকিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভালো করেছে, এমনকি তারা জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করছে। এমনকি অনেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনায় অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থানের পেছনে যে কয়েকটি বিষয়ে কাজ করেছে সেগুলো হলো:

সময় মতো পাস করে বের হওয়া যায়: পাবলিক বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক কম সময়ে স্নাতক পাস করা যায়। ফলে অনেক শিক্ষার্থী দ্রুত চাকরি পাওয়ার আশায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

বৈশ্বিক অভিবাসন আকাজক্ষা: বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী এখন বিদেশে পড়াশোনা ও স্থায়ী হতে চায়। ফলে তারা দ্রুত পড়াশোনা শেষ করার লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায় অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

ক্যাম্পাসের পরিবেশ: ক্যাম্পাসের পরিবেশ ছাত্রদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করছে। বিশেষ করে এসব বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি না থাকায় অনেক পিতা-মাতাই সন্তানকে সেখানে পড়ানো নিরাপদ বোধ করেন।

ফ্যাকাল্টির বৈচিত্র্য: অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খণ্ডকালীন নিয়োগ দিয়ে থাকে; এটা তাদের খরচ বাঁচানোর কৌশল। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ভিত্তিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি দেওয়া হয়। ফলে অনেক ভালো শিক্ষক সেখানে নিযুক্ত হন।

তবে মানের দিক থেকে বাংলাদেশে হাতেগোনা কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উৎকৃষ্টতা অর্জন করেছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মান নিয়ে অভিযোগ আছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিরুদ্ধে সাধারণত যেসব অভিযোগ ওঠে সেগুলো হলো:

১. বিদ্যায়তনিক উৎকৃষ্টতা অর্জনের মাধ্যমে ডিগ্রি লাভের চেয়ে অর্থের বিনিময়ে ডিগ্রি প্রদান,
২. স্থায়ী ক্যাম্পাস না থাকা এবং মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব;
৩. শিক্ষক-ছাত্রের উচ্চ অনুপাত;
৪. ট্রাস্টি বোর্ডের দুর্নীতি ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

২০১৫ সালে তৎকালীন সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ওপর ১০ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করে। তখন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নো ভ্যাট অন এডুকেশন বা শিক্ষার ওপর ভ্যাট নয় স্লোগানে সারা দেশে তুমুল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। শেষমেষ সরকার ওই ভ্যাট তুলে দিতে বাধ্য হয়।

টেকনিক্যাল ও ডোকেশনাল শিক্ষা: ব্যয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমান

বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড বা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কারিগরি শিক্ষার দেখভাল করে থাকে। সেই সঙ্গে আছে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এই দুটি সংস্থা কাজ করে থাকে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কাজ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট অনুমোদন, ভর্তি, শিক্ষাক্রম, পরীক্ষা ও সনদ প্রদান। অন্যদিকে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কাজ হচ্ছে দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ, নিয়োগ, অবকাঠামো ও সামগ্রিক পরিকল্পনা করা।

কারিগরি শিক্ষার চ্যালেঞ্জসমূহ

শিক্ষক স্বল্পতা ও প্রশিক্ষণের অভাব: কারিগরি শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেরই যোগ্যতার অভাব আছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনেক পদ এখনো খালি।

দুর্বল শাসনব্যবস্থা ও পর্যালোচনা: কারিগরি শিক্ষায় যথাযথ নজরদারির অভাব আছে, সেই সঙ্গে অভাব আছে কর্ম মূল্যায়নের। চাকরির বাজারের সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক দুর্বল।

লৈঙ্গিক বাধা: সামাজিক অবস্থা ও যথাযথ পরিবেশের অভাবের কারণে বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ এখনো অনেক কম।

বাজেট বরাদ্দ: ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাংলাদেশি কারিগরি শিক্ষায় অর্থায়ন ৪২ শতাংশ বাড়লেও এর বড় অংশই ব্যয় করা হয় অবকাঠামোগত খাতে। চাকরির বাজারের সঙ্গে এই শিক্ষার যে সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল, তা সেভাবে করা হয়নি।

শ্বেতপত্র কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কারিগরি শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় ব্যয় প্রায় সমান হলেও কারিগরি শিক্ষিত স্নাতকেরা নিরাপদ ও স্থায়ী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছেন। এর অর্থ হলো, চাকরির বাজারের সঙ্গে এই শিক্ষার আরো নিবিড় সংযোগ স্থাপন এবং এই খাতের শাসন ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন।

বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহ কমছে

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ভর্তি অনেক বাড়লেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির হার এখন অনেক কম। দেখা গেছে, পাবলিক ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ১২ দশমিক ৫ শতাংশ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫ শতাংশ শিক্ষার্থী বিজ্ঞানে ভর্তি হচ্ছে। কলেজগুলোতে এই চিত্র আরো করুণ। ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, কলেজগুলোতে উচ্চশিক্ষায় পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ২১ শতাংশ বিজ্ঞানে পড়াশোনা করছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি বিশেষ করে মানসম্পন্ন শিক্ষক ও পরীক্ষাগার নিয়ে বড় ধরনের উদ্যোগ আছে।

শিক্ষা বাজেট: অগ্রাধিকারের মিথ্যা আখ্যান ও বাস্তবায়নের নিম্নগতি

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে প্রকৃত অর্থে কত বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে, তা পরিষ্কার বোঝা যায় না। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বাজেটও এই খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে এই দুটি মন্ত্রণালয় যথাক্রমে ২১ হাজার ২০৪ কোটি টাকা এবং ১ হাজার ৭২০ কোটি টাকা বরাদ্দ পায়। এমনকি রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের বাজেট অযৌক্তিকভাবে শিক্ষা খাতে যুক্ত করা হয়। শিক্ষা খাতের বাজেট ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোর লক্ষ্যে সব সরকারই এ কাজ করেছে।

অপ্রতুল বরাদ্দ: জিডিপির অনুপাতে শিক্ষা বাজেট কমছে

বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে বাজেট অপ্রতুল। জিডিপির অনুপাতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমে আসছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির অনুপাতে তা ১ দশমিক ৬৯ শতাংশে নেমে এসেছে, আগে যা ছিল ১ দশমিক ৯ শতাংশ। বরাদ্দ যা দেওয়া হয়, তাও ঠিকঠাক ব্যবহৃত হয় না। এ ছাড়া এই বাজেটের মধ্যে অন্যান্য খাতের বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রকৃত অর্থে বাজেট ঘাটতি কত, তা বোঝা যায় না। ২০২১-২০৪১ সালের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল, ২০৩১ সালে শিক্ষা খাতে জিডিপির ৩ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৪ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হবে; কিন্তু বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

২০১৫-১৬ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাবে দেখা যায়, বিশ্বের ৩৮টি এলডিসিভুক্ত বা স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে জিডিপির অনুপাতে শিক্ষা বরাদ্দে বাংলাদেশ নিচের দিক থেকে তৃতীয়। বাংলাদেশের চেয়ে কম বিনিয়োগ করে কেবল হাইতি ও সোমালিয়া। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ শিক্ষা খাতে জিডিপির ১ দশমিক ৮ শতাংশ বরাদ্দ দিয়েছে— ২৮টি এলডিসিভুক্ত দেশের মধ্যে যা ছিল সর্বনিম্ন এবং বিশ্বের ১০৪টি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। এর বিপরীতে দেখা যায়, ভারত ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা খাতে জিডিপির ৪ দশমিক ১ শতাংশ থেকে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দিচ্ছে, অর্থাৎ তারা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণ করছে।

বাজেট বাস্তবায়ন: অনুন্নয়ন খাতে ব্যয়ের প্রবণতা বেশি

২০১০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষা বাজেট বিশ্লেষণ করে শ্বেতপত্র কমিটি দেখিয়েছে, অনুন্নয়ন খাতে ব্যয়ের প্রবণতা বেশি। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২০২০-২১ অর্থ বছরের তুলনায় শিক্ষা বাজেট ২২ দশমিক ৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই সময় অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় বেড়েছে ১৭ দশমিক ৯৬ শতাংশ, যদিও উন্নয়ন ব্যয় কমেছে ২২ দশমিক ০১ শতাংশ। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা— সবখানেই এই প্রবণতা দেখা যায়। যদিও মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা এখানে কিছুটা ব্যতিক্রম। সাময়িকভাবে দেখা যায়, শিক্ষা খাতে মোট ব্যয়ের ৩৯ শতাংশ ব্যয় হয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে।

১৪.খ.৫ বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে দুর্নীতির রূপ

বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে দুর্নীতি বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। এর মধ্যে যেমন আছে অননুমোদিত ভর্তি ফি আদায়, তেমনি আছে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণে অনিয়ম, প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করা আর বৃত্তিসহ অনুদানের জন্য ঘুষ। এছাড়া আরো কিছু পদ্ধতিতে দুর্নীতি হয়ে থাকে, যেমন শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, অবহেলা, বিদ্যালয়ের দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও কেনাকাটায় দুর্নীতি। এমনকি যৌন দুর্নীতি, যেমন নাজেহাল করা বা সুবিধার বিনিময়ে নম্বর দেওয়া, এগুলোও উদ্বেগের কারণ। এছাড়া প্রাইভেট পড়া আর পিএসসি, জেএসসি ও এসএসসির মতো বড় ধরনের পরীক্ষার কারণে সামাজিক অসমতা আরও তীব্র হয়। বিশেষ করে, দরিদ্র মানুষের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস: দুঃখের ওপরে দুঃখ

২০১৪ সালের পর বাংলাদেশের পাবলিক পরীক্ষায় ব্যাপক হারে প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে শুরু করে। পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি ও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের গবেষণায় দেখা গেছে, সরকারি কর্মকর্তা, স্কুল কর্তৃপক্ষ ও কোচিং ব্যবসায়ীদের যোগসাজশে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ ও বিতরণ পর্যায়ে এবং এমনকি পরীক্ষার হলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে— ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র আদান-প্রদান ও অননুমোদিত ফটোকপিার কারণেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। এছাড়া কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত কিছু শিক্ষক অর্থের বিনিময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছেন।

আইন প্রয়োগের দুর্বলতা, প্রতিষ্ঠানগুলোর ভালো ফল করার প্রতিযোগিতা ও কর্তৃপক্ষের অস্বীকৃতির কারণে প্রশ্নপত্র ফাঁস সম্ভব হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও কোচিং সেন্টারে বিরুদ্ধে আইন থাকলেও প্রয়োগের দুর্বলতা ও কঠোর শাস্তি না হওয়ায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। এমনকি পাবলিক এক্সামিনেশন অ্যাক্ট ১৯৯২-এ শাস্তির বিধান ১০ বছর থেকে কমিয়ে চার বছর করা হয়েছে। আইন থাকলেও কোচিং সেন্টার বন্ধ করা হয়নি।

নারী শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানি

২০০৯ সালের হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায়ে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির অভিযোগ গ্রহণে কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এসব নির্দেশনা মানা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে সময় সময় বিবরণী দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সব কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা দিয়েছে।

নারী শিক্ষার্থীরা যৌন হয়রানির অভিযোগ করেছে বলে নারী ও অধিকার কর্মী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা জানিয়েছে। কিন্তু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হয়রানি বিরোধী কমিটি গঠনের নির্দেশনা উপেক্ষা করেছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব কমিটি গঠিত হয়েছে, যদিও সেই সব কমিটিতে কর্তৃপক্ষের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

১৪.খ.৬ শিক্ষকদের ক্যারিয়ারের গতি

১৯৯৩ সালে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। এর মধ্য দিয়ে, প্রাথমিকে শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের ওপর বর্তায়। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের গড় বেতন ১৭০.০২ ডলার; এই অর্থ জাতীয় গড় আয়ের তুলনায় ২৭ শতাংশ কম। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের দিক থেকে এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ৪৫ তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সপ্তম। জাতীয় পে স্কেলে প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থান নিচের সারিতে।

বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক ১৩তম গ্রেডে মোট ১৯ হাজার টাকা বেতন পান; এর মধ্যে মূল বেতন ১১ হাজার টাকা। ১৯ হাজার টাকার মধ্যে ভাতাও আছে। শ্বেতপত্র কমিটি মনে করছে, এই বেতন পর্যাপ্ত নয়; কারণ হিসেবে তারা বলেছে, ঢাকা মহানগরীতে চারজনের পরিবারের মাসিক খাদ্য ব্যয় ২২ হাজার ৬৬৪ টাকা। মূল্যস্ফীতির হার ৯ শতাংশের ওপরে উঠলেও ২০১৫ সালের জাতীয় পে স্কেলের পর শিক্ষকদের বেতন আর বাড়েনি।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষকেরা মাসে ২২০ থেকে ৪৮২ ডলার বেতন পান, যদিও পার্শ্ববর্তী ভারত, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকেরা এর চেয়ে ঢের বেশি বেতন পান। বেতন কম হওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকেরা পড়ানো ও গবেষণায় বিশেষ সময় দিতে নিরুৎসাহিত হন, যদিও অনেকে তারপরও ভালো প্রকাশনা করছেন।

এছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি যেভাবে অপরাধমূলক হয়ে উঠেছে, তার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক প্রভাব রয়েছে। শিক্ষক সংগঠনগুলোর মধ্যে একতা নেই; এবং তারা একযোগে কোনো কিছু করতেও পারে না। আমলাতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক প্রভাবে শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

শিক্ষকতা পেশায় মনোযোগ ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নতির প্রয়োজন আছে। শিক্ষকদের পড়াশোনা নিয়ে লেগে থাকতে হয়। সে জন্য শিক্ষকদের যেমন নির্দিষ্ট হারে বেতন দেওয়া প্রয়োজন, তেমনি তাদের বেতনের সঙ্গে অন্যান্য পেশার বেতনের তুলনা করা ঠিক নয়। শিক্ষকেরা যেন প্রাপ্ত বেতন দিয়ে মানসম্পন্ন ও শোভন জীবনযাপন করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে তাঁরা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পুরোপুরি সক্রিয় হতে পারবেন না, এটাই স্বভাবিক।

উপসংহার

শ্বেতপত্র কমিটি মনে করছে, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল নজর থাকা উচিত শিক্ষার মানোন্নয়নে; এবং তার লক্ষ্য হবে, মানব পুঁজির উন্নয়ন। বৈশ্বিক নাগরিক হওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে হবে, যারা একইসঙ্গে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ভূমিকা রাখতে পারবে। ভবিষ্যতে আমাদের এলডিসি উত্তরণ হতে যাচ্ছে; এই বাস্তবতায় শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি জরুরি। নীতি প্রণেতাদের উচিত হবে, মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণে অগ্রাধিকার দেওয়া, এবং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে বস্তুনিষ্ঠভাবে উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা অগ্রাধিকার পাবেন।

এছাড়া এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অন্যতম অভীষ্ট ‘কেউ যেন পেছনে পড়ে না থাকে’— এখানেও কিন্তু শিক্ষা খাতে সমতার ঘাটতি আমলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সে জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমতামুখী ও রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতহীন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।

অধ্যায় ১৪.গ: উন্নয়নে প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী মানুষদের অন্তর্ভুক্তি: শুরুটা যেভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল

১৪.গ.১ সূচনা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের কাউকে পেছনে রাখা যাবে না- প্রতিবন্ধী মানুষকে উন্নয়নের অংশীদার করা টেকসই উন্নয়নের অন্যতম অনুষঙ্গ। বাংলাদেশ ২০০৭ সালে কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব পারসন্স উইথ ডিসঅ্যাবিলিটিসে ২০০৭ সালে অনুস্বাক্ষর করে। এরপর ২০২৩ সালে দেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সুরক্ষা ও অধিকার বিষয়ক আইন পাস হয়। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এই বিষয়ে বদান্যতাকেন্দ্রিক মনোভাব থেকে বেরিয়ে এসে অধিকার বিষয়ক মনোভাব গ্রহণ করে। এই আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ২১টি অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটির জন্য কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কাজ করা যায়। এটা নিঃসন্দেহে উন্নতি, কিন্তু তারপরও প্রতিবন্ধীদের ব্যক্তিদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে; তাঁরা বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছেন। প্রয়োজনীয় সেবা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে, যেমন সম্পদের অভাব, অকার্যকর নীতি, দুর্নীতি ও সমন্বিত জীবনচক্রভিত্তিক মনোভাবের অভাব। সাবেক সরকার উন্নয়নে এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছিল বলে দাবি করে, বিশেষ করে অটিজমের ক্ষেত্রে। যদিও এসব দাবির যথার্থতা নিয়ে আরও তদন্ত হওয়া উচিত। শ্বেতপত্রে এসব উদ্যোগের কার্যকারিতা খতিয়ে দেখা হবে।

১৪.গ.২ প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত করা: অগ্রগতি কম ও বাস্তবায়নে ফারাক

ন্যাশনাল সার্ভে অন পারসোন উইথ ডিজ্যাবিলিটি (এনএসপিএসডি) ২০২১ সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০১৩ সালের আইন অনুসারে বাংলাদেশে প্রায় ৪.৮ মিলিয়ন বা ৪৮ লাখ প্রতিবন্ধী মানুষ আছেন। তবে ওয়াশিংটন গ্রুপ ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে পরিমাপ করলে এই সংখ্যা বেড়ে ১২ মিলিয়ন বা ১ কোটি ২০ লাখের বেশি হয়। সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার প্রযুক্তিগত দিকগুলি চূড়ান্ত করতে ২০১২ সালে পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়। ২০১৩ সালে জাতীয়ভাবে চিকিৎসক ও সিভিল সার্জন কার্যালয়গুলো যুক্ত করে এই চিহ্নিতকরণ কর্মসূচি শুরু হয়। ২০১৫ সালে সরকারি তথ্য ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার একটি কার্যকর ব্যবস্থা তৈরি করা হয়।

এই চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিবন্ধী ভাতা এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের মতো বিভিন্ন পরিষেবা লাভের অধিকার পান। সমস্যা হলো, চিকিৎসকদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতার বৈচিত্র্য বোঝার ক্ষেত্রে সীমিত ধারণা এবং সর্বজনীন সংজ্ঞা প্রয়োগে অসুবিধা এই কর্মসূচির সাফল্য অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ ডিজ্যাবিলিটি ডিটেকশন সার্ভে (ডিএসএস) সমীক্ষায় দেখা যায়, মাত্র ৩৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিবন্ধিত। এই পরিসংখ্যান ২০১৩ সালের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে উল্লিখিত অধিকারভিত্তিক প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তির অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অত্যন্ত অপ্রতুল।

১৪.গ.৩ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন: যে সুযোগ হারিয়ে গেছে

১৯৯৯ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বাধীন সংস্থা গঠন করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন। প্রতিবন্ধীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও সামাজিক সংহতি নীতি প্রচার করা— এসব লক্ষ্য নিয়েও তারা কাজ করেছে। প্রতিবন্ধী নাগরিকদের ক্ষমতায়নে কাজ করা এনজিওগুলো, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলোকে সহায়তা করা এর উদ্দেশ্য। তবে সংস্থাটি মূল লক্ষ্য ও দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলো, যারা ১৯৯৯ সালে জয়েন্ট প্রোগ্রাম ফর ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেসিবিলিটি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল, তারা প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। জেইউপিএফ সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক ও ক্রয়-সংক্রান্ত যন্ত্র বা হাতিয়ারে পরিণত হয়।

ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ: দুর্বল প্রশাসনিক শাসন ব্যবস্থা

জেইউপিএফের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ২৪ জন- ২১ জন সরকারি কর্মকর্তা, তিন জন এনজিও প্রতিনিধি ও মাত্র এক জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। কিন্তু সমস্যা হলো, সরকারি কর্মকর্তাদের ঘন ঘন বদলি করা হয়। তাঁদের পক্ষে বিষয়বস্তুর বোঝাপড়া ব্যাহত হয়, সেই সাথে ব্যাহত হয় সুশাসন। পরিচালনা পর্ষদ বেশিরভাগ সময় প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, কর্মসূচি নিয়ে নয়। এতে পর্ষদের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। পর্ষদের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে নতুন কর্মসূচি, উদ্যোগ বা প্রকল্প পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা।

সুবর্ণ ভবন: ধারণা ও বাস্তবতার মধ্যে বিশাল ফারাক

২০০৮ সালে বিশ্বব্যাংকের ২ কোটি ২০ লাখ ডলার ঋণ সহায়তা নিয়ে সুবর্ণভূমি প্রকল্প হাতে নেয় জেপিইউএফ। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল ২৫০ জন প্রতিবন্ধী, বিশেষ করে মানসিক প্রতিবন্ধীকে কর্মসংস্থান, সহায়ক উপকরণ ও উচ্চমানের পুনর্বাসন সহায়তা দেওয়া। ১৫ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণও করা হয়েছে জেপিইউএফ ক্যাম্পসে, কিন্তু এই ভবন যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। যেসব সেবা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এই ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল, সেই সেবা মিলছে না।

ক্রয়ে দুর্নীতি ও অপচয়

আরও দেখা গেছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা যন্ত্র ও উপকরণ ক্রয়ে দুর্নীতি ও অপচয় হয়েছে। কার কী প্রয়োজন তা নিরূপণ না করে গণহারে এসব যন্ত্র কেনা হয়েছে। এমনকি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা না করেই এসব কেনা হয়েছে। ফলে বেশি দামে অদরকারি যন্ত্র কেনা হয়েছে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে এই প্রকল্পের লক্ষ্য পূরণ হয়নি।

এক দরজায় সেবা: ভাল মডেলের দুর্বল বাস্তবায়ন

জেপিইউএফ সারাদেশে ১০৩টি কেন্দ্রে চালু করে যাতে প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের সেবা যেন হাতের কাছে পাওয়া যায়। যদিও প্রতিবন্ধীদের জন্য সেবাগুলো স্বাস্থ্যসেবার মূলধারায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল মূলধারার স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে এর যোগ নেই; সেই সঙ্গে তাদের নেই জবাবদিহি। যে সেবা তারা দেয়, তাও নিম্নমানের। জনগণের অর্থে এই প্রকল্প করা হলেও প্রতিবন্ধীদেরকে কার্যকরভাবে সেবা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

১৪.৭.৪ প্রবেশগম্যতার বাধার বিভিন্ন রূপ: উন্নতির বড় সুযোগ

চলাচলের সীমাবদ্ধতা: পদ্ধতিগতভাবে বিয়ুক্তি গভীরতর করা

আইনে বলা হয়েছে ভবন, পরিবহনসহ সবখানেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। অর্থাৎ সেগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব করে তৈরি করতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ সরকারি ভবনে র‍্যাম্প, লিফট ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব বাথরুম নেই। অক্ষদের জন্য ব্রেইল ও অডিও ব্যবস্থাও নেই। গণপরিবহনে ৫ শতাংশ আসন প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত আছে, কিন্তু হুইলচেয়ার ওঠানোর ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিবন্ধীরা তা ব্যবহার করতে পারেন না। মেট্রোরেল সেই ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যথাযথ গণপরিবহনের অভাবে সেখানে পৌঁছানো আরেক চ্যালেঞ্জ। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে প্রতিবন্ধীদের ব্যক্তিবান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বড় ধরনের ঘাটতি আছে।

আমাদের কথা শুনুন: সাংকেতিক ভাষা ও ব্রেইল ব্যবস্থার অনুমোদন

শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের মূল সমস্যা হলো যোগাযোগ। সাংকেতিক ভাষার ক্ষেত্রে আবার যে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য আছে, সে কারণে বিষয়টি আরও জটিল হয়। এনজিও এবং অধিকার বিষয়ক আন্দোলনকারীরা বাংলা সাংকেতিক

ভাষার প্রমিতকরণে কাজ করেছেন। ফলে ২০০৯ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি সাংকেতিক ভাষা জাতীয় স্বীকৃতি পায়। এরপর ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা সাংকেতিক ভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এছাড়া বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের আনুষ্ঠানিক ভাষা হিসেবে এর প্রচার-প্রচারণাও তেমন একটা হয় না। একইভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা ব্রেইল ব্যবস্থা ব্যবহার করলেও তা এখনো গেজেটভুক্ত হয়নি।

ন্যায়বিচার পাওয়ার পথে বাধা

বাংলাদেশের আদালত প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়। ২০১৩ সালের আইনের ১৩ নম্বর তফশিলে বলা হয়েছে, সহিংসতার শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে— পুলিশ, আদালত ও কারাগার কর্তৃপক্ষ সবার জন্যই এই নির্দেশনা। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আসামি হলে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সে বিষয়ে আইন ও তফশিলে কিছু বলা নেই।

এছাড়া শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাক্ষ্য কীভাবে ধারণ করা হবে, সে বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশনা নেই। বিচারিক প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যাকারীর ভূমিকাও উপেক্ষা করা হয়েছে। আরও বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনে নারী ও মেয়ে শিশু প্রতিবন্ধীদের সব ধরনের নির্যাতন থেকে রক্ষায় কোনো বিধান নেই।

শিক্ষা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে। আইনে সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভর্তি না নেওয়ার ক্ষমতা বিদ্যালয়গুলোকে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা শিক্ষাক্রম নেই। এছাড়া মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবিধিত হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি। ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক ও লেখার সরঞ্জামের ঘাটতিও আছে। ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ছে।

দক্ষতা অর্জন ও কাজের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ছে

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজের আইনি বিধান থাকিলেও বৈষম্যপূর্ণ আইনের কারণে তাদের সরকারি চাকরি লাভের সুযোগ সীমিত। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রুলস (২০১৪) ও জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর্ডার্সের (২০০৭) কারণে তাদের চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা সীমিত হয়ে যায়। বেসরকারি খাতে প্রতিবন্ধীদের কোটা নেই বা সেখানে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য মোকাবিলায় বিধান নেই।

২০২০ সালে ২৮৫ জন শারীরিক ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রাথমিকভাবে সরকার তাঁদের নিয়োগ দিতে চায়নি। শেষমেষ, ২০২৪ সালে তারা মামলায় জিতে নিয়োগ পান। দেশে এক লাখের বেশি শিক্ষিত প্রতিবন্ধী মানুষ বেকার। এছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় সমাজ কল্যাণ কাউন্সিলের তহবিল রাজনৈতিক বিবেচনায় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ আছে।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়েও সমাজে ভুল ধারণা আছে। সে কারণে প্রতিবন্ধীদের এসব সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আছে। স্বাস্থ্যকর্মীদেরও অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের অভাব আছে। এই বিষয়টি প্রতিবন্ধীদের যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

নির্বাচন ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

দেশের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের অনেক সময় ভোটের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য আবার যথাযথ ব্যালট পেপারের অভাব আছে। নির্বাচিত পর্যবেক্ষণ প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত আসন নেই। এছাড়া মূলধারার কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষায়িত কোনো কর্মসূচি নেই।

বাস্তবায়ন সক্ষমতা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজ সেবা অধিদপ্তর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি দেখভাল করে। কিন্তু এসব কর্মসূচি যথাযথভাবে মূলধারায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাদের যেমন সক্ষমতা নেই, তেমনি নেই ক্ষমতা। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনি সহায়তা ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ফারাক থেকে যায়।

১৪.গ.৫ সামাজিক সুরক্ষা

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে নিম্ন আয়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা দেওয়া শুরু হয়। এই কর্মসূচি ২০১৫ সালে সর্বজনীন রূপ লাভ করে। ২০১৫-১৬ সালে এই ভাতা গ্রহীতার সংখ্যা ছিল ছয় লাখ, ২০২১-২২ সালে যা ২০ লাখে উন্নীত হয়। এর মধ্য দিয়ে দেশের ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই ভাতার আওতায় চলে আসে।

কিন্তু শ্বেতপত্র কমিটি জানতে পেরেছে, প্রতিবন্ধী ভাতাগ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা আছে। সচেতনতা ও সুযোগের অভাবে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই ভাতা পাচ্ছে না। সেই সঙ্গে আছে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সেবাদানকারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় তাদের বিবেচনা করা হয় না।

সুবিধা দেওয়ার নীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বৃহত্তর আন্দোলন

বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধীদের মধ্যে অটিস্টিকদের অগ্রাধিকার দিয়েছে। সাবেক সরকার নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট ও ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডার গঠন করেছিল। প্রতিবন্ধীদের সেবা দিতেই এসব তৈরি করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দুর্নীতি ও আর্থিক প্রতারণের অভিযোগ আছে এসব একাডেমির বিরুদ্ধে। ফলে এর কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে।

প্রতি বছরের ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম দিবস পালনে সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। এতে যেমন: সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি অটিস্টিক ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এতে অন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির গুরুত্ব কম পেয়েছেন। এমনকি অটিস্টদের গুরুত্ব দিতে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস এপ্রিলের বদলে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ৩ ডিসেম্বরে পালন করা শুরু হয়। মূলত অটিস্টদের গুরুত্ব দিতেই এটা করা হয়। এতে দিবসের গুরুত্ব কমে গেছে বলে মনে করে শ্বেতপত্র কমিটি। ফলে, অন্য প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বাদ পড়ে যাওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

শ্বেতপত্র কমিটি মনে করছে, সাবেক সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বদান্যতাভিত্তিক কর্মসূচি যতটা না পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে বেশি করা হয়েছে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে— অধিকারভিত্তিক সমাধানের পথে না গিয়ে এসব কর্মসূচি অগ্রগতির এক ধরনের মিথ্যা আখ্যান তৈরি করেছে। এসব কারণে এই খাতে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আসছে না।

উপসংহার

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের অধিকার আন্দোলন বেশ শক্তিশালী। তাই সেই ২০১৩ সালে প্রতেবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণীত হয়; ইউএনসিআরপিডিও বেশ আগে গৃহীত হয়েছে। ১৯৯৯ সালে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাধীন সংগঠন গড়ে ওঠাও তার একটি প্রমাণ।

তবে সাম্প্রতিক কয়েক বছরে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ক্রয়ের ক্ষেত্রে পক্ষপাত ও সুবিধাবাদের কারণে বেশকিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। সাবেক সরকারের আমলে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিবন্ধীদের অধিকার স্বীকৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশ বৈশ্বিক স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টা করলেও এই মনোভাবের কারণে বৃহত্তর আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জীবনেও অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আসেনি।

অধ্যায় ১৫: কথামালা ও বাস্তবতার ফারাক: জেন্ডার ইস্যু*

- বাংলাদেশে নারী অগ্রগতি নিয়ে সরকারি বয়ানে অনেক সাফল্যের কথা বলা হলেও বাস্তবে পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো, সহিংসতা, বাল্যবিবাহ ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এখনো নারীর অগ্রযাত্রার বড় বাধা হয়ে আছে
- ২০২৪ সালের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্সে সামাজিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৯তম হলেও, শিক্ষা ক্ষেত্রে অবস্থান ১২২তম এবং অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে ১৩৯তম
- বাংলাদেশে ৭২% বিবাহিত নারী জীবনে অন্তত একবার সহিংসতার শিকার হয়েছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে আইনি সহায়তা নিয়েছেন মাত্র ২%, যা বিচারব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রতি বিশ্বাসের ঘাটতি প্রমাণ করে
- বাল্যবিবাহ এখনো গুরুতর উদ্বেগের বিষয়— ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে ৬৩% মেয়ের। আইন থাকা সত্ত্বেও কার্যকর প্রয়োগের ঘাটতি এ সংকট তৈরি করছে
- শহরে উচ্চশিক্ষিত নারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ভয়ের কারণ। ৪০.১% নারী উচ্চশিক্ষিত হয়েও বেকার। এটা শিক্ষায় অগ্রগতিকে চাকরিতে রূপ দিতে ব্যর্থতার প্রমাণ
- নারীর প্রকৃত সমতা নিশ্চিত করতে শুধু আইন বা বাজেটে প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট নয়— বরং প্রয়োজন সহিংসতা প্রতিরোধে কঠোর জবাবদিহিতার প্রতিষ্ঠা। সেই সাথে সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে দায়মুক্তির সংস্কৃতি দূর করে কাঠামোগত সংস্কার এবং বাজেটের বাস্তবায়ন জরুরি

১৫.১ সূচনা

বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ‘প্রুপদী পিতৃতান্ত্রিক’, যেখানে নারীর সম্মানের সঙ্গে পরিবারের সম্মান জড়িত, এবং নারী-পুরুষের ভেদাভেদ বেশ কঠোর। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে অগ্রগতি সত্ত্বেও নারীর প্রতি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, পাচার ও শ্রমবাজারে বৈষম্যের মতো চ্যালেঞ্জ এখনো আছে।

এই অধ্যায়ে সরকারের বয়ানে নারী বিষয়ক ইতিবাচক অর্জন দেখানোর পাশাপাশি যে নেতিবাচক বিষয়গুলো না দেখানোর প্রবণতা আছে, সেই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। শ্রমবাজার থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক খাতে নারীরা যেভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, সেই বিষয়টি এখানে তুলে ধরা হবে। নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টিও পৃথকভাবে আসবে। নারীর মানবাধিকার রক্ষায় আইনি সুরক্ষা ও জেন্ডার বাজেটও পৃথকভাবে এসেছে। সেই সঙ্গে সুপারিশও দেওয়া হয়েছে।

১৫.২ অগ্রগতির ফাঁপানো চিত্র: তথ্য-উপাত্তে পক্ষপাত

লৈঙ্গিক সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা কী, তা নিরূপণে বৈশ্বিক মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নারীর অগ্রগতি চিত্রণে যে নেতিবাচক বিষয়গুলো বাদ দিয়ে ইতিবাচক বিষয়গুলো দেখানো হয়, তাও তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে সরকারের বহুল ব্যবহৃত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্সের (জিজিআই) সমালোচনা এখানে করা হয়েছে।

২০২৪ সালে এই জিজিআই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৫৯তম। মূলত সংসদ ও মন্ত্রণালয়ে নারীর উপস্থিতির কারণে এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উজ্জ্বল। কিন্তু রাজনীতিতে সামন্তীয় ও পারিবারিক অভিজাততন্ত্রের কারণে বাস্তবতা ঠিক এরকম নয় বলে মনে করে শ্বেতপত্র কমিটি। এর বিপরীতে শিক্ষাগত

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোম্মী, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

যোগ্যতা অর্জনে বাংলাদেশ খারাপ করেছে (১২২তম), অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে আরও খারাপ (১৩৯তম); স্বাস্থ্য ও জীবৎকালের অবস্থা এর মাঝামাঝি (১২৬তম)। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঘাটতি আছে।

১৫.৩ শ্রমবাজারের করুণ অবস্থা

জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের হার বাড়ছে। তবে শহরাঞ্চলের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ হ্রাস পাওয়া উদ্বেগজনক। এই প্রবণতার পেছনে তৈরি পোশাক খাতে কর্মসংস্থান হ্রাস এবং অতিমারী পরবর্তী সময়ে এই খাতের কর্মীদের চাকরি হারানোর বিষয়টি দায়ী করা যেতে পারে। এছাড়া শহরাঞ্চলে গৃহস্থালি কাজের বিকল্প হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক সেবার অভাবও শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করছে।

কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে: স্বেচ্ছায় না অনিচ্ছায়?

বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে; এই প্রবণতা বৈশ্বিক গড় হার ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমানে নারীর কর্মসংস্থানের ৭৪ দশমিক ১ শতাংশ হচ্ছে কৃষি খাতে; এর সঙ্গে নিম্ন-দক্ষতার সম্পর্ক আছে, পরিণামে এই খাতে কাজ করা নারীদের আয়ও কম।

শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণে না থাকা নারীর সংখ্যা এখনো অনেক বেশি

১৫-২৪ বছর বয়সী নারীদের পুরুষদের তুলনায় শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে (এনইইটি) না থাকার হার উল্লেখযোগ্যহারে বেশি। যদিও ২০১৬ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে এই বয়সী নারীদের মধ্যে এই হার ৬০.৭ শতাংশ থেকে কমে ৫২.৮৭ শতাংশ হয়েছে (খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০২২), তা সত্ত্বেও এই হার পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি (২০২২ সালে ১২ দশমিক ২৮ শতাংশ)। ১৫-২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ৬৫.৫ শতাংশ নারী এবং ৩৪.৫ শতাংশ পুরুষ। নারীদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি থাকার পেছনে সামাজিক প্রত্যাশা এবং নারীর প্রথাগত সামাজিক ভূমিকা বড় কারণ। যে কারণে পরিবারের সদস্যদের যত্নাভি ও গৃহস্থালি দায়িত্ব পালনের বোঝা মূলত নারীদের ওপরই বর্তায়। এছাড়া শিক্ষা লাভ ও দক্ষতা লাভের অসম সুযোগ, আয়ের বৈষম্য ও পরিবার গঠনে অগ্রাধিকার দেওয়ার সামাজিক চাপের কারণেও এই ব্যবধান বাড়ছে।

জনসংখ্যাগত সুবিধা: নারী ও শিশুদের নয়

নারীদের মধ্যে যারা কাজে আছেন, তাদের মধ্যে ৫০ দশমিক ২৮ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছর। এদের মধ্যে বড় একটি অংশ কৃষি কাজে আছে। পুরুষদের বেলায় যতটা জনসংখ্যাগত সুবিধা নেওয়া গেছে, নারীদের বেলায় ততটা নেওয়া যায়নি।

শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেশি। অর্থাৎ, কর্মসংস্থান হচ্ছে মূলত অনানুষ্ঠানিক খাতে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, উচ্চশিক্ষিত নারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, যেখানে বেকার নারীদের ১৮.৮৮ শতাংশই উচ্চশিক্ষিত। শহরাঞ্চলে উচ্চশিক্ষিত নারীদের মধ্যে ৪০.১% বেকার, গ্রামাঞ্চলে এই হার ২৮.৯%।

অরক্ষিত কর্মসংস্থান

নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার বাড়লেও কর্মসংস্থানের প্রকৃতি উদ্বেগজনক। কারণ অধিকাংশ নারী (২০২২ সালে ৮০.৮%) “অরক্ষিত কর্মসংস্থানে” নিয়োজিত; এই খাতের উৎপাদনশীলতা যেমন কম, তেমনি তাদের আয়ও কম। মাত্র ৩ শতাংশ নারী এমন চাকরিতে নিয়োজিত যেখানে পেনশন বা অবসর তহবিলের সুবিধা আছে। মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারগুলো মেয়েদের শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে দ্বিধা না করলেও সবচেয়ে ধনী পরিবারের ৩৩.৪ শতাংশ মেয়ে এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রায় ৫০ শতাংশ মেয়ে ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ের

পিঁড়িতে বসছে। অতিমারী পরবর্তী সময়ে তৈরি পোশাক খাত ও অন্যান্য খাতে চাকরি হারানোর কারণে অনেক নারী গ্রামে ফিরে গেছেন বলে ধারণা করা যায়।

শহরাঞ্চলে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের হার হ্রাস এবং উচ্চশিক্ষিত নারীদের মধ্যে বেকারত্বের উচ্চ হারের সঙ্গে সম্ভবত সড়কে চলাচলের ঝুঁকি, নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা, অপরিপূর্ণ গণপরিবহন, শিশু ও বয়স্কদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক যত্নের ব্যবস্থার অভাব, জনসমক্ষে ও কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা আর সর্বোপরি বিচার পাওয়ার অনিশ্চয়তা থেকে সৃষ্ট। ‘আদর্শ নারী’ হওয়ার সামাজিক রীতিনীতি নারীকে বাড়ির বাইরের চাকরি ছেড়ে দিতে বা বাইরে চাকরি না নিতে বাধ্য করে। যদিও অনেকেই একে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বলে চালিয়ে দেয়, অর্থাৎ চাকরি করার চেয়ে ঘরকন্যাকেই তারা অগ্রাধিকার দেন।

শ্বেতপত্র কমিটি বলছে, বাংলাদেশে, গৃহস্থালি/পারিবারিক কাজই নারীদের চাকরি না খোঁজার প্রধান কারণ (৬৪.৫%)। শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবার নারীদের জন্য ‘হাউসওয়াইফ প্লাস’ নামে একটি মডেল নিয়ে এসেছে। এই মডেলের অনুসারীরা বিশ্বাস করে, শিক্ষা নারীদের ‘ভালো স্ত্রী’ ও ‘ভালো মা’ হওয়ার যোগ্য করে তোলে। অনেক সময় সামাজিক রীতিনীতি কীভাবে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত হয়, তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রথাগত ভূমিকা আরও স্থায়ী হয়ে ওঠে; নারীদের তখন আর তেমন কিছু করার থাকে না। কিন্তু বিষয়টি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের মোড়কে চালিয়ে দেওয়া হয়।

তৈরি পোশাক খাতের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে লৈঙ্গিক বৈষম্য

তৈরি পোশাক শিল্পের উত্থান বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। পরিবারের বাইরে নারীদের জন্য উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে এই খাতে। তবে এই শিল্পটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক বাজারে টিকে থাকতে এবং মুনাফা বাড়াতে স্বল্পমজুরির নারী শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর এই খাতে বড় ধরনের পুনর্গঠন হয়েছে।

বাস্তবতা হচ্ছে, এই খাত এখন আরও বেশি মূলধনঘন হয়ে উঠেছে। নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তনের ফলে নারী শ্রমিকদের চাকরি হারানোর ঝুঁকি পুরুষদের তুলনায় বেশি বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উৎপাদনশীল শিল্প জরিপ (এসএমআই) অনুযায়ী, ২০১২ সালে তৈরি পোশাক খাতে প্রতি একজন পুরুষের বিপরীতে ১ দশমিক ৮১ জন নারী কর্মী ছিলেন; কিন্তু ২০২২ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১ দশমিক ৪৪। এই চিত্র থেকে বোঝা যায়, তৈরি পোশাক খাতের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে নারীদের চ্যালেঞ্জগুলো কী?

নারীদের ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসন: বঞ্চনার গল্প

জানা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো, বিশেষত সৌদি আরব, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও লেবানন বাংলাদেশের নারী শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য। তারা সাধারণত স্বল্প মজুরির বিনিময়ে নিম্ন দক্ষতার কাজে জড়িয়ে পড়েন। ইউএন উইমেনের গবেষণায় দেখা গেছে, নারী অভিবাসীরা শুধু প্রবাসী আয়ের মাধ্যমেই নয়, বরং তাঁদের ধারণা, দক্ষতা, জ্ঞান, মনোভাব, যোগাযোগ ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সামাজিক মূলধন তৈরি করছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার, লৈঙ্গিক সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখছেন তাঁরা।

ব্র্যাকের গবেষণায় দেখা গেছে, অতিমারী চলাকালীন বা ঠিক তার পরেই প্রায় পাঁচ লাখ আন্তর্জাতিক অভিবাসী শ্রমিক বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন, যার মধ্যে ৫০ হাজারই নারী। প্রত্যাবর্তনকারী নারী শ্রমিকদের মধ্যে প্রতি তিনজনের একজন আগের চেয়েও বেশি অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছেন। এই প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে ৫২ শতাংশ নারীকে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে; ৭ শতাংশ যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন ও ৩৮ শতাংশ শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

১৫.৪ শিক্ষায় বৈষম্য: চরম বাস্তবতাও উপেক্ষিত থেকে যায়

বাংলাদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিতে লিঙ্গ সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে। মেয়েদের শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ, যেমন ফিমেল স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম (এফএসপি) এই অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে মেয়েদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এতে যেমন ভর্তি ও শিক্ষা সমাপ্তির হার বেড়েছে, তেমনি মেয়েদের বাল্যবিবাহ ও গর্ভধারণ বিলম্বিত করেছে। এছাড়া এফএসপি বা উপবৃত্তির ইতিবাচক প্রভাব পরিবারেও পড়েছে। এর কারণে ওই মেয়েদের ছোট ভাইবোনদের শিক্ষাকাল বেড়েছে।

উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (স্টেম) শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ এখনো অনেক কম। মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের ভর্তির হার ৭৭.৩৪ শতাংশ হলেও উচ্চশিক্ষায় তা কমে দাঁড়ায় ২০ দশমিক ৮৪ শতাংশ; এবং স্টেম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নারী স্নাতকের হার মাত্র ২০.৬ শতাংশ। এ ছাড়া শিক্ষা সমাপ্তির নিম্ন হার, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, নারী শিক্ষা ও শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ ও শিক্ষার বাজার প্রাসঙ্গিকতার অভাবসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এখনো আছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লৈঙ্গিক সমতা অর্জন সত্ত্বেও এই অগ্রগতিকে যে তারা ভবিষ্যৎ জীবন ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনে রূপান্তর করতে পারবেই, তেমনটা নয়। বাংলাদেশ সরকার মেয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও বিদ্যালয়ে ধরে রাখার ঐতিহাসিক প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবিলা করেছে। তবে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ বা তাদের শিক্ষার বিষয়ে পিতামাতার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে—এমন জটিল আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক বিষয়গুলো জাতীয় নীতিমালায় পুরোপুরি আমলে নেওয়া হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, বাল্যবিবাহ সামাজিক সমস্যা হিসাবে দেখা হয়, কিন্তু সীমিত আয়ের পরিবারগুলো যে মেয়েদের আগেভাগে বিয়ে দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে নির্ভর থাকতে চায়, এই বিষয়টি বিবেচনা করা হয় না। মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে নির্ভর থাকা— এই হচ্ছে লেনদেন। একইভাবে, দারিদ্র্য এখনো মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রবেশের পথে প্রধান বাধা, তা সত্ত্বেও কিছু দরিদ্র পরিবার কেন এখনো সন্তানদের স্কুলে পাঠায় অথবা আর্থিক সহায়তা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের ঝরে পড়া রোধ করা যায় না— এই বিষয়গুলো ধর্তব্যের বাইরে থেকে যায়।

অতিমারীর কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল; ওই সময় শিক্ষায় লৈঙ্গিক ব্যবধান আরও বেড়েছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শ্বেতপত্র কমিটি। শিক্ষা, তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, মেয়েদের উচ্চবিদ্যালয় পাস করে বের হওয়ার হার কমেছে; বেড়েছে ঝরে পড়ার হার— এই পরিসংখ্যান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির পূর্বাভাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বোঝা যাচ্ছে, বাংলাদেশে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও সূক্ষ্ম ও বৃহৎ পরিসরের নীতি প্রণয়ন করা দরকার।

১৫.৫ স্বাস্থ্যে বৈষম্য: শারীরিক ও মানসিক

বাংলাদেশে ১৫-১৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে যারা সন্তান ধারণ শুরু করেছে (যাদের একটি জীবিত সন্তান হয়েছে বা প্রথম সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে এবং যাদের শুধুমাত্র গর্ভপাত হয়েছে তাদের বাদ দিয়ে) ২০১১ সালে তাদের অনুপাত ছিল ৩০ শতাংশ; ২০১৭-১৮ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৮ শতাংশ এবং ২০২২ সালে ২৪ শতাংশ। তবুও প্রতি চারজনের মধ্যে একজন (২৪%) ১৫-১৯ বছর বয়সী নারী কখনো না কখনো গর্ভবতী হয়েছে, এবং প্রায় পাঁচজনের মধ্যে একজন (১৮%) জীবিত সন্তান জন্ম দিয়েছে (BDHS, ২০২২)। বাংলাদেশ মাতৃস্বাস্থ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে (মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে প্রতি ১ লাখ জীবিত জন্মে ১২৩ এ নিয়ে এসেছে)। অর্থনৈতিকভাবে নিচের শ্রেণির ৪৭ শতাংশ নারী প্রসবের সময় প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য পেশাদারের সহায়তা পাচ্ছে, ২০১১ সালে যা মাত্র ১০ শতাংশ ছিল। ২০১১ সালে ওপরের শ্রেণির নারীদের মধ্যে প্রসবের সময় স্বাস্থ্য পেশাদারের সহায়তা পেত ৬১ শতাংশ; ২০২২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৮৭ শতাংশ। মাতৃমৃত্যু হ্রাসে এমন উন্নতি

সত্ত্বেও বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশের তুলনায় পিছিয়ে এবং অনেক দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশের (যেমন, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়া) তুলনায় অনেক পিছিয়ে।

সম্পদের দিক থেকে সবার নিচের শ্রেণির প্রতি চারজনে একজন গর্ভবতী নারী প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য পেশাদারের কাছ থেকে প্রসবপূর্ব যত্ন পায় না (BDHS, 2022)। মেয়েদের পুষ্টিমান দুর্বল, বিশেষ করে কিশোরী মেয়েদের; এর মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য ও অপুষ্টির চক্র প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়।

১৫.৬ নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি: এখনো দূর অন্ত

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে লৈঙ্গিক ব্যবধান কমাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে; মানুষ লেনদেনের জন্য ব্যাংক, মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) ও মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) ব্যবহার করছে। দেখা যায়, ব্যাংকের জমা হিসাবের ৩৭.৫ শতাংশ এবং এমএফআই জমা হিসাবের ৩৩.৯ শতাংশ নারীদের। এমএফআইগুলোর ক্ষুদ্রঋণের মূল গ্রাহক নারীরা। এমএফএসের জমা হিসাবের ৪১.৭ শতাংশ নারীদের। যদিও তাদের ব্যবহার মূলত রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়, বিল পরিশোধ ও সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা প্রাপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বিশ্বব্যাংকের ফিনডেক্স ডেটাবেস অনুযায়ী, ২০১৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নারী-পুরুষের ব্যবধান ১০ শতাংশ কমেছে; মূলত ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানে নারীর হিসাব (৯০% এর বেশি) বৃদ্ধির কারণে তা হয়েছে। আরও দেখা গেছে, ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যবধান জমা হিসাবের তুলনায় বেশি। সবচেয়ে বেশি জমা হিসাব এমএফএসে-২২৪ মিলিয়ন বা ২২ কোটি ৪০ লাখ; এরপরেই রয়েছে ব্যাংকগুলো-১৪২.৩ মিলিয়ন বা ১৪ কোটি ২৩ লাখ।

৫৬টি জেলার ৩ হাজার ৩০০ পরিবারের ৭ হাজার ৫০০ ব্যক্তির ওপর নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে গবেষণা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নারী-পুরুষের ব্যবধান কমে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৯৬ শতাংশ; ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে এই ব্যবধান নেমে এসেছে ১৭ দশমিক ২৮ শতাংশে (৪৮ শতাংশ হিসাব পুরুষদের এবং ৩০.৪৭ শতাংশ হিসাব নারীদের)। অন্যদিকে মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবা প্রদানকারী (এমএফএস) প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসাবের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যবধান ৩৫ শতাংশ রয়ে গেছে। মাইক্রোফাইন্যান্স বা ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোতে (এমএফআই) নারী-পুরুষের ব্যবধান নারীদের অনুকূলে।

নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে পিছিয়ে থাকার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে আছে বিভিন্ন সামাজিক নিয়ম— যে কারণে নারীদের চলাফেরায় অসুবিধা তৈরি হয়। সেই সঙ্গে আছে, জামানত দেওয়ার মতো সম্পদের অভাব, সচেতনতা, আর্থিক সাক্ষরতার অভাব ও ডিজিটাল বিভাজন। প্রায়ই দেখা যায়, নারীরা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের (স্বামী/পিতা) মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করেন। কারণ পরিবারে মোবাইল ফোন সাধারণত পুরুষদের কাছেই থাকে। নারীরা আর্থিক সেবার নিষ্ক্রিয় গ্রাহকে পরিণত হন। স্ত্রী বা মায়ের মজুরি বা ঋণ স্বামী বা পিতা ব্যবহার করেন, এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি।

১৫.৭ বাল্য বিবাহ: মেয়েদের বাল্য বিবাহ ঠেকাতে অগ্রতুল ব্যবস্থা

বাংলাদেশে বাল্য বিবাহের হার বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ, যদিও ১৮ বছরের আগে বিবাহিত ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের সংখ্যা হ্রাসে অগ্রগতি হয়েছে (২০১১ সালে ৬৫% থেকে ২০২২ সালে ৫০%)। ২০২২ সালে ১৮ বছরের কম বয়সী ৬৩ শতাংশেরও বেশি মেয়ের বিয়ে হয়েছে; ২০২১ সালের তুলনায় যা ১০ শতাংশ বেড়েছে। ২০২৩ সালে ১৬ বছরের আগে ২৭ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়েছে এবং ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে হয়েছে ৮.২ শতাংশ। ২০২২ সালে যা ছিল ৬.৫ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে শহরাঞ্চলের তুলনায় বাল্যবিবাহের হার বেশি।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এর বিভিন্ন ধারা নিয়ে বিতর্ক আছে। এই আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৬ বছর পর্যন্ত শিথিল করা হয়, সচেতন নাগরিক সমাজ ও জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব কফি আনানের মতো আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের বিরোধিতা সত্ত্বেও তা করা হয়। এই আইনের পক্ষে সরকারের যুক্তি ছিল, গ্রামাঞ্চলে কিশোরীরা অন্তসত্ত্বা হয়ে পড়লে সামাজিক চাপের মুখোমুখি হতে হয়। সমালোচকদের যুক্তি; মেয়েদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হলে বাল্য বিবাহ রোধে তা আরও কার্যকর হবে, তাদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া, চাকরির সুযোগ হ্রাস ও পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধির সঙ্গে বাল্য বিবাহের যোগ আছে।

২০১৪ সালের লন্ডনে অনুষ্ঠিত গার্লস সমিটে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিবাহ বন্ধ করার অঙ্গীকার করেছিল। তবে ২০১৭ সালের আইনের প্রভাব নিরূপণে এখনো কাজ হয়নি।

১৫.৮ বাংলাদেশে লৈঙ্গিক সহিংসতা

১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণের ঘোষণা এবং ভিয়েনা ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনায় নারীর প্রতি সহিংসতাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এসব ঘোষণায় রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই সহিংসতা দূর করতে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। সেটা হলো, নারীরা দুর্ঘটনাবশত বা সহজাত দুর্বলতার কারণে সহিংসতার শিকার হয় না, বরং সমাজের গভীরে প্রোথিত কাঠামোগত বৈষম্যের কারণে নারীরা সহিংসতার শিকার হয়; এবং এই বৈষম্য দূর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। যদিও আইন ও নীতিমালায় অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার জিবিভিকে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে; এবং নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) ও বাল্যবিবাহ বন্ধ জাতীয় কর্মপরিকল্পনার (২০১৮-২০৩০) মতো পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে এখনো অনেক নারী ও মেয়ে শিশু সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, বৈষম্যের শেকড় কতটা গভীর। এই বৈষম্য দূর করতে এবং নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চলমান চ্যালেঞ্জগুলো কী, এর মধ্য দিয়ে তাও বোঝা যায়। কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরা যাক:

- বাংলাদেশের ৭২ শতাংশ বিবাহিত নারী জীবনে অন্তত একবার কোনো না কোনো ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন।
- মাত্র ২ শতাংশ নারী সঙ্গীর শারীরিক বা যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন।
- ২৫ শতাংশ নারী মনে করেন, যদি সে তার অনুমতি ছাড়া বাইরে যায়, সন্তানদের অবহেলা করে, স্বামীর সঙ্গে তর্ক করে, শারীরিক সম্পর্কে অস্বীকৃতি জানায় বা খাবার পুড়িয়ে ফেলে, তাহলে স্বামীর তাকে প্রহার করার অধিকার আছে।

সাইবারস্পেসের যুগে সহিংসতা নতুন রূপ নিয়েছে এবং নানা কারণে তা মোকাবিলা করা চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন প্রযুক্তিগত উন্নতি সহায়ক নীতি ও আইনের অভাব আর প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। বিভিন্ন আইনে বৈষম্যমূলক ধারা সংশোধন ও প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ লৈঙ্গিক সমতার প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছে, যদিও কিছু আইন ও নীতি এখনো নারীর প্রতি সমস্ত বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের সনদের (CEDAW) সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়াও কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন (২০২২) প্রণয়ন, পারিবারিক সহিংসতা আইন (২০১০)-এ ‘পারিবারিক সম্পর্কের সংজ্ঞা পুনর্ব্যাখ্যা ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা সংক্রান্ত আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করে শ্বেতপত্র কমিটি।

শ্বেতপত্র কমিটি আরও মনে করে, ধনী মহল, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদদের নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে দেশে দায়মুক্তির সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কখনো কখনো মনে হয়, আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অসহায়; এমনকি তারা

কখনো কখনো এই নেটওয়ার্কের অংশ হয়ে যায় বলে অভিযোগ আছে। বেশকিছু আলোচিত অপহরণ, হত্যা ও ধর্ষণ মামলায় ন্যায়বিচার পাওয়া যায়নি, যেসব কারণে এই অভিযোগ উঠেছে। যেমন ২০১৬ সালের মার্চ মাসে কুমিল্লা সেনানিবাসে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী ও নাট্যকর্মী তনু ধর্ষণ ও হত্যা; ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে মুনিয়া হত্যাকাণ্ড; ১৯৯৬ সালে কল্লনা চাকমা অপহরণ; সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের কূল কিনারা না হওয়া ইত্যাদি।

এসব আলোচিত ঘটনা থেকে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, যেমন সহিংসতার সংস্কৃতি, দুর্বল আইনের শাসন, নারী-পুরুষের অসমতা, ভুক্তভোগীকে দোষারোপের সংস্কৃতি, দায়মুক্তির সংস্কৃতি, আইনি ফাঁক, শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা ও ব্যক্তি থেকে সামাজিক পর্যায়ে বিদ্যমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক কুসংস্কার ও কলঙ্ক। এই চলমান সহিংসতা সমাজে তৈরি হওয়া আইনহীনতার সংস্কৃতির ফল। এছাড়াও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের জবাবদিহির অভাব এবং বিচার ব্যবস্থায় অনেক ফাঁকফোকর আছে।

শ্বেতপত্র কমিটি মনে করছে, আইনহীনতা ও জবাবদিহিতার অভাব বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান, শুধু লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) বা নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা (ভিএডব্লিউজি) নয়। শ্বেতপত্র কমিটি মনে করে, জিবিভি ও ভিএডব্লিউজির মূল কারণ হলো ক্ষমতার সামাজিক-অর্থনৈতিক অসমতা (রাজনৈতিক ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত), তাই যে দলই পরবর্তী সরকার গঠন করুক না কেন, তাদের কাছ থেকে এই সমস্যা সমাধানের তেমন আশা করা যায় না, যদি না নাগরিক সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকে।

১৫.৯ প্রতিষ্ঠান ও আইন: সুরক্ষার জন্য এগুলোই কি যথেষ্ট?

বাংলাদেশ সিইডিডব্লিউএ (নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ) এবং বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশনে স্বাক্ষরকারী দেশ, যদিও সরকার সিইডিডব্লিউএ-এর অনুচ্ছেদ ২ ও ১৬.১(সি)-এর বিষয়ে আপত্তি বজায় রেখেছে। সরকারের মতে, আপত্তির মূলকারণ হলো এগুলো ‘পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক শরিয়্যা আইনের সাথে সাংঘর্ষিক’। সে জন্য সিইডিডব্লিউএর নীতিমালা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সতর্ক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ‘রাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করবে না’ এবং ‘রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করবে’—এগুলোকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

যা হোক, বাংলাদেশ নারী-পুরুষের বৈষম্য কমাতে পেরেছে এবং গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স (২০২৩) অনুযায়ী রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সপ্তম স্থান অর্জন করেছে। কারণ গত ৩৪ বছর ধরে দেশের নির্বাহী প্রধান হিসেবে দুজন নারী পালাক্রমে দেশ শাসন করেছেন। বাংলাদেশের সংবিধান, আইনি পরিবেশ, নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৩-২০২৫) নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

কিন্তু কিছু সমস্যা এখনো রয়ে গেছে। সেটা হলো, সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন হলেও এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু আইন রদ হচ্ছে না। সেই সঙ্গে নারীর সমান অধিকার সর্বোচ্চ আইনে নিশ্চিত করা হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ও প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নারীদের অধিকার প্রয়োগ চ্যালেঞ্জিং বিষয়—এটাই বাস্তবতা। প্রতিবন্ধী নারী ও মেয়েরা অধিকার ও ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, কারণ সংশ্লিষ্ট আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে উল্লেখ নেই।

যদিও নিম্ন আদালত যৌন সহিংসতার মামলার বিচার ১৮০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে। বেশিভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় না। মধুপুরে একজন নারীর হত্যা ও ধর্ষণের মামলাটি ১৭২ দিনে নিষ্পত্তি করা হয়েছে—এটি এখন পর্যন্ত একমাত্র মামলা যার রায় এই সময়সীমার মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি বাস্তবতা হলো, নারী অধিকার কর্মী ও আইনজীবীদের এক দশকেরও বেশি সময়ের সংগ্রাম সত্ত্বেও যৌন হয়রানি সংক্রান্ত নির্যাতনগুলো এখনও আইনে রূপান্তরিত হয়নি। কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। যদিও অনেকক্ষেত্রে এগুলো অকার্যকর, আবার কখনো কখনো তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

নারী অধিকার গোষ্ঠী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনায় জানা গেছে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত নির্যাতন মানে না; এবং এ সংক্রান্ত অভিযোগের সংখ্যাও অনেক বেশি। এছাড়া ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নারী শাখার সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের হয়রানি করে থাকে— এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে।

১৫.১০ জেভার বাজেট

বাংলাদেশ ২০০৯ সাল থেকে জেভার সংবেদনশীল বাজেট (জিআরবি) করে আসছে, শুরুতে যা কেবল চারটি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সময়ের সাথে সাথে তা ৪৪টি মন্ত্রণালয় ও সরকারের ৬২টি বিভাগের সবকটিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। জিআরবিএর উদ্দেশ্য হলো, বাজেট প্রণয়নে জেভার সংবেদনশীলতার বিষয়টি মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা।

সাম্প্রতিক অতীতে দেখা গেছে, রিকারেন্ট ক্যাপিটাল, জেভার অ্যান্ড পভার্টি (আরসিজিপি) মডেল ব্যবহার করে বাজেটের জেভার বরাদ্দ কোথায় কত যাচ্ছে, তা নিরূপণ করা হতো। কিন্তু তা আইবাস প্লাস প্লাস সিস্টেমের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল না। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে জেভার অর্থায়ন নিরীক্ষণ করতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নতুন পদ্ধতি জেভার ফাইন্যান্স ট্র্যাকিং (জিএফটি) মডেল চালু করা হয়েছে, আইবাস প্লাস প্লাসের সঙ্গে যা সঙ্গতিপূর্ণ।

এই উদ্যোগটি পেশাদারদের প্রশংসা পেলেও তার কার্যকারিতা এখনো মূল্যায়ন করা হয়নি। ফলে জিআরবি প্রণয়ন এখনো জেভার-প্রাসঙ্গিক বরাদ্দের ধারণা-নির্ভর গুরুত্বের ওপর নির্ভরশীল।

লৈঙ্গিকভাবে বিভাজিত তথ্যের অভাবের কারণে বাজেট বরাদ্দে লৈঙ্গিক ভার নির্ধারণ ব্যক্তি নির্ভর হতে পারে। ফলে লিঙ্গ-সম্পর্কিত বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে নানা ধরনের ত্রুটি থেকে যায়। জেভার বাজেট বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য বিষয়টি নিয়মিত কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে, যেখানে টোকেনিজম (প্রতীকী পদক্ষেপ) প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। নারী অধিকার গোষ্ঠীগুলো প্রকৃত ব্যয়ের হ্রাস নির্ধারণে সোচ্চার হলেও অর্থ বিভাগ বা পরিকল্পনা কমিশনের আইএমইডির পক্ষ থেকে এই ঘাটতি পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে জেভার বাজেটের বরাদ্দ মোট জাতীয় বাজেটের ৩৪.১১ শতাংশ এবং জিডিপির ৪.৬ শতাংশ। সংখ্যাগত দিক থেকে নামেমাত্র বাড়লেও ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে জিডিপির শতকরা হিসাবে জেভার বাজেট ৫.১৯ শতাংশ থেকে কমে ৪.৮৬ শতাংশে নেমে আসে। সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত করার সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জেভার বাজেটের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল কর্তন সাধারণ ঘটনা। কিন্তু শ্বেতপত্র কমিটি মনে করে, উন্নয়ন বাজেটে নারীদের যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, সংশোধিত বাজেটে তা কমানো উচিত নয়। সেটা হলে জেভার-সম্পর্কিত উন্নয়ন বাজেটের সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ও প্রকৃত ব্যয় নিশ্চিত করা সম্ভব।

১৫.১১ লৈঙ্গিক পরিচয়ের বৈচিত্র্য ও বহিঃপ্রকাশ

২০১৩ সালের ১১ নভেম্বর বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অনুসরণে হিজড়াদের পৃথক লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আইন পাস করে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান যথাক্রমে হিজড়াদের ‘অন্যান্য’ ও ‘তৃতীয়’ লিঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১২ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিচয়পত্রে তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে দীর্ঘ

আইনি লড়াইয়ের পরে এই পরিচয়কে ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। নেপাল ও ভারত ইতিমধ্যে হিজড়াদের আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয়ই শরিয়া আইনের ভিত্তিতে নয়, বরং সার্বজনীন মানবাধিকারের নীতির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পদক্ষেপ বিচিত্র সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বীকৃতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৃহত্তর আঞ্চলিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে যে যে পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে তা হলো:

১. স্থায়ী কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ: মাতৃস্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি সত্ত্বেও শ্রম বাজারের বৈষম্য, উচ্চ বাল্য বিবাহের হার ও আর্থিক বিযুক্তি নারী-পুরুষের সমতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রবণতা থেকে বোঝা যায়, নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে প্রতীকী ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রকৃত পক্ষে কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন।
২. বৈশ্বিক সূচকে আংশিক চিত্র: নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান অনেক ওপরে, কিন্তু সে কারণে নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সূচকের দুর্বল অবস্থান আড়াল হয়ে যায়। এর মধ্য দিয়ে দেশের নারীদের অগ্রগতির অসম্পূর্ণ চিত্র উঠে আসে।
৩. নীতির অপরিপূর্ণ বাস্তবায়ন: জেল্ডার বাজেটিং এবং জেল্ডারভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলায় আইনসহ বিদ্যমান কাঠামোর দুর্বল প্রয়োগ, পদ্ধতিগত ও কারিগরি ত্রুটির কারণে প্রান্তিক মানুষের কাছে তা পৌঁছাতে পারে না। বিশেষত প্রত্যন্ত ও প্রান্তিক অঞ্চলে এসব অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না।
৪. সামাজিক নিয়ম ও অর্থনৈতিক প্রান্তিকীকরণ: বিদ্যমান সামাজিক রীতিনীতি, নারী-পুরুষের প্রথাগত ভূমিকা ও অপরিপূর্ণ অর্থনৈতিক সুযোগের কারণে নারী আরও প্রান্তিক অবস্থায় চলে যায়। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত ও কৃষি খাতে, এসব খাতে কাজ করতে তেমন একটা দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।
৫. সমন্বিত সমাধানের প্রয়োজন: নারী-পুরুষের বৈষম্য মোকাবিলায় সমন্বিত মনোভঙ্গি দরকার। এছাড়া জেল্ডার সংবেদনশীল বাজেট বাস্তবায়ন, শক্তিশালী আইনি সংস্কার ও কাঠামোগত দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছে শ্বেতপত্র কমিটি।

অধ্যায় ১৬ - কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজারের গতিপ্রকৃতি: বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি*

- ২০২২ সালে বাংলাদেশে শ্রমশক্তি সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু শ্রমবাজারে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ সীমিত রয়ে গেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ বা নতুন চাকরি সৃষ্টির গতি জনসংখ্যার চাপের সামনে টিকতে পারছে না
- নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বাড়লেও তারা মূলত কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক খাতে আটকে আছে
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন তরুণদের সংখ্যা বাড়লেও তাদের দক্ষতা বাস্তব কাজের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না— ফলে শিক্ষিত তরুণরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে না
- দক্ষ কর্মশক্তি গড়ে তুলতে যে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন, বাংলাদেশে তার ভিত্তি এখনো অত্যন্ত দুর্বল। পুরো শ্রমশক্তির মধ্যে টেকনিক্যাল ডিপ্লোমাদারীর সংখ্যা মাত্র ০.৬৯%, যদিও শিল্প ও প্রযুক্তি খাতে এধরনের দক্ষ জনবলের অনেক চাহিদা রয়েছে
- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মানদণ্ডের বিচারে শ্রমবাজারের তথ্য উপাত্তে বড় ফাঁক রয়েছে। প্রকৃত বেকার সংখ্যা কত, বা বছরে কত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, তার কোনো নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই
- এই অধ্যায়ে দেশের শ্রমবাজারের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষ করে শোভন কর্মসংস্থানের অভাব, কাজ পাওয়ার যোগ্যতা হ্রাস ও শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে কর্মীদের যোগ্যতার ফারাক নিয়ে। এই অধ্যায়ের মূল দৃষ্টি নারী ও তরুণদের ওপর। সরকারি বিভিন্ন সংস্থার তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে শ্রমবাজারের পরিস্থিতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

১৬.১ শ্রমবাজারের মূল প্রবণতা: কিছু গাণিতিক হিসাব

দেশের শ্রমশক্তির আকার অনেকটা বেড়েছে। সেটা যেমন সংখ্যায়, তেমনি জনশক্তির অনুপাতেও বেড়েছে। ২০২২ সালে শ্রমশক্তির আকার ছিল ৭ কোটি ৩০ লাখ; ২০১০ সালে পর যা বেড়েছে ২৯ শতাংশ। ২০২২ সালে শ্রমশক্তিতে নারীর অনুপাত ছিল এক-তৃতীয়াংশ আর পুরুষের অনুপাত ছিল দুই-তৃতীয়াংশ। এই শক্তির এক-চতুর্থাংশ ছিল শহরাঞ্চলে আর বাকিটা গ্রামাঞ্চলে। এই প্রবৃদ্ধির পরও শ্রমশক্তিতে মানুষের অংশগ্রহণের হার ছিল তুলনামূলক স্থবির। ২০১০ সালে যা ছিল ৫৯ শতাংশ, ২০২২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬১ শতাংশ। অর্থাৎ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার সেভাবে বাড়ছে না।

দেশের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। ২০০০ সালে যা ছিল ২৪ শতাংশ, ২০২২ সালে তা ৪২ দশমিক ৮ শতাংশে উঠেছে। মূলত কৃষি কাজে নারীর স্বকর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে শ্রমশক্তিতে তাদের এই অংশগ্রহণ বেড়েছে। অন্যদিকে শ্রমশক্তিতে পুরুষের অংশগ্রহণ ৮০ শতাংশের ওপরে স্থির আছে।

দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের কৃষি কাজে অনেকাংশে নারী নির্ভর হয়ে পড়ছে। ২০০০ সালে দেশের নারী শ্রমশক্তির ৪৬ শতাংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল-২০২২ সালে যা ৭৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

কৃষি কাজের নারীর এই সংখ্যাবৃদ্ধির পরিসংখ্যান তথ্য-উপাত্তের মান নিয়ে প্রশ্নের জন্ম দেয়। এমনকি কৃষি কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের সংজ্ঞায় পরিবর্তন না আসলেও এই সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে, সে কারণেই পরিসংখ্যান নিয়ে এই প্রশ্ন। অন্যদিকে দেখা যায়, উৎপাদন খাতে কৃষি খাত থেকে যে পরিমাণ শ্রমিক গেছে, সেবা খাত থেকে ততটা যায়নি। ২০০০ সালের দেশের মোট কর্মসংস্থানের যেখানে ৫১ শতাংশই হতো কৃষি খাতে, ২০২২ সালে তা ৪৫ শতাংশে নেমে আসে। একইসময়ে উৎপাদন খাতের অবদান ১২ থেকে বেড়ে ১৭ শতাংশ হয়েছে।

বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের সিংহভাগ কর্মসংস্থান অনানুষ্ঠানিক খাতে। সামগ্রিকভাবে দেশের মোট কর্মসংস্থানের

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন ড. কাজী ইকবাল, গবেষণা পরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)।

৮৫ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলের ৮৮ ভাগ কর্মসংস্থান অনানুষ্ঠানিক খাতে। দেখা যাচ্ছে, দেশে অনানুষ্ঠানিক খাত থেকে আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান স্থানান্তরের গতি অত্যন্ত কম। গত ১২ বছরে অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থান কমেছে মাত্র ২ দশমিক ৬ শতাংশীয় পয়েন্ট। এই খাতে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান হয় আত্মকর্মসংস্থানে। শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, কৃষি খাতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এর মূল চালিকাশক্তি। তবে বেতনভুক্ত কর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে বেড়েছে; ২০১০ সালে যা ছিল ১৫ শতাংশ, ২০২২ সালে তা ৩৮ শতাংশে উন্নীত হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা শ্রমশক্তির পরিমাণ এখন সবচেয়ে বেশি। ২০১০ সালে যা ছিল ১৭ শতাংশ, ২০২২ সালে তা ৩৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বিশেষ করে নারীদের মধ্যে মাধ্যমিক সম্পন্ন করা শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে বেড়েছে—১২ শতাংশ থেকে যা ৪৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক সম্পন্ন করা শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে সামান্য; ২০১০ সালে যা ছিল ২৩ শতাংশ, ২০২২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২৬ শতাংশ। তবে শ্রমশক্তিতে উচ্চশিক্ষিত শ্রমিকের অংশগ্রহণ বেড়েছে; ২০১০ সালে যা ছিল ৩ দশমিক ৫ শতাংশ, ২০২২ সালে তা ৯ শতাংশে উন্নীত হয়। নারীদের ক্ষেত্রে এই হার আরও বেশি, ২ শতাংশ থেকে যা ৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

১৬.২ শ্রমবাজারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও চ্যালেঞ্জ

১. শ্রমিকের কাজ পাওয়ার যোগ্যতা (employability) হ্রাস সবচেয়ে বড় সমস্যা

এই অংশে শুধু অকৃষি খাতের শ্রমবাজারে আলোকপাত করা হয়েছে। মানবপুঁজি ও কর্মসংস্থান যোগ্যতার দিক থেকে এই খাত অত্যন্ত বিচিত্র; শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিতে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ আছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত কাঠামোর দিক থেকে শ্রমশক্তিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। সেগুলো হলো:

প্রাথমিক গোষ্ঠী: যেসব শ্রমিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন বা এমনকি যারা তার চেয়েও কম শিক্ষিত বা যাদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই।

মাধ্যমিক গোষ্ঠী: যেসব কর্মীর নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন হয়েছে

উচ্চশিক্ষা গোষ্ঠী: যেসব কর্মীর উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন হয়েছে তারা এই গোষ্ঠীভুক্ত।

কারিগরি গোষ্ঠী: যেসব কর্মী কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত, তারা এই গোষ্ঠীভুক্ত।

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত গোষ্ঠী: স্বল্প শিক্ষা ও শিখন ক্ষমতার অভাব। এই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা অত্যন্ত কম। একইসঙ্গে তাদের নতুন কাজ শেখার দক্ষতাও কম; শ্রমশক্তির ৪৬ শতাংশই এরা। এদের অনেকেই বিদ্যালয় থেকে অল্প বয়সেই বারে পড়া বা অনেকেই কখনোই বিদ্যালয়ে যাননি। গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, এই শ্রেণির মানুষেরা সাধারণত কৃষিকাজে যুক্ত হয়। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশ বা কাজের মাধ্যমে শেখার ধারায় এরা বেড়ে ওঠেন।

তবে শুধু কৃষি কাজ নয়, এঁরা উৎপাদন খাতেও যুক্ত আছেন। কারখানার কাজের ক্ষেত্রে এরা সাধারণত সহায়ক ভূমিকা বা স্বল্প দক্ষতার পরিচ্ছন্ন কর্মী ও নিরাপত্তা প্রহরীর কাজ করেন। তবে এই শ্রেণির মানুষের বেকারত্বের হার কমেছে—২০১৯ সালে যা ছিল ৩ দশমিক ২ শতাংশ, ২০২২ সালে তা নেমে আসে ১ দশমিক ৪ শতাংশে। এর মূল কারণ হলো, এই শ্রেণির মানুষেরা দীর্ঘ মেয়াদে কাজ খোঁজার মতো অবস্থায় নেই। শোভন কাজে তাদের জোটে না বললেই চলে; ২০২২ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে শহরাঞ্চলে তাদের প্রকৃত মজুরি কমেছে।

এই শ্রেণির মানুষেরা সবচেয়ে বেশি শিখন ঘাটতিতে ভুগছেন। ন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট (এনএসও) অনুসারে, ২০১১ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে শিক্ষার্থীদের বাংলা ও গণিতের দক্ষতা উল্লেখযোগ্যহারে কমেছে।

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ১২ থেকে ১৭ শতাংশ শিক্ষার্থীর কাজিক্ত দক্ষতা আছে। ফলে যেসব কাজে সামান্য পঠন ও লিখনের যোগ্যতা প্রয়োজন হয়, সেই সব কাজ পাওয়ার সুযোগ এদের কমে যায়; কারণ লিখিত নির্দেশনা পড়তে তাদের কষ্ট হয়। তাদের শিখন কেবল ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমিত। ফলে তারা দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে পারে না।

এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও এসব শিক্ষার্থীর জন্য কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। কারিগরি শিক্ষাবোর্ড স্বীকৃত প্রশিক্ষণ কোর্স ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাস। শ্বেতপত্র কমিটি মনে করে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত হবে, এসব মানুষের চাহিদা আরও ভালোভাবে আমলে নেওয়ার জন্য তাদের প্রণীত কর্মসূচিতে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা একীভূত করা।

মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত গোষ্ঠী: শ্রমশক্তির এরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং যাদের কিছুটা কারিগরি জ্ঞান আছে। দেশের শ্রমশক্তির ৩৪ শতাংশই মাধ্যমিক সম্পন্ন করা। দেশের উৎপাদন ও সেবা খাতে এরাই মূল কর্মশক্তি। এই মানুষেরা কাজ শিখেছেন মূলত অভিজ্ঞতা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। স্বল্পকালীন যেসব কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, সেগুলো মূলত এদের লক্ষ্য করেই করা হয়। ২০১০ সালের পর থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তাদের বেকারত্বের হার ৭ শতাংশ থেকে কমে ৩ দশমিক ৯ শতাংশে নামলেও শহরাঞ্চলে তাদের প্রকৃত মজুরি স্থবির ছিল অথবা কমেছে। এই পর্যায়ে মাদ্রাসা পাস করা শিক্ষার্থীদের বেকারত্বের হার অনেক বেশি, যা প্রায় ৭৫ শতাংশ।

এছাড়া দেশের কারিগরি বিদ্যালয়ের অভাবের কারণে শিক্ষার্থীরা সাধারণ ধারার দিকে ঝুঁকছে। এতে তাদের কাজ পাওয়ার যোগ্যতা কমছে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষেরা কাজ পান দ্রুত; তাঁরা আয়ও করেন বেশি। কিন্তু কাজের জগৎ সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাবে কর্মসংস্থান সম্পর্কে তাদের পুরোপুরি ধারণা থাকে না। শ্বেতপত্র কমিটি মনে করে, ইউনিয়ন পর্যায়ে এনজিও-সরকার অংশীদারির মাধ্যমে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং কেন্দ্র নির্মাণ করা দরকার।

উচ্চশিক্ষিত গোষ্ঠী: এই শ্রেণির সরবরাহ অনেক বেশি কিন্তু চাহিদা অনেক কম। উচ্চশিক্ষিত গোষ্ঠীতে আছে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পাস করা মানুষেরা এবং এদের মধ্যে মাদ্রাসা ছাত্ররাও অন্তর্ভুক্ত। ২০১০ সালে শ্রমশক্তিতে তাদের অনুপাত ছিল ৪ শতাংশ; ২০২২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৯ শতাংশ। বাস্তবতা হলো, শ্রমবাজারে এই স্নাতক পাশ করা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রচুর। চাহিদার তুলনায় তাদের সরবরাহ বেশি। শ্রমবাজারের মাত্র ৯ শতাংশ হোয়াইট কলার চাকরি আছে যাদের বেশিরভাগই ম্যানেজার বা একই ধরনের পেশায় নিযুক্ত। সেবা খাতের স্নাতকদের কর্মসংস্থান বেশি হলেও সুযোগ সীমিত। বেকারত্বের হার বাড়লেও (২০১০ সালে ৪.৯ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ১২ শতাংশ) এই গোষ্ঠীর প্রকৃত মজুরি বেড়েছে। ২০১৫ সালে সরকারি বেতন কাঠামোর প্রভাবে এই বৃদ্ধি ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

চাহিদা ও যোগানের এই ভারসাম্যহীনতার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, শিক্ষাকে বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা কতটা জরুরি। বাস্তবতা হলো, স্নাতকদের এই বাড়বাড়ন্ত দেশের অর্থনীতির কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমাদের শিল্প ও সেবা খাত মূলত জুনিয়ার প্রফেশনালদের ওপর নির্ভরশীল, এই যেমন এসএসসি, এইচএসসি ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষেরা। ফলে এত স্নাতকের প্রয়োজন বাজারের নেই।

এই স্নাতকদের যেমন কারিগরি দক্ষতার ঘাটতি আছে, তেমনি মানবীয় ও যোগাযোগ দক্ষতারও ঘাটতি আছে। পাবলিক ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে পড়াশোনা করে। অন্যদিকে মাত্র ১২ শতাংশ বিজ্ঞান, প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও গণিতে পড়াশোনা করে। সামঞ্জস্যহীনতার জায়গাটা হলো, ছোট ফার্ম যেখানে কমযোগ্য প্রার্থী নিয়োগ দেয়, সেখানে বড় ফার্মগুলো দেয় অতিযোগ্য প্রার্থী। এই যুগপৎ অতি শিক্ষা ও স্বল্প শিক্ষা সমাজের বড় ধরনের ক্ষতির কারণ।

২. কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত গোষ্ঠী: সরবরাহ কম, অপ্রস্তুত এবং স্বীকৃতির অভাব

কারিগরি শিক্ষায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা দেশে খুবই কম। শ্বেতপত্র কমিটি দেখেছে, এই অনুপাত মাত্র শূন্য দশমিক ৬৯ শতাংশ, যদিও ২০১০ সালে তা ছিল শূন্য দশমিক ১৪ শতাংশ। প্রকৌশল ফার্মগুলোর জন্য কারিগরি শিক্ষায় ডিপ্লোমা প্রাপ্ত মানুষের প্রয়োজনীয়তা বেশি; এবং একইসঙ্গে দেখা যায়, এই ডিপ্লোমাধারীদের বেকারত্বের হারও কম— ২০১৩ সালে যা ছিল মাত্র ১ শতাংশ।

বাংলাদেশের পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানগুলো সংখ্যাগত দিক থেকে যেমন অপ্রতুল, তেমনি গুণগত দিক থেকেও তারা অপ্রতুল। দেশে মাত্র ৪৫টি পলিটেকনিক ও পাঁচটি মনোটেকনিক প্রতিষ্ঠান আছে; এসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে ৪২ হাজার ৯০০ জন শিক্ষার্থী। এসব প্রতিষ্ঠানে যোগ্য প্রশিক্ষক ও যথাযথ অবকাঠামোর অভাব আছে। আবার এসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করা এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী আরও উচ্চতর পড়াশোনা করেন। বোঝা যায়, এসব প্রতিষ্ঠান এখনো বাজারের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত নয়।

চাকরির সম্ভাবনা বেশি থাকলেও সামাজিক কারণে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা দলে দলে উচ্চ শিক্ষা নিতে কলেজ ভর্তি হয়। এই পরিস্থিতি বদলাতে নীতিগত পরিবর্তন দরকার; সেই সঙ্গে দরকার আরও বিনিয়োগ। এছাড়া কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণের উচ্চ ব্যয় কমাতে উদ্ভাবনের প্রয়োজন আছে।

৩. উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাভিত্তিক প্রকল্প কাজিত ফল নিয়ে আসতে পারছে না

দেশে তরুণদের দক্ষতা বাড়াতে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় অ্যাসেস্ট ও সেইপের মতো বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে; এসব প্রকল্পে ৮ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হলেও কাজিত ফল আসেনি। ২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপে দেখা গেছে, আগের ১২ মাসে শ্রমশক্তির মাত্র ১ দশমিক ৪৬ শতাংশ প্রশিক্ষণ পেয়েছে; ২০১৬-১৭ সালে যা ছিল ১ দশমিক ৭ শতাংশ—অর্থাৎ কমেছে। এসব প্রকল্পের স্বাধীন প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়নি। প্রবাসী শ্রমিকদের দক্ষতারও তেমন উন্নয়ন হয়নি। প্রশিক্ষণের জন্য যতটুকু ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাও দুর্বল সমন্বয়ের কারণে ফলপ্রসূ হয় না। অধিকাংশ কর্মসূচি বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, যেমন কম্পিউটার ও তৈরি পোশাক খাতে, ফলে এসব খাতে অতি সরবরাহ তৈরি হয়। শ্বেতপত্র কমিটি মনে করে, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো খাতভিত্তিক ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হলে এই পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে, অর্থাৎ সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও বাহুল্য বন্ধ করা সম্ভব।

১৬.৩ শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ: এই বাধা কি ভাঙা যাবে?

দেশে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। ২০১০ সালে যা ছিল ৩৬ শতাংশ; ২০২২ সালে তা ৪৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই কর্মসংস্থান হয়েছে মূলত কৃষি খাতে। অকৃষি খাতের মধ্যে তৈরি পোশাক ছাড়া অন্যান্য খাতে নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। আরেকটি বিষয় হলো, সম্প্রতি বেতনভোগী নারীর শ্রমজীবীর সংখ্যা কমেছে; ২০১৬-১৭ এই সংখ্যাটা ছিল ৩১ শতাংশ; ২০২২ সালে যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৮ শতাংশে। নারীরা বরং আত্মকর্মসংস্থানের দিকে বেশি ঝুঁকছেন। সেটা হয়েছে কাজ ও জীবনের মধ্যে ভারসাম্য আনার লক্ষ্যে। শিক্ষায় নারীর অগ্রগতি হলেও বা এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের সমতা অর্জিত হলেও নারী স্নাতকদের কর্মক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি হয়নি। প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে বা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ কম। সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, বৈষম্য, কাজের সুযোগের অভাব, আবাসন ও দিবাযত্ন কেন্দ্রের সুযোগের অভাবে শিক্ষা থেকে কর্মসংস্থানে নারীর উত্তরণ সেভাবে ঘটছে না। শ্বেতপত্র কমিটি মনে করে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না থাকলে অকৃষি খাতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে না।

১৬.৪ তরুণদের বেকারত্ব: আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার ফারাক

তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য কেবল যে সুযোগ তা নয়, সেই সঙ্গে চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করে, বিশেষ করে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে। ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী তরুণদের বেকারত্বের হার ৮ শতাংশ। যদিও বেকারত্বের জাতীয় হার মাত্র ৩ শতাংশ। গত এক দশকে এই হার ৫ থেকে ১১ শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে।

বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের হার বেশি। ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের হার ৪০ শতাংশ। চাকরি খুঁজতে দীর্ঘ সময় লেগে যায় তাঁদের। ফলে তাঁরা একপর্যায়ে হতাশ হয়ে যান। প্রথম প্রজন্মের স্নাতকদের অনেকে সরকারি চাকরির সন্ধান করেন; কিন্তু দেশের শ্রমবাজার তরুণদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে না। প্রতিযোগিতামূলক বেতন কাঠামো ও সামাজিক মর্যাদার কারণে তরুণেরা সরকারি চাকরি খোঁজেন। কিন্তু এই চাকরি পেতে তিন বছর এবং কখনো কখনো চার পাঁচ বছর লেগে যায়। যারা সরকারি চাকরি পান না, তারা এত দিন বসে থাকার পর শেষমেষ কম আকর্ষণীয় বেসরকারি চাকরি নেন। আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার এই ফারাকের কারণে অনেক তরুণ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত বোধ করেন এবং এই অনুভূতি স্বাভাবিকভাবেই বেশ শক্তিশালী হয়।

১৬.৫ শ্রমবাজারের পরিচালনা প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের শ্রম বাজারের পরিচালনা পদ্ধতি বেশ দুর্বল। এখানে যেমন আইনের প্রয়োগ পর্যাপ্ত নয়, তেমনি ন্যূনতম মজুরি, শ্রমিকের নিরাপত্তা ও কাজের সুরক্ষাও দুর্বল। বাংলাদেশের শ্রম আইনে (২০০৬; সংশোধন হয়েছে ২০১৩ ও ২০১৮ সালে) শ্রমিকের অধিকার, মজুরি, কর্ম পরিবেশের বিধান আছে; কিন্তু এই আইনের প্রয়োগ দুর্বল, বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক খাতে। রানা প্লাজা ধ্বসের পর রণানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিবেশের উন্নতি হলেও অভ্যন্তরীণ শিল্প ও অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের সুরক্ষা পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। তাঁদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা নেই। অনানুষ্ঠানিক খাতে শিশু শ্রম আছে এবং সেখানকার কর্ম পরিবেশও ভালো নয়।

কর্ম পরিবেশ দেখভাল করার বিষয়ে সরকারের কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আছে; কিন্তু এই দপ্তরের সেই সক্ষমতা নেই। এটি একরকম অকার্যকর। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয় উৎপাদনশীলতার নিরিখে, দারিদ্রসীমার ভিত্তিতে নয়। এছাড়া সর্বজনীন মজুরির কোনো মানদণ্ড নেই। ইউনিয়ন গঠন করতে গিয়েও নানা রকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন হয়রানি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি। আইনে শিক্ষানবিশির যে বিধান আছে, অর্থাৎ যে শিল্পে অন্তত ৫০ জন কর্মী আছে সেখানে ১০ শতাংশ শিক্ষানবিশ থাকবে, সেই আইনের প্রয়োগ নেই-এ সংক্রান্ত ত্রিপক্ষীয় কমিটিও অকার্যকর।

১৬.৬ তথ্য-উপাত্ত

বাংলাদেশের শ্রমবাজার ও শ্রমিক সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের মূল উৎস হচ্ছে শ্রমশক্তি জরিপ; কিন্তু সংজ্ঞাগত পরিবর্তন, সূচকের ধারাবাহিকতার অভাব ও দক্ষতার মাত্রার মতো মাত্রার অভাবের কারণে তথ্য উপাত্ত জোগাড় করা কঠিন। ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ৫ দশমিক ৫ শতাংশীয় পয়েন্ট বেড়েছে; এর মূল কারণ হলো গ্রামাঞ্চলে কৃষি খাতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়ে যাওয়া, যদিও এর কারণ এখনো ঠিক পরিষ্কার নয়। প্রবাসী শ্রমিকদের তথ্য উপাত্তেরও ঘাটতি আছে।

শ্রমিকের সংজ্ঞা নির্ধারণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়। সেটা হলো, যারা মজুরির বিনিময়ে বা মুনাফার জন্য সপ্তাহে অন্তত এক ঘণ্টা কাজ করে, তারাই শ্রমিক। বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনা করার জন্য এই মানদণ্ড কার্যকর হলেও অনেক সময় নীতিনির্ধারণের জন্য বাস্তবসম্মত না। বাংলাদেশের জন্য বিবিএস বেকারের সংজ্ঞা ভিন্নভাবে নির্ধারণ করতে পারে— যেমন কাজের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে তা করা যেতে পারে, যেমন সপ্তাহে ২০ বা ৪০ ঘণ্টা। সেটা হলে আরও অর্থপূর্ণ মানদণ্ড পাওয়া সম্ভব। শ্রীলঙ্কায় এই ন্যূনতম কাজের সময় সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা।

আইএলও সম্প্রতি বেকারত্বের নতুন ধারণা নিয়ে এসেছে। সেটা হলো, যারা শ্রমশক্তির বাইরে আছে এবং কাজ করতে চাচ্ছে কিন্তু তারা আবার সক্রিয়ভাবে কাজও খুঁজছে না বা যাদেরকে কাজের জন্য পাওয়া যায় না, তারা বেকার। এই সংজ্ঞা মানদণ্ড হিসেবে বড়, যাকে বলা হচ্ছে জব গ্যাপ। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো:-

জব গ্যাপ (কর্মসংস্থানের ঘাটতি) = বেকার (যারা কাজ খুঁজছে এবং যাদেরকে কাজের জন্য পাওয়া যাচ্ছে) + সম্ভাব্য শ্রমশক্তি (যারা কাজ খুঁজছে কিন্তু কাজের জন্য পাওয়া যাবে না নয় অথবা পাওয়া যাবে কিন্তু খুঁজছে না) + কর্মসংস্থান চায় (কিন্তু খুঁজছে না এবং কাজের জন্য পাওয়া যাবে না)

শ্রমশক্তি জরিপে প্রথমোক্ত দুটি বিষয় আমলে নিলেও পরেরটা নেয় না। বিবিএসের উচিত হবে, শ্রমশক্তি জরিপে আরও কিছু প্রশ্ন যোগ করে জব গ্যাপ নির্ধারণ করা।

১৬.৮ উপসংহার ও সামনে চলার পথ

বাংলাদেশের শ্রমবাজার তিনটি সমস্যায় জর্জরিত। সেগুলো হলো:-

(ক) যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া; (খ) স্নাতকদের সংখ্যা ও বাজার চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা ও (গ) যথাযথ পরিমাণে কর্মসংস্থান না হওয়া।

বস্তুত, বাংলাদেশে প্রতিবছর কী পরিমাণ শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, তার যথাযথ পরিসংখ্যান নেই। এসব সমস্যা মোকাবিলায় শ্বেতপত্রও কমিটির পরামর্শ হলো:-

১. কারিগরি শিক্ষায় বিপুল সরকারি বিনিয়োগ করে কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ।
২. কারিগরি শিক্ষার মূল সমস্যা হলো, এই শিক্ষার সামাজিক স্বীকৃতির অভাব। এই বাধা দূর করা গেলে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বাড়বে।
৩. একইসঙ্গে কারিগরি শিক্ষার প্রসারে নীতিগত সমন্বয় দরকার। সমন্বিত মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রবৃদ্ধি ও খাত সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শ্রমবাজারের কৌশল প্রণয়ন করতে হবে।

অধ্যায় ১৭: ভালোবাসা বঞ্চিত রেমিট্যান্স যোদ্ধারা*

- প্রাক্তন শাসক দলের সঙ্গে সংযুক্ত একটি শক্তিশালী শ্রমিক রপ্তানিকারক সিন্ডিকেট ২০২১-২০২৪ সময়কালে প্রবাসী শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অনৈতিকভাবে নিয়ে গেছে
- এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের শ্রমিকদের অভিবাসন ব্যয় সর্বোচ্চ। একজন বাংলাদেশি পুরুষ প্রবাসী শ্রমিক একজন নেপালি পুরুষ প্রবাসী শ্রমিকের তুলনায় ৪ থেকে ৫ গুণ বেশি ব্যয় করে থাকে। একজন বাংলাদেশি শ্রমিকের এই পরিমাণ খরচ তুলতে প্রায় ১৭ মাস কাজ করতে হতে পারে
- বিদেশে কাজের জন্য ভিসার একটি বড় অংশ অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে লেনদেন হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়োগকারী সংস্থাগুলোকে এ ধরনের উদ্দেশ্যে অর্থ প্রেরণের অনুমতি না দেওয়ায় তাদেরকে অপ্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হতে হয়। গত এক দশকে এই সংস্থাগুলি কাজের ভিসার জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রায় ১.৩৪ ট্রিলিয়ন ডলার প্রবাসে স্থানান্তর করেছে
- টিটিসি স্নাতকধারীদের দক্ষতা বৈদেশিক শ্রমমানের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় যারা বিদেশে কাজ খুঁজেন, তারা অধরনের প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষা নেবার ব্যাপারে আগ্রহী হন না। বাংলাদেশের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মান বৈশ্বিক শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হবার কারণে বাংলাদেশ স্বল্প-দক্ষ শ্রমিক পাঠাতে বাধ্য হচ্ছে, এবং শ্রমিকরা প্রতারিত এবং শোষিত হচ্ছেন

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশি শ্রমিকদের স্বল্প মেয়াদে বিদেশ যাত্রা এবং তাঁদের রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই অভিবাসনের কারণে দেশের অনেক মানুষের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে; রেমিট্যান্স এখন জিডিপি'র বড় একটি অংশ। তা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ আছে। অভিবাসন প্রক্রিয়ায় চরম অব্যবস্থাপনা আছে। নীতি প্রণেতা, আমলা ও নিয়োগকারী এজেন্সিগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে। ফলে অভিবাসনের কারণে অভিবাসী, তাদের পরিবারবর্গ ও দেশের অর্থনীতিতে যে সামগ্রিক ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারত, তার অনেকটাই অধরা থেকে গেছে।

এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, দেশের মোট অভিবাসী কর্মীর ৬.০৩ শতাংশ নারী, ৭১.৭৯ শতাংশ আধাদক্ষ ও অদক্ষ। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের বাজার সংকুচিত হতে হতে সাম্প্রতিককালে ছয়টি দেশে নেমে এসেছে। সৌদি আরব এদের মাঝে প্রধান। অভিবাসন এবং রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে গেছে। প্রতিবছরে কর্মচ্যুতি সম্পন্ন করে কত সংখ্যক অভিবাসী শ্রমিক আবার দেশে ফিরে এসেছেন এবং, এবং তারা কে কী পরিমাণে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য বা পরিসংখ্যান নেই।

সাতটি বড় চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের অভিবাসন প্রক্রিয়ায় যেসব চ্যালেঞ্জ আছে তার মধ্যে সাতটি মূল চ্যালেঞ্জ এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অভিবাসনের উচ্চ ব্যয়

অভিবাসন তাত্ত্বিকভাবে বিনামূল্যে হওয়ার কথা থাকলেও বাংলাদেশি শ্রমিকদের বড় অংকের অর্থ গুনতে হয়। বস্তুত, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অভিবাসনে বাংলাদেশি শ্রমিকরাই সর্বোচ্চ অভিবাসন খরচ বহন করছে। ব্যয়ের খাতগুলো হচ্ছে ভিসা ক্রয়, নিয়োগ মাশুল, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিমান ভাড়া ইত্যাদি। সৌদি আরব, কাতার, মালয়েশিয়ায় অভিবাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি শ্রমিকদের মাথাপিছু ব্যয় নেপালি শ্রমিকদের তুলনায় চারগুণ।

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন অধ্যাপক তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, রামরু।

অস্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া

নিয়োগ প্রক্রিয়া অত্যন্ত রাজনৈতিক। দেখা যায়, সরকার ও রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাই এই নিয়োগ সিডিকেটের সদস্য। এই অধ্যায়ে অস্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার দুটি উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে, যেমন বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে সরকারি পর্যায়ে নিয়োগ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের সিডিকেট, যে কারণে বাংলাদেশি শ্রমিকদের অভিবাসন ব্যয় বেড়ে গেছে।

মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠাতে দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশ দুই বার সমঝোতা স্মারক সই করে। কিন্তু কোনোবারই তা কার্যকর হয়নি। প্রথমবার সমঝোতা স্মারক সই হয় ২০১২ সালে, কিন্তু সেবার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মালয়েশীয় নাগরিক দাতো আমিনের সঙ্গে বায়রার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সিডিকেট হয়। এই সিডিকেট মাত্র ১০টি এজেন্সিকে জনশক্তি রপ্তানির কাজ দেয়। ফলে অভিবাসনের ব্যয় অনেকটা বেড়ে যায়। অনিয়মের কারণে মালয়েশীয় সরকার এই সমঝোতা স্মারক বাতিল করে, যদিও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

২০২১ সালেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেবারও দাতো আমিন তাঁর বেস্টিনেট কোম্পানির মাধ্যমে ১০টি এজেন্সির সিডিকেট গঠন করে। এমওইউর শর্ত অনুযায়ী শুধু সিডিকেট সদস্যরাই কর্মী পাঠাতে পারবে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হওয়ার পর তা ১০২টি এজেন্সিতে সম্প্রসারিত হয়। এই সুযোগে সিডিকেটের বাইরে থাকা বায়রা সদস্যদের কাছ থেকে স্বাভাবিক অভিবাসন খরচের উপরে আরো অতিরিক্ত ২০ শতাংশ অর্থ আত্মসাৎ করতে সক্ষম হয়। ফলে অভিবাসন ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় জনপ্রতি ৫ হাজার ৪৬ মার্কিন ডলার। এই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র অভিবাসী পরিবারের দুই বিলিয়ন ডলার বা ২০০ কোটি ডলার লোপাট হয়। সংসদ সদস্য, উচ্চপদস্থ আমলা এবং ব্যবসায়ীগোষ্ঠির মদতপুষ্ট সরকার এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর চারজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করে এবং মালয়েশিয়া সরকারের প্রতি অনুরোধ জানায় অর্থ পাচার ও মানবপাচারের অভিযোগে যেন দাতো আমিন ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তার করা হয়।

অদৃশ্য দালালদের দৌরাণ্ড

বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসনে দালালদের ভূমিকা অদৃশ্য। এর সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সি এবং দালাল চক্র জালিয়াতির সুযোগ পায়। দেশের অধিকাংশ রিক্রুটিং এজেন্সি রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক, সে কারণে তারা গ্রাহক বা অভিবাসন প্রত্যাশীদের খুঁজে পেতে দালালদের ওপর নির্ভর করে। অথচ রিক্রুটিং এজেন্সিরা দালালদের ভূমিকা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি চায় না। কারণ জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়লে এরা একজনের দোষ আরেকজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দায়মুক্ত থাকে।

দেশের ৫০০০ অভিবাসী শ্রমিক পরিবারের ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, ১৯ শতাংশ অভিবাসী সম্পূর্ণ বা আংশিক খরচ দিয়েও অভিবাসনে ব্যর্থ হয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় অভিবাসীদের ১০ বছরের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮ হাজার ৩০০ কোটি টাকা যা সম্প্রতি নির্মিত মেট্রোরেল এমআরটি-০৬ এর নির্মাণ ব্যয়ের সমান। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০২৩ সালে সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধনীতে দালালদের ভূমিকার আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিধি তৈরি করা হচ্ছে, যদিও রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো এই বিধির বিরোধিতা করছে।

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আস্থা হ্রাস ও রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির ধীরগতি

২০০০ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি ছিল উর্ধ্বমুখী; কিন্তু ২০২১ সালের পর প্রবৃদ্ধির গতিতে মন্থর ভাব দেখা দিয়েছে। ২০২২ সালে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি কমেছে ৩ দশমিক ৫৩ শতাংশ। এই হ্রাসের পেছনে অতিমারী ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো বৈশ্বিক নানা কারণ উল্লেখ করা হলেও আরও গভীর কারণ আছে। ব্যাংকগুলোতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও আর্থিক কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশিত হলে অভিবাসী পরিবারগুলো ব্যাংক

ব্যবস্থায় ক্রমশ আস্থা হারিয়ে ফেলে। ফলে অনেক অভিবাসী শ্রমিক হুন্ডির মতো অনানুষ্ঠানিক খাতে টাকা পাঠাতে শুরু করে। ব্যাংক ও খোলা বাজারে মুদ্রার বিনিময় হারের মধ্যে পার্থক্য, অর্থ পাচার ও ভিসার ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণেও রেমিট্যান্স প্রবাহে চাপ পড়েছে।

এছাড়া নারী শ্রমিকেরা অভিবাসনের উচ্চ ব্যয় ও বিদেশে সুরক্ষাহীনতার কারণে নিরুৎসাহিত হন। এগুলো আমাদের অভিবাসনের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নারী অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা

২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে নারী শ্রমিকদের অভিবাসনের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল। বিদেশে অভিবাসন কেবল পুরুষদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর নারীদের বিদেশে যাওয়া বেড়ে যায়। ২০১৬ সাল নাগাদ মোট অভিবাসীর ১৬ শতাংশ ছিলেন নারী অভিবাসী। সৌদি আরবগামী নারী শ্রমিকদের জন্য শূন্য ব্যয়ে অভিবাসনের বিধান থাকলেও প্রায়ই দেখা যায়, নারী শ্রমিকদের এক লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে হচ্ছে।

বেশকিছু বছর ধরেই কিছু অনন্য চ্যালেঞ্জের কারণে নারী অভিবাসন কমে আসছে। যেমন- বিচ্ছিন্নতা, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যৌন নিগ্রহ, বিচারহীনতা, জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন এমনকি তাঁদের অস্বাভাবিক মৃত্যু, নারী শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ আশ্রয়সেবার অভাব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে, দূতাবাস কর্মীদের যোগাযোগ ঘাটতি।

বিভিন্ন শ্রমবাজারে অস্থিরতা

একদেশকেন্দ্রিক বাজার ব্যবস্থা বাংলাদেশের শ্রমবাজারের একটি বড় দুর্বলতা। কোনো দেশের শ্রমবাজার খুললে, গ্রহণকারী দেশ এবং বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সিরা উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র রয়েছে কি না তা, বিবেচনা না করেই সেখানে লাখ লাখ লোক পাঠাতে থাকে। দেখা দেয় নানা রকমের অব্যবস্থাপনা। গ্রহণকারী দেশ এক পর্যায়ে বাংলাদেশ হতে শ্রম অভিবাসনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বসে। সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় সেই শ্রম বাজার। সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কাতার ও বাহরাইনের সবক্ষেত্রেই কখনো না কখনো এমনটি ঘটেছে।

শ্রমবাজার স্বল্প ও আধা দক্ষ শ্রমিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ

বাংলাদেশ থেকে যেসব শ্রমিক অভিবাসন করছেন, তারা মূলত আধা ও স্বল্প দক্ষ শ্রমিক। দেশে ১১০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও দক্ষ শ্রমিক পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। এর রয়েছে নানামুখী চ্যালেঞ্জ। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতয়নপত্র আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায়, প্রশিক্ষিত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান যোগ্যতা কমে যায়। গন্তব্য দেশে কোন ধরনের চাকরির চাহিদা আছে, তাও বিবেচনা করা হয় না। তাছাড়া রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো আধা দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ শ্রমিক প্রেরণেই বেশি উৎসাহী। কারণ এদের কাছ থেকে বেশি টাকা নেওয়া যায়, বা তাঁদের ঠিকানো সহজ। পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাব, পদশূন্যতায় ভুগছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো। নব প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো তাদের সক্ষমতার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ প্রশিক্ষণ দিতে পারছে।

বিশদ আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: কার্যকারিতার ঘাটতি

আন্তর্জাতিক শ্রমিক অভিবাসনের ব্যবস্থাপনায় রয়েছে বিস্তৃত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ও বিশদ আইন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএমইটি, ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড এদের মধ্যে অন্যতম। আইনি কাঠামোতেই রয়েছে ক্ষমতা বিভাজনের অধিক্রমণ। সেই সঙ্গে আছে অদক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক বিভক্তি। কল্যাণ তহবিল পরিচালনায় বিএমইটি ও ওয়েজ

আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড উভয়েই ক্ষমতাপ্রাপ্ত। যা জন্ম দেয় দ্বন্দ্ব। স্তরে স্তরে দুর্নীতি তো আছেই, নিয়োগ থেকে শুরু করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া পর্যন্ত।

রিট্রুটিং এজেন্সির লাগামহীন সংখ্যাবৃদ্ধি

বাংলাদেশে জনশক্তি রপ্তানির রিট্রুটিং এজেন্সি অনেক বেড়েছে। গত ১০ বছরে মূলত রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতির কারণে এই সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯৭৬ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে যেখানে দেওয়া হয়েছিল মাত্র ৯৩৫টি সেখানে ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ১ হাজার ১৮৫টি নতুন লাইসেন্স দেওয়া হয়। শুধুমাত্র ২০২২ এবং ২০২৩ সালেই ৮০০ নতুন লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

দুর্নীতির ডিজিটাইজেশন

বিএমইটির স্মার্ট কার্ড এবং অন্যান্য ডিজিটাল সেবার বেসরকারিকরণের কারণে অভিবাসীদের ওপর যেমন আর্থিক চাপ বেড়েছে, তেমনি তাঁদের তথ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়েছে।

অভিবাসী চাঁদার অন্যায় ব্যবহার

ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড প্রবাসী শ্রমিকদের অর্থে গঠন করা হয় ১৯৯০ সালে। সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে বরাদ্দ না দিয়ে ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের কর্মীদের বেতন ও বাজার অনুসন্ধানের খরচ এই তহবিল থেকে মেটানো হয়। এই তহবিলের চাঁদার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৫০০ টাকা। তারপরও সেখানে স্বচ্ছতার ঘাটতি আছে। অভিবাসী পরিবারের পক্ষ থেকে প্রায়ই অভিযোগ দেওয়া হয়, ক্ষতিপূরণের অর্থ দিতে বিলম্ব করা হয় এবং ঘুষ চাওয়া হয়। জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া দুর্বল।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের আশানুরূপ ফলাফলের অভাব

২০১১ সালের প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী কল্যাণ বোর্ডের কাজ হলো, অভিবাসীদের বিদেশে যেতে ঋণ প্রদান এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর পুনর্বাসনে সহায়তা। প্রাথমিক পর্যায়ে দুর্বল পরিকল্পনা, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, পরিচালনা পর্ষদের ব্যাংকিং যোগ্যতার ঘাটতি, অন্যান্য ব্যাংকের সঙ্গে তাদের সংযুক্ত হয়ে রেমিট্যান্স আহরণে অপারগতা ইত্যাদি ব্যাংকটিকে দুর্বল করে রেখেছে।

লেবার অ্যাটাশে

অদক্ষ ও আধা দক্ষ কর্মীদের বিদেশে সেবা দেওয়ার জন্যই তৈরি হয়েছে লেবার অ্যাটাশেদের পদ। বর্তমানে ৩০টি দেশে লেবার অ্যাটাশেরা কাজ করছেন। অথচ এই ৩০টির ৯টিই বাংলাদেশের শ্রম গ্রহণকারী দেশ না।

সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় কিন্তু সবচেয়ে কম বাজেট বরাদ্দ

শ্রম অভিবাসন বাংলাদেশস সরকারের সবচাইতে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। অথচ ২০১০-১১ থেকে ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে বাজেট বরাদ্দ ছিল গড়ে ০.০৮ শতাংশ।

এগোবার পথ

শ্রমিকদের অভিবাসনের লক্ষ্যে দেশে আইন প্রণয়নে বেশ অগ্রগতি হয়েছে; কিন্তু নানা চ্যালেঞ্জের কারণে এসব আইনের প্রয়োগ দুর্বল। চ্যালেঞ্জগুলো হলো-প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, বিভিন্ন সংস্থার কাজের অভিন্নতা ও দুর্নীতি, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এবং আমলাতন্ত্রের সাথে রিট্রুটিং এজেন্সির আঁতাত। সে কারণে

অভিবাসনের ব্যয় বেড়েছে; তৈরি হয়েছে সিভিকিটি, এবং তাতে রেমিট্যান্স প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। নারী শ্রমিকেরা প্রবাসে মূলত গৃহকর্মে যুক্ত হচ্ছেন। দক্ষ শ্রমিকদের বিদেশে পাঠানো ও প্রবাসে শ্রমিকদের সুরক্ষায় নীতিমালার অভাব আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্বেতপত্র কমিটির পরামর্শ হলো:-

নীতি পরিবর্তন

১. অভিবাসী শ্রমিক সংক্রান্ত জ্ঞান সংরক্ষণ ও সেবার মানোন্নয়নে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য পৃথক ক্যাডার গঠন করা।
২. বিএমিইটিকে একাধিক পরিদপ্তরবিশিষ্ট বিভাগে রূপান্তরিত করা; এবং এটা নিশ্চিত করা যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহবিল শুধুমাত্র অভিবাসীদের প্রত্যক্ষ সেবাদানে ব্যবহৃত হয় এবং বোর্ড পরিচালনার প্রশাসনিক বরাদ্দ যেন জাতীয় বাজেট থেকে আসে।
৩. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সংস্কার এবং ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের মাধ্যমে অভিবাসীদের ঋণ প্রদানের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা।
৪. স্বার্থের সংঘাত এড়ানোর লক্ষ্যে সংসদ সদস্যদের জনশক্তি রপ্তানির ব্যবসায় আসতে না দেওয়া এবং অভিবাসন খাতে জাতীয় বাজেট থেকে আরও বেশি বরাদ্দ দেওয়া। অন্তত জাতীয় বাজেটের এক শতাংশ বা বার্ষিক রেমিট্যান্সের ৫ শতাংশ এই খাতে বরাদ্দ দেওয়া।

প্রশাসনিক

- ১। অভিবাসন খাতে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণশুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটিকে কার্যকরী করা।
- ২। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে অভিবাসীদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণ করা।
- ৩। দালাল নিবন্ধনে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী বিধি ২০২০ বাস্তবায়ন করা।
- ৪। রিক্রুটিং এজেন্সির লাগামহীন লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে তদন্ত করা।
- ৫। মালয়েশিয়ায় অভিবাসী প্রেরণে সিভিকেশনের সাথে যুক্তদের বিচার ও শাস্তির আওতায় আনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।
- ৬। অভিবাসনের উচ্চ ব্যয়ের বিষয়টি বহুপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় ফোরামে উত্থাপন করা।
- ৭। নারী শ্রমিকের নিরাপদ অভিবাসনের অধিকার নিশ্চিত করতে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ, বিদেশে নারী অভিবাসীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, সন্দেহজনক মৃত্যুর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত করা।
- ৮। জাতীয় শুমারিতে অভিবাসীদের তথ্য সংযুক্ত করার মাধ্যমে অভিবাসন সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত নিশ্চিত করা।

অধ্যায় ১৮- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন: বিপর্যয়ের পদধ্বনি*

- পরিবেশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি কিছু উদ্যোগের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ, যেমন ২২৪টি কারখানার LEED সনদ প্রাপ্তি, ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ, ইলিশ সংরক্ষণ ও সামাজিক বনায়ন
- ২২ বছর ধরে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ থাকলেও বেড়েছে এর ব্যবহার। বিন্দি জাল ও শিল্পবর্জ্যের অবৈধ নিক্ষেপনে জলজ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে নিরন্তর
- যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণধুলা ও অপরিষ্কৃত নগরায়নের কারণে ঢাকা এখন বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরগুলোর একটি
- শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা, অকার্যকর ইটিপি ও উপেক্ষিত সিইটিপি নদী-জলাশয় দূষণকে ভয়াবহ করেছে
- পরিবেশগত অভিযাত মূল্যায়ন (EIA) প্রক্রিয়া দুর্বল ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত। রামপালসহ বহু প্রকল্প প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ছাড়াই অনুমোদন পেয়েছে

১৮.১ সফলতা ও ব্যর্থতার মিশ্র অনুভূতি

দেশে একধরনের পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে রয়েছে। যদিও এর মধ্যে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে, যেমন দেশের ২২৪টি উৎপাদনমুখী কারখানা পরিবেশবান্ধব লিড সনদ পেয়েছে; ইলিশ মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে মাছের উৎপাদন হ্রাসের ধারা থেমেছে; ইটের ভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে; সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গতি পেয়েছে ইত্যাদি।

এ ছাড়া সরকার জাতীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কৌশল গ্রহণ করেছে এবং প্লাস্টিকের দূষণ রোধে পাটভিত্তিক পচনশীল পলিথিন তৈরিতে সহায়তা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও পরিবেশ দূষণ রোধে বাংলাদেশ বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারেনি, যেমন ২২ বছর ধরে প্লাস্টিক দূষণ রোধে জাতীয় পর্যায়ে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ব্যবহার বেড়েই চলেছে; ছোট মাছ ধরার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিন্দি জাল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও এই জালের অবৈধ ব্যবহার বেড়েই চলেছে। ফলে মাছের বৈচিত্র্য বিনষ্ট হচ্ছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ঢাকার আশপাশের নদীর ছোট মাছে পিসিবি (ক্যানসারের উপাদান) দূষণ; বড় বড় প্রকল্পের যথাযথভাবে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ না হওয়া; ঢাকার ক্রমবর্ধমান বায়ু দূষণ; রাজধানী শহরের বায়ুর মান প্রায়ই বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া; বন বিভাগের উদ্যোগ সত্ত্বেও দেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ হ্রাস।

১৮.২ শহরের বায়ুর মান

২০০০ সালের শুরুর দিকে বায়ুর মানোন্নয়ন করতে দুই স্ট্রোকের ইঞ্জিন বাতিল করে চার স্ট্রোকের সিএনজি ট্যাক্সি প্রবর্তন করা হয় এবং ডিজেলের পরিবর্তে সিএনজির ব্যবহার শুরু হয়। এ লক্ষ্যে সরকার রাজস্ব প্রণোদনা দেয় এবং সিএনজি কনভারশন বা রূপান্তর কেন্দ্র গড়ে তুলতে সহায়তা করে। সেই সঙ্গে ইটের ভাটায় লম্বা চিমনি স্থাপনের নির্দেশ দেয় সরকার; এসব কারণে প্রাথমিকভাবে বায়ু দূষণ কমেছিল। তখন ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় ছিল না।

কিন্তু এরপর দ্রুত নগরায়ন ও পরিবহন খাতের সম্প্রসারণ, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও সিএনজির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব অর্জন বৃথা যায়। এর ফলে বায়ুর মান আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। ২০২২ সালের মধ্যে ঢাকা নগরী বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত নগরীর তকমা ফিরে পায়। মূলত ট্রাফিকজ্যামের কারণে তার এই তকমা ফিরে পাওয়া। সেই সঙ্গে ছিল যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণ কাজজনিত দূষণ ইত্যাদি। তবে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জের চেয়ে বেশির ভাগ শহরের বায়ুর মান ভালো।

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন অধ্যাপক শরমিন্দা নীলোম্মী, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

১৮.৩ পরিবেশবান্ধব পরিবহন: হাইব্রিড ও বৈদ্যুতিক গাড়ির ভূমিকা

বায়ু দূষণ রোধে হাইব্রিড, বৈদ্যুতিক গাড়ি ও মেট্রোরেলের মতো যানবাহন বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। এর মধ্য দিয়ে পেট্রলের ব্যবহার কমে এবং বায়ুদূষণ রোধ করা যায়। তবে এর সফলতা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের ওপর, যেমন তেলের দাম, অবকাঠামো ও জ্বালানি পুনর্ব্যবহারের অভ্যাস। আরেকটি বড় উদ্বেগের জায়গা হলো, বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি যত্রতত্র ফেলে দেওয়া। এসব ব্যাটারি নিয়ম মেনে ফেলা না হলে বা পুনর্ব্যবহারোপযোগী করা না হলে মাটি ও পানি দূষণ হতে পারে। বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহারে প্রণোদনা দেওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনি ব্যাটারি যত্রতত্র ফেলে দেওয়ার বিষয়েও পাল্টা ব্যবস্থা থাকা উচিত। বর্তমানে লিড অ্যাসিড ব্যাটারি পুনর্ব্যবহার উযোগীকরণের উদ্যোগ কার্যকর নয়, কারণ এসব ব্যাটারি ব্যবহারের গোপন বাজার আছে। ফলে এই ব্যাটারি ব্যবহার নিয়ে আরও বিশদ বিশ্লেষণ প্রয়োজন, দরকার সুব্যবস্থাপনা।

১৮.৪ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য

গত ৪০ বছরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের দ্রুত প্রবৃদ্ধি হয়েছে একথা যেমন ঠিক, তেমনি রানা প্লাজা ধস ও সীতাকুণ্ডের অগ্নিকাণ্ডের মতো ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণে এই শিল্পের শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত উদ্বেগ আরও তীব্র হয়েছে। আন্তর্জাতিক চাপে দেশের অনেক কারখানা লিড সার্টিফিকেশন গ্রহণ করলেও বিদেশি সার্টিফিকেশনের ওপর নির্ভর করা ব্যয়বহুল। স্থানীয় সার্টিফিকেশন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে।

কালীগঞ্জের একটি ডেনিম কারখানায় দিনে ৭০০ টন রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়; এই রাসায়নিক পরিবহন করা ঝুঁকিপূর্ণ, এর ব্যবহার তো বটেই। এসবের জন্য কঠোর নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া টাঙ্গাইলের বংশী নদী শিল্প দূষণের কারণে প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। ফলে প্রাথমিক পরিবেশ পরীক্ষা ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন যে ঠিকঠাক হয় না, তা বোঝা যায়। এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বা (ইটিপি) বর্জ্য পরিশোধনাগারের অকার্যকারিতা সত্ত্বেও শিল্প মন্ত্রণালয় ইটিপি বাস্তবায়নে জোর দিয়েছে। ফলে শিল্পের ব্যয় বেড়েছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের (সিইটিপি) প্রয়োজনীয়তা মূলত উপেক্ষিত রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের নিষ্ক্রিয়তা, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে পরিবেশ বিপর্যয় ত্বরান্বিত হয়েছে, যেমন সাভারের ট্যানারি এস্টেটের পাশে ধলেশ্বরী নদীর দূষণ।

রহস্যজনক বিষয় হলো, পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজের আইন-কানুন বাস্তবায়নে নিষ্ক্রিয়তা। হতে পারে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা ঘুষ নিয়ে এ কাজ করেন বা ট্যানারি ও তৈরি পোশাক সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে তা হচ্ছে। এই সেদিন পর্যন্ত এসব সংগঠনের নেতারা বাংলাদেশের সংসদ সদস্যের মধ্যে ছিলেন প্রায় অর্ধেক।

১৮.৫ পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয়ের চ্যালেঞ্জ ও বিতর্ক

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে ১৯৯৭ সালের পরিবেশ বিধিমালায় অধীনে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) বাধ্যতামূলক করা হয়। ফলে বার্ষিকভাবে পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসিসি) নবায়নের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ সর্বত্র সমান নয় এবং অভিযোগ আছে, অনেকক্ষেত্রে ইআইএ প্রক্রিয়া এড়িয়ে যাওয়া বা অপব্যবহার করা হয়। রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও কিশোরগঞ্জ সড়কের মতো সরকারি প্রকল্পগুলো যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই ছাড়াই অনুমোদন পেয়েছে। ফলে পরিবেশের ক্ষতি হয়েছে। একইভাবে, হাজারীবাগ ট্যানারি সাভারে স্থানান্তর করা হয়েছে; কিন্তু উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প হওয়া সত্ত্বেও এর ইআইএ করা হয়নি। জলাভূমিতে হাইটেক পার্ক নির্মাণ নিয়েও স্থানীয় পর্যায়ে সমালোচনা আছে। অভিযোগ, এসবক্ষেত্রে পরিবেশগত ঝুঁকি উপেক্ষা করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ইআইএ ছাড়পত্র প্রদানে স্বজনপ্রীতি ও নিম্নমানের নকল প্রতিবেদন তৈরি করার অভিযোগ আছে। এতে দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা দুর্বল হয়েছে।

পর্যাপ্ত পরিবেশগত বিশ্লেষণ ছাড়াই বন্যপ্রাণ এলাকায় সড়ক নির্মাণের ফলে উল্টো বন্যা বেড়েছে। ফলে সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি লাখ লাখ মানুষ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। ১৯৯৯ সাল থেকে সরকার ১৩টি পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) চিহ্নিত করে এবং চারটি এলাকাকে সংকটাপন্ন ঘোষণা করে। কিন্তু গত দুই দশকে পরিবেশ কমিটির (ইসি) সভা হয়েছে মাত্র দুটি। সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে বক্তৃতা ও আলংকারিক অনেক কাজ করেন; এমনকি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সংরক্ষণে প্রতীকী পুরস্কারও দেন; কিন্তু তাদের কার্যক্রম আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এগুলোর বেশিরভাগই মানুষকে শান্ত করার লক্ষ্যে নিছক আচার অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

সরকারের কার্যক্রম আইনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। আইনের অবাধ প্রয়োগ না হওয়ায় ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে; এই জবাবদিহিতার অভাব লাখ লাখ মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়েছে। কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতারা নির্লজ্জভাবে নিয়ম লঙ্ঘন করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন। সমালোচকেরা বলছেন, পরিবেশ সংরক্ষণে সরকার মিথ্যা দাবি করছে।

১৮.৬ পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে মানুষের ক্রমহ্রাসমান সচেতনতা

এই অংশে বাংলাদেশের মানুষের পরিবেশ সচেতনতা ও সংরক্ষণ বিষয়ক চেতনার অবনতির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে জনসচেতনতা এখনো কম। বন্যপ্রাণি হত্যার মতো ঘটনায় মধ্য দিয়ে বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের সচেতনতাও প্রশ্নবিদ্ধ, যেমন চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইনের জন্য পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদনের অপূর্ণাঙ্গতার কারণে হাতির মৃত্যু ঘটেছে।

১৮.৭ বৃক্ষবিহীন বন

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দেশের ১১ শতাংশে বনাঞ্চল থাকলেও বাস্তবে ৩৫ শতাংশ বনভূমি বৃক্ষবিহীন হয়ে পড়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর একইসঙ্গে নিয়ন্ত্রক ও বাস্তবায়নকারী হওয়ায় সংঘাত তৈরি হয়েছে। এত পরিবেশ আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। সুন্দরবন ও কিছু শালবন ছাড়া অন্যান্য বনাঞ্চলের গাছের আচ্ছাদন ব্যাপকভাবে কমেছে। ফলে অনেক বনাঞ্চল এখন বৃক্ষবিহীন।

এদিকে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিকল্প সবুজায়ন প্রক্রিয়া বেশ শক্তিশালী। জাতীয় বনায়ন মাস (১ জুন থেকে ৩০ জুন) চলাকালীন গ্রামবাসীরা গ্রামীণ রাস্তার পাশে বনায়নের করে থাকে; এই বিষয়টি তারা বার্ষিক রীতিতে রূপান্তরিত করেছে। স্যাটেলাইট ও ড্রোন চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামগুলো আগের চেয়ে বেশি সবুজ হয়েছে। বন বিভাগের প্রণোদনা প্যাকেজ গ্রামবাসীদের রাস্তার পাশে বনায়নে উৎসাহিত করেছে; এই প্রক্রিয়া গ্রামগুলোর সবুজায়নে ভূমিকা রেখেছে। ১৯৮৯ সাল থেকে বনাঞ্চলে গাছ কাটা নিষিদ্ধ থাকায় বন বিভাগের দৃষ্টি বন ব্যবস্থাপনা থেকে বন্যপ্রাণি ব্যবস্থাপনায় স্থানান্তরের প্রয়োজন। ফলে তা পর্যটন আকর্ষণ ও আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে। অনেক দেশ বন বিভাগকে পার্ক বিভাগ হিসেবে রিব্র্যান্ডিং (নতুন নামে পরিচিত করা) করে স্থলজ ও জলজ প্রাণির যত্ন নেওয়ার প্রচেষ্টা নিয়েছে।

১৮.৮ স্থলের উপরিভাগের পানি কমে যাওয়া: ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে আপস

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সেচ এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি শেষ হয়ে গেছে বা শেষ হওয়ার কাছাকাছি। ভূগর্ভস্থ পানির অত্যধিক ব্যবহার ও অপরিপূর্ণ পুনঃপূরণের কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে। দুটি সেচ নলকূপের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব বজায় রাখার নিয়ম ছাড়া ভূগর্ভস্থ পানি বন্টনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন নেই। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সংজ্ঞা ও দায়িত্ব নিয়ে মতবিরোধ আছে। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় সমন্বয়কারী সংস্থা গঠনের জন্য পরিকল্পনা চেয়েছে, কিন্তু ২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে এর ফলাফল এখনো অপেক্ষমান। ভূগর্ভস্থ পানির পর্যবেক্ষণ, বন্টন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

১৮.৯ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিয়ে সামগ্রিক বোঝাপড়া

বাংলাদেশ পরিবেশগত কিছু ইস্যুতে ভালো করেছে বলে মনে হলেও বাস্তবতা হলো, ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা আছে। ২০১৮ সাল থেকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক দায়িত্ব পেলেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো ইতিমধ্যেই অত্যধিক চাপের মধ্যে থাকে। মানবসম্পদ ও আর্থিক সংস্থান বাড়ানো ছাড়াই অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় এই মন্ত্রণালয় নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ দিতে প্রস্তুত নয়। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিও নতুন; এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের যথেষ্ট ঘাটতি আছে। নতুন এই দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সভাগুলোতে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করলেও মন্ত্রণালয়টি তার মূল কাজ, অর্থাৎ পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় অবহেলা করেছে।

১৮.১০ জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি মূলধারায় নিয়ে আসা কথাসর্বস্ব, সারবস্তু নেই

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বৈশ্বিক তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশও বাংলাদেশ। তাই জলবায়ু সম্পর্কিত দুর্যোগ মোকাবিলায় অভিযোজন প্রয়োজন। সরকারের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ২০২২-এ বিস্তারিত পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৮.১১ জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP): উদ্বেগ আছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় বাংলাদেশের জন্য প্রায় ২২০ বিলিয়ন বা ২২ হাজার কোটি ডলারের অভিযোজন বিষয়ক কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবিলায় ২০০৯-১০ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়, যার মাধ্যমে ৮০০টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন, জলাধার নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, সৌর পাম্প স্থাপন, বৃক্ষ রোপণ, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ইত্যাদি।

এই তালিকা চমকপ্রদ হলেও এসব কার্যক্রমের স্বাধীন নিরীক্ষা প্রয়োজন। অনেকেই বলেন, এসব কার্যক্রম ধূর্ত শেয়াল ও বোকা কুমিরের গল্পের মতো; কারণ এসব কার্যক্রমের স্বচ্ছতার যেমন অভাব আছে, তেমনি অনেক প্রকল্পই নতুন নয়। এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের এমপি বা সরকারি কর্মকর্তাদের ইচ্ছানুসারে করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সেজন্য অনেকে এই তহবিলকে ট্রাস্ট ফান্ড না বলে মিস ট্রাস্ট ফান্ড (আস্থাহীন তহবিল) বলে অভিহিত করেন।

তাপপ্রবাহ ও ডেঙ্গু

বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করলেও তাপপ্রবাহের মতো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বড় চাপ মোকাবিলায় প্রস্তুত নয়। বাস্তবতা হলো, ১৯৯০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে দেশের গড় তাপমাত্রা ১৯৬০-১৯৯০ সালের তুলনায় প্রায় শূন্য দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। ২০১১-২০২০ সময়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার আগের দশকগুলোর তুলনায় অনেক বেশি ছিল। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে এই প্রথম দিনের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়। এতে মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে, সেই সঙ্গে তা অনেক মৃত্যুর কারণও হয়েছে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার মতো রোগ বাড়ছে। ২০২৪ সালে ডেঙ্গুর প্রকোপ এই প্রথম এপ্রিল-জুনের মূল সময়ের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। দেশজুড়ে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়লেও বাংলাদেশ এই স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলায় প্রস্তুত নয়।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো প্রস্তুত করতে হবে এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের কার্যকর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। মশার কামড় প্রতিরোধে জনসচেতনতা বাড়ানো জরুরি। বাংলাদেশের অনেকেই মশারি

ব্যবহারে অভ্যস্ত হলেও ডেঙ্গুর যে বিস্তার হয়েছে তা থেকে বোঝা যায়, এ বিষয়ক জনসচেতনতামূলক প্রচারণা ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে এই দায়িত্ব মূলত পৌরসভার মশা নিধন কার্যক্রমের ওপর; কিন্তু বাস্তবতা হলো, স্বাস্থ্য বিভাগ, পরিবেশ বিভাগ ও স্থানীয় পৌরসভার সমন্বিত প্রচেষ্টা এই সংকট মোকাবিলায় আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

১৮.১২ বৃষ্টিপাতের ধরন ও বন্যায় জলবায়ুর ধরন পরিবর্তনের প্রভাব

বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে বাংলাদেশের বৃষ্টিপাতের ধরনে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে বন্যার ঝুঁকি। বর্ষা ও পরবর্তী মৌসুমে বৃষ্টিপাত বাড়লেও শীতকালে কমে যাচ্ছে। প্রাক-বর্ষা মৌসুমের বৃষ্টিপাতের ধরনে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। জলবায়ু পরিবর্তনের এই অপ্রত্যাশিত প্রবণতা, (যেমন, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি ও নদীর উপচে পড়া পানিতে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যা) আমন মৌসুমের ফসলসহ কৃষিকে হুমকির মুখে ফেলেছে। ফেনীর পরশুরাম, কুমিল্লা, কক্সবাজার, লালমনিরহাট-ঠাকুরগাঁও ও শেরপুর জেলায় আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ ঘটে যাওয়া এই বন্যায় যে বিষয়টি উন্মোচিত হয়েছে তা হলো, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, যেমন গোমতী নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়া। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ) থেকে কোটি ডলার ব্যয় করেও বাঁধ সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ অভিযোজন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায়নি; এই ঘটনা তহবিল বরাদ্দে দুর্নীতি ও অদূরদর্শিতার প্রতিফলন। ফলে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতিহীনতা বেড়েছে। হুমকির মুখে পড়ে যাচ্ছে জনজীবন, জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তা।

১৮.১৩ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও উপকূলীয় অঞ্চলের সুরক্ষাহীনতা

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি উপকূলীয় বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে যদি পোন্ডারগুলো যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয়। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (২০২২) অনুযায়ী, ফরিদপুর, চাঁদপুর, পিরোজপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জসহ কিছু অভ্যন্তরীণ উপকূলীয় জেলা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ঝুঁকিতে আছে। যেগুলো আগেও সুরক্ষিত ছিল না। বঙ্গোপসাগরে দক্ষিণ তালপট্ট দ্বীপ যে সম্প্রতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে (শীতকালীন ভাটাতেও অদৃশ্য), এই বিষয়টি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, নভেম্বর-ডিসেম্বরে রেকর্ড উচ্চতার জোয়ার হচ্ছে যা জলবায়ু পরিবর্তনের সুস্পষ্ট প্রভাব।

২০২১-২২ সালে বাংলাদেশ অভিযোজন বাবদ ২.৯৬ বিলিয়ন বা ২৯৬ কোটি ডলার ব্যয় করলেও (পরিবেশ মন্ত্রণালয়, ২০২২) ২০২৪ সালের বন্যার সময় প্রস্তুতিহীনতা ও তহবিলের সম্ভাব্য তহরুরপের কারণে এই বিনিয়োগের কার্যকারিতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্নের উদয় হয়েছে। জলবায়ু অর্থায়নে আরও তৎপরতা ও তদারকির মাধ্যমে অভিযোজন কৌশল জোরদার করা জরুরি।

১৮.১৪ জলবায়ু পরিবর্তন রোধে নীতিনির্ধারণে বাংলাদেশের প্রবণতা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বিশেষত সম্প্রদায়ভিত্তিক অভিযোজন এবং স্থানীয়ভাবে নেতৃত্বাধীন অভিযোজনের মতো উদ্ভাবনী ধারণার কারণে। জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে গঠিত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের মতো উদ্যোগের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অগ্রগামী। আন্তর্জাতিকভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর ফোরাম বাংলাদেশ ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম গঠনে নেতৃত্ব দেয় এবং উন্নয়ন প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিবেচনাগুলোকে বাধ্যতামূলক করে।

তবে নীতির সঙ্গে বাস্তবায়নের বেশ অমিল রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের অভাব ও অর্থায়নের ঘাটতির কারণে এসব উদ্যোগের বেশিরভাগই কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। সমালোচকদের মতে, ডেল্টা প্ল্যান বা বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন ও অবাস্তব) ও মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (২০২২-

২০৪১; যা নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছে) প্রকৃত পরিবর্তনের চেয়ে রাজনৈতিক বা আর্থিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে। বলা হয়, আন্তর্জাতিক অনুদান লাভের কৌশল হিসাবে এসব করা হয়েছে। প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও নীতি ও বাস্তবায়নের মধ্যে ফারাক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিভক্তির কারণে বাংলাদেশের জলবায়ু সংকট মোকাবিলার পথ এখনো অনিশ্চিত।

সরকার ও তার অনুগত আমলাতন্ত্রের দাবি, পরিকল্পনা পদ্ধতি যাই হোক না কেন; জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম মূলত দেশীয় অর্থায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। শাসন কাঠামোর প্রচলিত ধারণা হলো, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উদ্যোগগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, এবং তা নিয়ে একপ্রকার আত্মতুষ্টির সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষত দেশীয় সম্পদ থেকে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়গুলো অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০২২ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে জলবায়ু অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৯০ বিলিয়ন বা ৯ হাজার কোটি ডলারের বেশি। যার বেশিরভাগই আন্তর্জাতিক উৎস থেকে আসার কথা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ ২০১৫ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) থেকে মাত্র ৫০ কোটি ডলারেরও কম প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এছাড়া ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) থেকে উন্নয়ন সহযোগীরা চার বছরের মধ্যেই সরে দাঁড়ায়।

১৮.১৫ পরিকল্পনা পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি যথাযথভাবে অঙ্গীভূত হয়নি

বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বেশকিছু উদ্যোগ হাতে নিয়েছে, যেমন: জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার কিছু অংশ বাস্তবায়ন। তবে মন্ত্রণালয়গুলোর সক্ষমতা এবং কাজের পদ্ধতিগত অসামঞ্জস্যের কারণে জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনকে মূলধারায় নিয়ে আসা চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনকে আন্তঃক্ষেত্রীয় বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও সম্পদ বরাদ্দ ও বাস্তবায়নে অসামঞ্জস্য আছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করে কার্বন নিঃসরণ ৬ দশমিক ৭৩ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক সহায়তা পেলে যা ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে ক্রমবর্ধমান দূষণের প্রেক্ষাপটে নিঃসরণের লক্ষ্যমাত্রা কমানোর লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় নীতি উপকরণের অভাব আছে।

১৮.১৬ জলবায়ু অর্থায়ন: একমাত্র যে দুর্বলতা ঢেকে রাখা যায়নি

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় যেসব উদ্যোগ নিয়েছে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকায় অনেকক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বৈশ্বিক তহবিল পাওয়া সম্ভব হয় না। দেখা গেছে, অনেক সময় আন্তর্জাতিক নির্দেশনার আগেই দেশে নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে তহবিল পাওয়ার জন্য যে শর্ত পূরণ করা দরকার, তা অনেক সময় পূরণ করা সম্ভব হয়নি। জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক তহবিল তৈরির প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছে। যার মূল কারণ হলো পরিবেশ বিশেষজ্ঞের অভাব, শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞানের ঘাটতি ও সরকারি কর্মকর্তাদের ঘন ঘন বদলি। জাতীয় কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন: ইডকল ও পিকেএসএফ বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিলের অর্থ বিতরণ দেখভাল করলেও ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা গড়ে তোলা ও নিঃসরণ রোধে দৃষ্টিগ্রাহ্য উন্নতি নেই।

তহবিল ব্যবস্থাপকের অতটা আত্মভাঙ্গন নয়

অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে দেশে যে জলবায়ু তহবিল গড়ে তোলা হয়েছে, তা বড় সমস্যার মুখে পড়েছে। এই তহবিল গড়ে তোলার প্রাথমিক উদ্যোগ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে এবং সরকারি তহবিল কমে গেছে। অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে এই তহবিলের বড় একটি অংশের অপব্যবহার হয়েছে। এই তহবিলের বিষয়ে দাতাদের আত্মবিশ্বাস কমেছে এবং পরিণামে অর্থায়নও নাটকীয়ভাবে কমেছে। সমালোচকেরা বলেন, সরকার এই তহবিলে একদম ন্যূনতম অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে; এমনকি তহবিলের কিছু অংশ স্থায়ী আমানত করে রাখা হয়েছে, যদিও

অভিযোজন বিষয়ক জরুরি অনেক কাজ করা যাচ্ছে না। কার্যকর জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অর্থায়ন পাওয়া বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে ওডিএ, দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় অর্থায়ন বিষয়ক তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে গেছে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করা হয়, যেন তারা জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে; এর সঙ্গে আছে ইউকল ও পিকেএসএফ।

এই গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড থেকে বাংলাদেশ মোট ৪৪ কোটি ১২ লাখ ডলার তহবিল পেয়েছে। অভিযোজন খাতে বিনিয়োগের অনেক চাহিদা থাকলেও বাংলাদেশ এ যাবৎকাল যত অর্থায়ন পেয়েছে, তার বড় অংশই (৫৮ শতাংশ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ব্যয় হয়েছে। বন্যা সংক্রান্ত অভিযোজন প্রকল্পের আবেদন করেছিল বাংলাদেশ; কিন্তু শ্বেতপত্র কমিটি বলছে, এই আবেদন ছিল দুর্বল; চাওয়া হয়েছিল মাত্র ৯৯ লাখ ডলার। চ্যালেঞ্জের যে ব্যাপ্তি, তাতে এই অর্থ ছিল একেবারে অপ্রতুল। আবার বন্যার ঝুঁকি সংক্রান্ত আরেকটি প্রকল্পের জন্য পাওয়া যায় ১৩ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলার। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, প্রকল্প প্রণয়নে আরও যত্নশীল হওয়ার পাশাপাশি টেকসই ও কার্যকর প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে।

জলবায়ু বাজেট

২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে অর্থ মন্ত্রণালয় জলবায়ু বাজেট প্রণয়ন করে আসছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে ২৫টি মন্ত্রণালয় জলবায়ু সংক্রান্ত বরাদ্দ সম্পর্কে জানিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, এই প্রক্রিয়ার পরিষ্কার মানদণ্ড থাকে না। কোনো কোনো মন্ত্রণালয় ইচ্ছামতো এ কাজ করে, এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে তাদের বিশেষ বোঝাপড়াও নেই। সে কারণে বাংলাদেশের পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল পাওয়া কঠিন। বাংলাদেশের প্রস্তাবে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয় না।

বোঝা যাচ্ছে, জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, সুশাসন ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞ জ্ঞান প্রয়োজন। শ্বেতপত্র কমিটি মনে করছে, দুর্নীতি, রাজনৈতিক স্বজনপ্রীতি ও নীতিগত সামঞ্জস্যহীনতার কারণে বাংলাদেশের পক্ষে কার্যকরভাবে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছে না। যদিও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি।

বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের অব্যবস্থাপনার কারণে দাতাগোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। ফলে অনেকে এখন আর অর্থায়ন করতে চায় না। এছাড়া এসব বিষয়ে বাংলাদেশ অনেক বেশি আন্তর্জাতিক জ্ঞানের ওপর নির্ভর করেছে। এতে স্থানীয় জ্ঞানের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞরা উপেক্ষিত হয়েছে। শ্বেতপত্র কমিটি মনে করে, জলবায়ু ও পরিবেশগত কৌশল প্রণয়নে বাংলাদেশকে আরও বিনিয়োগ করতে হবে। সেই সঙ্গে নীতি প্রণয়নে আরও স্বাধীন ও কার্যকর হতে হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ

অধ্যায় ১৯ – মেগা প্রকল্পে মেগা উৎকর্ষ*

- বাংলাদেশের প্রায় সব মেগা প্রকল্পই বৈদেশিক ঋণনির্ভর। গ্রেস পিরিয়ড শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের চাপ দ্রুত বাড়ছে ফলে সামষ্টিক ঋণঝুঁকি আরও তীব্র হচ্ছে
- প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, নকশা ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দুর্বলতা ও দুর্নীতি স্পষ্ট। রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প বাছাইয়ের প্রবণতা বেড়েছে
- সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে। সাতটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে ৮০,৫৬৯ কোটি টাকা (প্রায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি)
- বাংলাদেশে নির্মাণ ব্যয় প্রতিবেশী দেশের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বেশি। চার-লেন সড়ক নির্মাণে প্রতি কিলোমিটারে বাংলাদেশে গড়ে ৬.৩৫ মিলিয়ন ডলার খরচ হলেও ভারতে ১.৪৫ মিলিয়ন ডলার ও চীনে ৩.৯০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়ে থাকে
- ক্রয় ও দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি প্রকট। ই-প্রকিউরমেন্টে শীর্ষ পাঁচ শতাংশ প্রতিষ্ঠান মোট চুক্তির ৬৮ শতাংশ পেয়েছে; প্রায় এক-পঞ্চমাংশ প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট একক দরপত্রে সম্পন্ন হয়েছে
- ভূমি অধিগ্রহণ ও নকশা পরিবর্তনের কারণে প্রকল্প-ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথে ভূমি অধিগ্রহণ খরচ ১২ গুণ এবং কর্ণফুলী টানেল সংযোগ সড়কে প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ সম্ভাব্যতা যাচাই ও বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণে বিভিন্ন প্রকল্পের রিটার্ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কর্ণফুলী টানেলসহ বেশকিছু প্রকল্প প্রত্যাশিত রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হচ্ছে
- আইএমইডির মূল্যায়ন ও তদারকি ব্যবস্থা কার্যকর নয়। বছরের পর বছর একই সমস্যা চিহ্নিত হলেও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো তা আমলে নিচ্ছে না
- টাকার অবমূল্যায়ন ও ঋণ পরিশোধের বাড়তি চাপ সামলাতে টোল, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম এবং ভর্তুকি বৃদ্ধির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে

১৯.১ প্রেক্ষাপট, উদ্বেগ ও কতিপয় প্রশ্ন

পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং সামাজিক সেবামূলক খাত যেমন: স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে, এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহের ও উন্নয়নের অনুঘটকের জন্য এটি অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বিগত কয়েক বছরে সরকার অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে জনপরিকাঠামো প্রকল্প (পিআইপি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশে একাধিক বৃহৎ আকারের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিপুল সম্পদ ব্যয় করা হয়েছে। যেগুলো সাধারণত ‘মেগা প্রকল্প’ নামে পরিচিত। এগুলো বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সেবার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা ছিল।

তবে এই ধরনের অনেক জনপরিকাঠামো প্রকল্প (পিআইপি) বাস্তবায়নের যৌক্তিকতা, স্থায়িত্ব, ব্যয় পরিচালন ও অর্থায়ন, প্রকল্প থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ও বাস্তবায়নের দুর্বলমান ইত্যাদি সমন্ধে বিভিন্ন গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তাই গভীরতর অনুসন্ধানের দাবি রাখে। জনগণের করের টাকায় বিপুল অংকের বাজেট বরাদ্দ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা গেলে আগামী দিনে যথাযথভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর গ্রহণ ও সুশাসনভিত্তিক বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এ অধ্যায়ে নির্দিষ্ট মেগা প্রকল্পের গভীর পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা

*এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি ও কোর গ্রুপ সদস্য, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ।

হয়েছে। একইসঙ্গে, এসব বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশিত রিটার্ন বা আয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংশোধনমূলক পদক্ষেপের সুপারিশও করা হয়েছে।

মেগা প্রকল্পে মেগা অংকের ব্যয়ের যৌক্তিকতা এবং কাজক্ষিত সুফল কতটা মিলেছে তার পর্যালোচনা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথরেখা নির্ধারণের নীরিক্ষে অত্যন্ত জরুরি। বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য দুর্বলতাগুলো তুলে ধরাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটা আরও জরুরি এ কারণে যে, মেগাপ্রকল্পের ব্যয়সহ পুরো বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে প্রায় সব মেগাপ্রকল্পেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক অর্থায়নের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। যদি এ থেকে প্রত্যাশিত লাভ না হয় তাহলে কেবল জনগণ তাদের প্রত্যাশিত সুবিধা ও লাভ থেকে বঞ্চিত হবে না, বরং দেশ একটি বিপজ্জনক ঋণের ফাঁদে পড়তে পারে। যেমনটা প্রায়শ মধ্যম আয়ের দেশসমূহের ক্ষেত্রে আমরা দেখি। অভিজ্ঞতা বলে যে, একবার এ ফাঁদে পড়লে তা থেকে বেরিয়ে আসা বেশ কষ্টসাধ্য।

এ অধ্যায়ের আলোচনায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ইস্যুসমূহ সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মোটাদাগে সেগুলো হলো:-

১. মেগাপ্রকল্পগুলোর সম্ভাব্যতা অধ্যয়নের মান;
২. ঋণের শর্তাবলী, প্রকল্পের ধারাবাহিকতা ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
৩. ক্রয় প্রক্রিয়া ও বারংবার সময় ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম, এবং
৪. বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কাজক্ষিত ফলাফল প্রাপ্তির ওপর এর প্রভাব।

এসব বিষয় বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি বর্তমান আলোচনায় মেগা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কিছু করণীয় ও সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাস্তবায়নকৃত ও বাস্তবায়নাধীন মেগাপ্রকল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম ৭টি হলো : ১) পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, ২) কর্ণফুলী টানেল, ৩) ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভলপমেন্ট প্রকল্প, ৪) পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প, ৫) দোহাজারি থেকে কক্সবাজার রেল প্রকল্প, ৬) পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর এবং ৭) মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিকাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প। এই ৭টি প্রকল্পের কয়েকটি সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে, কয়েকটি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। বিভিন্ন কারণে এসব প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে আলোচনায় রয়েছে। এবং জনমানসে এসব প্রকল্পের বিষয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য এসব মেগাপ্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র বিশ্লেষণ এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনেকের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। এর থেকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশে সব ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রেই কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় :-

- (ক) প্রায় সব প্রকল্পেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে;
- (খ) বাস্তবায়ন চলাকালীন বেশিরভাগ প্রকল্পেই ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি হয়েছে;
- (গ) সব প্রকল্পেরই ঋণের শর্তাবলী তুলনামূলকভাবে কঠিন, যা বাংলাদেশের পূর্বকার প্রাপ্ত ঋণের শর্তাবলী থেকে ভিন্ন;

(ঘ) বেশকিছু মেগা প্রকল্পের ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে বা নিকট ভবিষ্যতে শুরু হতে যাচ্ছে। এর ফলে দেশের ঋণ পরিশোধের দায়ভার নিকট আগামীতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

১৯.২ মেগা প্রকল্প, মেগা উদ্যোগ

মেগা প্রকল্পের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক নথি, সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি), কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই), প্রাসঙ্গিক লেখালেখি, এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে কিছু গুরুতর উদ্বেগের বিষয় নিচের আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অস্বস্তিকর চিত্রের নমুনা

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) যেসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিয়মিত মূল্যায়ন বা পর্যবেক্ষণ করে তার মধ্যে মেগা প্রকল্পসমূহও অন্তর্ভুক্ত। গত কয়েক বছরে আইএমইডি কর্তৃক প্রস্তাবকৃত বিভিন্ন প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব প্রতিবেদনে পিআইপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি দুর্বলতা ধারাবাহিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদের বিশ্লেষণের অনেক উদ্বেগ এসব প্রতিবেদনেও প্রতিফলিত হয়েছে। তবে হতাশাজনক বিষয় হলো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে আইএমইডির বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ, মন্তব্য ও সুপারিশমালা বছরের পর বছর তুলে ধরা হলেও সেগুলোর নিরীখে কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থাগুলো গ্রহণ করেনি। এমনকি অনেকক্ষেত্রেই এসব বিষয়ে কর্ণপাতই করেনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলো। নীতিনির্ধারণকবন্দ এবং সমস্যাগুলোর সমাধানে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ায় পিআইপি বাস্তবায়নে সুশাসন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটে মেগা প্রকল্পের উদ্বেগগুলোকে আইএমইডির প্রতিবেদনের আলোকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে:-

- (ক) প্রকল্পের প্রস্তুতি ও অনুমোদন পর্যায়;
- (খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়;
- (গ) বাস্তবায়ন পরবর্তী পর্যায়।

এই বিষয়গুলোও সামগ্রিকভাবে সব পিআইপিসহ মেগা-পিআইপিগুলোর ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক।

প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে অসঙ্গতিসমূহ

প্রকল্প প্রস্তুতি ও অনুমোদন পর্যায়

মেগা উন্নয়ন প্রকল্পগুলো গ্রহণের যৌক্তিকতা এবং অর্থ বরাদ্দের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অনেকক্ষেত্রেই উহ্য রাখা হয়েছে। বিশেষ করে, একটি বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী ধরনের অর্থনৈতিক ও আর্থিক রিটার্ন পাওয়া যাবে সেটি প্রায়শই বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। ক্ষেত্রে বিশেষে রাজনৈতিক বিবেচনায় নেওয়া প্রকল্পগুলো আদৌও দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কতোটুকু অগ্রাধিকারের দাবি রাখে ও তার অর্থনৈতিক তাৎপর্য কী সেসব বিষয়ে তথ্যাদি স্পষ্ট করা হয়নি। প্রকল্প গ্রহণের আগে সম্ভাব্যতা যাচাইসহ বেশকিছু ক্ষেত্রে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন :-

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যকরিতা নিয়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় (ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি) দুর্বলতা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ না করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে প্রয়োজনীয় সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন থেকে জমি অধিগ্রহণের প্রাথমিক অনুমোদন না নেয়া। এবং এসব কারণ দেখিয়ে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি করা;
- প্রকল্প নির্বাচন করার সময় সরকারের নিজস্ব মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর (MTBF) আর্থিকসীমা ও শৃঙ্খলা মেনে না চলা;

- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য প্রাথমিক তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ না করা;
- প্রকল্পের জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত নির্গমন পরিকল্পনা বা এক্সিট প্লান প্রস্তুত না করা;
- প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত স্থানীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিসহ অর্থনীতির সংশ্লিষ্ট চাহিদাসমূহ সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করা;
- স্বার্থাশ্বেষী গোষ্ঠীসমূহ কর্তৃক ‘নিজস্ব প্রকল্প’ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রকল্পের অনুমোদন ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা;
- বিকল্প পরিস্থিতি (alternative scenarios) প্রস্তুত না করা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়

যথাপোযুক্ত সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়া মেগা প্রকল্প গ্রহণ করায় প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়েও বেশ কিছু গুরুতর সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। দুর্বলভাবে প্রণীত ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির পরবর্তীতে যখন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে তখন অনেক দুর্বলতা থেকেই গেছে। এক টাকা আয় করার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ এক টাকা ব্যয় সাশ্রয় করা। কিন্তু বাংলাদেশের মেগা প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে উল্টো ঘটনা ঘটেছে বললে ভুল হবে না। ব্যয় সাশ্রয়ের বদলে কত ভাবে ব্যয় বাড়ানো যায়, কীভাবে প্রয়োজন না থাকার পরও নতুন নতুন অনুখাত সংযোজন করে ব্যয় বাড়ানোর নজিরও রয়েছে মেগা প্রকল্পের ক্ষেত্রে। যেমন:

- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়কালে একাধিকবার প্রকল্প সংশোধন এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত সংশোধন;
- ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোফাইল (ডিপিপি)-এ উল্লিখিত কাজের সময়সূচি এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা;
- মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা;
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতায় দুর্বলতা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং স্টয়ারিং কমিটির নিয়মিতভাবে বৈঠক না করা;
- প্রধান ঠিকাদার কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ করা। এটা বাস্তবায়নের গুণগত মান ও জবাবদিহিতাকে দুর্বল করেছে;
- সংশ্লিষ্ট চুক্তিবদ্ধ সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে প্রকল্প সম্পন্নের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য বারবার অনুরোধ করা, যা সময় ও ব্যয়ের অতিরিক্ত বৃদ্ধির কারণ হয়েছে;
- সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনে জটিলতা।

প্রকল্প পরবর্তী পর্যায়

প্রকল্প গ্রহণের আগে অনেকক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় সম্ভাব্যতা যাচাই না করার ধারাবাহিকতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন উঠবে এটাই স্বাভাবিক। মূলত রাজনীতিবিদ, আমলা ও বিভিন্ন স্বার্থাশ্বেষী গোষ্ঠীর বিবেচনাকে প্রাধান্যে দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কারণে অনেক প্রকল্পেই স্থানীয় জনগোষ্ঠীসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যয় অনুপাতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকায় অনেকক্ষেত্রেই প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের সাধারণ নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করার উদাহরণও দেখা যায়। যেমন:

- প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে আইএমইডিতে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) দাখিল না করা;
- প্রকল্প সমাপ্তির পর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের অভাব;
- প্রকল্পে ব্যবহৃত অবকাঠামো ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের অভাব;
- পিআইপি বাস্তবায়ন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ মানবসম্পদের অভাব, যা বিদেশি ঠিকাদারদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সেবা চুক্তি স্বাক্ষরের দিকে পরিচালিত করে;

- নির্ধারিত সময়ের পরে মেগাপ্রকল্পগুলোর রিটার্ন বা উপকারিতা মূল্যায়নের কার্যকর ব্যবস্থা না থাকা এবং ফলাফলগুলোকে ডিপিপি ও আরডিপিপিতে উল্লিখিত লক্ষ্যগুলোর সাথে তুলনা না করা।

প্রশ্নবিদ্ধ সমীক্ষা প্রতিবেদন

প্রায় সব মেগা প্রকল্পের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, এসব প্রকল্প একাধিকবার সংশোধন করতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এর একটি প্রধান কারণ ছিল নিম্নমানের সমীক্ষা প্রতিবেদন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কমিটিতে মেগা প্রকল্পের জন্য পরিচালিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন ও আনুমানিক হিসাব যাচাই করতে সক্ষম দক্ষ বিশেষজ্ঞদের রাখা হয়নি। ফলে অনভিজ্ঞতা ও ত্রুটির কারণে প্রকল্পের নকশায় পরিবর্তন করতে হয়েছে এবং ঘন ঘন সময়সীমা সংশোধন করতে হয়েছে। একইসঙ্গে সময় বৃদ্ধির সুযোগে কয়েক দফায় ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আবার অনেক সময় দেখা গেছে, সংশোধিত ডিপিপির (আরডিপিপি) নির্দেশনারভিত্তিতে পরবর্তীতে ক্রয় প্রক্রিয়া প্রাথমিক ক্রয় প্রক্রিয়ার মতো কঠোরভাবে পরিচালিত হয়নি। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট আন্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প। যদিও এ ধরনের ব্যত্যয় অধিকাংশ প্রকল্পের ক্ষেত্রেই সাধারণ ঘটনায় পরিণত হতে দেখা গেছে। কারণ প্রতিটি প্রকল্পেই এমনটি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৮৬.৪% প্রকল্পে সময় বৃদ্ধি, ব্যয় বৃদ্ধি অথবা সময় ও ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে (ইকবাল প্রমুখ, ২০২৩)। সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির অতিরিক্ততা বেশিরভাগ প্রকল্পের যথার্থতা ক্ষুণ্ণ করেছে। এবং অর্থনৈতিক যৌক্তিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের ঘাটতি হয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ রয়েছে।

কালক্ষেপন ও ব্যয় বৃদ্ধি

বাংলাদেশের মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। উপরের উল্লেখিত যে ৭টি প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে, সেখানে প্রথম ডিপিপি থেকে সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপির মধ্যে ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে ৮০ হাজার ৫৬৯ কোটি টাকা! প্রাথমিক প্রাক্কলিত বাজেটের তুলনায় এ ব্যয় বৃদ্ধির হার ছিল ৭০.৩ শতাংশ। যেহেতু কিছু প্রকল্পের কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি, এসব প্রকল্পের চূড়ান্ত ব্যয় আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা।

এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, কিছু প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির পেছনে যৌক্তিক প্রয়োজন ছিল। কিন্তু, অনেকক্ষেত্রেই তা স্বচ্ছতার সাথে করা হয়নি। এসব মেগা প্রকল্পের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রায়শই অবহেলা করা হয়েছে, তা হলো প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন সম্পর্কিত। অধিকাংশ মেগা প্রকল্পেই পরবর্তীতে নকশায় পরিবর্তন করা হয়েছে। এমনকি প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ভেঙে ফেলে নতুন করে সংশোধিত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করার উদাহরণও আছে। প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হিসাবে মেট্রোরেল নির্মাণের সময় বেশকিছু ক্ষেত্রে যাত্রীদের উঠা-নামার বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ভুলভাবে সরকারে নকশা প্রণীত হয়েছে ফলে নির্মাণকাজের মাঝামাঝি এসে বেশিরভাগ জায়গায় ফুটপাথের ওপর দিয়ে ওঠা নামার সিঁড়ি এবং লিফট বসাতে হয়েছে।

অনেকেই জানেন, বাংলাদেশে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য অনেক বিধান, নিয়মকানুন এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (SoPs) বিদ্যমান আছে। কিন্তু বিভিন্ন নথিপত্র পর্যালোচনা, এফজিডি এবং কেআইআই থেকে জানা গেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুশাসন ও জবাবদিহিতার এসব বিধান সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়নি। বিদেশি অংশীদাররা সরকারি নির্দিষ্ট বিধান মেনে চলার ওপর জোর দিলেও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা অনেকক্ষেত্রেই তা গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করেনি। এতে বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়েছে। আবার কিছু প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণের বিভিন্ন শর্তাবলীর কারণে এই নির্দেশিকা অনুসরণ করা

সম্ভবও হয়নি। যেমন: একক দেশভিত্তিক ও সীমিত দরপত্র এক্ষেত্রে তথা পদ্মা রেল লিঙ্ক প্রকল্প এবং কর্ণফুলী টানেল প্রকল্পে চীনা সহায়তায় প্রদত্ত ঋণ এবং ভারতের লাইস অফ ক্রেডিটের (LOCs) আওতায় প্রকল্পগুলোর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

ফলাফলের সন্দেহজনক পূর্বানুমান

আর্থিক ও অর্থনৈতিক আয়ের অনুমান

শুধু মেগা প্রকল্প নয়, সব ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রেই বিনিয়োগের মুনাফা বা রিটার্নের হিসাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, মেগা প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে কী রিটার্ন আসতে পারে সেটা পর্যালোচনা জরুরি। তবে অনেকক্ষেত্রেই এই হিসাব যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়নি। ফলে এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নজরদারি ও কঠোরতার অভাব ছিল বলেই প্রতীয়মান হয়। যেমন: কর্ণফুলী নদীর টানেলের নির্মাণ ব্যয় ২০১৫ সালের ডিপিপি থেকে ২০২২ সালের সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) তে ২৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও আর্থিক বিশ্লেষণের ও লভ্যতা ও রিটার্নের পূর্বানুমানে কোনো পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ ব্যয় বৃদ্ধি করেও কোনো বাড়তি সুবিধা বা উপকার আসেনি ঐ প্রকল্প থেকে। অথচ জনগণের কর থেকে বিশাল অংকের টাকা বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এগুলোর বাস্তবায়নে। সাধারণভাবে ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠান সবক্ষেত্রেই বিনিয়োগের প্রাক্কালে হিসাব করা হয় বিনিয়োগকৃত টাকার বিপরীতে কতটা রিটার্ন বা উপকারিতা আসবে। কিন্তু মেগা প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এসব হিসাব অনেক সময়েই বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

কীভাবে মেগা প্রকল্পের ব্যয় দক্ষায় দক্ষায় বৃদ্ধি হয়েছে সে সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় পদ্মা সেতু প্রকল্পের উদাহরণ থেকে। যেমন: ২০০৭ সালে জুলাই মাসে পদ্মা সেতু প্রকল্পের ডিপিপিতে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ১০ হাজার ১৬১ কোটি টাকা। পরবর্তীতে ২০১০ সালে প্রথম সংশোধিত ডিপিপিতে দ্বিগুণ ব্যয় বাড়িয়ে করা হয় ২০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা। ২০১৫ সালের অক্টোবরে ২য় সংশোধনীতে এ ব্যয় বৃদ্ধি করে ২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা করা হয়; আর তৃতীয় সংশোধনীতে ২০২৩ সালের এপ্রিলে আরও চার হাজার কোটি টাকা ব্যয় বাড়িয়ে করা হয় ৩২ হাজার ৬০৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ পদ্মা সেতু প্রকল্পের ব্যয় ১০ হাজার কোটি টাকা থেকে তিন দক্ষায় বাড়িয়ে করা হয় সাড়ে ৩২ হাজার কোটি টাকার বেশি। প্রকল্প বৃদ্ধি তিনগুণেরও বেশি।

দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পগুলোর জন্য যেভাবে লাভ-ব্যয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা-ও প্রশ্নবিদ্ধ। এ কারণে এসব প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন হিসাব গভীর পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। অনেকক্ষেত্রে ব্যয়ের হিসাব স্থির দামে করা হলেও, সুবিধার হিসাব নামমাত্র মূল্যে করা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে প্রকল্প প্রস্তুত আয়ের হিসাব প্রাপ্তিতে বিলম্বিত সময়ের বিবেচনা না করেই মুনাফার হিসাব দেখানো হয়েছে। যা যে কোনো বিবেচনায় যথার্থ বা যুক্তিসঙ্গত নয়।

উচ্চ নির্মাণ ব্যয়

বাংলাদেশে প্রতি কিলোমিটার চার-লেনবিশিষ্ট প্রধান সড়কের নির্মাণ ব্যয় ভারতের তুলনায় প্রায় সাড়ে চারগুণ বেশি। এবং পাকিস্তানের তুলনায় ২ দশমিক ১৫ গুণ বেশি। রংপুর-হাটিকুমরুল চার-লেন সংযোগ সড়কের প্রতি কিলোমিটার নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৬ দশমিক ৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের প্রতি কিলোমিটার ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৭ দশমিক ০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (রহমান, ২০২২)। অন্যদিকে, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা চার-লেন মহাসড়ক প্রকল্পের প্রতি কিলোমিটার ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিলো ১১৩.৭ কোটি টাকা (আলী, ২০২১)। এসবই প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি।

এশিয়া অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক-এআইআইবির পরিসংখ্যান বলছে, চার লেনের সড়ক নির্মাণে প্রতি কিলোমিটারে বাংলাদেশের ব্যয় যেখানে ৬.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, সেখানে চীনে তা ৩.৯০ মিলিয়ন মার্কিন

ডলার, ভারতে এই হার ১.৪৫ মিলিয়ন ডলার, পাকিস্তানে প্রতি কিলোমিটার চার লেন সড়ক নির্মাণে ব্যয় ২.৯৫ মিলিয়ন ডলার, ইন্দোনেশিয়ায় ২.১৫ মিলিয়ন ডলার, ফিলিপিন্সে ১.১৫ মিলিয়ন ডলার এবং তর্কিয়ে তা ১.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সড়কের অতিরিক্ত নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে প্রতিবেদনও প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু যখন এসব নানা সমালোচনা করা হয়েছে, তখন সরকারের পক্ষ থেকে কয়েকটি সাধারণ কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: বাংলাদেশের ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয় বেশি; বেশিরভাগ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আমদানি করার প্রয়োজন হয়। উচ্চ আমদানি শুল্ক এবং বন্যা-প্রবণ এলাকায় নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনার কারণে ব্যয় বেড়ে যায় ইত্যাদি। তবে সরকারি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা আইএমইডির বিভিন্ন প্রতিবেদন, অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের লেখা এবং প্রকল্পের নথি (যার মধ্যে রয়েছে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, ডিপিপি এবং সংশোধিত ডিপিপির পর্যালোচনা) বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির এসব কারণ বিবেচনায় নিলেও নির্মাণ ব্যয়ের এত বিশাল পার্থক্য হওয়ার কথা নয়। অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বেশি অর্থে সড়ক নির্মাণ এবং বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বা পরিস্থিতির বর্ণনা করে ব্যয় বৃদ্ধির পেছনে যে কারণগুলো তুলে ধরা হয় তার যৌক্তিকতা প্রশ্নসাপেক্ষ। এসব সমালোচনা সত্ত্বেও ব্যয় বৃদ্ধির সঠিক কার্যক্রম নির্দিষ্ট করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সংশ্লিষ্টরা বোধ করেননি।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক প্রকল্পটি এক্ষেত্রে আরেকটি কেস স্টাডি হতে পারে। এই প্রকল্পের বিষয়ে আইএমইডির প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়। সেগুলো প্রাধান্যযোগ্য:-

- (ক) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের গুণগত মান যথাযথ ছিল না। মহাসড়কটিতে ধীরগতির যানবাহনের জন্য আলাদা কোনো লেন নেই। রোড ক্রসিংয়ের জন্য কোনও উপযুক্ত আন্ডারপাস বা ফুটব্রিজও নেই।
- (খ) ডিপিপিতে গুরুতর ত্রুটি ছিলো। ফলে পরবর্তীতে সংশোধনী আনতে হয়েছে। আর এ সংশোধনীর ফলে সময় বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যয়ও অনেক বৃদ্ধি হয়েছে;
- (গ) নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত বিটুমিন ছিলো নিম্ন মানের; এ কারণে ব্যয় বৃদ্ধি হলেও সড়ক হয়েছে নিম্নমানের।
- (ঘ) প্রকল্পের প্রাথমিক ডিজাইনে প্রথম ১০ বছরে বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কোনো পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। তবে নির্মাণের পরপরই যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ প্রকল্প মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৭৩৯ কোটি টাকার প্রস্তাব দিয়েছিল। এর পেছনে কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল যে যান চলাচলের সংখ্যা সম্পর্কে ভুল পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। এ মহাসড়কে ট্রাফিক বা যান চলাচল প্রতি বছর ৬ শতাংশ বাড়বে বলে পূর্বাভাসে, দৈনিক ১৬,৪৮৫ যানবাহন চলাচল করবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে দৈনিক যানবাহন চলাচলের এই সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ৩২,০০০;
- (ঙ) প্রকল্পে সড়কের ধারণ ক্ষমতা বা লোডের হিসাব সঠিক ছিলো না;
- (চ) এ মহাসড়ক নির্মাণের বিভিন্ন সময়ে ১২বার পরিচালক বদলি করা হয়েছে। ফলে বারবার পরিচালক বদলির এ কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে এবং ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

যদিও আইএমইডি অসংখ্যবার প্রকল্পের পর প্রকল্প নিয়ে এই ধরনের পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। এতদসত্ত্বেও পরিস্থিতির কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন হয়নি। বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেনি। দুঃখজনক যে, নিজ মন্ত্রণালয় প্রণীত মূল্যায়নের প্রতিবেদনগুলোও আমলে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

প্রতিযোগিতাহীন দরপত্র প্রক্রিয়া

টিআইবি কর্তৃক ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ইজিপি) পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, শীর্ষ ৫ শতাংশ কোম্পানিই ৩০৭টি দরপত্র পেয়েছে যা মোট দরপত্রের ৬৮ শতাংশ! টিআইবির দরপত্র/টেন্ডারিং রেকর্ডের

বিশ্লেষণে, ইজিপি তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রায় এক-পঞ্চমাংশ প্রকল্প চুক্তি (২০১২-২০২৩) একক দরপত্রের ভিত্তিতে ছিল। যার আর্থিক পরিমাণ ছিল প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকার বেশি। মেগা প্রকল্পের চুক্তিসমূহ ইজিপির মাধ্যমে করা হয় না— এক্ষেত্রে প্রকল্পের চুক্তির জটিলতাকে প্রধান কারণ হিসেবে দেখানো হয়। ফলে প্রকল্পের দরপত্র ও ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব দেখা যায়। কারণ দরপত্রগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে কেবল কিছু নির্ধারিত কোম্পানিই দরপত্র জমা দিতে পারে। যার ফলে প্রস্তাবনা জমা দেওয়ার আগে জোটবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ হয়ে সুবিধা নেওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনার সৃষ্টি হয় বলে কি ইনফরমেন্ট বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আলোচনায় উঠে এসেছে।

দুর্নীতিপূর্ণ চর্চা

টিআইবির প্রতিবেদনে ৪৮টি প্রকল্প পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে, প্রকল্পের ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি (অথবা গত ১৫ বছরে সড়ক বিভাগের বরাদ্দের ৪০ শতাংশ) বিভিন্ন প্রতারণার মাধ্যমে অপব্যয় করা হয়েছে (দ্য ডেইলি স্টার, ২০২৪)। প্রকল্পের নথিগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ভূমি অধিগ্রহণের সময় ব্যয়ক্ষীতির কারণে প্রকল্পে বড় ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, একবার প্রকল্প পরিকল্পনা প্রকাশ হলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভূমির দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষত: যখন প্রকল্প সংশোধন করা হয় তখন ভূমি অধিগ্রহণের ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। প্রকল্পের ভেতরের সংবাদ ও তথ্য কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে এই সুযোগ নিতে সাহায্য করে। যেমন: দোহাজারী থেকে কক্সবাজার রেলপথ এবং কর্ণফুলী টানেলের অধীনে মাল্টিলেন সড়কের ভূমি অধিগ্রহণ খরচ যথাক্রমে প্রথম ডিপিপি থেকে সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি পর্যন্ত যথাক্রমে ১২গুণ এবং প্রায় ৫গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রক্রিয়াগত ত্রুটি ও গতি নির্ধারণে সমস্যা

অনেক প্রকল্পই প্রাথমিকভাবে যথাযথ বলে পরিগণিত হলেও পরবর্তীতে সেগুলো কম ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত। এর কারণ হল এসব প্রকল্প অগ্রাধিকার ও প্রয়োজনীয়তার নিরীখে যাচাইবাছাই করা হয়নি। এবং প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ধাপ, ক্রম ও বাস্তবায়নের পরস্পরতা অনুসরণ করা হয়নি। যেমন: কর্ণফুলী টানেলের ক্ষেত্রে যানবাহন চলাচলের পূর্বাভাস অনেকটা অনুমানের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম একটি অনুমান ছিলো, আনোয়ারায় চীনের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন। সংশ্লিষ্টরা আশা করেছিল যে এ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ফলে চট্টগ্রাম ও মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দরগুলোকে কেন্দ্র করে অনেক বেশি যানবাহন চলাচল করবে এবং যথেষ্ট ট্রাফিকের সৃষ্টি হবে। এ প্রকল্পটি একটি সমন্বয়যোগ্য ও কার্যকরী প্রকল্প হবে বলে প্রচারণা চালানো হয়েছিল এবং সেই অনুমাননির্ভর প্রত্যাশা ধরেই ব্যয়বহুল কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেখানে চীনের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হয়নি, তখন গাড়ি চলাচলের পূর্বাভাস অযৌক্তিক বলে পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়। একইসঙ্গে, প্রকল্পটির কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। গণমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও প্রকল্প থেকে মাসিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব থেকে ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে যে কর্ণফুলী নদীর নিচে নির্মিত ব্যয়বহুল এ টানেল নির্মাণ প্রকল্পটি প্রয়োজনীয় লাভজনক নয়। এই প্রকল্পের থেকে লাভবান হতে হলে সমান্তরাল উদ্যোগগুলো সমাপ্ত করতে হবে এবং এটা হয়েতো প্রকল্পের বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণে অনেকক্ষেত্রে বাড়তি কমিটমেন্ট ফি গুনতে হয়।

তেমনি পদ্মা সেতু ও রেল সংযোগের ওপর পরিচালিত অর্থনৈতিক লাভে প্রাক্কলন অনুমান নির্ভরভাবে করা হয়েছিল। প্রয়োজন ছিল এই পরিবহন করিডোরগুলোকে অর্থনৈতিক করিডোরে রূপান্তরিত করা। এজন্য বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ১৭টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন এবং দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোর অর্থনীতিতে ব্যাপকহারে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। একইসঙ্গে, এর মাধ্যমে ভারত, নেপাল ও ভূটানের মধ্যকার উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিবিআইএন-এমভিএ এবং অন্যান্য উদ্যোগগুলোর সুবিধা গ্রহণ করা যাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছিল। অর্থনীতি যে এসব প্রকল্প থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে সেটা নিয়ে বিভিন্ন যুক্তি

প্রদর্শন ও প্রচারণা করা হয়েছিল। যদিও, ইতোমধ্যে রেল সংযোগ প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু অন্য যেসব কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেগুলো এখনও শুরু হয়নি। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে তখন সরকারের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং অর্থনৈতিক রিটার্ন নিশ্চিত হবে। এ ধরনের বিনিয়োগ করে রিটার্নের জন্য দীর্ঘকালীন অপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত নয় যে কোনো বিচারে।

ঋণদাতাদের ঋণ পরিবেবার সমক্ষতা নিয়ে উদ্বেগ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্প বিভিন্ন দেশ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ঋণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং বর্তমানেও অনেকগুলোর বাস্তবায়ন চলমান আছে। কিন্তু প্রায়ই ঋণদাতা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা এমনসব শর্তে ঋণ দেয় যা অনেক ঋণই পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। অনেক ঋণই পরিকল্পনা ও কৌশলগত ডকুমেন্টে উল্লেখিত জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিছু ঋণের শর্ত প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি করে। যেমন: যখন ঋণের শর্তের মাধ্যমে পদ্মা রেল সংযোগ এবং কর্ণফুলী টানেল প্রকল্প চীনের অর্থায়নে হয়েছে। তারা এসব প্রকল্পে এমন বেশকিছু শর্ত দিয়েছিল যা প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। যখন ক্রয়ের সূত্র সীমিত করা হয়, তখন প্রতিযোগিতা সক্ষমভাবে প্রকল্পের ব্যয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কি না তার নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব

মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতির প্রধান কারণ হলো স্বচ্ছতার অভাব। বিশেষ করে যেভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয় এবং প্রকল্প পরিকল্পনা ও কাগজপত্র প্রস্তুত করা হয়, তা যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ। দেখা গেছে অনেক প্রকল্পই যথাযথ যাচাই-বাছাই ব্যতিরেকেই রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে সবসময় কিছু কতিপয় রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও গোষ্ঠি এবং আনুকূল্যভোগী প্রতিষ্ঠানের সুবিধা পাওয়ার পথ আরও প্রশস্ত হয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, তথাকথিত রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার কথা বলে এসব মেগা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও প্রকল্প প্রণয়নের দলিল, ডিপিপি বা আর ডিডিপি প্রতিবেদন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয় না। এগুলো উন্মুক্ত থাকলে প্রকল্পের যৌক্তিকতা, ব্যয় ও বরাদ্দ, ব্যয় বৃদ্ধি, প্রকল্পের কার্যকারিতা এবং প্রকল্প থেকে কাক্ষিত ফলাফল সম্পর্কে স্বাধীন বিশেষজ্ঞ, মিডিয়া এবং আগ্রহী জনগণ সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে পারবে। কিন্তু প্রায়শই গোপনীয়তার ধুমুজালে এগুলোকে আড়াল করা হয়েছে, স্বচ্ছতার অভাব ছিল। জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি ছিল।

১৯.৩ আগামী দিনের দিক নির্দেশনা

মেগা প্রকল্পগুলো নির্বাচন, প্রকল্প প্রণয়ন সম্ভাব্যতা যাচাই, পুনর্বীক্ষণ, ব্যয় বৃদ্ধির আলোচনা-পর্যালোচনা, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ফলাফলের যে সমালোচনামূলক আলোচনা ওপরে উপস্থাপিত হল, তার নীরিখে নিম্নে সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

বিনিয়োগের রিটার্ন ও প্রকল্পের সম্পদের বর্তমান মূল্যের অনুমানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন

মেগা প্রকল্প পর্যালোচনা করে যেসব তথ্য উঠে এসেছে তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিনিয়োগের বিপরীতে প্রাপ্ত রিটার্নের প্রাক্কলন এবং লাভ ব্যয়ের হিসাব (বিসিআর) নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠে এসেছে। ফলে এই বিষয়গুলো আরও প্রমাণাদি ও তথ্য-উপাত্তসহ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কারণ এগুলোর অর্থনৈতিক অভিঘাত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে জনগণের করের টাকা ব্যয় করে এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে; ঋণ পরিশোধের দায়ভারও তাদেরই ওপরে বর্তাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যখন প্রকল্প অতিমূল্যায়ন হয় তখন এসব প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিসেবার মূল্য, টোল হার, বিদ্যুৎ-জ্বালানির মূল্য এবং অন্যান্য সেবার মূল্য বেশি রাখতে হয়, অথবা ভতুর্কি বেশি দিতে হয়। ঋণ পরিশোধ এবং দেশের ঋণ বহনের সক্ষমতার ওপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

এসব বিষয়ে সতর্ক না থাকলে মেগা বা পিআইপি বাস্তবায়নে সুশাসন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে এই উদ্বেগগুলো যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে ও দ্রুতভিত্তিতে সমাধান করা প্রয়োজন।

কোনো প্রকল্প পুনর্বিবেচনা করা হলে কিংবা প্রকল্পের খরচ বাড়লে প্রাথমিকভাবে অনুমিত রিটার্নের পুনঃমূল্যায়ন করা অত্যন্ত জরুরি। যাতে এটা নির্ধারণ করা যায় যে, প্রকল্পটির যথার্থতা বজায় আছে কি না। সমীক্ষা পর্যায়ে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে প্রত্যাশিত লাভের প্রভাব বুঝতে সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করা (Sensitivity analysis) উচিত। এতে করে প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক যথার্থতা ও ন্যায্যতা পরিমাপ করা যায়। প্রকল্পের নথি যেমন: ডিপিপি ও সংশোধিত ডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বেশিরভাগ মেগাপ্রকল্পের ক্ষেত্রেই এটি অনুসরণ করা হয়নি।

ভবিষ্যতে কোনো প্রকল্প সংশোধন করা হলে আর্থিক ও অর্থনৈতিক লাভ এবং ব্যয়-সুবিধার অনুপাতের পুনর্মূল্যায়নও বাধ্যতামূলক করা উচিত। যাতে প্রকল্পের কার্যকারিতা যৌক্তিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তবে এজন্য একটি ভালো উপায় হতে পারে প্রতিবেশী দেশের ব্যয়ের সাথে তুলনা করা। একইসঙ্গে, ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করতে হবে।

দরপত্র প্রক্রিয়ার শক্তিশালীকরণ

মেগা প্রকল্পের ক্রয় ও দরপত্র প্রক্রিয়া নিয়ে বেশকিছু উদ্বেগ রয়েছে। দরপত্র প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করার জন্য স্তরভিত্তিক ব্যবস্থা (চুক্তির পরিমাণের উপর নির্ভর করে) বিবেচনা করা উচিত। এতে দরপত্র জমা প্রক্রিয়া সহজ হবে। একইসঙ্গে, সঠিকভাবে শ্রমের বিভাজন এবং কাজের আদেশ বণ্টনের মাধ্যমে আরও প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়া কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। পাশাপাশি ই-প্রকিউরমেন্ট সিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং এর বিধানগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সম্ভাব্য দরদাতাদের সংঘবদ্ধ আচরণের (collusive behavior) বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে।

সঠিক প্রভাব মূল্যায়ন কার্যকর করা

মেগাপ্রকল্পসমূহ শেষ হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় পর নিয়মিতভাবে এগুলোর আর্থিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রকৃত রিটার্নগুলোর সাথে ফিজিবিলিটি স্টাডিতে পূর্বানুমাননির্ভর রিটার্নসমূহের তুলনা মূল্য বিশ্লেষণ করা উচিত। যার মাধ্যমে ক্রটি শনাক্ত করা যায় এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা নেওয়া যায়। যদিও বেশকয়েকটি বাজেট বৃদ্ধিতে ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (আরবিএম) চালুর বিষয়ে বলা হয়েছিল কিন্তু তা কখনই বাস্তবায়ন করা হয়নি। প্রকল্পের প্রকৃত রিটার্নের সাথে ফিজিবিলিটি স্টাডিতে পূর্বাভাসিত রিটার্নসমূহের একটি তুলনামূলক চিত্র প্রকল্প সমাপ্তির কয়েক বছরের মধ্যে করা উচিত।

আইএমইডির সক্ষমতা বৃদ্ধি

আইএমইডি তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়। আইএমইডি কার্যক্রমের চলমান বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। কারণ কার্যকর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য যথাযথ মানবসম্পদ ও আর্থিক সহায়তা, গুণগত মূল্যায়ন নিশ্চিত করে। ব্যয়ের নিরিখে মূল মন্ত্রণালয়গুলোর অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্ষমতা উন্নত করা প্রয়োজন। ল্যাব পরীক্ষার সক্ষমতা ও পেশাগত উন্নয়ন মান শক্তিশালী করা অপরিহার্য। পাশাপাশি নীতিনির্ধারকদের আইএমইডির স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা বাড়ানোর বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। আইএমইডি কতৃক তাৎক্ষণিক (রিয়েল-টাইম) পর্যবেক্ষণের জন্য ইপিএমআইএস টুলটি পর্যাপ্ত মানবসম্পদ দিয়ে জরুরিভিত্তিতে চালু করা উচিত। এছাড়াও প্রজেক্ট প্ল্যানিং সিস্টেমের (পিপিএস) মাধ্যমে সরসরি (ম্যানুয়াল) জমাদান প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে ই-জমাদান প্রক্রিয়ায় রূপান্তর যতো দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করা উচিত। এক্ষেত্রে বেশকিছু অগ্রগতি ইতোমধ্যেই সঠিক হয়েছে। এ পদ্ধতির দোষ-ক্রটিগুলো শনাক্ত করে যথাযথ উৎকর্ষ বৃদ্ধিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কঠোরভাবে ঋণ চাপ পরীক্ষার পরিচালন

মেগাপ্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে টেকসই ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঋণ চাপ পরীক্ষা পরিচালন করতে হবে। কিছু প্রকল্পের ক্ষেত্রে যেমন দেখা গেছে, বিলম্বে প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার আগেই ঋণ পরিশোধ শুরু হয়ে গেছে। এতে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় বহনের একটি বড় অংশ অর্থায়নকারী যেসব উন্নয়ন সহযোগী তারা বাংলাদেশের ঋণ বহন করার সক্ষমতাকে ঋণ প্রদানের সময় যথাযথভাবে বিবেচনায় আনেনি। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত এসব কার্যক্রম ও মূল্যায়ন নিজ উদ্যোগ ও নিজ স্বার্থে গ্রহণ করা। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে নন-কনসেশনাল (বেশি সুদে) ঋণের পরিমাণ ক্রমান্বয়েই বেড়ে চলেছে। তাই ঋণ পরিশেবা ভারও বাড়বে। একারণেই প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সাবধনতা ও সতর্কতা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন এতটা জরুরি। অসুবিধাজনক ঋণের প্রাধান্যের বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

টাকার অবমূল্যায়নের প্রভাব বিবেচনায় রাখা

সম্প্রতি বাংলাদেশি টাকার উল্লেখযোগ্য হারে অবমূল্যায়ন হয়েছে। ফলে আর্থিক বিশ্লেষণের (এনপিভি, ব্যয়-লাভের অনুপাত, আইআরআর) এ সংশ্লিষ্ট সব ধরনের হিসাবসমূহ পুনঃমূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এর ফলে বিনিয়োগের রিটার্নের সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে। যা প্রকল্পসমূহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও ধারণা দেবে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও যথার্থতা মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেমন: রেলওয়ে খাতে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্মাণ কার্যক্রম, মানবসম্পদ প্রস্তুত, কোচ ও লোকোমোটিভ সংগ্রহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করা গেছে। যা প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম শুরুতে বিলম্ব ঘটিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে প্রকল্পগুলোর সম্ভাব্য সেবা ও সুফল ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

মেগা প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে একাধিক মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এতে প্রকল্পগুলোর সম্ভাব্য সুফল কমে গিয়ে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সকল সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় এবং যথাযথ দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা জরুরি এবং এ লক্ষ্যে জবাবদিহিতার সংস্কার শক্তিশালী করতে হবে।

প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নথির উন্মুক্তকরণ

সব প্রকল্পের নথিপত্র যেমন: ফিজিবিলিটি বা সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, প্রকল্প প্রণয়নের দলিল বা ডিপিপি, সংশোধিত ডিপিপি বা আরডিপিপি এবং পরিবেশের ওপর প্রভাব এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংক্রান্ত নথিপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইট এবং আইএমইডির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা উচিত। অর্থাৎ এসব নথি উন্মুক্ত করে দেওয়া জরুরি। কারণ এই প্রকল্পগুলো জনগণের করের টাকায় বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং দেশের বর্তমান প্রজন্ম ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রকল্পজনিত ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং নাগরিক হিসাবে তাদের এসব প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জানা, বোঝা ও প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে। পাশাপাশি বৃহদাকারের প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে জনসাধারণের সঙ্গে পরামর্শ পূর্বক বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ উভয়ের সুযোগই রাখা উচিত।

অন্যদিকে, আইএমইডির উচিত সব মেগাপ্রকল্পের মূল্যায়ন দৈবনির্বাচনের ভিত্তিতে বাছাই করে প্রতিটিরই আলাদা আলাদাভাবে করা। এটা এ কারণেই প্রয়োজন যে, এসব প্রকল্পে অনেক বড় অংশের অর্থ জড়িত। প্রয়োজনে এ কাজে স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা যেতে পারে। এই প্রতিবেদনগুলো জনসাধারণের আলোচনার ও পর্যবেক্ষণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। একইসঙ্গে, প্রকল্পের শুরুতেই বিভিন্ন দেশের প্রকল্পগুলোর তুলনা করার সুযোগও থাকতে হবে।

ঋণ চুক্তি আলোচনার সক্ষমতা বৃদ্ধি

বিভিন্ন প্রকল্প বিশেষ করে মেগা প্রকল্পের জন্য এডিপি (Annual Development Program) এর আওতায় বিদেশি ঋণ গ্রহণ বাংলাদেশকে আগামীতে অব্যাহত রাখতে হবে, এর সাথে দ্বিমতের সুযোগ নেই। জটিল ঋণ আলোচনা সফলভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষ করে ইআরডিআর (ইকোনমিক রিলেশনস ডিভিশন) প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত সক্ষমতা শক্তিশালী করতে হবে। বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে উত্তরণের পরবর্তীতে ঋণ আলোচনার জটিলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি মেগা প্রকল্পের জন্য নেওয়া ঋণের পরিশোধের সময়সীমা ও ঋণের শর্ত নিয়ে পুনর্বিবেচনার প্রশ্ন যদি আসে তাহলে এ সক্ষমতার এসওএফআর (লাইবর) সুদের হারের দ্রুত উঠানামার প্রেক্ষাপটে নমনীয় হারে ঋণ গ্রহণ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ঋণ কোন মুদ্রায় নেওয়া হবে ও পরিশোধ করা হবে সেটাও আলোচনায় গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হতে হবে। কিছু মুদ্রার বিনিময় হার অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় বেশি তুলনামূলকভাবে দ্রুত উঠানামা করে। সব মিলিয়ে ঋণ চুক্তি সম্পাদন ও ঋণ চুক্তির পর্যালোচনার ক্ষেত্রে দেশীয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানদের পেশাদারী সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। কারেন্সি হেজিং এর দিকেও মনোযোগ দিতে হবে।

প্রযুক্তি হস্তান্তর নিশ্চিত করা

যদিও মেগা প্রকল্পের সব নথিতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের কথা বলা হয়, কিন্তু এটি কার্যকরভাবে অনুসরণ করা হয় না। ফলে প্রকল্প শেষ হলে অনেক প্রকল্প বিদেশি বাস্তবায়নকারী সংস্থার দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকে। যার কারণে চলমান ব্যয় বৃদ্ধি পায় ও তা দেশের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে। মেগা প্রকল্পসমূহে এসব বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা উচিত। যাতে করে স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য নির্দিষ্ট সময়ের পরে প্রকল্প পরিচালন কাজ বুঝে নিতে পারেন। যেখানে নির্ধারিত সময়সীমা ও ফলাফলও উল্লেখ থাকবে।

মেগাপ্রকল্প ও ঋণ ব্যবস্থাপনা

বিদেশি অর্থের ওপর নির্ভরশীল মেগা প্রকল্পগুলোকে ঋণ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঋণ পরিশোধের চাপের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

(ক) প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন রোড ম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রে পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ঋণের বোঝা বেড়ে যায়।

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধিক মূল্যে পূর্বে বাস্তবায়িত ব্যয়কে প্রকল্প খরচ রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

(গ) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মেগা প্রকল্পসমূহে অর্থায়নকারী দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অংশীদারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা, ঋণ পরিশোধের সময়কাল বা গ্রেস পিরিয়ড বৃদ্ধি এবং পরিশোধের সময়সীমা সম্প্রসারণের কথা বিবেচনা করতে পারে। এটি বিশেষভাবে প্রয়োজন কারণ ঠিকই আগামীতে ঋণ পরিশোধের দায়ভার বাড়তে থাকবে যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে ওইসিডি কাঠামোকে রেফারেন্স হিসেবে বিবেচনা করা

ওইসিডি প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য ১০টি স্তম্ভ ও ৪৭টি সূচক সম্বলিত একটি কাঠামো প্রস্তুত করেছে। এই কাঠামো বাংলাদেশের জন্য উপযোগী করে প্রস্তুত করলে বিন্যস্ত বাংলাদেশের মেগা প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তা ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। এ ধরনের ফ্রেমওয়ার্ক প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, কার্যাদেশ প্রদান, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, ব্যবস্থাপনাসহ সব ক্ষেত্রে সুফল আনতে পারে। অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে। প্রকল্পের গুণগত মানসম্মত বাস্তবায়নও সম্ভব হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশে মেগা প্রকল্পসহ অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় স্থানীয় অথবা বৈদেশিক ঋণের টাকায় বাস্তবায়িত হয়। দিন শেষে জনগণের করের টাকা দিয়েই এসব ঋণের দায় পরিশোধ নিশ্চিত করতে হয়। বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য এ ধরনের আরও অনেক প্রকল্প নিতে হবে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয়িত অর্থের গুণগত মান নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। উপরের আলোচনায় বিভিন্ন অসঙ্গতি উঠে এসেছে। এসব অসঙ্গতি দূর করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অবিলম্বে মনোযোগ দিতে হবে। এসব প্রকল্প সুশাসনের সাথে, সময় নির্দিষ্টভাবে এবং সাশ্রয়ীভাবে বাস্তবায়ন করলে সময়মত দায় পরিশোধ সমস্যা হবার কথা নয়। সমস্যা হয় যখন এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতি, কালক্ষেপণ, টাকা পাচার ইত্যাদির কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায় ও ইঙ্গিত ফলাফল ও রিটার্ন পাওয়া না যায়। অভিজ্ঞতা বলে ঋণ-নির্ভর মেগা প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন নিশ্চিত করা না গেলে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের ফাঁদে পড়তে পারে। এবং বিপজ্জনক ও বাধ্যতামূলক ঋণ ফাঁদে আটকা পড়তে পারে। এক্ষেত্রে সতর্ক ও সাবধান হবার এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের এখনই সময়।

অধ্যায় ২০ – অবৈধ সম্পদ পাচারের দৃষ্টান্ত*

- দুর্নীতি, ঘুষ, ব্যাংক লুট, আন্ডার-ওভার ইনভয়েসিং, ছদ্ম ও স্বর্ণ চোরাচালানকে ঘিরে গড়ে ওঠা জটিল দৃষ্টচক্রের মাধ্যমে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হচ্ছে
- ২০০৯-২০২৪ সময়ে বাংলাদেশ থেকে আনুমানিক ২৩৬ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে— গড়ে বছরে প্রায় ১৬ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ১.৮ লাখ কোটি টাকা), যা বার্ষিক জিডিপি প্রায় ৬ শতাংশের সমান
- পাচারকৃত অর্থের প্রধান গন্তব্য হলো সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও বিভিন্ন ট্যাক্স-হেভেন, যেখানে পাচারকৃত অর্থ রিয়েল এস্টেট ও বিভিন্ন ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়েছে
- অর্থপাচারের সবচেয়ে বড় পথ বাণিজ্যের আড়ালে, পণ্যের দাম কম-বেশি দেখানো (ট্রেড-বেইজড মানি-লন্ডারিং)। আমদানিতে কর ফাঁকি এবং রপ্তানিতে আয় বাইরে রেখে দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে
- রাষ্ট্রীয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর (বিএফআইইউ, দুদক, এনবিআর ও কাস্টমস) মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে, প্রায়োগিক দুর্বলতা প্রকট ও প্রয়োগ দুর্বল এবং তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতির। এসব রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নয়
- পাচারকৃত অর্থ ফেরাতে আইনি পদক্ষেপ, ফরেনসিক তদন্ত ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করতে হবে; স্বাধীন প্রসিকিউশন ইউনিট ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে উদ্যোগ-উদ্যম বেগবান করা অত্যন্ত জরুরি।
- বাণিজ্যের আড়ালে অর্থপাচার রোধে রিয়েল-টাইম মূল্যতথ্য, কাস্টমস বুঁকি-বিশ্লেষণ ও ব্লকচেইনভিত্তিক ট্র্যাকিং প্রযুক্তি চালু করা দরকার
- পাচার দমনে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রভাবমুক্ত প্রতিষ্ঠান ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরোধ ও প্রতিকার

২০.১ প্রাসঙ্গিকতা এবং সমস্যার মাত্রা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে থেকে অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ বিদেশে পাচার করার বিষয়টি ভয়াবহ ও বহুমাত্রিক সমস্যায় রূপ নিয়েছে। এ সমস্যা ক্যান্সারের মতো দেশের অর্থনীতিকে ক্রমাগত দুর্বল করে ফেলেছে। অর্থপাচারের এ দৃষ্ট প্রক্রিয়ার সাথে দুর্নীতিগ্রস্ত বিভিন্ন ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতায় জটিল দৃষ্টচক্র গড়ে উঠেছে— এর সাথে আছে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, অসাধু ব্যবসায়ী, সহায়ক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মুনাফা ও মধ্যস্বত্বভোগী, অসৎ সরকারি কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন অতিলোভী ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। অর্থপাচারের সাথে জড়িতরা সরকারের, আর্থিক, আইনি, বিচারিক এবং প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুর্নীতির বেড়াজালে আটকেপুটে বেঁধে ফেলে বিনিয়োগ ও রাজস্ব আহরণ ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। তাদের এই লাগামহীন অর্থপাচারের কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বিপজ্জনকহারে হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকেও তারা ব্যাপকভাবে দুর্বল করেছে। সর্বক্ষেত্রে সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে, বর্তমান অধ্যায়ে যেসব ইস্যুকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো বাংলাদেশ থেকে পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ নিরূপণ, অর্থপাচারের উৎস ও চ্যানেলগুলো চিহ্নিত করা, চুরি যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারের সম্ভাব্য পদক্ষেপ এবং এ গুরুতর সমস্যা মোকাবিলায় ভবিষ্যতে কী কৌশল নেওয়া যায় তার আলোচনা।

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি ও কোর গ্রুপ সদস্য, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ।

২০.২ অর্থ পাচারের উৎস এবং পরিমাণ

বিদেশে পাচারকৃত অর্থের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা দূরহ, এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যাদি যাচাই করে এর পরিমাণ, উৎপত্তি, পাচারের রুট এবং এ অর্থ কোথায় কীভাবে গচ্ছিত আছে এগুলো সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যায়।

অর্থপাচারের উৎস ও ধরন

বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচারে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় আর এর উৎসও বহুমাত্রিক। অবৈধভাবে পাচারের অর্থ বেশিরভাগই অবৈধ। আবার কিছুক্ষেত্রে বৈধ কার্যক্রমের মাধ্যমেও এ অর্থ অর্জিত হতে পারে। বড় অংশেরই উৎপত্তিস্থল হল বিভিন্ন ধরনের অবৈধ ও অনৈতিক কার্যক্রম। যেমন: দেশের অভ্যন্তরে ঘুষ ও দুর্নীতি, আর্থিক অপরাধ, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্যে কারসাজি, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে অর্থ লোপাট ও ঋণ পরিশোধ না করা, কমিশন বাণিজ্য বা রেন্টসিকিং কার্যক্রম, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও প্রভাব খাটানো, উন্নয়ন প্রকল্পে বাড়তি ব্যয় দেখিয়ে তছরূপ করা, শেয়ার বাজার কেলেকারির মাধ্যমে টাকা আত্মসাৎ, প্রবাসীকর্মী প্রেরণের নামে সিভিকিট করে অর্থ আদায়, কর ফাঁকি, মাদক ও মানব পাচারের মতো অপরাধসহ বিভিন্ন অবৈধ কার্যক্রম।

আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈধ উৎস থেকেও অর্থপাচার হয়ে থাকে। যেমন: দেশে পরিচালিত ব্যবসা ও পেশাগত কার্যক্রম থেকে অর্জিত আয় কম দেখানো ও কর ফাঁকি এবং তার একটা অংশ বাইরে পাচার; উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির বিক্রির অর্থ বাইরে পাচার ইত্যাদি। এভাবে অবৈধ চ্যানেলে বৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থও বাইরে চলে যাচ্ছে। এর মধ্যে এমন অর্থও রয়েছে যা দেশে ফিরিয়ে আনার কথা ছিল কিন্তু তা বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছে (যেমন: রপ্তানিতে আন্ডার-ইনভয়েসিং বা অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ ইত্যাদি)।

বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যেমন: মানবপাচার, অস্ত্রকারবার, ড্রাগস ব্যবসা ইত্যাদির মাধ্যমেও বড় অংকের অবৈধ অর্থের লেনদেন হয়, যা অর্থপাচারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। আগে অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের বড় অংশ দেশের অভ্যন্তরেই বিনিয়োগ করা হতো— যা দেশে একটি ছায়া অর্থনীতির জন্ম দিত। এবং এ অর্থের একটি বড় অংশ ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগের অংশ ছিল। ব্যতিক্রম হলো সাম্প্রতিক সময়ে, ক্ষমতার বলয়ে থাকা দুর্নীতিবাজ ও ব্যাংক লুটেরারা এসব অবৈধ সম্পদধারীরা অর্থ দেশে না রেখে বিদেশে নিয়ে যেতেই বেশি আগ্রহী। বিদেশে পাচারকৃত অর্থ যথেষ্ট ভোগ বিলাসের জীবন যাপন এবং আর্থিক ও রিয়েল এস্টেটসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করাকেই তারা নিরাপদ মনে করে।

অর্থপাচারের পরিমাণ

অর্থপাচার অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হতে থাকে এবং তা করা হয় অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে। একারণে পাচারকৃত অর্থের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ সহজ কাজ নয়। তবে তার মানে এই নয় যে, বিশ্বে পাচারকৃত অর্থের পরিমাণের অনুমান নির্ধারণ করার চেষ্টায় কোনো ঘাটতি আছে এবং তার প্রতিরোধের চেষ্টায় কোনো ত্রুটি আছে। এটা নানা প্রক্রিয়ায় করা হয়- কোথায় সম্পদ স্থানান্তরিত করা হয়েছে, কোন ব্যাংক হিসাবে টাকা গচ্ছিত আছে, কোথায় রিয়েল স্টেট কেনা হয়েছে, কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, বিনিয়োগ করা হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান পাচারকৃত অর্থ পরিমাপের চেষ্টা করেছেন তার মধ্যে ২০০৮ সাল থেকে বছরান্তে প্রকাশিত গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউট রিপোর্ট (জিএফআইআর) এবং ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্কের রিপোর্টগুলো উল্লেখযোগ্য। আংশিকভাবেও কিছু প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন—পাচারকৃত অর্থ ব্যবহার করে বিদেশে কেনা সম্পদ খুঁজে বের করা বা ট্যাক্স হেভেনে (কেম্যান দ্বীপ, আইল অফ ম্যান ইত্যাদি) বিনিয়োগ করা অর্থের পরিমাণ দ্বারা বা সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ট্র্যাক করে।

এখানে জিএফআইআর থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে কারণ তাদের ব্যবহৃত পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। জিএফআইআর ধারাবাহিকভাবে অর্থপাচারের একটি সংখ্যাগত ধারণা দিয়ে আসছে। এসব হিসাবের একটা বড় উৎস ছিল কমট্রেড থেকে নেয়া বিভিন্ন দেশের প্রেরিত আমদানি-রপ্তানির তথ্য/উপাত্ত। এর ওপর ভিত্তি করেই ট্রেড মিসপ্রাইজিং এর মাধ্যমে যে অর্থপাচার করা হয়ে থাকে (রপ্তানি আয় প্রকৃত আয়ের থেকে কম দেখিয়ে দেশ থেকে অর্থ বাইরে পাচার)। এফআইআর এর পদ্ধতিতে মোট অর্থপাচারের তিন-চতুর্থাংশই হয়ে থাকে বাণিজ্যের মাধ্যমে বাণিজ্য-মূল্যের কারসাজির সাহায্য নিয়ে। সেখানে বাংলাদেশের তথ্য আছে ২০০৯ থেকে ২০১৩ ও ২০১৫ সাল পর্যন্ত। ২০১৫ সালে যখন বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক অর্থপাচারের বিষয়টি নিয়ে অনেক লেখালেখি হলো, কারা পাঠাচ্ছে তাদেরকে শনাক্ত করার দাবি উঠলো, কী পদ্ধতিতে পাঠানো হচ্ছে তা শনাক্ত করার দাবি উঠলো। কেনই বা কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ অর্থপাচারকারীদের বিরুদ্ধে নেওয়া হচ্ছে না; এসব নিয়ে প্রশ্ন উঠলো। তৎকালীন সরকার ও নীতি নির্ধারকরা এর প্রেক্ষিতে কী সিদ্ধান্ত নিলেন? ২০১৫ এর পর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) কমট্রেড ডাটাবেসে বাংলাদেশের তথ্য পাঠানো বন্ধ করে দিলো। ফলশ্রুতিতে, যেহেতু জিএফআইআর কমট্রেড ডাটাবেস থেকেই বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে থাকে, তারা ২০১৫ এর পর আর বাংলাদেশের অর্থপাচারের কোনো হিসাব দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে, ২০০৯ থেকে ২০১৫ এর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ট্রেড লাইনের ওপর নির্ভর করে হিসাব করা হয়েছে, পরবর্তী বছরগুলোর জন্য। বাংলাদেশে সম্প্রতি রপ্তানি আয়ের পরিমাণ যেহেতু নিম্ন মাত্রায় পুনর্নির্ধারিত হয়েছে, এ প্রাক্কলনে সেটাকেও বিবেচনা করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, অর্থপাচার যেহেতু বহুমাত্রিক ও অদৃশ্য পর্দার আড়ালে সংঘটিত হয়, সঠিকভাবে পরিমাপ করা সহজ নয়। তবে এ লেখায় যে মাত্রায় অর্থপাচারের হিসাব দেওয়া হয়েছে তা জিএফআইআর এর পদ্ধতিকে অনুসরণ করে অর্থপাচারের একটা অনুমিত হিসাব দেয় যার থেকে অর্থপাচারের মাত্রা ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

অন্যান্য তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে জানা যায় যে, বাংলাদেশ থেকে আনুমানিক প্রায় ২৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা অবৈধভাবে পাচার হয়েছে। পাচারকৃত এই অর্থের পরিমাণ বাংলাদেশের বার্ষিক জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশের সমান। অন্যভাবে বললে এটি ছিল ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে পণ্য ও সেবার রপ্তানি এবং রেমিট্যান্স থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় এক পঞ্চমাংশ এবং জাতীয় সঞ্চয়ের প্রায় ১১ দশমিক ২ শতাংশ। এছাড়া এই অবৈধ অর্থপাচারের গড় পরিমাণ একই সময়ে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য এবং সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ-এফডিআই প্রবাহের পরিমাণের দ্বিগুণেরও বেশি।

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তরের (ইউএনওডিসি) মতে, বৈশ্বিক জিডিপির ২ থেকে ৫ শতাংশ বা ৮০০ বিলিয়ন থেকে ২০০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ প্রতিবছর অবৈধভাবে পাচার হয় বিশ্বজুড়ে। এই অর্থের ওপর ২৫ শতাংশ হারে কর আরোপ করলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাপ্ত মোট কর রাজস্বের প্রায় ৯ দশমিক ৮ শতাংশের সমপরিমাণ রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হতো।

বাংলাদেশ থেকে পাচারকৃত অবৈধ অর্থের গন্তব্য প্রধানত ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), যুক্তরাজ্য, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, হংকং, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারত এবং বিভিন্ন ট্যাক্স-হেভেন খ্যাত ছোট দ্বীপদেশ। স্বশরীরে উপস্থিত না থেকেও পাচারকৃত অর্থ সেসব দেশে আবাসন খাতে এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিনিয়োগ করার সুযোগ পাওয়া যায়। বৈশ্বিক গবেষণায় দেখা যায়, ঘুষ-দুর্নীতিসহ অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ ও অর্থ ক্রমবর্ধমানহারে রিয়েল এস্টেট, উদ্যোক্তা হিসাবে ব্যবসা এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। অনেক দুর্নীতিপরায়ণ বাংলাদেশি এই সুবিধা ব্যবহার করেছে।

বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচারের পরিমাণ সম্পর্কিত কিছু ধারণা বিভিন্ন উৎস থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় ট্যাক্স অবজারভেটরির ২০২৪ সালের তথ্যমতে, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ৫৩২ জন ব্যক্তি দুবাইতে ৩৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের জায়গা-জমিসহ সম্পত্তির মালিক ছিলেন। আবার সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড ডিফেন্স স্টাডিজ (সিএডিএস) এর প্রতিবেদনে ৪৫৯ জন বাংলাদেশি দুবাইতে ৩১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মোট ৯৭২টি ফ্ল্যাটসহ আবাসন সম্পত্তির মালিক বলে উল্লেখ করেছে।

২০২৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত, মালয়েশিয়ার সেকেন্ড হোম স্কিমের আওতায় ৩,৬০০ এর বেশি বাংলাদেশি নিবন্ধিত ছিলেন। ২০২১ সালে বাংলাদেশিদের অফশোর আর্থিক সম্পদের পরিমাণ ছিল আনুমানিক ৮ দশমিক ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (ইউরোপীয় ট্যাক্স অবজারভেটরি রিপোর্ট, ২০২৩)।

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের জমাকৃত অর্থ ২০০৮ সালে ছিলো প্রায় ৮ হাজার ৯৮৮ কোটি টাকা, যা ২০১৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩১ হাজার ২৩৮ কোটি টাকা। ২০১৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপে সুইস ব্যাংকে টাকা জমাকারীদের সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় সে দেশের সরকার। তবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সুইস ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে টাকা জমাকারীদের সম্পর্কে তথ্য পেতে কোনো উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্তের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারত। সুইস ব্যাংকে জমার পরিমাণ ২০১৪ সালের পর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়। ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টধারীরা হয়ত তাদের অর্থ অন্যান্য নিরাপদ গন্তব্যে স্থানান্তর করেছেন এবং তা অন্য ধরনের সম্পদে বিনিয়োগ করেছেন।

২০.৩ অবৈধ সম্পদ পাচারের চ্যানেল

বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ দুটি পর্যায়ে পাচার হয়েছে বলে মনে হয়। প্রাথমিকভাবে অবৈধ অর্থ ও সম্পদের বড় একটি অংশ দেশে নামে-বেনামে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। যা ছায়া অর্থনীতি বা শ্যাডো অর্থনীতির হিসাবে পরিচিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে, এই অর্থের একটি বিরাট অংশ হুন্ডিসহ অবৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং কি-ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই)-এর মাধ্যমে অর্থপাচারের বেশ কয়েকটি পদ্ধতি চিহ্নিত করে, যার মধ্যে রয়েছে;

- বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে অর্থপাচার
- নগদ লেনদেনভিত্তিক পাচার
- ব্যাংকিং, আর্থিক এবং বিমাখাতের মাধ্যমে অর্থ পাচার
- হুন্ডি বা হাওলা চ্যানেল
- কুরিয়ার ও বাহকের মাধ্যমে
- ইলেকট্রনিক পেমেন্ট
- ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন
- চেক বা বেয়ারার ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে
- ব্যাংক গ্যারান্টি, ক্রেসপন্ডেন্ট অ্যাকাউন্ট এবং ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্টের অপব্যবহার
- স্বর্ণ চোরাচালান
- অনলাইন বেটিং
- পুঁজিবাজারের মাধ্যমে অর্থপাচার

আগেই বলা হয়েছে, বাণিজ্যভিত্তিক অর্থপাচার (Trade-Based Money Laundering - TBML) অর্থপাচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী চ্যানেল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর মাধ্যমে শুষ্ক চালান বা ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে পণ্যের ঘোষিত মূল্য কম দেখিয়ে বা বাড়িয়ে আর্থিক সম্পদ অবৈধভাবে স্থানান্তর করা হয়। কেআইআই (KII) থেকে আরও জানা যায় যে, আমদানি প্রক্রিয়ায় আন্ডার ইনভয়েসিং এবং হুন্ডি/হাওলা ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসাজশ রয়েছে। যেমন আছে স্বর্ণ চোরাকারবাবারীদের সাথে। এরা সবাই মিলে দেশে একটি দুষ্টচক্র গড়ে ওঠেছে।

অর্থপাচারের প্রক্রিয়া

অর্থপাচার সাধারণত তিনটি স্বতন্ত্র ধাপে সম্পন্ন হয়। এ তিনটি ধাপ হলো- স্থাপন করা, বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা এবং একীভূত করা।

স্থাপন করা: অবৈধ অর্থকে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রথমবারের মতো প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াকেই বলা যায় মূলধারায় স্থাপন করা।

বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা: এই ধাপে অবৈধ অর্থকে তার উৎস থেকে কৌশলগতভাবে আলাদা করার জন্য বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়।

একীভূতকরণ: এটি চূড়ান্ত ধাপ, যেখানে পাচার করা অর্থ এমনভাবে মূল সুবিধাভোগীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যা বৈধ বলে মনে হয়। হুন্ডি/হাওলা এমন একটি সেবা প্রদান করে, যা ব্যাংক এবং মানি এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো প্রদান করতে প্রায় অক্ষম। এটি অনেকটা গ্রাহকের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার মতো। বাংলাদেশে অর্থপাচারকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ চক্র গড়ে উঠেছে দেশে-বিদেশে। যা হুন্ডি/হাওলা, আন্ডার ইনভয়েসিং, ওভার ইনভয়েসিং বা পণ্যের মূল্যায়ন কারসাজির পরামর্শদাতা, ব্যাংক, সিয়ান্ডিএফ এজেন্ট এবং সমন্বয়কারী, শেল ব্যাংক ও শেল কোম্পানি স্থাপনে সহায়ক বিশেষায়িত পরামর্শদাতা, বিনিয়োগ পরামর্শদাতা, আইনি বিশেষজ্ঞ এবং আইনজীবীদের সমন্বয়ে গত কয়েকবছরে গড়ে উঠে ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী হয়েছে।

বাণিজ্যভিত্তিক অর্থপাচার

আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে মিসইনভয়েসিং বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অর্থপাচারের একটি প্রধান পথে পরিণত হয়েছে। যা আমদানি ও রপ্তানি উভয়ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। পণ্যের প্রকৃত দামের চেয়ে বেশি দেখানো বা অতি-মূল্যায়ন (ওভার-ইনভয়েসিং) এবং পণ্যের প্রকৃত দামের চেয়ে কম দাম দেখানো বা কম-মূল্যায়ন (আন্ডার-ইনভয়েসিং) মাধ্যমে বিদেশে অর্থপাচার ও স্থানান্তর হয়ে থাকে।

ইনভয়েসিংয়ে কারসাজির প্রধান চারটি ধরন

আমদানিতে পণ্যের প্রকৃত দামের চেয়ে কম দেখানোর প্রবণতা: আমদানি পর্যায়ে শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্কসহ সরকারের প্রাপ্ত রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আন্ডার ইনভয়েসিং করা হয়। একইসঙ্গে উচ্চমূল্যের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধ এড়ানোর জন্যও এটা করা হয়। এভাবে কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধ অর্থ অর্জন করা হয়।

আমদানিতে ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে প্রকৃত দামের চেয়ে বাড়িয়ে দেখানোর প্রবণতা: পণ্য আমদানির নামে কৌশলে বিদেশে মূলধনী অর্থ স্থানান্তরের লক্ষ্যে এবং বিদেশে হার্ড কারেন্সিতে নগদ টাকায় ব্যয় নির্বাহের নিমিত্তে ওভার ইনভয়েসিং করা হয়। আয়করসহ রাজস্ব সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা এড়ানোর জন্যও আমদানিতে প্রকৃত দামের চেয়ে বাড়িয়ে দেখানো হয়। সরকারি বিনিময় হারের বেশি মূল্যে এলসি খুলে বৈদেশিক মুদ্রার একটি অংশ বাইরে রেখে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে, নিজেদেরই ভুয়া (শেল) কোম্পানির মাধ্যমে বাণিজ্য সংঘটিত করা হয়।

রপ্তানিতে ইনভয়েসিংয়ে প্রকৃত দামের চেয়ে বেশি দেখানো: রপ্তানি ভতুکی ও প্রণোদনার সুবিধা নেওয়ার জন্য অনেকে রপ্তানির ইনভয়েসিংয়ে বেশি টাকা দেখায়।

রপ্তানিতে ইনভয়েসিংয়ে পণ্যের দাম কম দেখানোর প্রবণতা: মূলধন পাচারের জন্য বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করার লক্ষ্যে রপ্তানির সময় পণ্যের প্রকৃত মূল্য না দেখিয়ে ইনভয়েসিংয়ে টাকার অংক কম দেখানো হয়। এ টাকা বিদেশে গচ্ছিত থাকে। আবার আয়কর ফাঁকি দেওয়ার জন্যও অনেকে এই কারসাজি করে থাকে। বাংলাদেশিদের

মালিকানাধীন বিদেশে অফশোর অ্যাকাউন্ট, কোম্পানি ও করস্বর্ণে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানির প্রক্রিয়ায় অর্থপাচার বা মানি লন্ডারিং পরিচালিত হচ্ছে।

হুডি-হাওলা চ্যানেল

হুডি বা হাওলা বাজার একটি জটিল ব্যবস্থা, যা বহু বছর ধরে গড়ে উঠেছে। এটি দেশীয় ও বিদেশি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অবৈধ অর্থপ্রবাহ নিষ্পত্তি করার প্রধান পদ্ধতি হলো, বিদেশে থেকে আসা রেমিট্যান্সের সাথে দেশে অর্জিত অবৈধ টাকার সমন্বয়। এতে উল্লার বিদেশে রেখেই বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাওয়া পরিবারগুলোকে স্থানীয় মুদ্রায় সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশে অবৈধ অপারেটর, এজেন্টা ও এগ্রিগেটরা প্রবাসীদের কাছ থেকে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট বিদেশি অ্যাকাউন্ট এবং বাংলাদেশে হুডি/হাওলা সিন্ডিকেটের অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করে। কিছু মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসকেও এই চক্রে জড়িত থাকতে দেখা গেছে, যারা প্রবাসীদের পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্টে সমপরিমাণ অর্থ স্থানান্তরিত করে দেয়।

সাম্প্রতিক সময়ে হুডি/হাওলা ব্যবস্থার মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে মূলধন পাচারের তথ্য উপাত্ত পাওয়া গেছে, যা মূলত অফশোর অর্থনৈতিক কেন্দ্রসমূহের (দুবাই, পানামা, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি) মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তিরা অফশোর অ্যাকাউন্ট বা ট্রাস্ট এবং শেল কোম্পানি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। মালিকানা সাধারণত একাধিক চক্রাবৃত্ত স্তরে বিভক্ত থাকায় এসব লেনদেন শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। পাচারকৃত অর্থ এবং চূড়ান্ত সুবিধাভোগীদের মধ্যে একাধিক স্তরের প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে মূল অর্থপাচারকারী ও চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর (অনেকক্ষেত্রে একই ব্যক্তি) মধ্যে সুপরিকল্পিত ব্যবধান গড়ে তোলা হয়। বিভিন্ন বিশেষায়িত কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে অর্থপাচারকারীকে সহায়তা করে থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভাবে দুর্বল এমন দেশসমূহকে (যেমন পানামা, কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ, চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ) এসব কাজে ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও বড় আকারের বিনিয়োগ করা সাপেক্ষে নাগরিকত্ব ক্রয় করা হয় (যেমন সেন্ট লুসিয়া, মাল্টা, ভানুয়াতু)। অনেক দেশই অর্থের উৎস সম্পর্কে 'জিজ্ঞাসা করা হবে না, বলতেও হবে না' এ নীতির অনুসরণ করে, যাতে সংশ্লিষ্ট দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট হতে পারে। বিনিয়োগের উৎস সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না করে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ স্থানান্তর ও বিদেশে বিনিয়োগে সহজতর হয়।

পাচারকৃত অর্থ বিদেশে গড়ে ওঠা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বৃহদায়ন মূলধনের মালিক এবং ক্রমান্বয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এখন এসব প্রতিষ্ঠান বড় আকারের বিনিয়োগে সক্ষম। করমুক্ত সুবিধার কারণে সিঙ্গাপুর, দুবাই এবং হংকং এখন অর্থপাচারকারীদের জন্য পছন্দের গন্তব্যস্থলে পরিণত হয়েছে।

অর্থপাচারের অন্যান্য পদ্ধতি: বাংলাদেশ কর্মরত বিদেশি কর্মীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধও দেশ থেকে অর্থপাচারের উৎসে পরিণত হয়েছে। মূলত বিদেশিকর্মীদের তাদের নিয়োগদাতারা আয়কর ফাঁকি দিতে নগদে সম্মানী দিয়ে থাকেন, আর এ টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরিত করে বা হুডি-হাওলার মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে বিদেশে নেওয়া হয়। আবার নিজের বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে বৈধভাবে অর্জিত টাকা বিদেশে অবৈধভাবে পাঠানো হয় বিভিন্ন অবৈধ চ্যানেল ব্যবহার করে।

২০.৪ সমস্যার সমাধানে করণীয়

অবৈধভাবে অর্জিত অর্থের উৎসমুখ বন্ধ করতে হলে পাচারকারীদের দৃশ্যমান শাস্তির বিধান, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। অর্থপাচারের চিহ্নিত চ্যানেলগুলো বন্ধ ও নির্মূল করতে কার্যকর আইনি, প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, উদ্যম ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের এখনই সময়।

দুর্নীতির মাধ্যমে পাচার হওয়া সম্পদ ফেরাতে অনুসন্ধানমূলক তদন্তের মাধ্যমে আইনগত পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা নিতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতায়ন করা, নীতিমালার পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার সংস্কার, আইনি প্রয়োগ, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়, আন্তঃসংস্থা এবং আন্তঃদেশীয় সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অর্থপাচার বন্ধে ওপরের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিম্নে প্রস্তাব করা হলো।

বৈদেশিক বাণিজ্যে মিথ্যা ঘোষণার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

আমদানি-রফতানির আড়ালে পণ্যের দামে মিথ্যা ঘোষণা বা ট্রেড-বেইজড মানি লন্ডারিং (টিবিএমএল) বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অর্থপাচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুট। বৈদেশিক বাণিজ্য পণ্যের প্রকৃত মূল্য কম বা বেশি দেখানো বা মিথ্যা ঘোষণার (ট্রেড মিসইনভয়েসিং) অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ধরনের মূল্য সংক্রান্ত মিথ্যা ঘোষণার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে।

কাস্টমস কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ট্রান্সফার প্রাইসিং সেল (টিপিসি) এবং ব্যাংকসমূহের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কেন্দ্রসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিশ্ববাজারে পণ্যের রিয়েলটাইম (প্রকৃত সময়) তথ্যের সহজলভ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্ল্যাক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তিখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, যেমন জিএফ ট্রেড সিস্টেম, যা কাস্টমসকে সম্ভাব্য জালিয়াতিমূলক এলসির চালান সময়মতো শনাক্ত করতে সহায়তা করবে।

বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বর্হিবাণিজ্যের ক্ষেত্রে মিথ্যা ঘোষণা এবং জালিয়াতি শনাক্তকরণের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বেগবান হচ্ছেছে। বাংলাদেশকেও বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে মুদ্রা পাচার প্রতিরোধে এসব আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ ও ব্যবহারের প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রকৃত মূল্যের সাথে ঘোষিত মূল্যের তথ্যনির্ভর তুলনা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃত দামের চেয়ে বেশি দেখানো বা ওভার-ইনভয়েসিং প্রতিরোধে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে যে পণ্যগুলো আমদানির ওপর কোনো শুল্ক নেই বা শুল্ক হার বেশ কম, যেমন মূলধনী যন্ত্রপাতি বা ক্যাপিটাল মেশিনারিজের ক্ষেত্রে।

অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থাসমূহের অধিকাংশ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এখনও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হয়। এসবের কার্যকারিতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। বাংলাদেশ চাইলে বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থপাচার প্রতিরোধে একটি স্বাধীন ট্রেড ট্রান্সপারেন্সি ইউনিট গঠন করতে পারে, যা কিছু উন্নত দেশ ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছে।

পাচার হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারে পদক্ষেপ গ্রহণ

দেশের সব মহল থেকে দাবি উঠেছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যেন বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ ও অর্থ ফেরত আনার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়। তবে অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ, সে অর্থ দেশ থেকে পাচার হওয়া এবং গন্তব্য দেশে পাচারকৃত অর্থের চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর মধ্যে সংযোগ চিহ্নিত করার কাজটা মোটেই সহজ নয়। এজন্য একটি সুচিন্তিত প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে যাতে পাচার হওয়া সম্পদ বাংলাদেশে যত দ্রুত সম্ভব ফেরত আনা সম্ভব হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) পাচারের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রথমে অভিযোগপত্র দাখিল করতে হবে। পাশাপাশি অর্থপাচার হওয়া সম্ভাব্য গন্তব্য দেশগুলোর কাছে এমএলএআর (মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসটেন্স) পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এ সংক্রান্ত মামলাগুলোকে বাংলাদেশি আদালতে প্রমাণ সাপেক্ষে পরবর্তী

পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের কাছে অনুরোধপত্র পাঠাতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী ঐ বাংলাদেশি নাগরিকের সম্পদ জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করা হয়। যেমন, কানাডার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে এসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। প্রচলিত আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাচারকৃত টাকা উদ্ধারে গন্তব্য-দেশসমূহের আদালতে মামলা দায়ের ও পরিচালনার জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। এ লক্ষ্যে মানি লন্ডারিং ও অর্থ পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ আইনজীবী এবং প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করতে হবে যাদের এসব বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে এ ধরনের আইনজীবীরা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরুদ্ধার করা অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশপ্রাপ্তির ভিত্তিতেও কাজ করে থাকে। এসব মামলা দেওয়ানি (খেলাপি কর আদায়) ও ফৌজদারি (অপরাধমূলক) উভয় ধরনেরই হতে পারে।

পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া

বিদেশে পাচারকৃত বাংলাদেশিদের সম্পদ পুনরুদ্ধারে কয়েকটি পর্যায় ও ধাপ রয়েছে। যা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে:

দোষী সাব্যস্তকরণ: অবৈধ উপার্জন এবং মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে বাংলাদেশের আদালতে দোষী সাব্যস্ত করা।

শনাক্তকরণ: মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ চিহ্নিত করা। যা গোয়েন্দা কার্যক্রম, ফরেনসিক তদন্ত এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে।

তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ: বিভিন্ন স্তরে সম্পদের সাথে সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন এবং বিচারের জন্য আদালত ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা।

দ্বৈত অপরাধের প্রমাণ: পাচারকৃত অর্থের দেশের আদালতে মামলা দায়ের করা এবং অপরাধের যথাযথ প্রমাণ উপস্থাপন করা।

সম্পদ সংরক্ষণ: বিদেশি আদালত থেকে জব্দ বা স্থগিতাদেশ নেওয়া, যাতে সম্পদের স্থানান্তর, হস্তান্তর বা লিকুইডেশন (বিক্রি) প্রতিরোধ করা যায়।

ফৌজদারি/দেওয়ানি মামলা: আদালত বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে Conviction-based (CB) or Non-conviction based (NCB) বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রাপ্তি।

ইউএনসিএসি/গন্তব্য দেশের আইনি বিচারব্যবস্থা: পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারে গন্তব্য-দেশের আদালতের অনুকূল রায়।

প্রতিফলন আদেশ বাস্তবায়ন: পাচার হওয়া সম্পদ দেশে ফেরত আনতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া (স্থাবর সম্পদের লিকুইডেশনসহ)।

পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআরকে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ পাচার হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার একটি বহুস্তর বিশিষ্ট প্রক্রিয়া। তবে এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ-

- (ক) ফরেনসিক অডিট পরিচালনা করে অপরাধসংশ্লিষ্ট দায় এবং অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা;
- (খ) বিচারিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধের দায়বদ্ধতা নির্ধারণ ও অর্থপাচারের জন্য দায়ীকে দোষী সাব্যস্ত করা;
- (গ) প্রত্যক্ষ বা বিশেষায়িত সংস্থার মাধ্যমে গন্তব্য-দেশে মামলা দায়ের করে মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনা।

মুদ্রা পাচার প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশে মুদ্রা পাচার এবং বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য বেশ কয়েকটি আইন ও নীতিমালা কার্যকর রয়েছে। ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন’ মানি লন্ডারিংকে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বাংলাদেশকে পাচারকৃত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ কিছু দেশের সঙ্গে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স ট্রিটি (চুক্তি) স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ৮১টি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেমোরাভান্ডম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ), এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ (এপিজি), এবং এগমন্ট গ্রুপের সদস্য। এসব সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে, সক্রিয় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত আহরণ করতে হবে। রাজনৈতিক বিবেচনায় বিএফআইইউ, দুদক, এনবিআর এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমকে বিগত বছরগুলোতে প্রভাবিত হয়েছে।

অর্থপাচার রোধ এবং অর্থপাচারকারীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে পাচার হওয়া সম্পদের ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য থাকলেও, সক্রিয় উদ্যোগ এবং পরবর্তী পদক্ষেপের অভাব ছিল স্পষ্ট। কিছুক্ষেত্রে বিএফআইইউ ব্যবস্থা নিলেও সেগুলো ছিল মূলত ছোটখাটো অপরাধীদের বিরুদ্ধে। ব্যাপকভাবে আলোচিত ব্যাংক কেলস্কারির ক্ষেত্রে সন্দেহজনক লেনদেন বা এসটিআরের তথ্য ব্যাংকগুলো থেকে বিএফআইইউর কাছে পাঠানো হয়নি এবং কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। এখন সময় এসেছে এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার।

বৈশ্বিক পর্যায়ে পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ

পাচার হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক ও বহুপাক্ষিক ইস্যু হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। বৈশ্বিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বিষয়টি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ২০০৭ সালে ‘স্টোলেন অ্যাসেট রিকভারি ইনিশিয়েটিভ’ চালুর পর থেকে প্রায় দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়াসহ বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাচার হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অ্যাঙ্গোলা প্রায় পাঁচ বিলিয়ন পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

বিএফআইইউ ও দুদকে যারা কাজ করেন তাদের বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করার সক্ষমতা আরো শক্তিশালী করতে হবে; অনেকেরই কৌশলগত প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের হাতে অভিযানের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করা বা তাদের অফিস-বাসাবাড়িতে অনুসন্ধান চালানোর ক্ষমতা নেই। এ কারণে অপরাধীদের পালিয়ে যাওয়া এবং প্রমাণ নষ্ট করার সুযোগ থেকে যায়। কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারটকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং অন্যান্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

ভারতের মতো বাংলাদেশেও ব্যাংকে সন্দেহজনক লেনদেন (এসটিআর বিশ্লেষণ) শাখাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাইরে রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। যাতে করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থেকেও সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে এ শাখাটি আরও স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। অর্থপাচার রোধ ও পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে তার জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য অপেক্ষা না করে নিজস্ব উদ্যোগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

স্বাধীন প্রসিকিউশন সংস্থা গঠন করা জরুরি

পাচার হওয়া অর্থ-সম্পদ দেশে ফেরাতে আইনি প্রক্রিয়া পরিচালনায় প্রসিকিউশনের দুর্বলতার ফলশ্রুতিতে এবং রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকারের কারণে দুদক, বিএফআইইউ, সিআইডি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের

কার্যক্রম অতীতে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি স্বাধীন প্রসিকিউশন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ সংস্থাকে যথাযথ ক্ষমতা ও ম্যান্ডেট দিয়ে স্বাধীনভাবে আইনি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সহযোগিতা শক্তিশালীকরণ

ইন্টারগভর্নেন্টাল গ্রুপ অন ফাইন্যান্সিং ফর ডেভেলপমেন্ট এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে অপরাধমূলক আর্থিক লেনদেনের প্রবাহ প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জ ও জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থপাচার মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তা জরুরি হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ২০০৭ সালে দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘ কনভেনশনে (ইউএনসিএসি) যোগ দিয়েছে। বাংলাদেশ স্টোলেন অ্যাসেট রিকভারি উদ্যোগেরও সদস্য। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ-সম্পদ বিভিন্ন দেশে নিরাপদ স্থানান্তরের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশ্বব্যাংক ও ইউএনওডিসির মধ্যে অংশীদারত্বমূলক উদ্যোগ রয়েছে। এটি প্রায়শই দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের সাপেক্ষে দ্রুত ফলাফল পাওয়ার একটি উপায় হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশকে কনভেনশন অন মিউচুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ অ্যাসিস্ট্যান্স ইন ট্যাক্স ম্যাটারসে (এমএএসি) যোগ দিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করতে হবে এবং কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করতে হবে। যা স্বয়ংক্রিয় তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একইভাবে, প্রয়োজনে বিভিন্ন বিদেশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা (যেমন: ইন্টারপোল) চাইতে হবে এবং এসব সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করতে হবে। পাচারকৃত অর্থের মূল গন্তব্যস্থল দেশগুলো থেকে সম্পদের প্রত্যাবর্তন সহজতর করার জন্য তাদের আইন/নীতিমালায় পরিবর্তন আনার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

বিদ্যমান নীতিমালায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে

অবৈধভাবে অর্থের স্থানান্তর হতে পারে এমন সব সুযোগ বন্ধ করার নিমিত্তে বিদ্যমান বিধি/নীতিমালাসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে এবং প্রয়োজনে সংশোধন করতে হবে। যেমন, ফ্রিল্যান্সিং ও বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) কার্যক্রমের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ বাংলাদেশে আইনিভাবে প্রত্যাবাসন করা যায় না। কারণ পে-পালের মতো গেটওয়ের কার্যক্রমে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বৈত কর পরিহার, বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের দ্বারা উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় স্থানান্তর এবং বিদেশে অভিবাসী কর্মীদের নিয়োগকারীদের কাছে ভিসা ফি পাঠানোসহ বেশকিছু কর্মকাণ্ড আছে যেখানে অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ অবৈধভাবে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এসব বিষয় গভীরভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। এ প্রেক্ষিতে কিছু বিদ্যমান নীতিমালা পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চলমান ইতিবাচক উদ্যোগসমূহ সক্রিয়ভাবে বাস্তবায়ন

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি অ্যাসেট রিকভারি কমিটি গঠন করেছে যেটি একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে এই কমিটি সক্রিয় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এ কমিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। কালো টাকা সাদা করার বিধানটি বাতিল করার যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেটিও ইতিবাচক। একইসাথে সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদের বিবরণী জমা দেওয়ার বিধানও কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এসব পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি, যার বাস্তবায়নের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

রাজনৈতিক চাপমুক্ত দুর্নীতি দমন কমিশন বর্তমানে বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন, সুইস সরকার এবং জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক কার্যালয়ের সাথে সহযোগিতা করে পাচার হওয়া সম্পদ চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে এবং অর্থ পুনরুদ্ধারে এসব সংস্থার সাহায্য নিচ্ছে। বাংলাদেশ বর্তমানে মাত্র তিনটি দেশের সাথে কাস্টমস সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যভিত্তিক

অর্থপাচার মোকাবিলার জন্য বিশেষভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র এবং সিঙ্গাপুরের সাথে চুক্তি করা প্রয়োজন। দুদককে অর্থপাচার সম্পর্কিত বিশ্বখ্যাত আইনবিদ এবং পাচার হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে সহায়তা নেওয়ার প্রয়োজন হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

২০.৫ উপসংহার

বিগত সময়ে রাজনৈতিক প্রশয় ও পৃষ্ঠপোষকতা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, আইনি দায়মুক্তি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের অভাবজনিত কারণে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ বিভিন্ন চ্যানেলে ব্যাপকভাবে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন আইনি উদ্যোগ, পেশাদারিত্ব নিয়ে এসবের বিরুদ্ধে লড়াই এবং আপসহীন রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজন ব্যাংকিংখাতসহ অন্যান্যখাতে সুশাসনের পুনরুদ্ধার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইনি সংস্কার, দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা (জিরো টলারেন্স), প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, সংশ্লিষ্টসংস্থাগুলোর মধ্যে অধিকতর সমন্বয় এবং মুদ্রা পাচারের প্রধান প্রধান গন্তব্য-দেশসমূহের সাথে আরও বেশি সহযোগিতা দেশের জনগণের ও করদাতাদের অর্জিত অর্থ যারা পাচার করেছে তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে যা করার সব করতে হবে। এ কাজ হওয়া উচিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দায়িত্ব।

অধ্যায় ২১ - প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাবে জাতীয় উন্নয়নে স্থবিরতা*

- বাংলাদেশে দুর্নীতি গভীরভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। ঘুষ, তহবিল তছরূপ এবং পক্ষপাতিত্ব নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কর ফাঁকি, ঋণ খেলাপি এবং অর্থপাচারের মতো বিষয়গুলো একে অপরের সঙ্গে জড়িত, যা আর্থিক ও নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে এবং জনগণের আস্থা নষ্ট করেছে
- ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়েছে, যা শাসক দলের স্বার্থে কাজ করেছে। বিরোধী মত দমন এবং গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের ফলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা কমে গেছে এবং গণতন্ত্র দুর্বল হয়েছে
- অর্থনৈতিক অগ্রগতির বহুল প্রচলিত বয়ান, উচ্চ-প্রশংসা এবং আন্তর্জাতিকভাবে মৃদুভাষী সমালোচনার কারণে কর্তৃত্ববাদী আচরণ বৈধতা পেয়েছে। উন্নয়ন বিচারে জিডিপি বৃদ্ধির ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু গণতান্ত্রিক সংস্কার উপেক্ষিত থেকেছে
- সরকার একটি কার্যকর সুশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি— পুরানো আইন, দুর্বল বাস্তবায়ন ক্ষমতা এবং সংস্কার বাস্তবায়নে ব্যর্থতার কারণে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ও ন্যায্যবিচার বাধাগ্রস্ত হয়েছে।
- রাষ্ট্রের সীমিত সক্ষমতা বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। কর-জিডিপি অনুপাত কম হওয়ায় সরকার পর্যাপ্ত বাজেট অর্থায়ন করতে পারেনি। ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অবকাঠামোর মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে সরকারি বিনিয়োগ হয়েছে অনেক কম

২১.১ ভূমিকা

গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তবে সরকারি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে আছে। সুশাসনের অভাব, প্রশাসনিক ও আইনের শাসনের দুর্বলতার কারণে বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান নিচের দিকে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মূল্যায়নেও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাবের কারণে প্রদত্ত তথ্য-উপাত্তের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক মানের গুণগত মান বেশ নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। শূন্য থেকে ১০০ নম্বরের পরিমাপে ছয়টি প্রাতিষ্ঠানিক মান সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কেলমান ৩০-এর নিচে রয়েছে। বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে প্রতিযোগী দেশ ভারত ও ভিয়েতনামের তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সূচকে দুর্বল অবস্থানে আছে। যেমন বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার স্কোর ১৩.২১—যা ভিয়েতনামের (৪৫.৭৫) ও ভারতের (২৪.৫৩) তুলনায় অনেক কম। একইভাবে সরকারের কার্যকারিতা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা সূচকে বাংলাদেশের স্কোর যথাক্রমে ২৩.১১ এবং ১৫.৫৭, যা ভারতের (৬৩.২১ ও ৪৪.৩৪) এবং ভিয়েতনামের (৫৯.৪৩ ও ৪৫.৭৫) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

ওপরের পরিসংখ্যানগুলো স্পষ্ট জানান দিচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে বড় ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। যাতে বাংলাদেশ অন্তত আঞ্চলিক প্রতিযোগী দেশগুলোর যে সুশাসনের মান সে পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে।

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন ড. সেলিম রায়হান, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্বাহী পরিচালক, সানেম।

২১.২ বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার বহিঃপ্রকাশ

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কাঠামোগত ব্যর্থতা

গত এক দশকে বিগত সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত ব্যর্থতা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ব্যর্থতাগুলো গণতান্ত্রিক শাসন, সুশাসন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে যে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ করে তাদের কার্যকারিতাকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। নিম্নে এর কয়েকটি প্রধান দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো:

১. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও নির্বাচনী স্বচ্ছতায় দুর্বলতা

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দুর্বলতা

২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচন ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এসব নির্বাচনে ভোটারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন, গোপনে সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভরা এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে চাপের মধ্যে রেখে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত করার মতো ঘটনা ঘটেছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) অংশগ্রহণ করেনি ফলে বেশকিছু আসনে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। এই নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি এত কম ছিল যে, নির্বাচনের বৈধতাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এই প্রবণতা পরবর্তীতে ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনেও অব্যাহত ছিল।

২০১১ সালে তৎকালীন সরকার নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে। যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ছিল। এই পরিবর্তনের ফলে ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে ব্যাপক ভোট কারচুপি ও অনিয়ম হয়। কোয়ালিটি অব গভর্নেন্স (Quality of Government QoG) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯ সালে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৯, ২০২১ সালে তা কমে ৪-এ নেমে আসে, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ধারাবাহিক অবনতির ইঙ্গিত দেয়।

নির্বাচন কমিশনের উপর নিয়ন্ত্রণ

যদিও বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বাস্তবে এটি ক্রমশ ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থ রক্ষা করে চলে বলে অভিযোগ রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা, কারচুপি রোধে কার্যকর তদারকির অভাব এবং পক্ষপাতমূলক আচরণ নিয়ে জনমনে ব্যাপক সন্দেহ তৈরি হয়েছে। যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি করেছে।

২. বিচার বিভাগের রাজনৈতিকীকরণ

বিচারক নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব

বিগত সরকারের শাসনামলে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগে যোগ্যতার পরিবর্তে দলীয় আনুগত্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, যা নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচার প্রক্রিয়ার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বিচার বিভাগের স্বায়ত্তশাসনের দুর্বলতা

বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলোতে আদালতের রায়ের ধরনের মাধ্যমে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এসব সংবেদনশীল মামলার রায় প্রায়ই

সরকারের পক্ষে গেছে। যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করার ভূমিকা ভীষণ দুর্বল করেছে।

৩. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের ওপর বিধিনিষেধ

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

২০১৮ সালে প্রণীত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। আইনটি কার্যত সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে এ আইনের মাধ্যমে সরকারের যারা সমালোচনা করেন তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে। এর মাধ্যমে বহু সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীকে গ্রেপ্তার, হয়রানি ও আইনি জটিলতার মুখে পড়তে হয়েছে। কোয়ালিটি অব গভার্নমেন্ট এর তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯ সালে বাংলাদেশের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সূচক ছিল ৯। যা ২০২১ সালে কমে ৬ এ নেমে আসে। এভাবেই মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সূচকে ধারাবাহিক অবনতির চিত্রই উঠে আসে।

গণমাধ্যম দমন ও সাংবাদিকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন

গণমাধ্যমের ওপর সরকারের প্রত্যক্ষ চাপ ছিল, যাতে তারা সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা বা নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশ না করে। ফলে, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে অনেকটাই ‘নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের’ মধ্যে সংবাদ পরিবেশন করতে বাধ্য করা হয়েছে। প্রশাসনিক চাপ ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সরকার সমালোচনামূলক সাংবাদিকতাকে দমন করেছে, যা গণতান্ত্রিক পরিসরে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা লঙ্ঘনের গুরুতর উদাহরণ।

৪. নাগরিক সমাজ ও বিরোধীদের রাজনৈতিক দমন

বিরোধী রাজনৈতিক দলের ওপর দমন-পীড়ন

বিরোধী দলগুলোর নেতা-কর্মীদের গণহারে মামলা দিয়ে হয়রানি, গ্রেপ্তার এবং হামলা-নির্যাতন করা হয়েছে বিগত সরকারের শাসনামলে। গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী নেতাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মামলা দিয়ে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা ব্যবস্থা দুর্বল হয়েছে এবং কার্যকর বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

নাগরিক সমাজের ওপর বিধিনিষেধ

বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে সরকার-বিরোধী সমালোচনামূলক সংগঠনগুলো ব্যাপক বিধিনিষেধের মুখে পড়েছে গত সরকারের সময়ে। বৈদেশিক অনুদানের ওপর কঠোর আইনি মারপ্যাচে ও এনজিওগুলোর কার্যক্রমের ওপর তথাকথিত নজরদারির নামে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সংকুচিত করা হয়েছে। এর ফলে, এনজিওগুলোর মানবাধিকার, সুশাসন ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৫. জবাবদিহিতার অভাব

দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি

বিগত সরকারের সময়ে দুর্নীতি এতটাই ব্যাপক রূপ নিয়েছিল যে, এটি রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা, সরকারি অর্থব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক সংস্থাগুলোর কাঠামোগত ব্যর্থতাকে প্রকট করে তোলে। বিগত সরকারের আমলে দুর্নীতির

বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার কথা মুখে বললেও দুর্নীতি-অনিয়ম বিরুদ্ধে তদন্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আচরণ ছিল পক্ষপাতদুষ্ট। এটি প্রায়শই শাসকদলের সঙ্গে সম্পর্কিত উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতির মামলা উপেক্ষা করে এবং রাঘব বোয়ালদের ছেড়ে চুনোপুটিদের ধরতে ব্যস্ত থাকতো। বিপরীতে দুর্নীতির অভিযোগে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করত দুদক। বিশ্বব্যাংকের ‘ওয়ার্ল্ড গভর্নেন্স ইন্ডিকেটরস’ এর তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯ সালে ভয়েস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৩৮.৪। যা ২০২২ সালে কমে দাঁড়ায় ২৮ এ। স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার বৈশ্বিক সূচকে এমন পড়তি দশাই বলে দেয় দুর্নীতি কতটা সর্বগ্রাসী হয়েছিল বিগত সরকারের শাসনামলে।

তথ্য অধিকার আইন অকার্যকর রাখা

২০০৯ সালে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) পাশ হওয়ার পরে এটি অত্যন্ত যুগান্তকারী আইন হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু আইনটি কার্যকর থাকলেও বিভিন্ন কৌশলে এর মাধ্যমে বড় ধরনের কোনো দুর্নীতি-অনিয়ম বা কেলেকারির তথ্য প্রকাশ পেতে দেওয়া হয়নি। ফলে জনগণের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে চরমভাবে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার বদলে রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার কাজে ব্যবহারের করা হয়েছে। বিশেষ করে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের দমন-পীড়ন, গণবিক্ষোভ দমন এবং নাগরিক স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করতে এসব আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে, বিচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়াসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। একইসাথে, এই সংস্থাগুলোর নিরপেক্ষতা চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ‘অধিকার’-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত কমপক্ষে ৭০৮টি গুমের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে অনেকেই ‘আয়নাঘর’ নামক গোপন কারাগারে আটক ছিলেন বলে জানা যায়। যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক গুরুতর উদাহরণ।

৬. সংসদের ভূমিকা দুর্বলকরণ

সংসদে কার্যকর বিরোধী দলের অভাব

২০১৪ সালের নির্বাচন প্রধান বিরোধী দলের বর্জন, ২০১৮ সালের নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিরোধী দলের পুনরায় বর্জনের কারণে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কার্যত একদলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ফলে কার্যকর সংসদীয় গণতন্ত্র চরমভাবে ব্যাহত হয়। সংসদীয় কার্যকর বিতর্ক প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গঠনমূলক সমালোচনা বা পর্যালোচনার সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। ফলে নির্বাহী শাখার ওপরে সংসদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। এতে সরকার পক্ষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একচেটিয়া আইন প্রণয়ন করা সহজ হয়েছে।

নির্বাহী শাখার হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে সংসদসহ অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। সংসদ কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক অনুমোদনদাতা বা রাবার স্ট্যাম্প জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সরকার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ভারসাম্য ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে—যা বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বড় অন্তরায় হয়ে ওঠে।

৭. অকার্যকর সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ

দলীয়করণে বিপর্যস্ত প্রশাসন

সরকারি প্রশাসন যা আদর্শগতভাবে নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। কিন্তু ক্রমশ দলীয়করণ ও রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দক্ষতা ও ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা দুর্বল হয়েছে। বস্তুত প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুগত হয়ে পড়ে এবং ন্যূনতম যাচাই বাছাই ছাড়াই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে সম্মতি ও অনুমোদন দিতে বাধ্য হয়।

জনসেবায় ব্যর্থতা

নাগরিকদের কাছ থেকে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন সরকারি সেবার নিম্নমান নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ উঠে। এর মূল কারণ ছিল সীমাহীন দুর্নীতি ও রাজনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে সম্পদের বন্টন। ফলে জনগণের মৌলিক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি হয় এবং রাষ্ট্রের সক্ষমতা নিয়ে ব্যাপক হতাশা তৈরি হয়।

মিলেমিশে গণহারা দুর্নীতি

বাংলাদেশের সর্বস্তরে দুর্নীতি অত্যন্ত গভীরে শেকড় গেড়ে বসেছে। ঘুষ, সরকারি তহবিলের অপব্যবহার-অনিয়ম এবং বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার মতো বিষয়গুলো ব্যাপক আকারে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এতটাই গভীরভাবে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে যে, এটি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা যেমন নষ্ট করেছে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করেছে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর জনগণের আস্থা নষ্ট করে দিয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিবেদন অনুসারে, সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, কর ব্যবস্থা, ব্যাংকিং খাত, স্বাস্থ্য খাত, পরিবহন খাত, জ্বালানি খাত, এবং নির্মাণ শিল্পে দুর্নীতি সবথেকে বেশি। এছাড়াও দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

গত এক দশকে দুর্নীতি বাংলাদেশে সর্বগ্রাসী রূপে বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে গেছে। যার ফলে সমগ্র জাতি এক ধরনের দুর্নীতির জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। কর ফাঁকির সাথে যারা জড়িত, তাদের অনেকেই ঋণখেলাপি, শেয়ার বাজার কেলেকারি এবং অর্থপাচারের সাথেও সম্পৃক্ত। একাধিক খাতে দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এটিকে এতটাই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে ফেলেছে যে এখন এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভয়ানক কঠিন হয়ে পড়েছে। এক খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি অন্য খাতে একই ধরনের অপরাধকে উসকে দিয়েছে। যার ফলে একটি স্বয়ংক্রিয় দুর্নীতির চক্র তৈরি হয়েছে। এটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা এবং জনআস্থার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আন্তঃসংযুক্ত বড় কিছু দুর্নীতির উদাহরণ

১. সরকারি পরিসেবা খাতে দুর্নীতি

- **সরকারি কর্মকর্তাদের অবৈধ সম্পদ অর্জন:** দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তে ঘুষ, কমিশন গ্রহণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের অসংখ্য ঘটনা চিহ্নিত হয়েছে।
- **সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দুর্নীতি:** সরকারি চাকরিতে ঘুষ প্রদান, ফলাফল বিকৃতি এবং স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে।
- **অতিমারীর সময় স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি:** করোনাকালে চিকিৎসা সরঞ্জাম, করোনা পরীক্ষার কিট ক্রয় এবং ভুয়া কোভিড-১৯ টেস্ট সার্টিফিকেট ইস্যুতে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।
- **পাসপোর্ট ইস্যুতে দুর্নীতি:** পাসপোর্ট অফিসের সিভিকিট কর্তৃক আবেদনকারীদের কাছ থেকে অবৈধ

অর্থ আদায়ের ঘটনা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল। প্রবাসীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট নবায়নেও অবৈধ লেনদেন ছিল ওপেন সিক্রেট বিষয়।

- **ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা খাতে দুর্নীতি:** জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) কার্ডের তথ্য সংশোধন, ডিজিটাল স্বাক্ষর জালিয়াতি এবং ভুয়া বা নকল আইডি ইস্যু করার মতো অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।
- **দুর্নীতি দমন কমিশনের সাম্প্রতিক তদন্ত (২০২২-২০২৪):** বিগত সরকারের সাবেক মন্ত্রী ও সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ভূমি কেলেঙ্কারি, অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং অর্থপাচারের অভিযোগ উঠেছে দুদকের তদন্ত প্রতিবেদনে।

২. ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে কেলেঙ্কারি

- **হলমার্ক গ্রুপ ঋণ কেলেঙ্কারি (২০১০-২০১২):** সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আত্মসাতের ঘটনা ঘটে।
- **বেসিক ব্যাংক ঋণ কেলেঙ্কারি (২০০৯-২০১৩):** ২০১০ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে শতভাগ সরকারি ব্যাংক বেসিক ব্যাংকে পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে ভুয়া ও নামসর্বস্ব ঋণ অনুমোদন দিয়ে ৪৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- **ডেসটিনি গ্রুপের জালিয়াতির পনজি স্কিম (২০১২):** মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) কেলেঙ্কারির মাধ্যমে ৪৫ লাখের বেশি বিনিয়োগকারীকে প্রতারিত করে প্রায় ৭৫০ মিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করা হয়। জালিয়াতির মাধ্যমে ডেসটিনি গ্রুপটির এই পনজি স্কিমের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- **পি কে হালদার আর্থিক কেলেঙ্কারি (২০২০):** নকল কোম্পানির মাধ্যমে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। যা মূলত বিভিন্ন নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে লোন নেওয়ার মাধ্যমে ঘটানো হয়েছে।
- **ই-অরেঞ্জ পনজি স্কিম (২০২১):** অনলাইনে গ্রাহকদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ নিয়ে পণ্য সরবরাহ না করেই প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার প্রতারণার অভিযোগ পাওয়া যায়।

৩. অবকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্পে দুর্নীতি

- **পদ্মা সেতু দুর্নীতি কেলেঙ্কারি:** পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের ঋণ প্রত্যাহার করে নেয় বিশ্বব্যাংক। ২০১৭ সালে একটি কানাডিয়ান আদালত প্রমাণের অভাব দেখিয়ে মামলা খারিজ করে দেয়। তবে সমালোচকদের মতে আদালতের এই সিদ্ধান্ত দুর্নীতি যে হয়নি তা প্রমাণ করে না। বরং ঠিকমতো প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়নি।
- **রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে দুর্নীতি (২০১৯):** সরঞ্জাম কেনাকাটায় অতিরিক্ত ব্যয় দেখানো হয় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে। যেখানে ঠিকাদার ও কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম আলোচিত সমালোচিত ছিল ‘বালিশ কান্ড’।
- **রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র ভূমি অধিগ্রহণ কেলেঙ্কারি (২০১৮-২০২০):** অনিয়মিত ক্ষতিপূরণ প্রদান, জমির রেকর্ড জালিয়াতি এবং ঘুষের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিযোগ উঠে সুন্দরবন ঘেঁষে গড়ে উঠা কয়লাভিত্তিক রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে।
- **মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও বন্দর উন্নয়ন (২০২০):** সরঞ্জাম কেনাকাটায় অনিয়ম, অস্বচ্ছ দরপত্র প্রক্রিয়া এবং ঘুষের মাধ্যমে ঠিকাদারি কাজ পাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায় মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পে।
- **চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (২০২১-২০২৩):** ঠিকাদারি কাজ প্রদানের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব এবং নির্মাণ ও সরঞ্জাম ক্রয়ে অতিরিক্ত ব্যয়ের অভিযোগ রয়েছে অন্যান্য প্রকল্পের মতো চট্টগ্রাম উড়াল সড়ক নির্মাণে।

- **পায়রা বন্দর ও বিদ্যুৎ প্রকল্প (২০১৯):** অনিয়মিত ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা, জমির রেকর্ড জালিয়াতি এবং দ্রুত অনুমোদন পেতে ঘুষ প্রদানের অভিযোগ পাওয়া গেছে পায়রা বন্দর ও বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে।
- **পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প (চলমান):** রাজনৈতিক বিবেচনা ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অবৈধভাবে প্লট বরাদ্দ, ঘুষ এবং ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে।

৪. অন্যান্য দুর্নীতির ঘটনা

- **বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের দুর্নীতি:** বিমানের যন্ত্রাংশ কেনা, এয়ারক্রাফট লিজ নেওয়া, টিকিট জালিয়াতি এবং তহবিলের অপব্যবহারের মতো বড় বড় অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিরুদ্ধে।
- **ক্যাসিনো কেলেঙ্কারি (২০১৯):** অবৈধভাবে চালানো ক্যাসিনোগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চলে। যার ফলে শাসক দলের নেতাদের জুয়া, চাঁদাবাজি ও অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় বেশ কয়েকজনকে। ক্যাসিনোক্যাণ্ডে জড়িত সরকার দলীয় কয়েকজন কর্মীর সিন্দুক থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারও হয়েছিল।

গোষ্ঠী স্বার্থে কতিপয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখল

গোষ্ঠীগত স্বার্থবাদিতা এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে অল্প কিছু ব্যবসায়িক গ্রুপ এবং ব্যক্তি বিশেষ রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ এবং সরকারি সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে। এতে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি দক্ষ নতুন উদ্যোক্তারা সুযোগ বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের পাশাপাশি মেগা প্রকল্পগুলোর নির্মাণ ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। কিছু ব্যবসায়িক গোষ্ঠী রাজনৈতিক যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে লাভজনক চুক্তি ও লাইসেন্স করার সুযোগ পেয়েছে। ব্যাংকিং খাতেও এ ধরনের কয়েকটি গ্রুপ বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে খেলাপি হয়েছে এবং বিদেশে টাকা পাচার করেছে। কিন্তু কার্যত কখনও তাদের জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হয়নি। একইভাবে, বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থায় কর ফাঁকি ও কর ছাড়ের মাত্রাও তাদের জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখল তখনই ঘটে, যখন প্রভাবশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠী ও ব্যক্তি নীতি ও আইন প্রণেতাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার ও পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। ফলে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে সুবিধা দিতে থাকে। এটি গণতান্ত্রিক শাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতার জন্য হুমকি, বিশেষত যারা নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর ওপর বিশাল চাপ ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখে। তারা নিজেদের স্বার্থে আইন ও বিধিবিধান শিথিল করাতেও সক্ষম হয় এবং হয়েছেও তাই। এই প্রবণতা বিগত সরকারের শাসনামলে তৈরি পোশাক, ব্যাংকিং এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে।

বাংলাদেশে গোষ্ঠীগত স্বার্থবাদিতা এবং ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর দ্বারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখলের বিষয়টি ক্রমেই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন সময়ে কিছু ক্ষমতার বলয়ের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় গোষ্ঠী বা ব্যক্তি নীতি-নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামোকে হীনস্বার্থে ব্যবহার করতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। নিজেদের স্বার্থে সেগুলোকে ব্যবহার করার এই প্রবণতা বিভিন্ন খাতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

১. ব্যাংকিং খাত

- **নতুন ব্যাংকিং লাইসেন্স:** দেশে গত কয়েক দশকে ব্যাংকিং খাতের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাংকিং লাইসেন্সের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। যদিও অর্থনীতির

আকারের তুলনায় ইতিমধ্যেই ব্যাংকের বাজার ছিল অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ। তারপরও বেশিরভাগ নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে শাসক দলের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক গ্রুপগুলোকে। ফলে তারা তাদের আর্থিক সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে বিশেষ সুবিধায় ঋণ গ্রহণ করেছে। তবে কোনো ধরনের যাচাই-বাছাইয়ের অভাবে এসব ঋণের বড় অংশই খেলাপি হয়েছে, হু হু করে বেড়েছে অনাদায়ী ঋণ (এনপিএল)।

- **ঋণ খেলাপি ও অনিয়ম:** রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে দুর্বল জামানতের বিপরীতে যথাযথ যাচাই-বাছাই ছাড়াই বিপুল পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে ঋণ খেলাপির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকগুলো প্রভাবশালী ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও ছিল উদ্যোগহীন। যা দায়মুক্তির সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করেছে এবং পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে তথা কোটি কোটি আমনতকারীর আমনত হুমকির মুখে ফেলেছে।
- **বিশেষ সুবিধায় ঋণ পুনঃতফসিল:** বাংলাদেশে অনেক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক থেকে একাধিকবার ঋণ নিয়েছেন। কিন্তু এসব ঋণের পরিশোধের ক্ষেত্রে তেমন কোনো জবাবদিহিতা ছিল না। ফলে ঋণ পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া নামে তাদের জন্য বিশেষ বিশেষ নীতিমালা করে ছাড় দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই পরিচালিত হওয়া খেলাপি বা মন্দ ঋণের রেকর্ড থাকা ব্যক্তিরাও নতুন করে বড় অংকের ঋণ নিতে পেরেছেন। রাজনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠ ঋণ খেলাপিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি যা ব্যাংকিং খাতের কাঠামোগত সমস্যাগুলোর অন্যতম উদাহরণ।
- **বড় ঋণ কলেঙ্কারি:** হলমার্ক গ্রুপ ও বেসিক ব্যাংকের কলেঙ্কারিগুলো রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত ব্যবসায়ী ও ব্যক্তির কীভাবে ব্যাংকিং ব্যবস্থার অপব্যবহার করতে পারে তার উদাহরণ। তদন্তে দেখা গেছে, এসব ঋণ যথাযথ যাচাই-বাছাই ছাড়াই অনুমোদন করা হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে দোষীদের অনেকেই সহজেই পার পেয়ে গেছে, যা ব্যাংকিং খাতের দুর্বল শাসনব্যবস্থাকে আরও উন্মোচিত করেছে।

২. কর ফাঁকি ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর অপব্যবহার

- **কর আইন প্রয়োগে বৈষম্য:** বাংলাদেশে কর ফাঁকির হার বরাবরই অনেক উচ্চমাত্রায় ছিল। তবে কর ফাঁকি রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ ছিল বাছাই করা নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও ক্ষেত্রভিত্তিক। রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হতো না। বরং তারা কর নির্ধারণে শিথিলতা, জরিমানা বা কর ছাড়ের মতো সুবিধা ভোগ করতো। যেমন, সরকার বারবার কর অব্যাহতির সুযোগ দিয়েছে। যা মূলত অপ্রদর্শিত সম্পদের মালিকদেরই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এসব সুবিধাভোগীর মধ্যে অনেকেই রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।
- **কর মওকুফের কারণে রাজস্ব ক্ষতি:** পোশাক শিল্প, রিয়েল এস্টেটসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে কর প্রণোদনা বা কর মওকুফের প্রচলন ছিল ব্যাপক। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব সুবিধা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী নেতৃত্বাধীন ব্যবসাগুলোর হাতে চলে গেছে।

৩. বিদ্যুৎ খাতের চুক্তিসমূহ

- **স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান (আইপিপি):** স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স সাধারণত শাসক দলের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলো পেয়ে আসছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতিতে পক্ষপাতদুষ্ট পরিবর্তন এনে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা হয়েছে। এমনকি অনেক আইপিপি প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র ছাড়াই বিশেষ সুবিধায় অনুমোদন পেয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র সচল অবস্থায় না থাকার পরও ক্ষমতার অপব্যবহার করে সুবিধা পেয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা ও প্রতিযোগিতার অভাব স্পষ্ট হয়েছে।

- **কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র:** বিদ্যুৎ ঘাটতি কমানোর লক্ষ্যে সরকার দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কুইক রেন্টাল বা ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এটি ছিল স্বল্পমেয়াদী সমাধান। যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র ছাড়াই চুক্তিগুলোর অনুমোদন করা হয় এবং সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশিরভাগই রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ছিল। এতে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলো সহজেই বিদ্যুৎ খাতে ব্যবসা করার সুযোগ পেয়েছে। এই কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় অনেক বেড়ে যায় এবং যার ভার জনগণকে বিদ্যুতের উচ্চমূল্য পরিশোধের মাধ্যমে বহন করতে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।
- **বড় বিদ্যুৎ প্রকল্পের চুক্তিসমূহ:** বড় বড় বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং জ্বালানি অবকাঠামো নির্মাণের বড় চুক্তিগুলো রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোর কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে যে, এসব প্রকল্পে ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে এবং দরপত্র প্রক্রিয়াও ছিল অস্বচ্ছ। ফলে বিদ্যুৎ খাতের মূল অবকাঠামোতে ব্যবসায়িক এলিটদের একচেটিয়া দখলের একটি চিত্র ফুটে ওঠে।

৪. গণমাধ্যমের লাইসেন্স

- **গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ:** বাংলাদেশে অতীতে মিডিয়া লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ মনে করা হয়নি। বিগত সরকারের শাসনামলে চালু হওয়া বেশিরভাগ টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক বা পৃষ্ঠপোষকরা শাসক দলের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত ছিলেন। এ ধরনের ঘটনা গণমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা হ্রাসের আশঙ্কা বাড়িয়েছে। সমালোচকদের মতে, এই চ্যানেলগুলো প্রায়শই সরকারের প্রতি পক্ষপাতমূলক মনোভাব দেখায়, যা স্বজনপ্রীতির একটি বহিঃপ্রকাশ। সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক সংবাদে বড় অংশ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।
- **ভিন্নমত দমনের প্রচেষ্টা:** অন্যদিকে যারা সরকারের সমালোচনা করেছে, সেইসব গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর চাপ, হয়রানি বা বন্ধ করে দেওয়ার মুখোমুখি হতে হয়েছে। গণমাধ্যমের লাইসেন্স নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকার কীভাবে ভিন্নমত দমন করতে পারে এখানে তারই চিত্রই উঠে এসেছে।

৫. মেগা প্রকল্পের চুক্তিসমূহ

- **অবকাঠামো উন্নয়ন:** সরকার বেশ কয়েকটি বড় বা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। যেমন- পদ্মা সেতু, ঢাকা মেট্রোরেল, বিভিন্ন মহাসড়ক ও ফ্লাইওভার নির্মাণ। তবে এসব মেগা প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের কাজ সংক্রান্ত চুক্তিগুলো অনেকক্ষেত্রেই অস্বচ্ছ, যথাযথ সরকারি ক্রয় ও অনুমোদন প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই রাজনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ইচ্ছমত ব্যয় দেখানো এবং অব্যবস্থাপনার অভিযোগ ওঠায় স্বজনপ্রীতির আশঙ্কা আরও বেড়েছে।

৬. রিয়েল এস্টেট ও ভূমি বরাদ্দ

- **বিশেষ সুবিধাযুক্ত ভূমি চুক্তি:** মূল্যবান ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জমির বরাদ্দে রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত ডেভেলপাররা কম মূল্যে জমি পেয়েছে বা আইনগত বাধা এড়িয়ে অনুমতি পত্র আদায় করতে পেরেছে। বিগত সরকারের আমলে এটি বাংলাদেশের স্বজনপ্রীতি সংস্কৃতির অন্যতম প্রকাশ।
- **উচ্ছেদ ও ভূমি দখল:** রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক স্বার্থে জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও সরকারি-বেসরকারি জমি দখলের সঙ্গে জড়িত ছিল। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৭. শেয়ারবাজার কেলস্কারি

- **২০১০-১১ পুঁজিবাজার ধস:** বাংলাদেশের ২০১০ ও ২০১১ সালের শেয়ারবাজার ধস দেখিয়েছে কীভাবে প্রভাবশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে যোগসাজশ করে শেয়ারের দামে কারসাজি করেছে। যার ফলে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীসহ জনরোষ ও অভিযোগের তদন্তের প্রতিবেদনের পরও রাজনৈতিক সুবিধা নিয়ে মূল অপরাধীরা শাস্তি এড়িয়ে যেতে পেরেছে।
- **বেক্সিমকো বন্ড ইস্যু:** ২০২০-২১ সালে বেক্সিমকো গ্রুপ 'বেক্সিমকো গ্রিন-সুকুক বন্ড' নামে শেয়ারবাজার থেকে ৩০০০ কোটি (তিন হাজার কোটি) টাকা সংগ্রহ করে। দাবি করা হয়, এই অর্থ তিস্তা সোলার লিমিটেড ও করতোয়া সোলার লিমিটেড প্রকল্প নির্মাণ, বেক্সিমকোর টেক্সটাইল ব্যবসার সম্প্রসারণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হবে। এজন্য রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক, বিমা কোম্পানি ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এই বন্ডে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা হয়। যার ফলে বেক্সিমকো গ্রিন সুকুক বন্ডে নিশ্চিতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী পেয়ে যাওয়ায় সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো গ্রুপ ৩ হাজার কোটি টাকা পুঁজিবাজার থেকে তুলে নিতে সক্ষম হয়।

৮. শিল্প খাত

- **রপ্তানি সুবিধা ও কর প্রণোদনার সুযোগ:** বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী নেতারা কর মওকুফ ও ভর্তুকি সুবিধা এবং সহজ শর্তে আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন। অনেক সময় এই প্রণোদনাগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো অন্যদের তুলনায় বাড়তি ও অন্যায় বাজার সুবিধা পায়। সেই সব বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কারখানাগুলো শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও কারখানার কর্ম পরিবেশ নিরাপদ করার উদ্যোগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, যাতে তারা তাদের রাজনৈতিক প্রভাব ধরে রাখতে পারে।
- **বাণিজ্য ও কর নীতির কারসাজি:** কিছু প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য ও কর নীতিকে নিজেদের স্বার্থে প্রভাবিত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব নিয়মকানুনের মাধ্যমে তারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করেছে। ফলে তারা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকে, আর ছোট বা রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত নয় এমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর টিকে থাকতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ইলেকট্রনিকস, স্টিল ও ভোজ্যতেল খাতের কিছু কোম্পানির নাম উল্লেখ করা যায়।

রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সাথে বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সংস্কারবিরোধী ঐক্যবদ্ধ অবস্থান

সংস্কারবিরোধী জোট হলো একদল প্রভাবশালী ব্যক্তি, যারা নিজেদের বিশেষ সুবিধা ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিরোধিতা করেছে। এই জোটের মধ্যে রাজনৈতিক শীর্ষ নেতাকর্মী, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এবং আমলাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যুক্ত থাকে। দুর্নীতিবিরোধী সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ ও চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই এই জোটের বাধার মুখে পড়তে হয়েছে এবং সংস্কার কার্যক্রম ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তারা তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে প্রচলিত দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়।

বিগত সরকারের শাসনামলে বিভিন্ন খাতে সংস্কার কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে রাজনৈতিক শীর্ষ নেতৃত্ব, ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এবং বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রের কিছু অংশ একত্রিত হয়েছে কাজ করেছে। এর কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো;

১. কর কাঠামোর সংস্কার

- **রাজস্ব আয় বাড়তে কর জাল বিস্তারের বিরুদ্ধে বাধা:** উচ্চ আয়ের ব্যক্তিদের এবং বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ওপর কর আরোপ এবং কর আদায়ের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় শক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে। বিশেষ করে বড় বড় শিল্পের মালিক এবং ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সদস্যরা কর ব্যবস্থার কঠোর প্রয়োগের বিরুদ্ধে সব সময় লবিং চালিয়েছে এবং ভ্যাট আইন সংস্কার ও প্রয়োগের বিরোধিতা করেছে।
- ২০১২ সালে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি (ECF) চুক্তির অংশ হিসেবে সরকার ‘মুসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২’ প্রণয়ন করে। এর লক্ষ্য ছিল ভ্যাট সংগ্রহের দক্ষতা বৃদ্ধি ও রাজস্ব আয় বাড়ানো। তবে রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট স্বার্থাশ্রেষ্টী ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর বিরোধিতার কারণে সংশোধিত ভ্যাট আইনটি সঠিকভাবে সময় মতো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।
- **জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্বায়ত্তশাসন:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজনৈতিক চাপের কারণে সর্বদা দুর্বল অবস্থায় থেকেছে। ফলে ব্যাপকভাবে কর সংস্কার কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়েছে। রাজনৈতিক নেতারা প্রায়শই তাদের ব্যবসায়িক মিত্রদের কর সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রভাব খাটিয়েছে। যা পুরো কর কাঠামো ও সংগ্রহ ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে।
- **প্রযুক্তি নির্ভর কর ব্যবস্থার বিরোধীতা:** কর ফাঁকি কমানো ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার মাধ্যমে ডিজিটাইজেশন করার চেষ্টা নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছে। এমন অনেকেই আছেন যারা বিদ্যমান আইনের ফাঁকফোকর ও ম্যানুয়াল পদ্ধতি থেকে কর ফাঁকি দেওয়ার সুবিধা নিচ্ছেন। ফলে তারা সব সময় কর সংগ্রহে ডিজিটাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। পাশাপাশি, অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানিতে রাজস্ব কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের সংখ্যা না বাড়ানো এবং যৌক্তিক কর যাতে প্রদান করতে না হয় তার বিরোধীতায় ব্যাপকভাবে তদবির বা লবিং চালানো হয়েছে। এর ফলে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া এগিয়েছে শামুক গতিতে।
- **সম্পত্তি ও সম্পদ কর সংস্কারে অনীহা:** সম্পত্তি, সম্পদ ও বিলাসবহুল পণ্যের ওপর কর আরোপ বা বৃদ্ধির পরিকল্পনার বিরুদ্ধে উচ্চ-সম্পদশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠী ও রিয়েল এস্টেট খাতের সঙ্গে যুক্ত রাজনীতিবিদরা সবসময় বিরোধিতা করেছেন। এর ফলে সরকার ধনীদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদ কর আদায় করতে পারেনি এবং কর রাজস্বের ভিত্তি সংকুচিত হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে কর বৈষম্য আরও বাড়িয়েছে।
- **স্বচ্ছ কর নিরীক্ষার (ট্যাক্স অডিট) বিরোধীতা:** বড় বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীও কর কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে কর সংক্রান্ত বিষয়ে নিষ্পত্তি করতে স্বচ্ছ কর নিরীক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। ফলে কর ফাঁকির সুযোগ বহাল থেকেছে।
- **প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার বিলম্ব:** ধনীরা বিলাসবহুল পণ্য ও মূলধনী আয়ের ওপর উচ্চ হারে কর আরোপের বিরোধিতা করেছেন বড় গ্রুপ ও রাজনৈতিক শীর্ষ নেতারা। তাদের এই অবস্থানের কারণে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং কর ব্যবস্থা সমতাভিত্তিক করার উদ্যোগ ধীরগতিতে এগিয়েছে।

২. ব্যাংকিং খাতের সংস্কার

- **রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও অনাদায়ী ঋণ:** রাজনৈতিকভাবে সম্পর্কিত ব্যাংক ঋণগ্রহীতারা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাওয়ায় অনাদায়ী বা খেলাপি ঋণের হার অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের ব্যবসায়িক সহযোগীদের রক্ষা করায় ব্যাংকিংখাতে কাঠোর নিয়ম নীতি পরিপালন ও কার্যকর ঋণ পুনরুদ্ধার নীতির বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। যদিও বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সুশাসন উন্নত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

- **রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলোর শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা:** রাজনৈতিকভাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালনা পর্ষদ নিয়োগের কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলোতে অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা চরম আকার ধারণ করেছে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ থেকে রাজনৈতিক প্রভাব দূর করার প্রচেষ্টা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ রাজনৈতিক নেতারা এই ব্যাংকগুলোকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে থাকেন।
- **বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ:** রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনি। যা মুদ্রানীতি ও ব্যাংকিং খাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করেছে।
- **বড় ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পুনঃগঠনে শিথিলতা:** রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ীরা সহজ শর্তে ঋণ পুনঃগঠনের সুবিধা পেয়েছে, যা ব্যাংকিং শৃঙ্খলাকে দুর্বল করেছে। সংস্কারের প্রচেষ্টা রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রভাবশালী গ্রুপগুলোর বাধার সম্মুখীন হয়েছে।
- **ব্যাংকের মালিকানা সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ:** ব্যাংকগুলোতে পারিবারিক মালিকানার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে নেওয়া পরিচালকদের সংখ্যা কমানোর উদ্যোগ শক্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন সেই রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট গ্রুপগুলো। যার ফলে প্রভাবশালী পরিবারগুলো ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।
- **ব্যাংকগুলোর যথাযথ মূলধন সংরক্ষণ নীতিমালার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ:** ব্যাংকগুলোর উদ্যোক্তারা কঠোর মূলধন সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে লবিং চালিয়েছে। তারা দাবি করেছে যে, পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ করতে গেলে ব্যাংকগুলোর ঋণ বিতরণ কমে আসবে, যা ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতাকে ব্যাহত করতে পারে।

৩. বিচার ব্যবস্থা সংস্কার

- **বিচারক নিয়োগ ও স্বাধীনতা:** রাজনৈতিক নিয়োগের ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়েছে। মেধাভিত্তিক নিয়োগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা রাজনৈতিক শীর্ষ নেতৃত্বের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। কারণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব সবসময়ই বিচার ব্যবস্থার ওপর দলীয় প্রভাব বজায় রাখতে চায়।
- **দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের প্রতিরোধ:** দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টাগুলো প্রায়শই ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে। যেখানে ক্ষমতাসীনদের ঘনিষ্ঠদের প্রতি নরম মনোভাব দেখানো হয়েছে। ফলে প্রকৃত সংস্কারের উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হয়েছে।
- **স্বাধীন বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠনে বাধা:** রাজনৈতিক শীর্ষ নেতৃত্ব, বিচারক নিয়োগ ও বদলির ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চেয়েছে। তাই স্বাধীন বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে।
- **আদালত ডিজিটাইজেশনে ধীরগতি:** আইনজীবী মহলের একাংশের বিরোধিতার কারণে আদালতের কার্যক্রম প্রযুক্তি নির্ভর বা ডিজিটাইজেশনের প্রচেষ্টা খুব একটা অগ্রগতি হয়নি। এর ফলে মামলার জট ও বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা বহাল রয়েছে।
- **গুরুত্বপূর্ণ মামলায় হস্তক্ষেপ:** রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে বিচার ব্যবস্থার সংস্কার বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট মামলাগুলো পরিচালনায় দীর্ঘায়িত বা খারিজ করা হয়েছে।
- **অর্থপাচারবিরোধী প্রচেষ্টায় বাধা:** রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রভাবশালীরা বিদেশে অর্থপাচারের বিরুদ্ধে নেওয়া বিচারিক পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছে, যার ফলে অর্থপাচার সংক্রান্ত মামলাগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে।
- **বিচার বিভাগের কার্যকর পৃথকীকরণে ব্যর্থতা:** ২০০৭ সালে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের আনুষ্ঠানিকভাবে আলাদা/ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হলেও, বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ দেখা গেছে বিচার বিভাগের ওপর।

৪. জনপ্রশাসনে সংস্কার

- **সিভিল সার্ভিস সংস্কার:** প্রশাসনে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও রাজনীতিকরণের প্রভাব কমানোর জন্য নেওয়া সংস্কার প্রচেষ্টা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবশালীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। ফলে মেধাভিত্তিক পদোন্নতি, পদায়ন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় যোগ্যতার ভিত্তিতে পরিচালনার কাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছে।
- **আমলাতান্ত্রিক জোটবদ্ধতা:** প্রশাসনে কর্মরত সিনিয়র আমলারা প্রায়শই মন্ত্রী-এমপিসহ শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে গাঁটছড়া বেধে থাকতেন। যাতে তাদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা ও সুবিধাজনক পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার বিষয়টি অক্ষুণ্ণ থাকে। বিশেষত সরকারি কেনাকাটার মতো লাভজনক খাতে তারা সংস্কার উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত করেছেন।
- **বিকেন্দ্রীকরণের প্রতি প্রতিরোধ:** প্রশাসনে কেন্দ্রে অবস্থান করা শীর্ষ আমলারা স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতা দেওয়ার সংস্কার প্রচেষ্টাকে বিভিন্নভাবে প্রতিহত করেছেন। যার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক সংস্কারের বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে।
- **কর্মদক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়নের বিরোধিতা:** মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বৈষম্যহীন কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালুর প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত করেছে আমলাতান্ত্রিক জোট। কারণ অনেক আমলা চাকরির নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক আনুকূল্য হারানোর ভয়ে, এটি মেনে নিতে চান না। ফলে জনসেবার মান উন্নয়নে সংস্কার কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করেছে।
- **আউটসোর্সিং ও বেসরকারিকরণের বিরোধিতা:** সরকারি সেবায় আউটসোর্সিংয়ের প্রস্তাব শ্রমিক সংগঠন ও আমলাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। তারা কর্মসংস্থান হ্রাস ও পৃষ্ঠপোষকতা হারানোর আশঙ্কায় এসব সংস্কার কার্যক্রম স্থগিত রেখেছে।

৫. বাণিজ্য নীতি সংস্কার

- **সংরক্ষণমূলক শুদ্ধ নীতি:** বাণিজ্য উদারীকরণের প্রচেষ্টা শক্তিশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোর বাধার সম্মুখীন হয়েছে প্রতিনিয়ত। যারা মূলত সংরক্ষণমূলক শুদ্ধ ও ভুক্তি থেকে লাভবান হয়েছে। রাজনৈতিক শীর্ষ নেতৃত্ব প্রায়শই এসব ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নেয় বলেই তারা এসব নীতি বাস্তবায়ন করতে পারেনি।
- **রপ্তানি খাতের চ্যালেঞ্জ:** তৈরি পোশাক খাতের বাইরের অন্যান্য পণ্যের রপ্তানি খাতকে বৈচিত্র্যময় করার প্রচেষ্টা বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোর আধিপত্যের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে— যা নতুন শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধিকে সীমিত করেছে।
- **নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা:** ইম্পাত ও ভোজ্যতেল শিল্পে শুদ্ধ ও কর সুবিধা দিয়ে প্রতিযোগিতার পথ সংকুচিত করা হয়েছে। দেশীয় স্বার্থাশ্রেষ্ট গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীদের এসব খাতে প্রবেশ রোধে রাজনৈতিক সহায়তা পেয়েছে।
- **রপ্তানি প্রণোদনা সংস্কারে প্রতিবন্ধকতা:** শক্তিশালী লবিষ্ট গ্রুপগুলোর চাপে রপ্তানি প্রণোদনার সংস্কার বিলম্বিত হয়েছে। বর্তমান কাঠামো যেহেতু তাদের কায়মি স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই তারা নতুন খাতের প্রসারের সুযোগ সীমিত করে রেখেছে।
- **কৃষিপণ্য আমদানির উদারীকরণ প্রতিরোধ:** বড় কৃষিভিত্তিক ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলো সংরক্ষণমূলক নীতির সুবিধা নিয়ে থাকে, ফলে খাদ্য মূল্য হ্রাস বা সরবরাহের ঘাটতি পূরণের জন্য কৃষিপণ্য আমদানির উদারীকরণ বাধাগ্রস্ত হয়েছে।
- **লজিস্টিক খাতে সংস্কারের প্রতিবন্ধকতা:** বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। পরিবহন ও লজিস্টিক খাতের শক্তিশালী স্বার্থাশ্রেষ্ট গোষ্ঠীগুলো অনানুষ্ঠানিকভাবে আর্থিক সুবিধা হারানোর ভয়ে সংস্কারের বিরোধিতা করেছে।

৬. পুঁজিবাজার সংস্কার

- **নিয়ন্ত্রক সংস্থার ওপর রাজনৈতিক প্রভাব:** রাজনৈতিক শীর্ষ নেতৃত্ব বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে (বিএসইসি) নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর পুঁজির স্বার্থকে সুবিধা ও নিশ্চয়তা দিতে চাপ দিয়েছে। যা পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে গৃহীত সংস্কার উদ্যোগগুলোর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।
- **সুশাসন শক্তিশালীকরণের বিরোধিতা:** রাজনৈতিক অভিজাতদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলো কর্পোরেট গভর্নেন্স উন্নত করার প্রস্তাবিত সংস্কারের বিরুদ্ধে জোর চেষ্টা চালিয়েছে। কারণ তারা অধিকতর জবাবদিহিতা ও নজরদারি এড়িয়ে তাদের নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিল করার চেষ্টা করেছে।
- **নতুন সিকিউরিটিজ আইন প্রণয়নে বাধা:** শক্তিশালী শিল্পগোষ্ঠীগুলো আরও কঠোর সিকিউরিটিজ আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছে। কারণ তারা দুর্বল নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সুবিধা নিয়ে কম তদারকি/নজরদারির মধ্যে তাদের অনৈতিক কার্যক্রম ও শেয়ার ব্যবসা পরিচালনা করতে চেয়েছে।
- **আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ:** রাজনৈতিক সংযোগ থাকার ফলে নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা পেয়েছে। যা পুঁজিবাজারে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করার প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করেছে।
- **বাজার বৈচিত্র্যকরণের প্রতি সমর্থনের অভাব:** প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলো নতুন আর্থিক উপকরণ ও বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগের বিরোধিতা করেছে। কারণ তারা বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চেয়েছে।
- **প্রযুক্তিগত সমাধান বাস্তবায়নকে দীর্ঘায়িত করা:** শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের প্ল্যাটফর্ম ডিজিটাইজ করা ও বাজারে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে নেওয়া উদ্যোগগুলো বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কারণ সুবিধাভোগীরা প্রচলিত পুঁজিবাজার কাঠামোর পরিবর্তন চায়নি।

এই উদাহরণগুলো বাংলাদেশের পুঁজিবাজার বাজারে সংস্কারের বিরুদ্ধে গভীর ও বহুমুখী বিরোধিতাকে স্পষ্ট করেছে। রাজনৈতিক অভিজাত, ব্যবসায়ী নেতা ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে স্বার্থের সংযোগ একটি জটিল নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। যা কার্যকর সংস্কারের উদ্যোগগুলোকে বাধাগ্রস্ত বা দুর্বল করে দেয়। ফলে সরকার অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়।

২১.৩ কেন এই পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা?

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অবক্ষয়

বাংলাদেশে বিগত সরকারের শাসনকালে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতার মূল কারণ ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং দীর্ঘদিনের সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ার ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রমশ দলীয়করণ হয়েছে। যেখানে শীর্ষস্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলো গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করার পরিবর্তে ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত হয়েছে।

বিরোধীদের কণ্ঠস্বরের পাশাপাশি গণমাধ্যমের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। যার ফলে ভিন্নমত দমন করা সহজ হয়েছে এবং নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত হয়েছে। এসব চর্চায় এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছে, যেখানে গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে বহুমতের উপস্থিতি ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার সুযোগ সংকুচিত হয়েছে।

তবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সীমিত নিন্দার কারণে সরকার একধরনের বৈধতার আবরণ পেয়েছে। যা তাদেরকে স্বৈরাচারী কার্যক্রম চালিয়ে

যেতে সহায়তা করেছে। সরকারের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব এবং বৈশ্বিক চাপের অভাব গণতান্ত্রিক সংস্কারকে পেছনের সারিতে ঠেলে দিয়েছে। যার ফলে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২০১৪ সালের ত্রুটিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন থেকে এই সংকট প্রকট আকারে দেখা দেয়। যা রাজনৈতিক বৈধতার এক গুরুতর সমস্যা তৈরি করে। যেকোনো সরকারের জন্য দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার ক্ষেত্রে বৈধতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ২০১৪ সালের পর থেকে এই বৈধতা ক্রমশ প্রশ্লবদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশে। এই সংকট মোকাবিলার জন্য সরকার উন্নয়নের একটি বিকল্প ধারণা প্রচারে মনোযোগ দেয়। তবে এই উন্নয়নের বৈধতা প্রতিষ্ঠার নামে স্বজনপ্রীতিমূলক পুঁজিবাদ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। একইসঙ্গে, প্রকল্পভিত্তিক দুর্নীতি গত এক দশকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

এসময় একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক গোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় নীতিগুলোর মাধ্যমে ইচ্ছেমত লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। যাদের কেন্দ্রের প্রভাবশালী রাজনৈতিক, সামরিক বাহিনীর নির্দিষ্ট অংশ এবং বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কিছু গোষ্ঠী সমর্থন করেছে। তারা সম্মিলিতভাবে এই উন্নয়ন বর্ণনাকে একটি দীর্ঘমেয়াদি কাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্রিয় ছিল।

ভঙ্গুর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থার ওপর পরাক্রমশালী অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য বিস্তার

বাংলাদেশে কর্মক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রক হলো বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান। যেখানে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল ও ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনুরূপ উন্নয়ন পর্যায়ের অনেক দেশ, বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ ব্যতিক্রমভাবে কিছু কার্যকর 'জিডিপির প্রবৃদ্ধি বর্ধনকারী' অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। যদিও সামগ্রিকভাবে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থা উদ্বেগজনক। তারপরও কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশে 'কার্যকর অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের' কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো— তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য বিশেষ সুবিধা ও নীতিগত সমর্থন; শ্রমশক্তি রপ্তানির প্রসার; খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন; এবং ক্ষুদ্র ঋণখাতের অগ্রগতি।

তবে বাংলাদেশ এখনও শক্তিশালী ও কার্যকর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। যা উচ্চ প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা এবং উন্নয়নের পরবর্তী লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য।

'চুক্তিভিত্তিক পরিবেশের' আধিপত্য

বাংলাদেশের শিল্প বা বৃহত্তর পরিসরে উন্নয়ন কৌশল, বিনিয়োগের প্রধান সিদ্ধান্ত এবং সম্পদের বণ্টন মূলত রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রভাবশালীদের মধ্যে সম্পাদিত 'চুক্তি' বা সমঝোতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এই সমঝোতাগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম বা প্রকল্পের জন্য গৃহীত হয় এবং একটি সুস্পষ্ট ও সুসংগঠিত নীতির পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্ত ও খণ্ডিতভাবে পরিচালিত হতো। তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে এই 'চুক্তিভিত্তিক পরিবেশ' ইতিবাচক ফলাফল বয়ে এনেছে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে এ ধরনের চুক্তি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আনতে পারেনি বা রপ্তানি বহুমুখীকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিকল্পগুলোর অনুসরণে বাধা সৃষ্টি করেছে।

তবে এটি সত্য যে, চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক শিল্পনীতির সঙ্গে বিরোধপূর্ণ হতে হবে এমন নয়। যদি এগুলো একটি সুসংগঠিত দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের আওতায় পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্র নির্দিষ্ট শিল্পখাতের জন্য প্রদত্ত সহায়তার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। তবে বাংলাদেশে যে 'চুক্তিভিত্তিক পরিবেশ' বিদ্যমান, তা এই শর্ত পূরণ করতে পারেনি।

শিল্পনীতি সরকার পরিচালিত অন্যান্য নীতিমালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, যেমন—মৌলিক অর্থনৈতিক নীতি (যেমন প্রকৃত বিনিময় হার), সরকারি অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ব্যবস্থাপনা। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে এসব নীতির প্রভাব সম্পর্কে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকা জরুরি।

উল্লেখযোগ্যভাবে সামগ্রিক ব্যবসায়িক পরিবেশ শিল্পোন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে খুবই জরুরি। পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ দেখিয়েছে যে, শিল্প পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে এফডিআই প্রধান চালিকা শক্তি। তবে বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ এখনও প্রতিকূল এবং এই অবস্থার উন্নতি করে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নীত করা এখানে একটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অকার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কার্যকারিতা এবং ন্যায্যসঙ্গত জিডিপির প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, তাকে ‘কার্যকর নিয়ন্ত্রণ সমস্যা’ (problem of effective regulation) নামে বলা হয়। কিছু ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণের জন্য বিদ্যমান আইনগত কাঠামো পুরনো বা অপরিপূর্ণ যা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং যেখানে সংস্কারের প্রচেষ্টা বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতিমালা বিদ্যমান থাকলেও তা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত দক্ষতা বা সক্ষমতা নেই।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার বেশ কিছু উদাহরণ রয়েছে, যেমন—ব্যাংকিং খাতে আইনি মানদণ্ড অনুসরণে অবহেলা; তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমমান ও কর্মপরিবেশ উন্নত করার দুর্বল প্রয়োগ; রাজস্ব আহরণের দুর্বলতা, মূলধন পাচারের ব্যাপকতা। রায়হান, বুরগুইনিয়ন ও সালাম (২০২৪) মনে করেন যে, এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ব্যর্থতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

দুর্বল রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা

যেখানে নিম্নমানের সরকারি সেবা দুর্বলতার পরিচায়ক, সেখানে বাংলাদেশ সীমিত রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। যা সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভাবনাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করতে পারে। সম্পদের সংকট এই সীমাবদ্ধতার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি। যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো বাংলাদেশের কর-জিডিপি (tax-to-GDP) অনুপাত অনেক কম। বাস্তবে এটি বিশ্বে অন্যতম সর্বনিম্ন। যা সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জনসেবা খাতে অর্থায়নের সক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

কর, রাজস্ব থেকে পর্যাপ্ত আয় না হওয়ায় সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অবকাঠামোর মতো সামাজিক খাতে যথেষ্ট বিনিয়োগ করতে পারে না। ফলে সরকারি সেবার প্রসার এবং দক্ষতা মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। যার কারণে বিপুল জনগোষ্ঠী প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক পরিসরের তুলনায় বাংলাদেশের সরকারি খাত তুলনামূলকভাবে ছোট আকারে রয়ে গেছে। যা দেশের সর্বত্র মানসম্পন্ন সেবা প্রদানকে সীমিত করে। পাশাপাশি জনসেবার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও সম্পদের ঘাটতির কারণে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক ও ন্যায্যসঙ্গত সেবা প্রদানের সক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে অপরিপূর্ণ অর্থায়ন ও দুর্বল কাঠামোর কারণে অধিকাংশ মানুষ মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যা দারিদ্র্যের দুই চক্র বজায় রাখছে এবং সামাজিক অগ্রগতিকে সীমিত করছে। তবে বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্জনের একটি বড় অংশ এনজিওগুলোর অবদানের ফলে সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ ও সেবামূলক খাতে ঐতিহাসিকভাবে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা সীমিত ছিল। গত পাঁচ দশকে সরকার এনজিওগুলোকে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছিল। যাতে তারা প্রয়োজনীয় সেবাগুলো দিতে পারে এবং রাষ্ট্রের সীমিত উপস্থিতির ঘাটতি পূরণ করতে পারে।

তবে গত এক দশকে এই স্বাধীনতা অনেকটাই সংকুচিত হয়েছে। বিশেষ করে মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক সংস্কার এবং দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত এনজিওগুলো ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। পাশাপাশি নানা ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছে, বিশেষ করে অর্থছাড়ের প্রক্ষেপে। এটি সরকারের সমালোচনামূলক সংগঠনগুলোর প্রতি সহনশীলতা হ্রাসের প্রতিফলন। যা নাগরিক সমাজের শাসন ও জবাবদিহিতার ভূমিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

২১.৪ মূল বার্তাসমূহ

১. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তিশালীকরণ: বিগত সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধারাবাহিক ব্যর্থতার ফলে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির অবক্ষয়, নাগরিক স্বাধীনতার সংকোচন এবং ক্ষমতার ভারসাম্য ও জবাবদিহিতার দুর্বলতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই ব্যর্থতাগুলো ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীয়করণের ফলে সৃষ্ট। যা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা দুর্বল করে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা কমিয়ে দেয়। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নির্বাচনী স্বচ্ছতা এবং নাগরিক সমাজের অধিকার নিশ্চিত করা জরুরি।

২. প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের শক্তিশালীকরণ: টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য কার্যকর, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দূর করা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর কাঠামো উন্নত করা এবং আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাই হবে নাগরিকদের আস্থা পুনরুদ্ধার এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর প্রধান উপায়।

৩. পৃষ্ঠপোষকতামূলক পুঁজিবাদ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হ্রাস: রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবসায়িক প্রভাবশালীদের প্রভাব কমানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত পৃষ্ঠপোষকতামূলক পুঁজিবাদী নেটওয়ার্ক ভেঙে ফেলবে। পাশাপাশি ন্যায্য প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করবে এবং লাইসেন্স, চুক্তি ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সম্পদের বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনবে।

৪. গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাতগুলোর ব্যাপক সংস্কার: টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যাংকিং খাত, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, দক্ষতার সাথে সরকারি অর্থ পরিচালনা এবং বাণিজ্য ও শিল্প নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাতগুলোতে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। এর মধ্যে থাকবে নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি, করের আওতা সম্প্রসারণ, রাজস্ব ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং কৌশলগত বাণিজ্য ও শিল্প নীতির বাস্তবায়ন। এসব পরিবর্তন অর্থনীতিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থিতিশীল করে তুলবে। পাশাপাশি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অনিয়ন্ত্রিত আধিপত্য কমিয়ে আনবে।

৫. রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা ও সরকারি সেবার উন্নয়ন: স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতকে আরও শক্তিশালী করার জন্য রাজস্ব আদায়ের পরিধির বিস্তৃত করা এবং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা জরুরি। এছাড়াও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানবসম্পদে বিনিয়োগ অবকাঠামোগত বিনিয়োগের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৬. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্পনীতি প্রচার: বাংলাদেশের জন্য খণ্ডিত ও অস্থায়ী ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি সুসংগঠিত এবং সমন্বিত শিল্পনীতি প্রয়োজন। যা রপ্তানি বহুমুখীকরণ, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং তৈরি পোশাক শিল্পের বাইরে অন্যান্য খাতের বিকাশে গুরুত্ব দেবে। এটি অবশ্যই একটি সহায়ক ব্যবসায়িক পরিবেশ, স্বচ্ছতা এবং সুস্পষ্ট ও ধারাবাহিক নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে।

অধ্যায় ২২ - ডেটা ইকোসিস্টেম: উন্নয়ন আখ্যানের খলনায়ক*

- বাংলাদেশের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও সরকারি পরিসংখ্যানের স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন রয়েছে
- বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থার মূল তিনটি প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ হলো—দক্ষ জনবল ও প্রযুক্তির অভাব, সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং রাজনৈতিক-পক্ষপাতমূলক হস্তক্ষেপ
- জিডিপি, মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্যসহ প্রধান অর্থনৈতিক সূচকসমূহে তথ্যের গড়মিল ও রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ আছে। ২০১৫-২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশের বার্ষিক জিডিপির প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যানের মধ্যে ৩.৭% বিশ্বব্যাংকের মডেল থেকে ব্যাখ্যা করা যায়নি। এত বড় পার্থক্য একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণেও বিভিন্ন সময়ে সরকারি প্রবৃদ্ধির উপাত্ত ও হার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে
- মূল্যস্ফীতি ও দারিদ্র্যের পরিসংখ্যানে বাস্তবতার সঙ্গে বড় ধরনের অসামঞ্জস্য দেখা গেছে, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ওপরে যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে তা গোপন রাখা হয়েছে
- শ্রমশক্তি জরিপে পুরোনো আন্তর্জাতিক মান (১৩তম ICLS) ব্যবহার করায় বেকারত্বের হার কম এবং কর্মসংস্থান বেশি দেখানো হয়েছে, যা বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক
- বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক সূচকে দেখা গেছে, তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা, সময়ানুবর্তিতা ও স্বচ্ছতায় বাংলাদেশ আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। বিবিএসসহ সরকারি সংস্থাগুলো অনেক সময় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশে দেরি করেছে বা প্রকৃত তথ্য সংশোধন করেছে
- তথ্য ব্যবস্থাপনায় সহজলভ্যতা, প্রবেশাধিকার, গতিশীলতা ও সঠিকতা ফেরাতে স্বাধীন তথ্য কমিশন গঠন করা প্রয়োজন, যাতে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে সঠিক তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছায় এবং নীতি নির্ধারণে ব্যবহার করা যায়

২২.১ তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা: কাঠামোগত বিশ্লেষণ ও চ্যালেঞ্জ

একটি কার্যকর নীতি প্রণয়নের জন্য নির্ভরযোগ্য ও সঠিক তথ্য-উপাত্ত তথা পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি এমন একটি ভিত্তি তৈরি করে, যার ওপর একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সুশাসনের গুণগত মান নির্ভর করে। সঠিক তথ্য উপাত্ত নীতিনির্ধারণের প্রতিটি পর্যায়ে যেমন— নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও সংশোধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে বাংলাদেশে তথ্য ব্যবস্থা বা পরিসংখ্যানের স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতা দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্নবিদ্ধ।

গত ১৫ বছরে স্বাধীন বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদরা বারবার সরকারি পরিসংখ্যানের গুণমান ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত প্রায়ই অর্থনীতির প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত করে না এবং কার্যকর নীতিনির্ধারণের জন্য তা পর্যাপ্ত নয়। যখন জিডিপির প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রাস্ফীতি, বেসরকারি বিনিয়োগ বা কর্মসংস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচকের তথ্য অবিশ্বাস্য বা ত্রুটিপূর্ণ হয়, তখন বাস্তব পরিস্থিতি ও নীতিগত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিশাল ফারাক সৃষ্টি হয়। এর ফলে সরকার ও অন্যান্য অংশীজনদের পক্ষে প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করা এবং কার্যকর সমাধান গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এটি শুধুমাত্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নীতিনির্ধারণকদের জন্য সমস্যা তৈরি করে না, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আন্তর্জাতিক ঋণমান নির্ধারণকারী সংস্থাগুলো সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি ও আস্থায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ; তওফিকুল ইসলাম খান, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সিপিডি; সারাহ সাবিনা খান, হেড অফ সল্যুশন ম্যাপিং, এক্সেলারেটর ল্যাব, ইউএনডিপি বাংলাদেশ এবং ইফফাত আনজুম, হেড অফ এক্সপ্লোরেশন, ইউএনডিপি বাংলাদেশ।

ওপর ভিত্তি করে একটি দেশের অর্থনৈতিক ঝুঁকি ও প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা মূল্যায়ন করে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনের জন্য এই তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যদি বাংলাদেশের তথ্য ব্যবস্থার ক্রটিগুলোর সমাধান করা না হয় তাহলে এটি দেশের ঋণমান উন্নয়ন ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে উঠবে।

বৈশ্বিক সূচক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণেও বাংলাদেশের পরিসংখ্যানগত সক্ষমতার দুর্বলতা স্পষ্ট হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ক্যাপাসিটি ইনডেক্স (এসসিআই) অনুযায়ী, ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পরিসংখ্যানগত কার্যকারিতার অবনতি ঘটেছে। বিশেষত, তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা, সময়ানুবর্তিতা এবং স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও ভিয়েতনামের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। যদিও সাম্প্রতিক মূল্যায়নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সম্পর্কিত তথ্যের প্রাপ্যতা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। তবুও তথ্যের উৎস, অবকাঠামো ও পরিষেবার ক্ষেত্রে বড় ঘাটতি রয়ে গেছে।

এই সীমাবদ্ধতাগুলো তথ্যের গুণগত মান, প্রবেশগম্যতা, উন্মুক্ততা এবং বিশ্লেষণযোগ্যতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি নতুন তথ্য উৎস ব্যবহারের জন্য যে কাঠামোগত সহায়তা প্রয়োজন তা বাংলাদেশে এখনও দুর্বল।

বাংলাদেশ যখন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উত্তরণের পথে রয়েছে তখন এই দুর্বলতা আরও গভীর উদ্বেগের কারণ হয়েছে উঠেছে। এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, নীতি বাস্তবায়নের ঘাটতি চিহ্নিতকরণ এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত অপরিহার্য হবে। একইসঙ্গে, উত্তরণের পর বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশের সক্ষমতা মূল্যায়নে সঠিক পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সুতরাং বাংলাদেশের জাতীয় তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থার সমালোচনামূলক পর্যালোচনা শুধুমাত্র একটি কারিগরি বিষয় নয়; বরং এটি দেশের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই প্রেক্ষাপটে এই অধ্যায়টি বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনা বা ডেটা ইকোসিস্টেম নিয়ে যেসব পর্যালোচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো—

(ক) চারটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্তের সমস্যা এবং সেগুলোর অন্তর্নিহিত কারণ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা; (খ) প্রাপ্যতা (Availability), প্রবেশযোগ্যতা (Accessibility), দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা (Agility) এবং যথার্থতা (Accuracy)—এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনা বা ডেটা ইকোসিস্টেম মূল্যায়ন করা; (গ) পরিসংখ্যান উৎপাদন সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা; এবং (ঘ) প্রাপ্ত শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

এই গবেষণায় তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেখানে প্রক্সি ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে। গবেষণাটি এ সংক্রান্ত অন্যান্য গবেষণা, আন্তর্জাতিক সূচক এবং জাতীয় তথ্য সূত্রের গুণগত বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতা ও নীতি-প্রণেতাদের মতামত সংগ্রহ করে প্রাসঙ্গিক প্রমাণ এবং পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণে তিনটি প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে। যা বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে তথ্য-উপাত্তের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং পরিসংখ্যান ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। চ্যালেঞ্জগুলো হলো—

১. দক্ষতার ঘাটতি অর্থাৎ তথ্য উৎপাদনের জন্য দক্ষ জনবল ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার অভাব।
২. সমন্বয়হীনতা, অর্থাৎ বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পর্যাপ্ত সমন্বয় না থাকা।
৩. সংশ্লিষ্টতা ও পক্ষপাত, অর্থাৎ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পক্ষপাতদুষ্টতা, যা তথ্যের নিরপেক্ষতা নষ্ট করে।

এসব চ্যালেঞ্জের কারণে তথ্যদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো ধারাবাহিকভাবে নির্ভরযোগ্য, সময়োপযোগী, বিশ্লেষণযোগ্য এবং ব্যবহারযোগ্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটা প্রথমে উন্নয়নের বয়ান তৈরির জন্য ব্যবহার করা হলেও শেষ পর্যন্ত সেটি নীতি-নির্ধারকদের জন্যও বিভ্রান্তি তৈরি করেছে।

এই অধ্যায়ে প্রস্তাবিত সংস্কারমূলক উদ্যোগগুলোর মূল লক্ষ্য হলো— প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করা, যা আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দ্বারা সম্ভব; আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয় বৃদ্ধি করে তথ্যের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা দূর করা; একটি স্বাধীন তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা।

২২.২ নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রের গভীর বিশ্লেষণ: সমস্যার কাঠামো উন্মোচন

এই শ্বেতপত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কিত সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় হলো— জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিক দ্রুত বৃদ্ধি নিয়ে অস্পষ্টতা (অধ্যায় ২); মূল্যস্ফীতির তথ্যের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন (অধ্যায় ৩); বৈদেশিক লেনদেনের পরিসংখ্যান বা ব্যালেন্স অব পেমেণ্টের অসামঞ্জস্যতা (অধ্যায় ৪); ব্যাংকগুলোর অনাদায়ী ও খেলাপি ঋণ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে কম দেখানো (অধ্যায় ১০); শ্রমবাজার পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব, যেখানে বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়নি (অধ্যায় ১৬); রপ্তানি আয়ের পরিসংখ্যানের অসঙ্গতি (অধ্যায় ১২); এবং সরকারি বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যের অগ্রহণযোগ্যতা (অধ্যায় ১৭ ও ১৯)।

এই সমস্যাগুলোর সৃষ্টির কারণ হলো পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। আর এ কারণে তথ্য-উপাত্তের বিশ্বাসযোগ্যতা ভীষণভাবে নষ্ট হয়েছে। দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে বাংলাদেশের সরকারি পরিসংখ্যান।

এই অধ্যায়ে চারটি প্রধান তথ্য সূচক— জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, শ্রমশক্তি জরিপ এবং পারিবারিক আয় ও ব্যয় বা খানাজরিপের তথ্য উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সূচকগুলোর গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে বিগত সরকারের সময় এগুলো উন্নয়নের বিবরণ বা ফিরিস্তি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও তা বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্তিসঙ্গত সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

নির্বাচিত সূচক ও জরিপগুলো তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। যেমন, খানাজরিপ কেবল দারিদ্র্যের হার নয় বরং আয়, ভোগব্যয় ও বৈষম্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। এসব তথ্য এককভাবে কার্যকর নয়, বরং প্রশাসনিক রেকর্ড, জাতীয় রাজস্ব পরিসংখ্যান, বেসরকারি বিনিয়োগ, অনাদায়ী ঋণ এবং রপ্তানি পরিসংখ্যানের মতো অন্যান্য উৎসের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্যের যথার্থতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

এই বিশদ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হলো— তথ্যের গড়মিল ও অনিশ্চয়তার পরিমাণ চিহ্নিত করা। এই সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণগুলো ব্যাখ্যা এবং তথ্য-উপাত্তের ধারাবাহিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা মূল্যায়ন করা। সাধারণভাবে কাঠামোগত দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা। তবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো— দেশের নীতি-নির্ধারণ ও ভবিষ্যৎ সংস্কার উদ্যোগগুলোর জন্য মূল সূচকগুলোর পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন আছে কি না।

এই অধ্যায়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো— জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থায় আস্থা পুনঃস্থাপনের জন্য সম্ভাব্য সংস্কারের পথ খোঁজা। শুধুমাত্র বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থাপনা দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরভাবে সাহায্য করতে পারে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: যেখান থেকে শুরু হয়েছিল তথ্যের গড়মিল

বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। বিভিন্ন সময়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণও হয়েছে। কারণ এটি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অর্থনীতি বা ম্যাক্রো-ইকোনমিক ও উন্নয়নের অন্যান্য সূচক যেমন—বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহ, রাজস্ব সংগ্রহ, যন্ত্রপাতির আমদানি ব্যয়, জ্বালানি ব্যবহার, রপ্তানি আয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

অনেকে মনে করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জিডিপি পরিসংখ্যানের সঠিকতা ও স্বচ্ছতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিশেষত গত এক দশকে এই আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৫ থেকে ২০১৯ সাল সময়কাল নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক একটি গবেষণা দেখা যায়, ১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকে গঠনমূলক অর্থনৈতিক উপাদান (যেমন—বাণিজ্য, বৈদেশিক বিনিয়োগ, আর্থিক খাত, অবকাঠামো, সামাজিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা) বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির একটি যুক্তিসঙ্গত পূর্বাভাস দিতে সক্ষম ছিল। তবে ২০১০-এর দশক থেকে ‘ব্যাখাহীন প্রবৃদ্ধির’ হার ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বিশেষ করে ২০১৫-২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশের বার্ষিক জিডিপির প্রবৃদ্ধি হার ৩ দশমিক ৭ শতাংশ বলা হলেও তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেনি সরকার। বিশ্বব্যাংকের মতে এই প্রবৃদ্ধির ধারা ‘অস্বাভাবিক’। বাংলাদেশে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণেও বিভিন্ন সময়ে প্রবৃদ্ধির এই হার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যেমন ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত (মূলভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬) বাংলাদেশে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার কখনও আগের বছরের তুলনায় কম দেখানো হয়নি।

জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারের তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক সূচকগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যতা না থাকার বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে সমালোচনা হয়েছে। যেমন ২০১৭ অর্থবছরে শিল্প উৎপাদন সূচক (কিউআইআইপি) অনুযায়ী, চামড়াজাতদ্রব্য খাতে ৫৪ দশমিক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছিল। অথচ এ খাতের রপ্তানি আয় সেই বছরে কমেছে ১৬.৩ শতাংশ। একইভাবে ২০১৮ অর্থবছরে চামড়াজাতদ্রব্য খাতে ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখানো হলেও রপ্তানি আয়ে কমেছিল ২১ দশমিক ৩ শতাংশ। ওষুধ খাতেও একই ধরনের অস্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছিল। একইসঙ্গে, শিল্প খাতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের ওঠা-নামা শিল্প উৎপাদনের মূল্য সংযোজন পরিসংখ্যানেও প্রতিফলিত হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে অর্থের বেশি মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রক্ষেপণের তথ্য উপাত্ত বাস্তব সম্মত ছিল না। যার বেশিরভাগই সমকালীন পরিসংখ্যানের সাথে মিল থাকতো না। বিভিন্ন খাতে মূল্য সংযোজনের হিসাব-নিকাশও পুরনো উপাত্তের ওপর নির্ভর করে করা হতো। যেমন ব্যক্তিগত পরিবহন খাতের মূল্য সংযোজন নির্ধারণ করা হয় শুধুমাত্র বিআরটিএতে নতুনভাবে নিবন্ধিত যানবাহনের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির মূল্য সংযোজন অনুমান বা প্রক্ষেপণ করা হয়। যেখানে পুরনো ও অকেজো যানবাহনের সংখ্যা বিবেচনায় নেয় না।

এছাড়া খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধির অন্যান্য হিসাবের সাথেও পরিসংখ্যানগত পার্থক্য রয়েছে। যখন খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করা হয়, তখন কিছু অস্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। যেমন পরিসংখ্যানের একটি সাধারণ মান বিচ্যুতি (স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন) বিশ্লেষণ দেখিয়েছে যে, সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল সবচেয়ে স্থিতিশীল। যেসব খাতের তথ্যের যথার্থতা প্রশ্নবদ্ধ (যেমন—মান বিচ্যুতির হার কম), সেসব খাতের প্রবৃদ্ধির ওঠানামা তুলনামূলকভাবে কম দেখা গেছে। আবার যেসব খাতে প্রবৃদ্ধির অস্বাভাবিক স্থিতিশীলতা দেখা গেছে, যেমন—পশুপালন, মৎস্য খাত, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, ভূমি পরিবহন, জলপথ পরিবহন, আবাসন ও ভাড়া সংক্রান্ত ব্যবসা, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতগুলোর মান বিচ্যুতির হার শূন্য দশমিক ২ থেকে শূন্য দশমিক ৬-এর মধ্যে ছিল। যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এই প্রবণতাগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যানে কাঠামোগত ত্রুটির

ইঙ্গিত দেয়। এই শ্বেতপত্রের তৃতীয় অধ্যায়েও উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের মূল্য সংযোজনের একটি বড় অংশ ক্রমাগতভাবে নিম্নমুখী।

বাংলাদেশের জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য জরুরিভিত্তিতে তথ্যের দুর্বলতা দূর করার পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। নিয়মিত একাধিক জরিপ পরিচালনা করা অপরিহার্য। সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে (যেমন, প্রাণিসম্পদ বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর ইত্যাদি) তথ্যের গুণগত মান উন্নত করতে হবে। জিডিপির অনুমান উল্লেখযোগ্যভাবে সরকারের বাজেট তথ্যের উপর নির্ভরশীল। তবে বিশ্বয়করভাবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) আর্থিক বিভাগের কাছ থেকে প্রকৃত ব্যয়ের তথ্য সময়মতো সংগ্রহের অনুমতি পায় না। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, বাজেট বরাদ্দের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকা ব্যবহৃত হয় না, যা জিডিপি তথ্যের গুণগত মানকে ক্ষুণ্ণ করে।

ব্যয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করেও জিডিপি অনুমানে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের অভাবে গুরুতর সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সহজলভ্য হলেও সরকারি ব্যয়, বিশেষ করে সরকারি বিনিয়োগ, বাজেট বা সংশোধিত বাজেটের উপর নির্ভর করে। যা আইবিএস++ থেকে প্রাপ্ত সরকারি ব্যয়জনিত তথ্যের না পাওয়ার সমস্যায় জর্জরিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ভোক্তার ব্যয়ের জন্য কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। ফলে সবসময় সেটা আনুমানিক হিসাবের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। একই অবস্থা সঞ্চয়ের তথ্যের ক্ষেত্রেও। বেসরকারি বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের তথ্যও চলতি সময়ে পরিবর্তে পুরনো জরিপের তথ্যের উপর নির্ভরশীল। ফলে অনেক তথ্যই বিশ্বাসযোগ্য হয় না।

গত এক দশক ধরে অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য বিকৃত করা হয়েছে কি না। বিবিএস ও অন্যান্য সংস্থার সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনায় উঠে এসেছে, জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেখানোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ এবং নিঃসন্দেহে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ২০১৩ পরবর্তী রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকরা। তবে এটাও সত্য, জাতীয় হিসাবের পরিসংখ্যান প্রকাশের ক্ষেত্রেও নীতিনির্ধারকদের সন্তুষ্টি বজায় রাখতে প্রভাবিত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় কিছু ক্ষেত্রে আগের বছরের পটভূমির তথ্যও সংশোধন করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, বিবিএসের মধ্যে একটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, যারা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি কাগজে-কলমে ধরে রাখার জন্য কাজ করেছে। ২০১৯ পরবর্তী সময়ে এই গোষ্ঠী তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। তথ্য প্রস্তুতকারীরা সম্ভবত এমন এক চাপের মধ্যে ছিলেন, যেখানে পূর্বের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দ্রুতগতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেখানোর জন্য অতিরঞ্জিত তথ্য উপস্থাপন করতে হয়েছে। তারপরও তথ্য প্রস্তুতকারী ও ব্যবহারকারী উভয়েই একমত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সূচকের তথ্য প্রভাবিত করার প্রবণতা শুরু হয়েছিল জিডিপি প্রবৃদ্ধি থেকেই।

মূল্যক্ষীতি: সাধারণ মানুষ সরকারি পরিসংখ্যানের সাথে বাস্তবতার মিল খুঁজে পায় না

সরকারি মূল্যক্ষীতির তথ্য সাধারণ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম কি না, এ নিয়ে ব্যাপক শঙ্কা রয়েছে। ২০১৮ সালে গবেষণা সংস্থা সানেম (SANEM) ১০,৫০০টি পরিবারের ওপর পরিচালিত একটি জাতীয় জরিপের বিশদ তথ্য ব্যবহার করে পরিবারগুলোর জন্য নির্দিষ্ট ভোগ্যপণ্যের তালিকা তৈরি করে। একইসঙ্গে, বাংলাদেশ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের খুচরা মূল্য তথ্যের ভিত্তিতে খাদ্য মূল্য সূচক নির্ণয় করে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যে খাদ্য মূল্যক্ষীতির সম্মুখীন হয়, তা বিবিএসের দেয়া তথ্যের তুলনায় উল্লেখযোগ্যহারে বেশি।

জানুয়ারি ২০২২-এ বিবিএস জানায়, শহরাঞ্চলে খাদ্য মূল্যক্ষীতি ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ এবং গ্রামীণ এলাকায় ৫ দশমিক ৯৪ শতাংশ। যদিও সানেম এর অনুমান অনুযায়ী, ২০২২ প্রান্তিক পরিবারগুলো দ্বিগুণেরও বেশি মূল্যক্ষীতির হার মোকাবিলা করেছে। শহরাঞ্চলে প্রান্তিক পরিবারগুলোর মোট ব্যয়ের ৬১ দশমিক ১৩ শতাংশ

এবং গ্রামীণ এলাকায় ৬৫ দশমিক ৩৬ শতাংশ খাদ্য ব্যয় হয়। অথচ বিবিএস-এর ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) বলছে, শহরাঞ্চলে ৪৫ দশমিক ১৭ শতাংশ এবং গ্রামীণ এলাকায় ৫৮ দশমিক ৫৪ শতাংশ। যা প্রমাণ করে, মূল্যস্ফীতির বাস্তব চিত্র বিবিএস প্রদত্ত পরিসংখ্যানের চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়াও গবেষণাটিতে ঝুঁকিতে থাকা পরিবারগুলোর উপরে মূল্যস্ফীতির প্রভাবও ব্যাখ্যা করেছে।

গবেষণা সংস্থা বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-বিআইডিএস দাবি করেছে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রামীণ এলাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি বিবিএসের দেয়া খাদ্য মূল্যস্ফীতির চেয়ে বেশি ছিল। বিআইডিএস স্বাধীনভাবে দেশের ৬৪ জেলায় এই গবেষণা পরিচালনা করে। যেখানে দরিদ্র জনগণের জন্য নির্ধারিত খাদ্য পূর্ববর্তী বছরের তথ্যের সাথে তুলনা করা হয়। বিআইডিএসের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে গ্রামীণ এলাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১৫ শতাংশ। যেখানে বিবিএসের প্রতিবেদনে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার দেখানো হয়েছিল ৯ দশমিক ৫৮ শতাংশ।

২০২২ সালের আগস্ট মাসে ডিজেল ৪২.৫ শতাংশ এবং অকটেনের দাম ৫১.৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়। ওই মাসে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ৫ শতাংশ। যদিও ডিজেল ও অকটেন ভোক্তার চাহিদার শীর্ষে থাকা ৪২২টি পণ্যের মধ্যে মাত্র দুটি। তবে এই জ্বালানির দামের বৃদ্ধি সরাসরি মূল্যস্ফীতিতে বড় প্রভাব না ফেললেও এর বহুমাত্রিক প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, পরিবহন ও সেবামূলকখাতে দামের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। তবে আগস্ট মাসের সিপিআই ও মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব ও অনীহা লক্ষ্য করা যায় বিবিএসের। যা তাদের রিপোর্টকৃত তথ্যের সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করে। এছাড়াও মূল্যস্ফীতির হার জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত করে না। এ নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষও লক্ষ্য করা গেছে। ওই মাসে ভাড়া, জ্বালানি ও আলোকসজ্জার উপাদানগুলোর জন্য সিপিআই মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮ দশমিক ৪ শতাংশ।

অন্যান্য উৎস থেকে নেওয়া পণ্য মূল্যের তথ্যের তুলনা করলে বিভ্রান্তি আরও বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন (ক্যাব) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী পণ্যের দাম বিবিএসের তথ্যের চেয়ে বেশি দেখা গেছে। ফলে ক্যাব বারবার মূল্যস্ফীতির হার বিবিএসের অনুমানের তুলনায় বেশি নির্ধারণ করেছে। দুঃখজনক হলেও বিবিএস তথ্য ব্যবহারকারীদের কাছে পণ্যের মূল্য তথ্য সরবরাহ করে না। প্রকৃতপক্ষে ২০২৩ সালের মার্চ থেকে বিবিএস ‘ঢাকা শহরে নির্বাচিত পণ্যের গড় খুচরা মূল্য’ প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। ফলে দেশের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মূল্য তথ্যের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

দেশে মূল্যস্ফীতির তথ্য নিয়ে অবিশ্বাস বেড়ে গেছে। কারণ বিবিএস একটি নতুন ভিত্তি বছরসহ একটি সম্প্রসারিত পণ্য তালিকা ব্যবহার করে মূল্যস্ফীতি অনুমান প্রক্রিয়া সংশোধন করেছে। সর্বশেষ সিপিআই রিবেসিং (২০২১-২২), যা এইচআইইএস ২০১৬-১৭ ব্যবহার করেছে। তা শহর ও গ্রামীণ উভয় এলাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতির হারে যথাক্রমে প্রায় ৬ এবং ১০ শতাংশ পয়েন্ট কমিয়েছে। একইসাথে সিপিআই এখন ৭০০টিরও বেশি পণ্য অন্তর্ভুক্ত করছে। এই নতুন পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত অনেক পণ্য দেশের বাজারে সহজলভ্য নয়। যা তথ্য সংগ্রাহকদের জন্য ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ তৈরি করে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো এই বিশাল পণ্যের তালিকা সাধারণ নিম্ন ও সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠীর ভোগ্যপণ্যের তালিকাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে না।

অতীতে বিবিএস নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশ করত। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ মূল্যস্ফীতির তথ্যের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। আবার অনেক তথ্যের বিভাজনও নীতিনির্ধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন খাদ্য মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দুটি বিভাগ রয়েছে: ‘খাদ্য ও অ্যালকোহলমুক্ত পানীয়’ এবং ‘আলকোহলযুক্ত পানীয়, তামাক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য’। নীতিনির্ধারণে আরও কার্যকর করার জন্য মূল্যস্ফীতির তথ্যকে আরও বিশদভাবে উপস্থাপন করা উচিত।

মূল্যস্ফীতির তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিকে আরও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং স্বচ্ছ করা প্রয়োজন। তথ্য সংগ্রাহকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ই-মেইল ব্যবস্থার পরিবর্তে CAPI549 প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য অবিলম্বে উদ্যোগ নেওয়া উচিত। বাজারে সহজলভ্য পণ্যের ক্ষেত্রে বা একই পণ্যের জন্য পরিবর্তনশীল মূল্যের তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরি করা প্রয়োজন। খাদ্যবর্হিভূত পণ্যের তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ারও উন্নতি করা প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা পুনরুদ্ধারের জন্য সকল পণ্যের ইউনিট-স্তরের তথ্য (সব বাজারের জন্য), মূল্যস্ফীতি গণনার পদ্ধতিসহ, সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা উচিত। যাতে নাগরিক ও বিশ্লেষকরা জাতীয় পরিসংখ্যান যাচাই করতে পারেন।

শ্রমশক্তি জরিপ: উন্নত পরিস্থিতি দেখাতে বৈশ্বিক মান উপেক্ষা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমবাজার সম্পর্কিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে বেকারত্বের হার কম। এর প্রধান কারণ হলো, বিবিএস এই প্রক্ষেপণ করার ক্ষেত্রে একটি পুরোনো পদ্ধতি ব্যবহার করে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ILOSTAT ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের প্রোফাইলে ২০১৩ সালে প্রকাশিত ১৯তম আন্তর্জাতিক শ্রম পরিসংখ্যানবিদদের সম্মেলনের (ICLS) মানদণ্ড অনুযায়ী শ্রম বাজারের সূচকগুলো দেওয়া হয়েছে। অথচ বিবিএস ১৯৮২ সালে প্রকাশিত ১৩তম ICLS-এর মানদণ্ড ও সংজ্ঞা অনুসরণ করে শ্রম বাজার সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

এছাড়া বিবিএস আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বয়সসীমার তুলনায় ভিন্ন বয়সসীমা ব্যবহার করে যুব ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী নির্ধারণ করে। এই মানদণ্ড ও সংজ্ঞার পার্থক্যের কারণে বিবিএস বছরের পর বছর একটি অতিরঞ্জিত কর্মসংস্থানের হার প্রকাশ করে আসছে। যা দেশে বেকারত্বের প্রকৃত চিত্রকে কমিয়ে দেখাচ্ছে। অতিপুরোনো মানদণ্ডের ওপর নির্ভরশীলতা শ্রম ও কর্মসংস্থানের প্রকৃত অবস্থা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছে। যা শ্রম শক্তি অংশগ্রহণের হার (LFPR), কর্মসংস্থানের হার, বেকারত্বের হার, যুব বেকারত্ব, কর্মসংস্থানে না থাকা, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে অংশ না নেওয়া যুব জনগোষ্ঠী এবং অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের মতো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচকের ওপর প্রভাব ফেলেছে।

১৩তম ICLS-এ কর্মসংস্থানের আওতায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমের পরিসর ১৯তম ICLS প্রস্তাবনার তুলনায় সংকীর্ণ। তবে এটাও ঠিক যে ১৩তম ICLS-এ কর্মসংস্থানের সংজ্ঞা তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত। যেমন যারা নিজেদের চূড়ান্ত ব্যবহারের জন্য পণ্য উৎপাদনের সাথে যুক্ত তারা ১৩তম ICLS সংজ্ঞা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের অংশ। তবে ১৯তম ICLS প্রস্তাবনায় তাদের কর্মসংস্থানের সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার পরিবর্তে ‘নিজ ব্যবহারের জন্য উৎপাদনমূলক কাজ’ (own-use production work) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। যা ‘কর্মসংস্থানমূলক কাজ’ থেকে আলাদা।

১৯তম ICLS প্রস্তাবনায় ‘কাজ’ (work) ধারণাটি চালু করা হয়েছে এবং পারস্পরিকভাবে পৃথক পাঁচটি ধরণ নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হলো ক) কর্মসংস্থানমূলক কাজ, খ) বেকারত্বের প্রশিক্ষণমূলক কাজ, গ) নিজ ব্যবহারের জন্য উৎপাদনমূলক কাজ, ঘ) স্বৈচ্ছাসেবামূলক কাজ, এবং ঙ) অন্যান্য কার্যক্রম, যার মধ্যে বিনা পারিশ্রমিকের কমিউনিটি সেবা এবং বন্দিদের দ্বারা সম্পাদিত বিনা পারিশ্রমিকের কাজ অন্তর্ভুক্ত।

আবার ১৩তম ICLS-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী বিবিএস তাদের প্রতিবেদনে নিজ ব্যবহারের জন্য পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের হার হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করেছে। বিপরীতে ১৯তম ICLS প্রস্তাবনায় শুধুমাত্র মজুরি বা লাভের বিনিময়ে চাকরি করা ব্যক্তিদেরই কর্মসংস্থানের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বাংলাদেশে যেখানে জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিজ ব্যবহারের জন্য পণ্য উৎপাদনের সাথে যুক্ত, সেখানে ১৩তম ICLS থেকে ১৯তম ICLS-এ কর্মসংস্থানের সংজ্ঞা পরিবর্তনের ফলে বিশাল পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে শ্রমশক্তি জরিপ সংক্রান্ত বিবিএসের প্রতিবেদন এবং ILOSTAT-এর সূচকের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য

স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সংজ্ঞাগত বিভাজন শুধুমাত্র কর্মসংস্থানের হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে না, বরং অন্যান্য শ্রম ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচকে পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে এটি নারীদের শ্রমশক্তি সম্পর্কিত পরিসংখ্যানে আরও বেশি প্রভাব ফেলেছে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিবিএস তাদের প্রতিবেদনে দাবি করে যে, তারা মূল সূচকের জন্য ১৯তম ICLS-এর সংজ্ঞা অনুসরণ করে। তবে ILOSTAT ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি শ্রম বাজার সূচকের তথ্য ১৩তম ICLS-এর মানদণ্ড ও সংজ্ঞার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৯তম ICLS এর মানদণ্ড বিবেচনা করলে কর্মসংস্থান-জনসংখ্যা অনুপাত, কর্মক্ষম শ্রমশক্তির হার এবং অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের হার বেশি করে দেখানো হয়েছে। এছাড়া বেকারত্বের হার, মোট যুবসংখ্যার মধ্যে যুব বেকারত্বের হার এবং NEET (কাজে, শিক্ষায় বা প্রশিক্ষণে নেই এমন) যুবাদের হার বেশি করে দেখানো হয়েছে। দুর্ভাগ্য হলো, এই পরিসংখ্যানের পূর্ববর্তী বছরের তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে এগুলো বিশ্লেষণ করাও সম্ভব হয় না। নীতিনির্ধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯তম ICLS পদ্ধতি বেশি যৌক্তিক এবং ভবিষ্যতে বিবিএস-এর এটি অনুসরণ করা উচিত। এ লক্ষ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য ১৯তম আইসিএলএস অনুযায়ী পূর্ববর্তী শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য পুনর্মূল্যায়ন করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

সংজ্ঞাগত বিষয়গুলোর পাশাপাশি শ্রমশক্তি জরি (এলএফএস) এর তথ্যও বছরের পর বছর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কারণসহ বিভিন্ন প্রভাবের কারণে প্রভাবিত হয়েছে। সাম্প্রতিকালে এলএফএস-এর তথ্য সংশোধন করে প্রকাশের অভিযোগ রয়েছে। যেখানে তথ্য সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত তা প্রকাশ করা হয়নি বলে বলা হয়েছে। যেমন ২০১৬ সালের ত্রৈমাসিক এলএফএস -এর তথ্য প্রথম বছরের পর প্রকাশিত হয়নি। এর পরিবর্তে ২০১৬-২০১৭ সালের বার্ষিক তথ্য প্রকাশ করা হয়। দীর্ঘ বিরতির পর ২০২২ সালে আবারও ত্রৈমাসিক এলএফএস পরিচালনা করা হয়। অভিযোগ উঠেছে, এই ফলাফল রাজনৈতিক প্রশাসন দ্বারা পুনর্বিবেচনা ও সংশোধন করে তারপর প্রকাশ করা হয়েছে। কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশে বিলম্বের ফলে তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণও কঠিন হয়ে পড়ে।

বিশ্বব্যাপী শ্রমবাজারের পরিসংখ্যান অর্থনীতির স্বাস্থ্য মূল্যায়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে কাজ করে। এর কার্যকারিতা বাড়তে সংজ্ঞার স্পষ্টতা এবং তথ্য প্রকাশের সময়োপযোগিতা উন্নত করা জরুরি। শ্রমশক্তি জরিপকে বৈশ্বিক পদ্ধতিগত মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সময়মতো প্রকাশ করা হলে নীতিনির্ধারণকদের জন্য এর কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। একইসঙ্গে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দারিদ্র্যের পরিসংখ্যান: কিছুটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা

বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরো-বিবিএসের এর ২০২২ সালের খানা জরিপ অনুযায়ী, ২০১০ সাল থেকে দারিদ্র্যের হার কমছে। ২০১৬ সালের ২৬ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে ১৮ দশমিক ৭ শতাংশে। একইভাবে হতদরিদ্র বা চরম দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালে ৯ দশমিক ২ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে কমে তা দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৬ শতাংশে। তবে দারিদ্র্যের হার কমানোর সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যান্য সূচকের সামঞ্জস্য দেখা যায় না, যেমন খাদ্য নিরাপত্তা। বিবিএস সাম্প্রতিক 'খাদ্য নিরাপত্তা পরিসংখ্যান ২০২৩' প্রকাশ করেছে। যেখানে প্রায় ২২ শতাংশ পরিবার মনে করে তারা মাঝারি থেকে তীব্র খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকিতে আছে। সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলোতে এই হার ছিল ৭০ শতাংশ। সরকারি তথ্য অনুযায়ী দারিদ্র্য হ্রাসের হার সাম্প্রতিক খাদ্য নিরাপত্তার পরিসংখ্যানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। চরম দারিদ্র্যের এই দ্রুত কমে যাওয়ার হার বিশ্লেষকদের মধ্যে বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে।

সরকারি সূত্র থেকে প্রাপ্ত মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের তথ্যেও অনুরূপ অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কৃষি বিপণন বিভাগের (ডিএএম) সরবরাহকৃত বাজারমূল্যের তথ্য প্রকৃত বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় (গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী)। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) কৃষি বিপণন বিভাগের বাজারমূল্যের তথ্য ব্যবহার করে একটি পুষ্টিকর খাদ্য বুন্ডির ব্যয় হিসাব করেছে। যা ২০২২ সালের খানা জরিপে দেওয়া জাতীয় খাদ্য দারিদ্র্যসীমার তুলনায় অনেক বেশি ছিল।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ২০২২ সালের খানা জরিপে উল্লেখিত দারিদ্র্য পরিসংখ্যান হালনাগাদ করার জন্য একটি মাঠ যাচাইকরণ জরিপ পরিচালনা করেছে। এই যাচাইকরণে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে কিছু হটস্পট এলাকার উপজেলা পর্যায়ে ধারণাভিত্তিক দারিদ্র্য র‍্যাংকিং করা হবে। জেলাভিত্তিক দারিদ্র্যের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা, ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবগুলো তুলে ধরাই এই জরিপের মূল লক্ষ্য। এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর একজন কর্মকর্তা জানান, খানা জরিপের তথ্যের মান খারাপ হওয়ার কারণে চরম দারিদ্র্য পরিমাপ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। একইসঙ্গে, আরও অভিযোগ করা হয়েছে ২০১৬ ও ২০২২ সালে দারিদ্র্য পরিসংখ্যানকে উন্নয়নের ফিরিস্তি বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল বিবিএসের ওপর। প্রকৃতপক্ষে, ভোগ-ব্যয়ভিত্তিক দারিদ্র্য তথ্য এবং কিছু অ-আয়/ভোগব্যয়ভিত্তিক বিশ্লেষণও একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

খানা জরিপের তথ্যে এই ঐতিহাসিক অসঙ্গতির কারণে আয় ও ভোগ ব্যয়ের তথ্যের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, মাসিক ৪০,০০০ টাকার কম আয়ের ৮১ শতাংশ পরিবার জানিয়েছে যে তাদের গড় ভোগ ব্যয় তাদের আয়ের তুলনায় বেশি। যা ২০১৬-এর প্রতিবেদন থেকে ৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র্য মূল্যায়নের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য, দারিদ্র্য-সীমা নির্ধারণের পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করা অপরিহার্য। খাদ্য দারিদ্র্য সীমা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত যে ভোগ্য পণ্যের তালিকা (consumption basket) তা ৫০ বছরের পুরানো তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি। ফলে বর্তমান প্রেক্ষাপট ও পরিবারের চাহিদাগুলিকে আরও সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য এই তালিকাকে হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

প্রথমেই এটা স্বীকার করে নিতে হবে যে, রাজনৈতিক প্রভাব ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভিত্তিতে পরিসংখ্যানের হেরফের একটি চিন্তার বিষয়। কার্যকর নীতি প্রণয়নের মেরুদণ্ড হিসাবে সঠিক তথ্যের গুরুত্ব অপরিহার্য। অন্যদিকে হেরফের করা তথ্য একটি ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। যে কারণে নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ‘বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই)’ শীর্ষক প্রতিবেদনটি বছরের পর বছর ধরে প্রকাশ হয়নি। অভিযোগ রয়েছে রাজনৈতিক কারণে তা প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। প্রতিবেদনের সর্বশেষ সংস্করণ (ফেব্রুয়ারি ২০২৪) যা ২০১৯ এমআইসিএসের (MICS) কোভিড-পূর্ব তথ্য ব্যবহার করেছে। এখানে দেখা যায়, বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের হার মাথাপিছু অনুপাতে ২৪ দশমিক ০৫ শতাংশ ছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের শিকার। মজার বিষয় হলো, এই অনুশীলনের জন্য ২০২০ সালের নভেম্বরে প্রথম চূড়ান্ত অনুমান রিপোর্টে বলা হয়েছিল, বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের হার মাথাপিছু অনুপাতে ছিলো ৩৬ দশমিক ১ শতাংশ।

মূলত একটি ভিন্ন সূচক ব্যবহারের কারণে দারিদ্র্য হার নির্ধারণে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। নতুন অনুমানে শিক্ষার বছরকে পাঁচ বছর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অনুমানে যা ছিল আট বছর। সর্বশেষ সংস্করণে (যা এখনও প্রকাশিত হয়নি) উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন অংশীজনের সাথে আলোচনার পর শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে পাঁচ বছরের শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, প্রতিবেদনের পূর্ববর্তী সংস্করণটি প্রকাশিত হয়নি, কারণ এমপিআই-এর ভিত্তিতে পরিমাপ করা দারিদ্র্যের হার ভোগভিত্তিক সিবিএন পদ্ধতির মাধ্যমে পরিমাপ করা দারিদ্র্যের তুলনায় অনেক বেশি ছিল।

প্রকৃতপক্ষে ২০২০ সালের অনুমানে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য (এমপিআই) সূচকে শিক্ষা বছরের অবদান ছিল মোট দারিদ্র্যের ৩০ শতাংশেরও বেশি, যা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক। তবে ২০২৪ সালের অনুমানে দারিদ্র্যের হার কমে যাওয়ার পাশাপাশি এটাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০২০ সালের নভেম্বর মাসের সংস্করণে শিশু এমপিআই সম্পর্কিত তথ্যও ছিল। যেখানে দেখা গেছে যেসব পরিবারের শিশু রয়েছে তাদের ৫৭ শতাংশ মানুষ বহুমাত্রিকভাবে দরিদ্র। তবে এই তথ্য নতুন সংস্করণ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

নতুন অনুমানের ভিত্তিতে তৈরি প্রতিবেদনটি এখনো প্রকাশিত হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, সরকারের নীতিনির্ধারণকরা এটিকে খানা জরিপের দারিদ্র্যের হার থেকে বেশি বলে বিবেচনা করেছেন; সেজন্য প্রতিবেদনটি জনসমক্ষে আনা হয়নি। দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) পরিমাপের প্রচেষ্টা প্রায় চার বছর ধরে স্থগিত রয়েছে।

২২.৩ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে উদ্বেগ-উৎকর্ষা

সরকারি তথ্য উপাত্ত নিয়ে উদ্বেগ-উৎকর্ষা শুধুমাত্র পূর্বে উল্লেখিত চারটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা অন্যান্য বিভিন্ন খাতেও ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা গেছে। শ্বেতপত্রের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতেও পরিসংখ্যান নিয়ে যে বিশ্বাসের ঘাটতির কথা বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রধান অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক জরিপ, প্রশাসনিক নথি এবং হিসাব ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার তথ্য সম্প্রতি আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। বিশেষ করে ২০২২ সালের ১৫-২১ জুনে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ জনশুমারি ও গৃহগণনা ঘিরে উদ্ভূত বিতর্কের পরে এই আলোচনা আরও বেড়েছে। প্রতি ১০ বছর পর পর একবার অনুষ্ঠিত এই শুমারি বেশকিছু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। যার মধ্যে রয়েছে করোনায় প্রভাব এবং পরবর্তী সময়ে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও নেত্রকোনার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে জটিলতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-বিবিএসের পক্ষে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) পরিচালিত গণনা পরবর্তী যাচাই (Post Enumeration Check-PEC) সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যেখানে দেখা যায় যে, জনশুমারিতে প্রাথমিক জনসংখ্যা গণনায় প্রত্যাশার তুলনায় ২ দশমিক ৭৫ শতাংশ কম হয়েছে। যা থেকে বোঝা যায় যে, জনশুমারি প্রক্রিয়া গভীরভাবে পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রভাবের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। যা জনসংখ্যা কমিয়ে দেখানোর একটা কারণ হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে জনশুমারির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব যৌক্তিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

এছাড়াও জনশুমারিতে সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের বিষয়বস্তু আরও সময়পোযোগী করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাবনা এসেছে। বিশেষ করে আদিবাসী জনগণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি ভালভাবে উঠে আসেনি। যা পূরণ করা জরুরি। কারণ সেটা নাগরিক সমাজের সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলোর সাথে আস্থার সম্পর্ক তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জনশুমারির প্রতিবেদনের পরিকল্পনা প্রক্রিয়া উন্নত করা এবং এর কার্যক্রম পরিচালনায় স্বায়ত্তশাসনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যাতে নির্ভুল তথ্য ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যায়।

জনশুমারির তথ্য নীতি নির্ধারণ এবং সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন: বৈশ্বিক সহায়তা নিশ্চিতকরণে মাথাপিছু জাতীয় আয় নির্ধারণ এবং টিকাদান কর্মসূচির জন্য জনসংখ্যার প্রকৃত তথ্য জানা ভীষণ জরুরি। বিভিন্ন মৌলিক পণ্যের চাহিদা নির্ধারণে নির্ভরযোগ্য জনসংখ্যার পরিসংখ্যান অপরিহার্য। এবং এটি আগামী দশকের জরিপ ও কর্মসূচি পরিচালনায় দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। জনশুমারি ও এর ফলাফল ঘিরে গড়ে ওঠা আলোচনাটি পারস্পরিক সহযোগিতা, স্বচ্ছতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলকতার প্রতি প্রতিশ্রুতি রক্ষার একটি সুযোগ হিসেবে কাজ করতে পারে।

কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন তথ্যের গুণগত মান নিয়ে উদ্বেগ

ধান-চালসহ কৃষিজাত ফসল ও ফলের উৎপাদনের তথ্যের গুণগত মান নিয়েও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া জরুরি। বিভিন্ন ফসলের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিসংখ্যানের নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্ত নিয়ে প্রায়ই প্রশ্নে ওঠে। কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকৃত চিত্র না থাকলে তা বাজারের অস্থিরতা বা আমদানির চাহিদা বোঝার ক্ষেত্রে অসুবিধা তৈরি করে। অনেকেই মনে করেন যে মাঠপর্যায়ে থাকা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তারা আরও বেশি সহায়তা পেলে তথ্য রিপোর্টে স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা সহজ হতো। উদাহরণস্বরূপ, মাঠ পর্যায় থেকে সদর দপ্তরে তথ্য পাঠানোর আগে কৃষি অফিস থেকে যৌথ স্বাক্ষরের নিয়ম কর্মকর্তাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে যেন তারা অতিমাত্রায় ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরেন। গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য খাতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সম্পর্কিত পরিসংখ্যানও বিশ্বাসযোগ্য নয়। ফলে এই সমস্যাটি কখনোই প্রয়োজনীয় নীতিগত গুরুত্ব পায়নি। এই প্রক্রিয়াগত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা হলে আরও নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে। যা কৃষি খাতের প্রবণতা বোঝার পাশাপাশি সঠিক নীতিনির্ধারণে সহায়ক হবে। অংশীজনরা জোর দিয়ে বলেছেন, নির্ভরযোগ্য উৎপাদন ও চাহিদা সংক্রান্ত তথ্যের অভাব প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণকে ব্যাহত করে। এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে যখন দেশ ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘমেয়াদী মূল্যস্ফীতির চাপের মধ্যে থাকে।

তথ্যের গুণগত সমস্যার আরও উদাহরণ

একই ধরনের আরও কয়েকটি উদাহরণ দেখা যায়। যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও জ্বালানি মজুতের তথ্য প্রায়শই অতিরঞ্জিত বলে মনে করা হয়। বিদ্যুৎ খাতে ত্রুটিপূর্ণ চাহিদার পূর্বাভাস সরকারের পাশাপাশি জনগণের ওপরও আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছে। এছাড়া সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময় অর্থনৈতিক ও আর্থিক রিটার্ন বা প্রত্যাবর্তনের হিসাব প্রায়ই ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে অথবা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রকল্পের মেয়াদ ও বাজেট বরাদ্দ সংশোধনের ক্ষেত্রে। আমরা দেখেছি রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তথ্য অতিরঞ্জিত করার ফলে কীভাবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। অনাদায়ী ও খেলাপি ঋণের তথ্য গোপন করে দেশের ভঙ্গুর আর্থিক ব্যবস্থার দুর্বলতা আড়াল করা হয়েছে। একইভাবে সরকারি বৈদেশিক ঋণের প্রকৃত তথ্য এবং সহায়তা পাওয়ার পূর্বাভাসের পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা গেছে।

সামগ্রিকভাবে আর্থিক তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত হলেও এতে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস অর্থমন্ত্রণালয়ের আইবাস++ সিস্টেমটি নীতিনির্ধারণকসহ বিস্তৃত অংশীজনদের জন্য সহজলভ্য নয়। তাছাড়া সরকারি বিনিয়োগে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর তথ্য মাসিকভিত্তিতে প্রকাশ করা হয় না। ফলে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে সরকারি ব্যয়ের তথ্যেরও যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এতে নীতিনির্ধারণ ও জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

অভিন্ন সমস্যা: তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থাপনা গ্রহণযোগ্য করার প্রয়োজনীয়তা

উন্নয়ন-সম্পর্কিত তথ্যের চারটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়ে গভীর পর্যালোচনা বিভিন্ন সমস্যার দিকগুলো উন্মোচন করেছে।

প্রথমত, বাংলাদেশে তথ্য উৎপাদনে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। কিছু পরিসংখ্যান (যেমন শ্রমবাজার) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মানসম্মত পদ্ধতিতে পুনর্মূল্যায়ন করা গেলেও, অনেক সময় প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপটগত তথ্য পাওয়া যায় না। যেমন, জিডিপির প্রবৃদ্ধির তথ্য বিশেষ করে ব্যয়ভিত্তিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভোগ ও সঞ্চয় সম্পর্কিত মানসম্মত তথ্য সহজলভ্য নয়। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সরবরাহকৃত তথ্যের গুণগত মান বিবিএসের নির্ভরযোগ্য

পরিসংখ্যান উৎপাদন সক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে রাখে। আইনগত সুরক্ষা থাকলেও এই সংস্থাগুলোর সক্ষমতার ওপর বিবিএস নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। দুঃখজনকভাবে এই বিষয়গুলো নীতিগত আলোচনায় খুব কমই উঠে আসে।

দ্বিতীয়ত, তথ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। যেমন, বিবিএসের কাছে আইবাস++ সিস্টেমের প্রকৃত বাজেট ব্যয়ের তথ্য পাওয়ার জন্য প্রবেশের সুযোগ নেই। যা বিভিন্ন খাতে সঠিক ও গুণগত তথ্য-উপাত্ত উৎপাদনকে সীমিত করে। রাজনৈতিক সদৃচ্ছার মাধ্যমে এই ঘাটতি সহজেই পূরণ করা সম্ভব।

তৃতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তথ্য-উপাত্ত বিকৃতির ক্ষেত্রে একটি গুরুতর যোগসাজশের অভিযোগ রয়েছে। এটি জাতীয় আয়ের হিসাব গণনা থেকে শুরু করে বিবিএসের পরিচালিত জরিপের তথ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, এই আচরণ কেবল রাজনৈতিক মহলেই সীমাবদ্ধ নয়, পেশাদার পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িতদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন একটি প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান যা বাংলাদেশে একটি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবনে সহায়ক হবে।

২২.৪ কাঠামোভিত্তিক বিশ্লেষণ: অনেক কিছু করা হয়েছে এবং অনেক কিছু করা এখনো সম্ভব

শ্বেতপত্রের এই অংশে চারটি মূল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যেগুলো পূর্বে আলোচনা করা একাধিক বিষয়সহ আরো কয়েকটি দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যমান কাঠামো থেকেই এই বিষয়গুলো নির্বাচন করা হয়েছে, কারণ এগুলো তথ্য ব্যবস্থাপনার জটিলতাকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে তুলে ধরে। আমরা তথ্য ব্যবস্থাপনায় পরিসংখ্যানের চাহিদা এবং সরবরাহ উভয় দিকই মূল্যায়ন করব চারটি বিষয়ের ভিত্তিতে। এগুলো হলো, পরিসংখ্যানের সহজলভ্যতা, প্রবেশাধিকার, গতিশীলতা, এবং সঠিকতা।

সহজলভ্যতা

সহজলভ্যতা থেকে বোঝা যায় যে তথ্যটি আদৌ পাওয়া যাচ্ছে কি না। তথ্য সবসময় জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক সরকারি ওয়েবসাইটে সময়মতো প্রকাশ এবং জনগণের তা বিনামূল্যে পাওয়া উচিত। একইসঙ্গে তথ্য সঠিক সময়ে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা উচিত। তথ্য-উপাত্তের প্রতিবেদনগুলো কত সময় পর পর করা হচ্ছে এবং প্রতিবেদন প্রকাশের যাতে দেরি না হয় সেটিও বিবেচনায় রাখা উচিত। পাশাপাশি, বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরি; এক উৎসের তথ্য অন্য প্রাসঙ্গিক সূচকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

বিগত কয়েক বছরে তথ্যের প্রাপ্যতায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন ২০১৬ সালে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি'র ২৪৭টি নির্দেশকের মধ্যে মাত্র ১১২টির জন্য তথ্য পাওয়া যেত। তবে ২০২৩ সালের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে ২১৩-তে পৌঁছেছে। এই অগ্রগতি উৎসাহব্যঞ্জক হলেও এখনো কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের জন্য তথ্য এখনো অপ্রতুল।

বিভাজিত তথ্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। বর্তমানে বিভাজন মূলত লিঙ্গভিত্তিক যেমন নারী ও পুরুষ ও অবস্থান, গ্রাম বা শহরভিত্তিক করা হয়। তবে এই দুটির ভিত্তিতে তথ্যের বিভাজন করা যথেষ্ট নয়। মাত্র ২৭টি নির্দেশকের জন্য লিঙ্গভিত্তিক এবং ২০টি নির্দেশকের জন্য অবস্থানভিত্তিক তথ্য পাওয়া যায়। অন্যান্য দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য বিভাজিত তথ্য এখনো পর্যাপ্ত নয়। এই ঘাটতি পূরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের মাত্রা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে।

এছাড়াও প্রকৃত সরকারি ব্যয়ের তথ্য সবক্ষেত্রেই সমানভাবে পাওয়া যায় না। যেমন, সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাজেট সংক্রান্ত তথ্য থাকলেও প্রকৃত ব্যয়ের সব তথ্য সব সময় পাওয়া যায় না। কিছুক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থার

মধ্যে থেকেই তথ্য উন্মুক্ত করা সম্ভব। তবে মূল চ্যালেঞ্জ হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছা। যা এই তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে সহজ করতে পারে।

প্রবেশাধিকার

তথ্য-উপাত্তে যদি সহজে প্রবেশাধিকার না পাওয়া যায় তাহলে পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনার অগ্রগতিতে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। নির্ভুল ও সর্বোচ্চ সঠিকতার সাথে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত তখনই কার্যকর হয় যখন তা সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, গবেষক ও নাগরিক সমাজের সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের জন্য সহজলভ্য হয়। বর্তমানে সাধারণত প্রকাশিত তথ্য প্রতিবেদন বা পিডিএফ আকারে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত এগুলো এক্সেল বা অন্যান্য ব্যবহারবান্ধব ফরম্যাটে সহজে উপযোগী করা হয় না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতো প্রধান তথ্য সরবরাহকারী সংস্থাগুলোর কোনো ব্যবহারবান্ধব সার্চ ডাটাবেস নেই। ফলে তথ্য ব্যবহারকারীরা প্রায়ই বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্যের ওপর নির্ভর করেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পিডিএফ থেকে কপি করার সুবিধাও অনেক ক্ষেত্রে সীমিত করা হয়েছে। ইউনিট-লেভেল (খুব বিস্তারিত) তথ্য সবসময়ই বেশ ব্যয়বহুল। এমনকি কেউ বিবিএস থেকে ইউনিট-লেভেল সার্ভের তথ্য কিনলেও তিনি সম্পূর্ণ ডাটাসেটের পূর্ণ প্রবেশাধিকার নাও পেতে পারেন। পাশাপাশি তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনেকক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না।

বিবিএস ও অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলো প্রায়শই গবেষণা বা জরিপের পর তথ্য প্রকাশ করতে দেরি করে। এর পেছনে বেশকিছু কারণ রয়েছে। বিশেষ করে সংস্থাগুলোর প্রতিবেদন প্রকাশ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ ও সক্ষমতা থাকে না। তারা তথ্য ব্যবহারকারীদের চাহিদা ও বৈশ্বিক মান অনুযায়ী তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা সম্পর্কে ততটা জানেও না। তাছাড়া সরকারি আমলাদের মধ্যে কোন তথ্য প্রকাশ করব বা আর কোনটা করব না তা নিয়েও এক ধরনের অনিশ্চয়তা কাজ করে। ফলে তারা বেশ দ্বিধাগ্রস্ত থাকে।

এছাড়া রাজনৈতিক কারণেও অনেক সময় তথ্য প্রকাশ করা হয় না। প্রশাসনিক তথ্যের প্রবেশাধিকার প্রায়শই ‘গোপনীয়তা’ রক্ষার অজুহাতে সীমিত রাখা হয়। যা পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তোলে। যেমন, সরকারি অর্থবিষয়ক তথ্যের প্রবেশাধিকারে নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তথ্য প্রবেশ করার সুযোগও অত্যন্ত সীমিত।

গতিশীলতা

বাংলাদেশে তথ্য ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো তথ্য-উপাত্ত প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতা। অনেক সময় তথ্য সংগ্রহের কয়েক বছর পর পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয় না। যেমন- বিবিএস প্রতি পাঁচ বছর অন্তর খানা জরিপ (Household Income and Expenditure Survey) পরিচালনা করে এবং ক্লাস্টারভিত্তিক বহুমাত্রিক সূচক (Multiple Indicator Cluster Survey) প্রতি তিন বছর অন্তর করা হয়। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে ত্রৈমাসিক জনশক্তি জরিপ আরও ঘন ঘন পরিচালনার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ ২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পূর্ণ প্রতিবেদন এখনো প্রকাশ করা হয়নি। যদিও এর প্রাথমিক ফলাফল এক বছর আগেই প্রকাশ করা হয়েছিল।

সরকারি অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাধারণত তথ্য প্রকাশে ছয় থেকে সাত মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়ার সুযোগও সীমিত। অল্প কিছু সূচকেই সময়ের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য পর্যাপ্ত উপাত্ত রয়েছে। তথ্যের এই অনিয়মিত ও দেরিতে প্রকাশ হওয়ায় বিশ্লেষক এবং নীতিনির্ধারণকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। বিশেষ করে অতিমারীর সময় নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় তথ্যের অভাব একটি বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

সঠিকতা

বাংলাদেশের তথ্য-উপাত্তের বড় চ্যালেঞ্জ হলো পরিসংখ্যানের মানসম্মতকরণ (standardisation) ও সামঞ্জস্যতা (harmonisation) ধরে রাখা। উপরে জনশক্তি জরিপ সংক্রান্ত আলোচনায় এই সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে আর্থিক তথ্যের যথার্থতা একাধিকবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। কারণ বিভিন্ন উৎস একই নির্দেশকের জন্য একই সময়ে ভিন্ন পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এমনকি কিছু উৎস বিভিন্ন সময়ে একই নির্দেশকের জন্য আলাদা পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেছে। যেমন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এনবিআরের প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী তাদের রাজস্ব আহরণের পরিমাণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাবের তুলনায় ২১ হাজার ২৬৪ কোটি টাকা বেশি ছিল। রাজস্ব আয়ের তথ্যে এত বেশি পার্থক্য হওয়ার সুযোগ নেই। এনবিআর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা থেকে জানা গেছে, ভবিষ্যতে এনবিআর, আইবাস++ ব্যবস্থার তথ্য অনুসরণ করে তাদের রাজস্ব আহরণের হিসাব প্রকাশ করতে পারে।

এ ধরনের পার্থক্য দেখা যায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED) এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার তথ্য উপাত্তে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আইএমইডির প্রকাশিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয়ের পরিমাণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত হিসাবের তুলনায় ৭ হাজার ১৩৪ কোটি টাকা বেশি ছিল।

এছাড়াও বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংখ্যা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান বিবিএসের বিভিন্ন জরিপে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। এর প্রধান কারণ হলো, আলাদা জরিপগুলোতে বিভিন্ন সংজ্ঞা ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার সুযোগের অভাবে (lack of comparability)। নতুন ভিত্তিবছর নির্ধারণ (rebasement) এবং নতুন পদ্ধতি গ্রহণের ফলে পূর্ববর্তী তথ্যের সঙ্গে বর্তমান তথ্য তুলনা করা যায় না। ফলে তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারকারীদের জন্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন তথ্যের তুলনা করাও কঠিন হয়।

২২.৫ তথ্য-উপাত্ত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর চ্যালেঞ্জসমূহ

উপরোক্ত চারটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত সমস্যা এবং পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনার ৪ বৈশিষ্ট্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশকিছু কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ ও পদ্ধতিগত দুর্বলতা রয়েছে। এগুলো যথাযথ নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনার জন্য সঠিক ও গুণগতমানের তথ্য উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করেছে। যদিও এই চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। তবে শাসনব্যবস্থার ধরন অনুযায়ী এর মাত্রা ও প্রকাশের ধরন ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত কোনো সরকার যত বেশি স্বৈরাচারী হয় ততই তার তথ্যচর্চা তুলনামূলক কম স্বচ্ছ হয়। যার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়।

বাংলাদেশে তথ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলো তিনটি প্রধান কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এগুলো হলো, প্রথমত, সামর্থ্যের ঘাটতি, প্রয়োজনীয় জনবল, প্রযুক্তি ও দক্ষতার অভাব; দ্বিতীয়ত, সমন্বয়ের ব্যর্থতা এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতার অভাব; এবং তৃতীয়ত, রাজনৈতিক চাপ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আচরণ যা প্রাপ্ত তথ্য যথাযথভাবে প্রকাশে রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রশাসনিক বাধা হিসাবে কাজ করে। এই চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার উন্নয়ন জরুরি।

দক্ষতার ঘাটতি

বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা (national statistical system) তথ্য সংগ্রহ, মেথডলোজির ব্যবহার, সংশোধনের ব্যবস্থা, ডকুমেন্টেশন এবং উপযুক্ত প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার ব্যবহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবে ভুগছে। এর ফলে উৎপাদিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও সঠিকতা ব্যাহত হচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে জানা যায়, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে অভিজ্ঞ বিবিএস কর্মীদের বদলি

করা হয়েছে। যা প্রতিষ্ঠানটির দক্ষতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হওয়াসহ দক্ষতা ও কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

এছাড়াও চাকরিতে পরবর্তী ধাপে উন্নয়নের সুযোগ কম থাকায় কর্মীদের মধ্যে এক ধরনের শৈথিল্য কাজ করে। যা কর্মীদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা কম হওয়ার অন্যতম কারণ। তথ্য ও পরিসংখ্যান বিভাগ মূলত প্রশাসনিক ক্যাডারদের দ্বারা পরিচালিত হয়। যার ফলে পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আবার কারিগরি দক্ষতার অভাবে বিবিএসের কার্যকর তথ্য সংগ্রহের তদারকি কার্যক্রমের ব্যাহত হয়েছে। যার ফলে জিডিপির হিসাব, মূল্যস্ফীতি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচকের তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন কার্যক্রম দুর্বল ও প্রলম্বিত হয়ে পড়েছে।

জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (NSO) নিয়মিত জরিপ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পায় না। যা জিডিপি ও মূল্যস্ফীতি মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অপরিহার্য। বিবিএসের কর্মকর্তাদের বেতনের বাইরে কোনো নির্দিষ্ট বাজেট নেই। ফলে নিয়মিত জরিপ পরিচালনা ও হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করা সংস্থাটির জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থাকে উন্নয়ন প্রকল্প ও বিদেশি অনুদানের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। যা জরিপ পরিচালনায় বিলম্ব ও অদক্ষতা সৃষ্টি করে।

সমস্বয়ের ব্যর্থতা

বিবিএস এবং মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময়, সংজ্ঞা নির্ধারণ, মানদণ্ড, শ্রেণিবিন্যাস ও বিভাজন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমস্বয়হীনতা লক্ষ্য করা যায়। যদিও বিবিএস স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে আদান প্রদানের আনুষ্ঠানিক চুক্তি করেছে। তারপরও ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাটিসটিক (এনএসডিএস) ২০১৫ এর রিপোর্টে প্রতিষ্ঠানগত সমস্বয়ের ঘাটতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলো বিবিএসের নির্ধারিত সংজ্ঞা, মানদণ্ড ও শ্রেণিবিন্যাস অনুসরণ না করে নিজস্ব সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস ব্যবহার করে থাকে। এ কারণে তথ্য-উপাত্তের মধ্যে নানা ধরনের অসঙ্গতি তৈরি করে। ফলে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও দপ্তরগুলোর মধ্যে তথ্যের আন্তঃসংযোগ ও সমস্বয় থাকে না।

রাজনৈতিক প্রভাব ও গোপন আঁতাত

রাজনৈতিক চাপ ও গোপন আঁতাতমূলক আচরণের ফলে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (NSO) এবং অন্যান্য উপাত্ত-উৎপাদনকারী সংস্থাসমূহ— যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। যার কারণে জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ স্বায়ত্তশাসনের অভাবের ফলে উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানকে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রভাবিত বা বিকৃত করার আশঙ্কা দেখা দেয়। যা তথ্যের বিকৃতি ও পক্ষপাতদুষ্টতা সৃষ্টি করে। সরকার তাদের উন্নয়নের ফিরিস্তি বা বয়ান প্রচারে জিডিপির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানব উন্নয়নের ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরে। এজন্য রাজনৈতিক চাপে পড়ে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা প্রায়শই প্রকৃত তথ্য গোপন রাখতে বাধ্য হয় এবং তাদেরকে বিতর্কিত কৌশল গ্রহণ করতে হয়। যেমন, বিবিএসের তথ্য প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে। এই বিলম্বের ফলে নীতি প্রণয়নের জন্য তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণের সুযোগ কমে যায়।

কখনো কখনো সংবেদনশীল তথ্য গোপন রাখতে ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতা করে থাকে। এতে তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসএসডিএস এর ২০১৫ প্রতিবেদনে বিবিএসের শাসন ব্যবস্থা, স্বায়ত্তশাসন, পরিসংখ্যান আইন ও তথ্যপ্রযুক্তিগত অবকাঠামোর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসনের অভাবে প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য নির্বাচনেও স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার অভাব দেখা যায়। বিবিএস প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শের উপর নির্ভর করে। বিশেষত জাতীয় হিসাব পুনর্বিবেচনা, পদ্ধতিগত যাচাই ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদের সময়। তবে এই কমিটি একটি স্থায়ী সংস্থা নয়। এটি শুধুমাত্র বৃহৎ হালনাগাদের (যেমন জাতীয় হিসাব পুনর্বিবেচনা) সময় আহ্বান করা হয়।

স্টেকহোল্ডার বা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের পরামর্শ সভায় কমিটির সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। অনেকেই বিশ্বাস করেন, কমিটির সদস্য নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব ও সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করা হয়। যা স্বাভাবিকভাবেই চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও পরিসংখ্যানের নির্ভরযোগ্যতাকে ব্যাহত করে। এই সমস্যাগুলো শুধু বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান প্রণয়নই বাধাগ্রস্ত করে না, বরং জাতীয় প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতাকেও ক্ষুণ্ণ করে। ফলে নীতি নির্ধারণে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুযোগও কমে যায় এই পরিসংখ্যানগত স্বচ্ছতার অভাবে।

২২.৬ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও আগামীর করণীয়

বাংলাদেশের তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থাপনার যে কাঠামো রয়েছে তা উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বর্তমানে এটি রাজনৈতিক ও কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসঙ্গতিপূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী পরিসংখ্যান প্রকাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতিবিদরা লক্ষ্য করেছেন, ঘোষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টির তথ্যের মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি রয়েছে। এই অধ্যায়ের পাশাপাশি পুরো শ্বেতপত্রে তথ্য-উপাত্তের অস্বচ্ছতাসহ অনিয়মের বেশকিছু বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম: নীতিনির্ধারকদের ইচ্ছা অনুযায়ী পূর্ববর্তী বছরের পরিসংখ্যান পুনরায় হিসাব করা; পরিসংখ্যানকে কাঙ্ক্ষিত সরকারের উন্নয়ন কাহিনির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা; পছন্দসই বা বাছাইকৃত সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করা; তথ্য-উপাত্ত প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতা; সংবেদনশীল তথ্য এবং বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন গোপন রাখা এবং সঠিক পূর্বাভাস না দেওয়া। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এই পরিস্থিতি অবশ্যই আত্মসমালোচনার দাবি রাখে।

বিগত শাসনামলে নীতিনির্ধারকরা গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানগুলো নিয়মিতভাবে বিকৃত করে নিজেদেরকে অন্ধকারে রেখেছেন। একইসঙ্গে, তারা একটি ভয়ের সংস্কৃতি ও নিয়ন্ত্রণমূলক পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। এর ফলে তথ্য ব্যবস্থার পেশাদারিত্ব, সততা ও জবাবদিহিতা দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অসঙ্গতিগুলো দূর করতে হলে—প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়তে হবে; বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় উন্নত করতে হবে; তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে বাস্তব অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। এছাড়াও তথ্যের বিভাজন কমিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় বাড়তে হবে।

বিভিন্ন তথ্যভাণ্ডার এক প্ল্যাটফর্মে এনে নতুন ও সুসমন্বিত বিশ্লেষণ তৈরি করা সম্ভব। বিদ্যমান অসঙ্গতিগুলো দূর করে তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করলে সরকারি তথ্যের ওপর জনগণের আস্থা বাড়বে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন বা স্টেকহোল্ডাররা এই তথ্য বিশ্লেষণ করে আরও কার্যকর ও তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। তথ্য ব্যবস্থার গভীর পর্যালোচনার ভিত্তিতে একটি উন্নত ও স্বচ্ছ জনতথ্য ব্যবস্থার জন্য নিম্নলিখিত সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হলো।

সংস্কারের রূপরেখা তৈরি করণ

বর্তমান তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থার দুর্বলতা বিবেচনা নিয়ে পরিসংখ্যানগত সূচকগুলোর বিকৃতির মাত্রা নির্ধারণ করতে আরও গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে জাতীয় তথ্যভাণ্ডার পর্যালোচনা ও পুনর্মূল্যায়নের জন্য একটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের এখনই উপযুক্ত সময়। এই কমিটি অবশ্যই বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোর বাইরে এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে। কমিটিকে অতীতের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পরিসংখ্যানগুলোর প্রবণতা পর্যালোচনা

করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করে দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক চিত্র উপস্থাপন করতে হবে। ফলে তথ্য উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন; তথ্য প্রচার ব্যবস্থার উন্নয়ন; এবং মাননীয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে। একইসঙ্গে, এই তিনটি ক্ষেত্রে কাঠামোগত ও প্রশাসনিক সংস্কারের পথ তৈরি হবে।

এই কমিটিকে যথাযথ কর্তৃত্ব ও অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। একইসঙ্গে, এটি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ করবে। সরকারি তথ্য উৎপাদনকারী কর্মকর্তারা কমিটির অধীনে কাজ করবেন এবং পূর্ণ সহযোগিতা ও তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ দেবেন। যদি এই উদ্যোগ গ্রহণ না করেই তথ্য ব্যবস্থাপনাকে ঠিক করার চেষ্টা করা হয় তাহলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যার আশঙ্কা থেকে যায়। যা ভুল নীতিনির্ধারণের কারণও হতে পারে। সুতরাং এই কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি।

এছাড়া বিবিএসকে স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত প্রযুক্তিগত কমিটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই কমিটিতে স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা (তথ্য ব্যবহারকারী ও মূল্যায়নকারী) এবং তথ্য প্রস্তুতকারীরা (বিবিএসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা) থাকবেন। এই কমিটি পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি পর্যালোচনা করবে এবং বিবিএস কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য প্রকাশের আগে যাচাই ও অনুমোদন করবে। কমিটিকে প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই যুক্ত করতে হবে এবং পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরির প্রতিটি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। বর্তমানে মন্ত্রণালয় থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন নেওয়ার প্রচলন বন্ধ করা উচিত। এছাড়া সার্ভের ফলাফল প্রকাশের আগে পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন নেওয়ার প্রচলনও বাতিল করা উচিত। কারণ এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা শুধুমাত্র প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। আর কারিগরি বিষয়গুলো শুধুমাত্র বিবিএসের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।

পরিকল্পনা প্রণয়ন করণ

একটি শক্তিশালী ডাটা ইকোসিস্টেম বা তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। যেটা সবধরনের মানুষের তথ্যের চাহিদা পূরণ করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। এক্ষেত্রে কয়েকটি সুপারিশ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। প্রথমত, তথ্যের চাহিদা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ও ম্যাপিং করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাতে বিদ্যমান জরিপ ও প্রশাসনিক প্রতিবেদনের তথ্য সহজলভ্য হয়। তথ্যের পরিসর সম্প্রসারণ ও যথাযথভাবে সুশৃঙ্খল করে প্রস্তুত রাখা হলে বিভিন্ন বিষয়ে আরও সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্ভব হবে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি তথ্যের সংযোগ গড়ে তোলা হলে তথ্যের বৈচিত্র্য ও গভীরতা আরও সমৃদ্ধ হবে।

জাতীয় তথ্য-উপাত্তের মান যাতে পরিসংখ্যানের আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সে জন্য তথ্যের গুণগত নিশ্চয়তা কাঠামো (ডিকিউএএফ) তৈরি করা প্রয়োজন। এতে তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা, নির্ভুলতা ও নির্ভরযোগ্যতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হবে এবং একইসঙ্গে তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ও নিয়মিতকরণ বৃদ্ধি করা যাবে। তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য একটি কার্যকর তথ্য প্রচারনীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্যের ব্যাপ্তি ও ব্যবহারযোগ্যতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করাও অপরিহার্য। এর মধ্যে থাকবে তথ্যের যোগানদাতাদের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা; বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন করা; সংস্থাগুলোর অভ্যন্তরে পরিসংখ্যান সেল চালু করা ইত্যাদি। যা তথ্য সংক্রান্ত সহায়তা দেবে। এছাড়া তথ্য উৎপাদন ও প্রণয়ন কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জাতীয় অর্থায়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে যথাযথ বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ও সহায়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্যের প্রবাহকে আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে। উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করা হলে একটি কার্যকর ও তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণে সহায়ক ডাটা ইকোসিস্টেম বা তথ্য উপাত্ত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। যা সব ব্যবহারকারীর জন্য সহজলভ্য ও কার্যকর হবে। একইসঙ্গে সেটা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করণ

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করলে জাতীয় তথ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোর জন্য কার্যকারিতা ও প্রভাব বৃদ্ধি করার একটি সুযোগ আসবে। এজন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তবে বর্তমানে প্রকল্প, কর্মশালা ও বিদেশে সফরকেন্দ্রিক সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশি অনুদান ও ঋণের ওপর নির্ভরশীল। যা যথেষ্ট কার্যকর নয়। তাই তথ্য সংগ্রহের আধুনিক সরঞ্জাম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। এসব পদক্ষেপ তথ্যের গুণগত মান বাড়াতে আরও ঘন ঘন জরিপ পরিচালনা করতে এবং সবার জন্য তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

এছাড়া অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতীয় তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিগুলোকে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত কাঠামো ও সর্বোত্তম পন্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে করতে হবে। যেমন- জাতিসংঘের পরিসংখ্যানের নিজস্ব মৌলিক নীতিমালা, ওইসিডি মানদণ্ড, এসডিএসএন, টিরিএনডিএস(TReNDS) এবং উন্মুক্ত তথ্য কাঠামোর মাধ্যমে জাতীয় পরিসংখ্যানের গ্রহণযোগ্যতা ও তুলনামূলক মান বৃদ্ধি পাবে। এতে তথ্য ব্যবহারকারীদের মধ্যে আস্থা তৈরি হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার এই উন্নয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নতুন নতুন প্রযুক্তি যেমন জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, নাগরিক-উৎপাদিত তথ্য, ব্লকচেইন, মেশিন লার্নিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও বর্তমানে পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনার জন্য অপরিহার্য। এছাড়া মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, স্বয়ংক্রিয় রিপোর্টিং সিস্টেম ও ইন্টারঅ্যাকটিভ ডেটা পোর্টাল ব্যবহারের মাধ্যমেও তথ্য সহজলভ্য ও ব্যবহারযোগ্য করা সম্ভব।

এই প্রযুক্তিগুলোর মাধ্যমে তথ্য যাচাই ও গুণমান নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাধীন পর্যালোচনা করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের মাধ্যমে তথ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত সম্ভব হবে। একইসঙ্গে, জাতীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গে তথ্য ব্যবস্থার সামঞ্জস্যতা বৃদ্ধি পাবে। সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক চিত্র বোঝার জন্য তথ্য বিভাজন ও ঘাটতি পূরণ করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ নিয়মিত স্বাধীন নিরীক্ষা ও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচকের পুনঃমূল্যায়ন করতে হবে। যাতে তথ্য বিভ্রান্তি দূর হয় এবং বাস্তব অবস্থার প্রকৃত প্রতিফলন ঘটে। অতীতের বিতর্কিত তথ্য পুনঃমূল্যায়ন করলে ভবিষ্যতের তথ্যভিত্তিক নীতি গ্রহণের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি হবে। স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে নীতিনির্ধারকদের। এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থাপনা আরও নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ ও কার্যকর হয়ে উঠবে।

সমন্বয় ব্যবস্থা উন্নত করণ

সরকারি ও প্রান্তিক তথ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হলে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ও অসঙ্গতিপূর্ণ তথ্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সহজ হবে। এই সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তথ্য ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা আরও শক্তিশালী করা যাবে। আর এজন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো, সরকারি দপ্তর ও সংস্থাগুলোর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য কার্যকর কাঠামো তৈরি করা। সব সরকারি সংস্থাকে অন্যান্য সংস্থা ও অংশীজনদের সঙ্গে আরও বেশি তথ্য বিনিয়ম করার জন্য উৎসাহিত করা উচিত। এজন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অনুসরণ করা সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। এছাড়া সহজ কিছু পদক্ষেপের মাধ্যমেও দ্রুত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর মাসিক অগ্রগতি ও সংশ্লিষ্ট ডিপিপি নথিপত্র জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত। বিটিআরসির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো উন্মুক্ত করলে সরকারি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আরও তথ্যভিত্তিক কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। একইভাবে বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তথ্য ব্যবস্থার পরিধি আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব। এই উদ্যোগগুলো সরকারি তথ্যের সামঞ্জস্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। নীতি বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও

সুসংগঠিত, বাস্তবসম্মত ও কার্যকর করবে। এই সংস্কারের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করলে জাতীয় তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য সরকারি তথ্য-উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। সরকারি তথ্য ব্যবস্থাকে আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ এবং গণমাধ্যমের পাশাপাশি রাষ্ট্রের পঞ্চম স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি দিলে গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে। বিশ্বব্যাপী তথ্যের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিভিন্ন সফল মডেল রয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে।

যুক্তরাজ্যের অফিস ফর ন্যাশনাল স্টাটিস্টিক (ওএনএস) সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করে। এটি ইউকে স্টাটিস্টিকস অথোরিটির অধীনে পরিচালিত হয়। যা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তভাবে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ নিশ্চিত করে। আবার কানাডার স্টাটিস্টিকস অ্যান্ড অনুসারে, তারা সরাসরি সংসদের অধীনে পরিচালিত হয়। এর মাধ্যমে সরকারি নির্দেশনার বাইরে থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়েছে। মেক্সিকোর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্টাটিস্টিকস অ্যান্ড জিওগ্রাফি (আইএনইজিআই) দেশটির জাতীয় পরিসংখ্যান ও ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থার সমন্বয়কারী সংস্থা। ২০০৮ সালের জাতীয় পরিসংখ্যান ও ভৌগোলিক তথ্য আইন (Law on the National System of Statistical and Geographic Information) এর মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন দিয়েছে। এই সংস্কার তথ্য ব্যবস্থার শাসনকাঠামোকে শক্তিশালী করেছে এবং জনগণের মধ্যে বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে।

বাংলাদেশে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে—

- তথ্য ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হবে।
- গবেষণা ও নীতিনির্ধারণে নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যবহার করা সম্ভব হবে।
- সরকারি পরিসংখ্যান ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

এভাবে একটি শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। যা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন ও সুশাসনকে আরও শক্তিশালী ও টেকসই করবে। তথ্যের হেরফের করা ঠেকানো এবং তথ্যের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে স্বাধীন পরিসংখ্যান কমিশনে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। যা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং সরাসরি রাষ্ট্রপতির কাছে জবাবদিহি করবে। এই কমিশন গঠন তথ্য উৎপাদন, সংকলন ও প্রচারের সকল দিক তদারকি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যা আন্তর্জাতিক মানের নির্ভরযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। কমিশনের মূল দায়িত্ব হবে জাতীয় পরিসংখ্যানের অসঙ্গতি ও ঘাটতিগুলো গভীরভাবে তদন্ত করা। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরাও এ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে পারবে। এছাড়াও এটি একটি শাসন কাঠামো প্রস্তাব করতে পারে, যা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ থেকে তথ্যের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে। যার মাধ্যমে পরিসংখ্যানের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। কমিশন জাতীয় তথ্যকে বৈশ্বিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার পাশাপাশি তথ্যের গুণগত মান উন্নত করতে এবং তথ্যের ঘাটতি পূরণ করতে মনোযোগ দেবে। যা রেটিং এজেন্সি, উন্নয়ন অংশীদার এবং বিনিয়োগকারীদের মতো আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি করবে। এই উদ্যোগ একটি শক্তিশালী ডেটা ইকোসিস্টেম বা তথ্য উপাত্ত ব্যবস্থাপনা তৈরি করবে। যা প্রমাণভিত্তিক নীতি প্রণয়নকে সাহায্য করবে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের বৈশ্বিক বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে। এতে দেশের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংস্কার ও নীতিমালা

অধ্যায় ২৩: কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপন*

- অর্থনীতি স্থিতিশীল করতে হলে জরুরিভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি, ব্যাংক খাতের দুর্বলতা আর ডলারের চাপ মোকাবিলায় সমন্বিত ও দ্রুত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে
- বাস্তবসম্মত আর্থিক কাঠামোর ভিত্তিতে ২০২৫-২৬ সালের বাজেটে-রাজস্ব বৃদ্ধি, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে
- আগামী ২-৩ বছরের অন্তর্বর্তীকালীন মধ্যমেয়াদি কৌশল ও অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারকে (ব্যাংক, জ্বালানি, রাজস্ব, ব্যয়, উপাত্ত) অগ্রাধিকার দিতে হবে
- স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়ায় রপ্তানি সুবিধা হ্রাস ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা মোকাবিলায় একটি কার্যকর রূপান্তর কৌশল গ্রহণ করতে হবে
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে দুর্বল সুশাসন, তথ্যঘাটতি ও বৈষম্যমূলক সেবা ব্যবস্থাই বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ
- উন্নয়ন অংশীদার, ঋণদাতা ও বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ করে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, বৈদেশিক সহায়তার সুষ্ঠু ব্যবহার এবং বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকর্ষণকে কৌশলগতভাবে অগ্রাধিকার দিতে হবে

শ্বেতপত্র প্রণয়নে যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। তাতে মূলত অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দীর্ঘদিনের বিশ্বাসযোগ্যতার যথার্থতাই প্রমাণ করেছে। মাঠ পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণ করা হলে তথ্য-উপাত্তের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে আরও খারাপ চিত্র পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নিঃসন্দেহে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, নীতিগত পরিবর্তন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শ্বেতপত্রের এই শেষ অধ্যায়টি পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর বিশদ বিশ্লেষণের সারসংক্ষেপ যেমন নয়, তেমনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য করণীয়র পূর্ণাঙ্গ তালিকাও নয়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কার কর্মসূচির রূপরেখা নির্ধারণের জন্য শ্বেতপত্র প্রস্তুত করা হয়নি। বরং এই অধ্যায়টি নিম্নলিখিত সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে। যা তাৎক্ষণিকভাবে মনোযোগের দাবি রাখে।

- (১) বর্তমান সরকারের শাসনামলের প্রথম কয়েক মাসের অভিজ্ঞতার আলোকে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার জন্য একটি কর্মসূচি চালু করা।
- (২) আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের জন্য একটি কাঠামো নির্ধারণ।
- (৩) বিলম্বিত অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২০-২৫) শক্তিশালী মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে একটি মধ্য-মেয়াদি পরিকল্পনা কাঠামো (২০২৫-২৭) প্রস্তাব করা।
- (৪) অগ্রাধিকারভিত্তিতে সংস্কারের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা।
- (৫) স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের জন্য একটি কার্যকর রূপান্তর কৌশল বাস্তবায়ন করা
- (৬) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করা।
- (৭) উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে সংলাপের জন্য একটি ফোরাম আয়োজন।

* এই অধ্যায়টি প্রস্তুত করেছেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি ও আহ্বায়ক, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম;
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি ও কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এবং
জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সিপিডি।

২৩.১ অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার জন্য কর্মসূচি চালু করা

সংস্কার কর্মসূচির জন্য ব্যাপক প্রত্যাশা থাকলেও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচিকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

২০২১ সাল থেকে চলমান দীর্ঘস্থায়ী মূল্যস্ফীতি আপামর জনসাধারণের, বিশেষ করে সীমিত ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য এক গভীর সংকট তৈরি করেছে। পাশাপাশি সাধারণ জনগণ তাদের সঞ্চয় ও আমানতের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বিগ্ন। বিশেষত যারা ঝুঁকিতে থাকা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে আমানত রেখেছে। যদিও টাকার বিনিময় হার ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে সাময়িক স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে। তবে এর স্থায়িত্ব এখনো পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। বৈদেশিক খাত এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি যেখানে সরকার বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে টেকসই স্থিতিশীলতা আনার জন্য কার্যকর হস্তক্ষেপ করতে পারে।

দুঃখজনকভাবে সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে উৎপাদনশীল খাত এবং জরুরি সহায়তা প্রয়োজন এমন জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা দেওয়া যাচ্ছে না। ব্যক্তি বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব। এজন্য ব্যবসায়ী সমাজ সরকারের কাছ থেকে বন্দর ও লজিস্টিক ব্যবস্থার দক্ষতা, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং শিল্প ক্ষেত্রে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে নিশ্চয়তা চায়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা আইনের শাসন ও স্থিতিশীল ব্যবসায়িক পরিবেশ পুনরুদ্ধারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। যা বিনিয়োগকারীদের ব্যবসায়িক আস্থা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

নীতিগত প্রতিক্রিয়াগুলো এ পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খণ্ডিতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কঠোর সংকোচনমূলক নীতি অনুসরণ করেছে। অন্যদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমদানিকে উৎসাহিত করতে পর্যায়ক্রমে কর ও শুল্ক ছাড় দিয়েছে। তবে অবশ্যই ভোগ্য পণ্য সরবরাহের চেইনে কৃষক ও দেশীয় শিল্পকে সমর্থন দিয়ে নীতি প্রণয়ন করা উচিত। বাজারে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য বা অলিগার্ক সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়েছে দাঁড়িয়েছে। বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোর ভোগ্যপণ্যের বাজারে সম্ভাব্য কৃত্রিম সংকট তৈরি করার অপতৎপরতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতির জন্য অনলাইনে তাৎক্ষণিক তথ্য-উপাত্ত পাওয়া ও পূর্বাভাস ব্যবস্থার আধুনিকায়ন জরুরি। একইসঙ্গে দরিদ্র জনগণের জন্য ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-টিসিবির বিক্রয় কার্যক্রমের বাইরে আরও বিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন।

সংকটাপন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্যদের পরিবর্তন অবশ্যই স্বাগত জানানো উচিত। অর্থ ছাপিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে এসব সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংককে সহায়তা দিতে হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্ভবত এসব ব্যাংক নিয়ে আদ্যপান্ত পর্যালোচনা বা ফরেনসিক ডায়াগনোসিস করছে। যা ব্যাংকগুলোর সমস্যাগ্রস্ত সম্পদের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরবে। একইসঙ্গে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংকগুলো ঘুরে দাঁড়াতে পারবে এমন বিশ্বাস ও আস্থা তৈরি করতে না পারলে আমানতকারীরা সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংক থেকে আমানতের অর্থ তুলে নিতে সচেষ্ট হবে। এজন্য আমানতকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য দ্রুত একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা জরুরি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংকগুলোর অবশ্যই খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধারে দৃশ্যমান সাফল্য ও অগ্রগতি তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে অগ্রগতির বিষয়টি নিয়মিতভাবে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা উচিত। ব্যাংকগুলোর মূলধন ঘাটতি এবং তারল্য সংকট নিরসনে যথাযথ কৌশলগত মূলধন সংযোজন প্রয়োজন হতে পারে। যা যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করা জরুরি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তবে এই প্রক্রিয়াটি সুপরিকল্পিত ও যথাযথভাবে কার্যকর এবং ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরি। যাতে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

ডলারের বিনিময় হার তথা বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে আপাতত স্থিতিশীলতা মূলত রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি, আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের বাজেট সহায়তার কারণে সম্ভব হয়েছে। তবে এই প্রবণতা মধ্যমেয়াদে স্থিতিশীল নাও হতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী করতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আকৃষ্ট করাই মূল কৌশল হতে হবে। এই লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে কূটনৈতিক আলোচনার সমন্বয় ঘটানো জরুরি।

সরকার বিদ্যমান সীমিত আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ব্যয় ব্যবস্থাপনায় সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করছে। তবে ২০২৪ সালের জুনে পাসকৃত জাতীয় বাজেটে অবাস্তব প্রকল্প গ্রহণ এবং সেখানে জবাবদিহিতার অভাব দেখা গেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উচিত অবিলম্বে বাজেটের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য একটি বাস্তবসম্মত সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন করা। যা প্রয়োজনীয় নীতি অগ্রাধিকারগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের জন্য সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে প্রশাসনিকভাবে কর ফাঁকি রোধ এবং প্রত্যক্ষ করে ভিত্তি সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারগুলো খুঁজে বের করা দরকার।

সরকার যথাযথভাবে বাজেট সহায়তার জন্য বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে বিদ্যমান ঋণ পরিস্থিতির গভীর বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি। একইসঙ্গে বৈদেশিক ঋণ পুনর্গঠন ও পুনরায় আলোচনা করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও সংস্কার এজেন্ডা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আরও কাঠামোবদ্ধভাবে নীতিসংলাপ শুরু করা উচিত। যাতে সরকার দীর্ঘমেয়াদে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার যে কর্মসূচি তার জন্য তিনটি উপাদান প্রয়োজন। প্রথমত, উপরের আলোচনাগুলো বিবেচনায় নিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এই পরিকল্পনা সরকারের সকল নীতিনির্ধারণী সংস্থার নীতি-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডকে সমন্বিতভাবে পরিচালিত করবে এবং এটি নিয়মিতভাবে হালনাগাদ ও পর্যবেক্ষণ করা যাবে। দ্বিতীয়ত, এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য একটি অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে। যা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে পরামর্শ দেবে। এই কাউন্সিলে অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রধান মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টারা, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকনেতারা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এই কাউন্সিলের কার্যক্রমকে সহায়তা করতে আমলাতন্ত্র কাজ করবে।

তৃতীয়ত, এই কাউন্সিলের কাজকে সহায়তা করতে বাস্তবসম্মত, উচ্চমানের এবং বিভাজিত তথ্যের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। এই দায়িত্ব পালনের জন্য একটি কারিগরি বিশেষজ্ঞ দল নিয়োগ করা উচিত, যেখানে সরকারি কর্মকর্তা ও স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা থাকবেন। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কর্মসূচির অগ্রগতি ও প্রভাব প্রতি ১৫ দিনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে জানাতে হবে। পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, উন্নয়ন সহযোগী এবং গণমাধ্যমসহ বিস্তৃত অংশীজনদের এই অগ্রগতির বিষয়ে নিয়মিতভাবে অবহিত করা উচিত। এটি অংশীজনদের আস্থা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করবে।

সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার জন্য সহজে বাস্তবায়নযোগ্য কিছু পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে আইনগত এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার জন্য যেসব সংস্কার কার্যক্রম রয়েছে তা যথাযথভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাস্তবায়ন করতে হবে। স্থিতিশীলতার এই পর্যায়টি আসন্ন বাজেট (২০২৫-২৬) পর্যন্ত চলবে বলে আশা করা যায়। এই সময়ে স্থিতিশীলতা আনার যে কার্যক্রম তাকে সুসংহত করতে হবে এবং মধ্যমেয়াদি সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। টেকসই স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক সংস্কারের ওপর নির্ভরশীল হবে। তবে এর শুরুটা সমন্বিত পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি সুসংগঠিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো গঠন করার মাধ্যমে হওয়া উচিত।

২৩.২ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের জন্য একটি কাঠামো নির্ধারণ

২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এনে দেবে। যার মাধ্যমে তারা স্বল্পমেয়াদী যেসব সংস্কার আছে সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে পারে। একইসঙ্গে, সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনার জন্য মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তি তৈরি করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার সূচনা একটি বিশ্বাসযোগ্য আর্থিক কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে হওয়া উচিত। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিম্নলিখিত পাঁচটি নীতিগত দিকনির্দেশনা বিবেচনা করতে পারে।

রাজস্ব পরিসর সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ

রাজস্ব পরিসর সম্প্রসারণের জন্য একটি কৌশলগত ও বহুমুখী পদ্ধতি গ্রহণ করা জরুরি। যা অতিরিক্ত অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ এবং আর্থিক ব্যবস্থার ফাঁকফোকর দূর করার ওপর গুরুত্ব দেবে। করের বোঝা বিদ্যমান করদাতাদের ওপর না চাপিয়ে কর কাঠামোকে আরও বিস্তৃত করার জন্য ২০২৬ অর্থবছরের বাজেট একটি সুযোগ। ডিজিটাল টুল ব্যবহারের মাধ্যমে কর ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করলে এনবিআর ডিজিটাল অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন উৎস থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারবে।

বর্তমানে প্রচলিত কর রেয়াত ও ছাড়গুলোর গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা জরুরি। তথ্যভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সরকার অকার্যকর কর প্রণোদনাগুলো চিহ্নিত করে ধাপে ধাপে বন্ধ করতে পারবে। একইসঙ্গে প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের জন্য কৌশলগত খাতগুলোতে কর প্রণোদনা দিতে পারবে। পাশাপাশি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে কর ফাঁকি রোধ এবং কর আদায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজস্ব কাঠামো গড়ে তোলার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিশেষ করে সম্পদ ও সম্পত্তির ওপর কর আদায়ের ক্ষেত্রে কার্যকর নীতিমালা গ্রহণের সময় এসেছে। অবৈধ আর্থিক প্রবাহ কমানোর জন্য এবং কর ফাঁকি ও কর পরিহার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে আরও স্বচ্ছ ও দক্ষ কর ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। সরকারের দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব সংস্কার ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য এসব পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনাকে সুসংহত করা

অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য চলমান মিতব্যয়ী নীতিগুলো বজায় রাখা জরুরি। তবে তা যেন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ওপর নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে এটা নিশ্চিত করতে হবে। আসন্ন জাতীয় বাজেটে এই গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সেখানে শুধুমাত্র অবকাঠামো উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়া যাবে না। স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাজেট প্রণয়নের সময় যেসব অবকাঠামোর কাজ প্রায় শেষ হয়েছে অথবা অর্থনীতির জন্য সুবিধাজনক নয় সেসব প্রকল্পগুলোর পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করা দরকার। এই পর্যালোচনার মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলো চিহ্নিত করে ক্ষতি কমানোর উপায় বের করতে হবে।

এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তালিকা থেকে অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাদ দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। যাতে সরকারি ব্যয় পরিকল্পনাগুলো আরও কার্যকর হয় এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

অপ্রয়োজনীয় ও ব্যবহৃত সরকারি ব্যয় হ্রাসের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা

সরকারি যানবাহন কেনা ও বিদেশে ভ্রমণের মতো অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয় হ্রাসের বর্তমান প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তাহলে সম্পদের আরও দক্ষভাবে বণ্টন নিশ্চিত হবে এবং দায়িত্বশীল ব্যয় ব্যবস্থাপনা উৎসাহিত হবে। তারপরও রপ্তানি ও রেমিট্যান্স সংক্রান্ত রাজস্ব প্রণোদনা থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসা যায় সে বিষয়ে কৌশল প্রণয়ন করাও জরুরি। যদি বাজারভিত্তিক বিনিময় হার নীতি গ্রহণ করা হয়, তবে এর ফলে টাকার অবমূল্যায়ন হতে পারে। যা বর্তমানে প্রচলিত রাজস্ব প্রণোদনাকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে সামঞ্জস্য করতে সহায়তা করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য টেকসই কাঠামো তৈরি করবে এবং অর্থনীতির কৌশলগত খাতগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করবে।

অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ

২০২৫-২৬ অর্থবছরের রাজস্ব পরিসর সম্প্রসারণ ও সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হলে ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রভাব ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া জরুরি। রাজস্ব ও ব্যয় উভয় ব্যবস্থার নকশায় সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা প্রদানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ব্যয় কাঠামো এমনভাবে সাজানো উচিত যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সামলানো যায় এবং নিম্ন ও সীমিত আয়ের পরিবার এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের সহায়তা দেওয়া যায়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বড় আকারের ও লক্ষ্যভিত্তিক বিনিয়োগ প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যেমন নারী, যুবক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য এটা খুবই জরুরি। আসন্ন বাজেটে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ ও গ্রামীণ এলাকায় মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

এছাড়া কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সম্প্রসারণ করে বাজারে চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। সরকারের উচিত নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া, যাতে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানো যায়। পাশাপাশি পরিবেশগত দুর্বলতা মোকাবিলার জন্য জলবায়ু সহনশীলতা কর্মসূচির জন্য নতুন তহবিল সংগ্রহ ও বণ্টন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়ক হবে।

বাজেট ঘাটতি পূরণে বৈদেশিক উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবহার

বাজেট ঘাটতি মোকাবিলায় বহিঃস্থ উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সুযোগগুলো খুঁজে বের করতে হবে। ক্রমহ্রাসমান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সরকারকে বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিশেষ করে যেসব প্রকল্প ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে ৮৫ শতাংশ বা তার বেশি সম্পন্ন হবে, সেগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ এগুলো দ্রুত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, বেসরকারি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক স্বল্প সুদের ঋণ বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য একটি কার্যকর অর্থায়নের সুযোগ তৈরি করতে পারে। তবে এসব বৈদেশিক তহবিল পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থাগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। ফলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে দ্রুত উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরি।

পাশাপাশি নীতিগত সংস্কারও বাজেট সহায়তা পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ফলে সরকার আরও কার্যকরী কর্মপন্থা নিতে পারবে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মতো সংস্থাগুলোর বাজেট সহায়তাকে কার্যকর সংস্কারমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে শক্তিশালী করতে হবে। যাতে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা যায়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বৈদেশিক বাজেট সহায়তা ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থানের সুষ্ঠু ব্যবহার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এটি নিশ্চিত করলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলো পূরণ করা সম্ভব হবে এবং দেশকে একটি টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেওয়া যাবে।

সুশাসন নিশ্চিত করা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপট অর্থবহ সংস্কারের জন্য চ্যালেঞ্জ। আবার একইসঙ্গে এটি একটি সুযোগও এনে দিয়েছে। যদিও এই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়গুলোর সমাধানের পথ প্রশস্ত করতে পারে। রাজস্ব সংগ্রহের প্রচেষ্টায় সুশাসনের উপর গুরুত্ব দিয়ে সরকার একটি আরও দক্ষ ও কার্যকর কর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। একইসঙ্গে করদাতা ও বেসরকারি খাতের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে পারে। সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে তা টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সুশাসন অর্জন ও সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে রাজনৈতিক সমর্থন নিশ্চিত করা গেলে এই কাজগুলো করা সহজ হবে। আগামী অর্থবছরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে পারে। একইসঙ্গে সম্মিলিতভাবে এই প্রচেষ্টাগুলো সরকারি অর্থব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি আনতে পারে।

২৩.৩ মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার প্রস্তাবনা

অষ্টম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) স্থগিত হওয়ার ফলে এই সময়ের জন্য লক্ষ্যনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন। যেহেতু অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ সীমিত, তাই পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা করা বাস্তবসম্মত নয়। তবে বাজেট প্রণয়ন এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার জন্য দুই থেকে তিন বছরের মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে সরকার একটি দুই বছর মেয়াদি পরিকল্পনার কাঠামো প্রণয়নের দিকে মনোযোগ দিতে পারে। প্রয়োজনে সেটা বাড়ানো যেতে পারে। এই পদ্ধতিটি মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) প্রস্তুতিতে সহায়তা করবে এবং একইসঙ্গে ধারাবাহিকতা, পূর্বাভাসযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করবে। যা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদার, ঋণদাতা ও অন্যান্য অংশীজনদের আস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই মধ্যমেয়াদি কৌশল জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন রূপরেখা দেবে যা একইসঙ্গে নতুন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে পারবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের সাথেও সম্পর্ক বৃদ্ধি করবে। যাতে বৈদেশিক সহায়তায় অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক খাতে বিনিয়োগ ও পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে। দেশীয় অগ্রাধিকার ও আন্তর্জাতিক সহায়তার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে। এই মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা কাঠামো বাংলাদেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবে এবং দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্ব ও অগ্রগতির জন্য শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলতে পারবে বলে আশা করা যায়।

২৩.৪ অগ্রাধিকারভিত্তিক সংস্কারের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ

বাংলাদেশের শাসন ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে যে গভীর চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে তা এই শ্বেতপত্রে তুলে ধরা হয়েছে। যা বহুমাত্রিক ও বিস্তৃত সংস্কার ছাড়া দূর করা সম্ভব নয়। অর্থনীতির প্রধান খাতগুলোর বাধা চিহ্নিত করে সমাধান করা জরুরি। যাতে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী করা যায়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ইতোমধ্যে কিছু সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তবে দেশের অর্থনীতিকে সংকট থেকে বের করে আনতে এই প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করতে হবে।

শ্বেতপত্রের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে ছয়টি প্রধান অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো, ব্যাংকিং খাত; জ্বালান ও বিদ্যুৎ খাত; রাজস্ব আহরণ ও ব্যবস্থাপনা; অবৈধ আর্থিক প্রবাহ; সরকারি ব্যয়, বিশেষ করে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর দক্ষ ব্যবস্থাপনা; এবং ডাটা ইকোসিস্টেমের উন্নয়ন। এই খাতগুলোর জন্য ইতোমধ্যে

কমিশন, কমিটি ও টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। যাতে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য কার্যকর সংস্কার পরিকল্পনা ও সুপারিশ প্রদান করা যায়। তবে শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ নিলে যথেষ্ট হবে না। এজন্য একটি সমন্বিত ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা জরুরি। যাতে দীর্ঘদিনের কাঠামোগত সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা যায় এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে টেকসই করা যায়।

২৩.৫ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জন্য কার্যকর রূপান্তর কৌশল বাস্তবায়ন

জাতিসংঘের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী, বাংলাদেশ ২০২৬ সালের নভেম্বর মাসে স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকা থেকে উত্তরণের জন্য প্রস্তুত। বাংলাদেশ এর আগে দুই দফায় (২০১৮ ও ২০২১) জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি (ইউএনসিডিপি) নির্ধারিত তিনটি সূচক পূরণ করেছে। সম্প্রতি ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সালে সিডিপির ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা অনুযায়ী, সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান এখনও অনুকূলে রয়েছে।

তবে চলতি অর্থবছরে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কিছুটা শ্লথ হলেও বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারিত সীমার নিচে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচকে সাম্প্রতিক উদ্বেগ থাকলে সেটা তেমন প্রাসঙ্গিক নয়। জাতিসংঘের সংস্থাগুলো কেবল তখনই তাদের হিসাব পুনর্বিবেচনা করবে যখন সরকারের নতুন কোনো তথ্য-উপাত্ত পাবে। কিছু রণাঙ্গনিকারক গোষ্ঠীর আপত্তি থাকলেও বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত কোনো কারণ নেই।

এই পরিস্থিতিতে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ কৌশল গ্রহণে কার্যকর ও সুসংগঠিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যাতে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের ফলে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব কীভাবে মোকাবিলা করা যায় এবং কাঠামোগত অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে কীভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সে ব্যাপারে একটা রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সময়সীমা স্থগিত বা পিছিয়ে দেওয়া হলে তা বিভিন্ন মহল থেকে রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

তবে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে একটি মসৃণ রূপান্তর কৌশল (Smooth Transition Strategy-STS) প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতির একটি কাঠামো আছে। তবে এই কৌশলটির সমন্বিত বাস্তবায়ন, প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর ভূমিকা ও নীতিনির্ধারণী নেতৃত্ব নিশ্চিত করা এখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। সঠিক দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা গেলে বাংলাদেশ সফলভাবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পথে অগ্রসর হতে পারবে।

২৩.৬ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা

আমরা জাতিসংঘের এজেন্ডা ২০৩০-এর মধ্যপথে পৌঁছেছি। ফলে উদ্বেগের বিষয় হলো, জাতিসংঘের এসডিজি প্রতিবেদন ২০২৪ অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী মাত্র ১৭ শতাংশ লক্ষ্য বর্তমানে সঠিক গতিপথে রয়েছে। যদিও UNESCAP SDG গেটওয়ে অনুযায়ী, বাংলাদেশ ২৪৮টি নির্দেশকের মধ্যে ৩৩ শতাংশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবুও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। কারণ ১৭ শতাংশ নির্দেশক নেতিবাচক রয়েছে। আর ১০ শতাংশ স্থবির অবস্থায় আছে। এই চ্যালেঞ্জ আরও জটিল হয়ে উঠছে, কারণ বিভাজিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক চিত্র উঠে আসছে না। বিশেষ করে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এটা প্রকট আকার ধারণ করেছে।

বাংলাদেশের জন্য এসডিজি ট্র্যাকার-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হল, ২০১৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ৫৮ শতাংশ নির্দেশকের (জলবায়ু-সংক্রান্ত নির্দেশকসহ) কোনো তথ্য নেই। তবে বিদ্যমান তথ্যের একটি মিশ্র চিত্রও রয়েছে। দেখা গেছে ৫৩টি নির্দেশক ইতিবাচক অবস্থায় রয়েছে এবং ৩৪টি খারাপ অবস্থায় আছে। আর ৯টি স্থবির হয়ে আছে। কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশকের অবস্থা তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে উদ্বেগ তৈরি

করেছে। বাংলাদেশে এসডিজি অর্জন এবং এর চ্যালেঞ্জগুলোর মূল্যায়ন চারটি প্রধান ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যেতে পারে। এগুলো হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত এবং শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত যেখানে ২০১৯ সালের পরের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে (এসডিজি ১, ২, ৭, ৮ ও ১০) শুধুমাত্র এসডিজি ৭ (সাশ্রয়ী ও টেকসই জ্বালানি) লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। বিদ্যুৎ সুবিধার প্রসার, পরিচ্ছন্ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের সামান্য বৃদ্ধি এবং শক্তি উৎপাদন সক্ষমতার উন্নতির পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে। বিশেষ করে (energy intensity), জিডিপি তুলনায় প্রাথমিক জ্বালানি ব্যবহারের অনুপাত হ্রাস পেয়েছে। এসডিজি ১ (দারিদ্র্য দূরীকরণ) লক্ষ্যেও কিছু অগ্রগতি হয়েছে। তবে দারিদ্র্য পরিমাপের পদ্ধতি এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে সরকারি ব্যয় হ্রাস নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। চলমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ যেমন উচ্চ মূল্যস্ফীতি, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার বৃদ্ধি, শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে নেই এমন তরুণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসঙ্গে শিশুশ্রমের উদ্ভবগতি এবং সরকারি সেবার অপরিপূর্ণতা লক্ষ্যণীয়। এসবই ব্যাপক দুর্নীতির কারণে এসডিজি ২ (শূন্য ক্ষুধা), এসডিজি ৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) এবং এসডিজি ৮ (উন্নত কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি) সূচকগুলোর স্থবিরতা বা অবনতি হয়েছে।

আবার সামাজিক ক্ষেত্রে (এসডিজি ৩, ৪, ৫ এবং ৬) এসডিজি ৬ (পরিষ্কার পানি ও স্যানিটেশন) কিছু অবকাঠামোগত উন্নতি হয়েছে। যেমন হাত ধোয়ার সুবিধার সম্প্রসারণ। তবে নিরাপদ খাবার পানীয় এবং পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবনতি হয়েছে। এসডিজি ৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ), এসডিজি ৪ (গুণগত শিক্ষা) এবং এসডিজি ৫ (লিঙ্গসমতা) নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে। কারণ দেশে বাল্যবিবাহ, শিশু মৃত্যুহার এবং কিশোরি মাতৃত্বের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মানেরও অবনতি হয়েছে। এই পরিস্থিতি আরও সংকটময় হয়ে উঠেছে শিক্ষাবৃত্তি ও উপবৃত্তির সীমিতকরণ, শিশুশ্রমের উদ্ভবগতি এবং সরকারি সেবায় দুর্নীতির কারণে।

এছাড়া অনানুষ্ঠানিক শ্রমবাজার বিশেষ করে গৃহস্থালি ও পরিচর্যা সম্পর্কিত কাজে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বেড়েছে। যা শ্রমবাজারে স্থায়ী লিঙ্গ বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে এবং লিঙ্গসমতা অর্জনের পথে বড় বাধা সৃষ্টি করেছে। এই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সমস্যাগুলো বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। জলবায়ু বিষয়ক এসডিজি (এসডিজি ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫) অর্জনে প্রধান সমস্যা হলো পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব। তারপরও জলবায়ু সংক্রান্ত এসডিজির অগ্রগতি বৈশ্বিক উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। যা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মুখে এসব লক্ষ্য অর্জনকে আরও জটিল করে তুলেছে।

শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকারি তথ্য অনুযায়ী, জনসেবা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে। বিশেষ করে জন্ম নিবন্ধনে উন্নতি হয়েছে এবং ২০২০ সাল পর্যন্ত সংঘাতজনিত মৃত্যুহার কমেছে। তবে এই ইতিবাচক অগ্রগতিকে স্নান করে দিয়েছে বিচারবহির্ভূত হত্যা, অপহরণ, গুম, নির্বিচার আটক এবং সাংবাদিক, গণমাধ্যমকর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান ঘটনা। এই প্রবণতা বিগত সরকারের সময়ে নাগরিক অধিকার অবক্ষয়ের পাশাপাশি মানবাধিকার সংস্থাগুলোর স্বাধীনতা সংকুচিত হওয়ার দিকেও ইঙ্গিত দেয়। আসলে এগুলো বাংলাদেশের পূর্ববর্তী সরকারের অধীনে সীমিত নাগরিক পরিসর, স্বচ্ছতার অভাব, জবাবদিহির ঘাটতি ও দুর্বল শাসন কাঠামোর প্রতিফলন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা ও সমস্যাগুলোও স্পষ্ট করে তোলে। যা আরও ন্যায়সঙ্গত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে প্রধান অন্তরায়।

এসডিজি বাস্তবায়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে এসডিজি ১৭ সংক্রান্ত অগ্রগতির অভাবে। সবচেয়ে হতাশাজনক পারফরম্যান্স লক্ষ্য করা গেছে দেশীয় সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে। একইসঙ্গে, জিডিপি অনুপাতে রেমিট্যান্স প্রবাহও হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়েছে প্রয়োজনীয় মাত্রার তুলনায় বৈদেশিক সাহায্যের নিম্ন প্রবাহ। এছাড়া সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তুলেছে মৌলিক পরিসংখ্যানের বাইরে বিস্তৃত ও বিশ্লেষণমূলক তথ্যের

অভাব। ফলে তথ্য উৎপাদনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। তারপরও বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তি স্থানান্তর, বাণিজ্য ও অভিবাসন সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর ধীর অগ্রগতি বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

অতিমারীর পর থেকে উন্নয়ন নীতির কাঠামো হিসেবে এসডিজি তার পূর্বের গতি হারিয়েছে। উন্নয়ন এজেন্ডাকে পুনরুজ্জীবিত করতে এসডিজির মূল নীতিগুলো যেমন— কাউকে পিছিয়ে না রাখা, তথ্য বিপ্লবকে উৎসাহিত করা, স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করা এবং সমন্বিত ও রূপান্তরমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে আবার গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং নীতির সামঞ্জস্য পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন।

২৩.৭ অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত ফোরামের আয়োজন

অন্তর্ভুক্তিকালীন সরকার আসার সাথে সাথে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রেক্ষাপট ও আলোচনা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এসব পরিবর্তন দেশের বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্কেও প্রভাব ফেলছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদাররা এখন পর্যন্ত অন্তর্ভুক্তিকালীন সরকারের সাথে কাজ করতে এবং তাদের সমর্থন বৃদ্ধি করতে সদিচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে পূর্ববর্তী সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ বৈদেশিক সহায়তা ও অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প ও নীতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে কি না সেটা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

উন্নয়নে অর্থায়নকারীদের পাশাপাশি বাংলাদেশের রপ্তানির জন্য বিশেষ বাজার সুবিধা প্রদানকারী উন্নয়ন অংশীদাররাও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে অনুকূল পরিবেশের অভাব নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে আসা বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও বর্তমান সরকারের সাথে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। এই প্রেক্ষাপটে সরকার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের চারটি প্রধান গোষ্ঠীর সাথে বিস্তৃত আলোচনা আয়োজনের জন্য একটি ফোরাম গঠন করতে পারে। এই চারটি গোষ্ঠী হলো, (ক) বৈদেশিক সহায়তা-অর্থায়ন প্রদানকারীরা, (খ) বিশেষ বাজার সুবিধা প্রদানকারীরা, (গ) বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের গ্রহণকারীরা এবং (ঘ) বিদেশি বিনিয়োগকারীরা।

প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন ফোরাম সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, উপরে উল্লেখিত চার উন্নয়ন অংশীদার, বিশেষজ্ঞ, দেশীয় বিনিয়োগকারী, শ্রমিক ইউনিয়ন, নাগরিক গ্রুপের সদস্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অংশীদারদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। ফোরামের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

- উন্নয়ন অংশীদারদের অগ্রাধিকারগুলো বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন প্রত্যাশার সঙ্গে সমন্বয় করা।
- বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে এবং উন্নয়ন অংশীদারদের নিজেদের মধ্যেও সমন্বয় বৃদ্ধি করা।
- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নীতি ও সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করা।
- উন্নয়ন সহযোগিতার কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ চিহ্নিত করা।

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন ফোরামটি ২০২৫ সালের প্রথমদিকে ঢাকায় আয়োজন করা যেতে পারে। এটি অন্তর্ভুক্তিকালীন সরকারকে দেশের মধ্যমকালীন উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্কার এজেন্ডা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সহায়তা করবে। একইসঙ্গে এর জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা সংগ্রহ করতে সাহায্য করবে। একদিন বা দেড়দিনের এই প্ল্যাটফর্মটি বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অফিসের নেতৃত্বে, এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কের সক্রিয় অংশগ্রহণে ইআরডির সহায়তায় এবং উন্নয়ন অংশীদারদের স্থানীয় পরামর্শক দলের সহযোগিতায় আয়োজন করা যেতে পারে। ফোরামের কাঠামোতে একটি উদ্বোধনী সেশন, মূল বক্তৃতা,

বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার শ্বেতপত্র

বিষয়ভিত্তিক গোলটেবিল আলোচনা, একটি প্রতিক্রিয়া বা ফিডব্যাক সেশন এবং পরিশেষে একটি ফলপ্রসূ ডকুমেন্ট গ্রহণের মাধ্যমে ফোরামের সমাপ্তি হবে। এই ডকুমেন্টটি বাংলাদেশের ভবিষ্যত উন্নয়ন সহযোগিতার এজেন্ডা নির্ধারণ করবে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সরকার ও শাসন ক্ষমতার পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। শাসনভার গ্রহণের পরবর্তীতে এই সরকারকে গভীর কাঠামোগত সংকট এবং বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, সুশাসনের ঘাটতি, দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি, ক্রমবর্ধমান আয়-ভোগ-সম্পদ বৈষম্য এবং ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি এই চ্যালেঞ্জসমূহকে আরো ঘনীভূত করে তোলে।

এই পরিস্থিতিতে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ২০২৪ সালের ২৯ আগস্ট একটি গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর একটি ‘শ্বেতপত্র’ (White Paper) প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এ দায়িত্ব পালনের জন্য একটি ‘শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি’ (White Paper Committee) গঠন করে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন প্রস্তুতপূর্বক জমা দেয়ার জন্য ১২ সদস্যের এই কমিটিকে তিন মাস সময় দেওয়া হয়। কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে, এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে, এবং সেটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে কাছে হস্তান্তর করে। দলিলটি সম্বন্ধে অব্যাহত আগ্রহের প্রেক্ষিতে এর বাংলা ভাবানুবাদ প্রকাশ করা হলো।